এই নরদেহ

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

EI NARADEHA PART-I
(This mortal human flesh)
A novel by BIMAL MITRA
Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market,
Calcutta-7 (1st Floor) INDIA

প্রথম প্রকাশ
পৌষ, ১৯৬০

প্রতিষ্ঠাতা
ঁশরৎচন্দ্র পাল
ঁকিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রণে ঃ
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বর্ণসংস্থাপক ঃ
প্রিন্ট-এন-পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

ISBN-31-7334-149-4

শ্রীনাথমল কেডিয়া

প্রীতিভাজনেষু —

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের কয়েকটি বই

এই নরদেহ (প্রথম খণ্ড)	১০০্	সরস্বতীয়া	৩০্
পতি পরম গুরু	১ম ১০০্ ২য় ১০০্	মনে রইলো	৩০
পাঁচকন্যার পাঁচালী	৬০্	এর নাম সংসার	৪৫্
বিষয় নরনারী	৬০্	বিবাহিতা	৩৫্
স্বামী-স্ত্রী সংবাদ	৬০্	কিশোব অমনিবাস	৩৫্
ভগবান কাঁদছে	৪৮্	লাল নীল হলদে	৩০্
কথা ছিল	৩৫্	টক ঝাল মিষ্টি	৩০্
হে নূতন	৩০্	সুখের অসুখ	৩৫্
যোগাযোগ শুভ	৪০্	গুলমোহর	৩৫্
টাকার মুকুট	৩০্	রাণী সাহেবা	৪০্
রাজরাণী হও	৩৮্	বিশ্বরূপ দর্শন	৪৮্
মনের আয়নায়	৪৮্		

এছাড়াও এই লেখকের অন্যান্য বই

সাহেব-বিবি-গোলাম
কড়ি দিয়ে কিনলাম
একক দশক শতক
বেগম মেরী বিশ্বাস
সব ঝুট হ্যায়
মন কেমন করে
দিনের পর দিন
শনি রাজা, রাহু মন্ত্রী
গল্প সম্ভার
চার চোখের খেলা
চলো কলকাতা
কথা চরিত মানস
দু চোখের বালাই
ও হেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প
কলকাতা থেকে বলছি
আমি বিশ্বাস করি
তিন নম্বর সাক্ষী
যা ইতিহাসে নেই
রাজা হওয়ার ঝকমারি
বিষয় বিষ নয়
রাতের কলকাতা
যে অঙ্ক মেলেনি
পয়সা পরমেশ্বর
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

মিথুন লগ্ন
অন্য রূপ
বাহার
স্ত্রী
কাহিনী সপ্তক
রঙ বদলায়
নবাবী আমল
রাজা বদল
যে যেমন
কে?
পরস্ত্রী
আমি
নটনী
লজ্জাহরণ
শ্রেষ্ঠ গল্প
বেনারসী
রাজপুতানী
বিনিদ্র (অপ্রকাশিত)
পুতুল দিদি
সে এলো
সুয়োরাণী
কন্যাপক্ষ
কুমাবী ব্রত
ফুলফুটক

চলতে চলতে
তিন ছয় নয়
জন গণ মন
নিশিপালন
চাঁদের দাম এক পয়সা
হাতে রইলো তিন
মধ্যিখানে নদী
নিবেদন ইতি
মৃত্যুহীন প্রাণ
প্রথম পুরুষ
এক রাজার ছয় রাণী
সাহিত্য বিচিত্রা
নগর সংকীর্ত্তন
বরনারী (জাবালী)
সখী সমাচার
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
প্রেম পরিণয় ইত্যাদি
সুনির্বাচিত
রাগ ভৈরব
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
আসামী হাজির
যাদের কেউ নেই
খেল্ নসীব কা
পটভূমি কলকাতা

লেখকের নিবেদন

আমাদের বিশ্বস্রষ্টা পৃথিবীর যাবতীয় জীবকে সম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই পশুপক্ষী, বৃক্ষ-লতা জলচর স্থলচর সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণ। একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষ, মানুষকে সৃষ্টি করবার সময় বিশ্বস্রষ্টা বলেছিলেন—যাও, তোমাকেই একমাত্র অসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করলাম। তুমি নিজের চেষ্টায় নিজের সংগ্রামে নিজের শ্রম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সাধনা দিয়ে সম্পূর্ণ হও। সম্পূর্ণ হওয়া তোমার কর্তব্য। আমি তোমাকে শুধু সৃষ্টি করেই দায়-মুক্ত।

এই বিশ্বস্রষ্টার নির্দেশে গ্রামের ছেলে সন্দীপ লাহিড়ী একদিন কলকাতা শহরে এসেছিল। তখন সে বালক। এসে এমন একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে অর্থসামর্থ্য আর প্রাচুর্য্যের অপ্রতিহত স্থিতি। সেই অর্থ-সামর্থ্য আর প্রাচুর্য্যের পরিবেশ কল্পনাতীত ছিল। তখন থেকে এই শহরে চরম দারিদ্র্য দেখলে, চরম বৈরাগ্য দেখলে, ঐশ্বর্য্য দেখলে, তার সঙ্গে দেখলে প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের সবরকম প্রতিযোগিতা—অর্থের প্রতিযোগিতা, অনর্থের প্রতিযোগিতা, দম্ভের প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। সব কিছু দেখে সন্দীপ ভাবলে—এ কোথায় এলাম আমি, চারপাশের এই সব কারা? অথচ তারই মতন সকলের দু'টো করে হাত আছে, দু'টো করে পা আছে, একটা করে মাথা আছে—অথচ এদেরও তো সবাই মানুষ বলে জানে, মানুষ বলে ভাবে।

সে ভাবতে লাগলো তাহলে তার কী করণীয়, তার কী কর্তব্য, তার কী লক্ষ্য হওয়া উচিত? কী করলে সে মানুষ পদবাচ্য হবে? কী করলে তার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হবে, সম্পূর্ণ হবে? সেই প্রশ্নের উত্তরই সে সারা জীবন ধরে খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে লাগলো কোথায় তার আদি, কোথায় তার অন্ত? আদি-অন্তহীন যে অনন্ত, তার সন্ধান সে কী করে কোথায় পাবে? কার কাছ থেকে পাবে?

আর সম্পূর্ণতা?

সে সম্পূর্ণই বা হবে কোন্ পথে? যখন সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তখন কি সে এই জগৎ সংসারকে অন্যদের মতো কেবল বঞ্চনা করেই যাবে? মানুষের জন্যে এতটুকু সত্য, এক কণা মঙ্গল ও কি সে রেখে যেতে পারবে না? সামান্য এই দেহটার পরিচর্যা করেই বেঁচে থাকবে? এই নশ্বর নরদেহটা?

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমাব পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত পঁচিশ বছর যাবৎ অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ওগুলি এক অসাধু জুয়াচোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু লোক এই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠক-বর্গকে প্রতারণা করে আসছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর সহ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত আছে।

॥ আলাপ ॥

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন নিজের সমস্ত অতীতটা পরিক্রমা করতে ইচ্ছা হয়। অতীতটা তখনই মানুষের মনে পড়ে, যখন তার কাছে ভবিষ্যৎটা ছোট হয়ে আসে। কম বয়েসে মানুষের কাছে অতীতটা তুচ্ছ তখন তার কাছে ভবিষ্যৎটাই আসল। তখন সেই কম বয়েসে সব কিছুই সে কামনা করে বসে। কামনা করে সুখ-সমৃদ্ধি-সৌভাগ্য। সব কিছু দুর্লভ কামনা করার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যাশা তাকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে শেখায়, তাচ্ছিল্য করতে শেখায়। কিন্তু যেই আধখানা জীবন ফুরিয়ে যায় তখনই আসে প্রত্যয়। তাই এই পৃথিবীর সব মানুষের জীবনই প্রত্যাশা আর প্রত্যয়ের সমন্বয়। প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে প্রত্যয়ে পৌঁছে তবে সে পরিত্রাণ পায়।

কথাগুলো নিবারণকাকার। ছোটবেলায় নিবারণকাকা সন্দীপকে খুব স্নেহ করতেন। বলতেন—কথাগুলোর মানে তুমি এখন বুঝতে পারবে না বাবা। যখন আমার মত বয়েস হবে তখন বুঝবে।

তা এখন কি সন্দীপের বয়েস সেই সেদিনকার নিবারণকাকার মত হয়েছে? ঠিক বলা যায় না। ছোটবেলায় চারদিকের সব মানুষকেই বুড়ো মানুষ বলে মনে হয়। এখন তো নিজেই সে বুড়ো হয়েছে। অন্য লোকদের চোখে সে বুড়োই তো। অথচ নিজের কাছে তো সন্দীপ এখনও ছোটই আছে।

নিবারণকাকা আরো বলতেন—আগে তোমার চল্লিশ বছর বয়েস হোক, তখন আমি যা এখন বলছি তা মনে ভেবো। এখন তোমাদের কেবল আশা করবার বয়েস, এখন কেবল আশা করে যাও—শুধু আশা করে যাও, আর কিছু নয়—

সত্যিই তখন কত কিছুই না আশা করেছিল সন্দীপ। আশা ছিল একদিন বেড়াপোতা স্কুল থেকে বেরিয়ে সে কলকাতার কলেজে পড়তে যাবে। কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। আর তারপর? আর তারপর সে উকিল হবে। কলকাতার কোর্টে গিয়ে ওকালতি করবে। গরীব মানুষদের উপকার করবে।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে এত জিনিস থাকতে সে উকিল হতেই বা চেয়েছিল কেন? হয়ত উকিলের পোশাক দেখে। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রফেসার বা অন্য কোন পেশার লোকদের কোনও রকম ধরা-বাঁধা পোশাক-পরিচ্ছদ থাকে না। তবু উকিলদের গায়ে একটা কালো কোট থাকে। বেড়াপোতার চাটুজ্জেবাবুদের ছোটছেলে উকিল হয়েছিল। রোজ রেলস্টেশনে ট্রেন ধরে কলকাতায় যেত ওই কালো কোট পরে। বাড়ি ফিরতো অনেক রাত্রে। সন্দীপ সেই চাটুজ্জেবাবুদের ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো। সে কবে ওই রকম কালো কোট পরে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবে! বেড়াপোতার সমস্ত লোক তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবে! আশ্চর্য, কত বিচিত্র সব আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের ছোটবেলায়।

সন্দীপ ভাবতে লাগলো মানুষের ছোটবেলাটাই বোধহয় সব চেয়ে সুখের। তখন কত ভালো লাগতো পৃথিবীর মানুষগুলোকে। পৃথিবী মানে তখন সন্দীপ বেড়াপোতাটাকেই বুঝতো। আর কলকাতা? কলকাতার নামটাই শুধু সে শুনে এসেছিল। কলকাতায় যাবার স্বপ্নই দেখতো। কখনও সশরীরে সে যায়নি সেখানে। অথচ বেড়াপোতা থেকে কতই বা দূর। দু ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেনে চড়ে পৌঁছানো যেত কলকাতায়। মাত্র বারো আনা পয়সা খরচ করলেই কলকাতায় যাওয়া যেত। কিন্তু সেই বারো আনা পয়সাই বা তখন কে তাকে দেবে?

মা কাজ করতো চাটুজ্জে বাড়িতে। বারো টাকা মাইনে ছিল মা'র। মাইনের সঙ্গে ছিল মা'র আর ছেলের দু'বেলার খাওয়া। সে যুগে সেটাই কি কিছু কম?

চাটুজ্জেবাবুরা জমিদার মানুষ।

এক একদিন সন্দীপও চাটুজ্জে-বাড়িতে যেত। কী বিরাট বাড়ি ছিল চাটুজ্জেবাবুদের। কত লোকজন, কত নায়েব-গোমস্তা। ওই চাটুজ্জেবাবুদের ছোট ছেলে কাশীনাথবাবু ছিল উকিল। তার

বৈঠকখানায় কত মক্কেল আসতো সন্ধেবেলায়। দূর থেকে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে সন্দীপ। মনে হতো যদি কখনও সে ওই কাশীনাথবাবুর মত উকিল হতে পারে তো তার জীবন সার্থক!

কোথায় উকিল আর কোথায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস!

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলটার দিকে ফিরে তাকালো সন্দীপ। কতগুলো বছর ওখানে কাটলো তার?

কিছুই মনে ছিল না তার। কবে সে সেখানে ঢুকলো আর কতদিন কত বছর পরে সে জেলখানা থেকে বেরলো, তা হিসেব করতে গেলে তাকে হিম্-সিম্ খেয়ে যেতে হবে। আর তা ছাড়া যদি সারা জীবনই তাকে জেলখানাব ভেতরে কাটাতে হতো তাতেও তার কোন আপত্তি ছিল না। আজ ছাড়া পেলেই বা সে কী করবে? সে কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে সে উঠবে?

ট্রাম-রাস্তার ওপর তখন অনেক গাড়ি-বাস-ট্রামের রুদ্ধশ্বাস আনাগোনা চলেছে। অথচ আগে তো রাস্তায় এত গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় ছিল না। এই কটা বছরের মধ্যেই কি কলকাতার এত পরিবর্তন হয়ে গেছে?

সেই রাস্তার ওপরেই সে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

কোথা থেকে কে যেন ডেকে উঠলো—এই সন্দীপ—

সন্দীপ শব্দটার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। এখানে এত বছর পরে কে তার নাম ধরে ডাকলে? কে তাকে চিনতে পারলে?

যে ভদ্রলোক তাকে ডেকেছিল, সে কাছে এসে বললে—ও সরি, আমার ভুল হয়েছে। আমি সন্দীপ লাহিড়ীকে ডাকছিলুম, কিছু মনে করবেন না।—

সন্দীপ বললে—আমিও তো সন্দীপ, সন্দীপ লাহিড়ী—

ভদ্রলোক বললে—না, সে-সন্দীপ লাহিড়ী আমাদের বঙ্গবাসী কলেজে ইভ্‌নিং সেকসানে ক্লাশ-ফ্রেন্ড ছিল—

সন্দীপ বললে—আমিও তো বঙ্গবাসী কলেজেরই ইভ্‌নিং সেক্‌সানে পড়ে বি. এ. পাশ করেছি—

—তা হতে পারে, কিছু মনে করবেন না—

ভদ্রলোক চলে গেল। আশ্চর্য! সন্দীপও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। নামও এক, পদবীও এক, কলেজেও এক, সেকসানও এক, এ-রকম সাধারণত বড় একটা হয় না। কিন্তু সন্দীপের জীবনে এত অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে যে তা বললে অনেকে বিশ্বাসও করবে না। অথচ এই যে সেন্ট্রাল জেল থেকে সে বেরিয়ে এল, এর ভেতরেই কি কম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে? জেল-সুপার নিজে এসে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন—কেমন আছেন মিস্টার লাহিড়ী?

জেলের কয়েদীকে জেল-সুপার কেন এত সম্মান দেখাতেন? তবে কি জেল-সুপার সব ঘটনা জানতেন?

কে জানে। অথচ প্রথম থেকে সন্দীপ লাহিড়ী জেলের ভেতরকার সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলেছে। অন্য কয়েদীদের মত সন্দীপও তো সাধারণ কয়েদী ছাড়া আর কিছু ছিল না। তার ওপর বিশেষ ব্যবহারের দাবীও কোনও দিন করেনি। তাকে যা কিছু খেতে দেওয়া হতো তাই-ই সে নির্বিবাদেই খেয়েছে। তাকে যে কাজ করতে আদেশ দেওয়া হতো, তাই-ই সে মাথা নিচু করে করতো। জেলখানার ইতিহাসে এমন অনুগত কয়েদী বোধহয় কেউ কখনও দেখেনি।

এবার কি সে ট্রামে উঠবে? না, পায়ে হেঁটে-হেঁটে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূরই সে যাবে। টাকা অবশ্য তার পকেটে রয়েছে। অনেক টাকাই রয়েছে। বোধহয় কয়েক শো বা কয়েক হাজার টাকা রয়েছে। জেলখানার অফিসে নিয়ম মাফিক কাজ করার বাবদে যত টাকা সে মাইনে হিসেবে উপায় করেছে, সেই সব টাকাটাই তার নামে এত বছর জমা ছিল। জেলখানার মেয়াদ শেষ হবার পর সেই সমস্ত টাকাগুলোই তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চলবার সময় প্যান্টের পকেটের টাকার বাণ্ডিলটা তখনও সে অনুভব করতে পারছে। সন্দীপের মনে হলো ওই টাকার বাণ্ডিলটা যেন টাকার বাণ্ডিল নয়, কাঁটার বাণ্ডিল। টাকাগুলো যেন কাঁটা হয়ে তার শরীরে ফুটছে।

একটা বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত জিনিসের দিকে তার নজর পড়লো। বাড়িটার চওড়া আর লম্বা দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে কী সব লেখা রয়েছে।

সন্দীপ সেখানেই দাঁড়িয়ে লেখগুলো পড়তে লাগলো' লেখা রয়েছে ঃ

॥ সংগ্রামের আঘাতে আঘাতে স্বৈর শাসকদের
আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের খড়্গ ভোঁতা করে দাও ॥

কথাগুলো মনে হলো খুব টাট্‌কা লেখা। তখনও ভালো করে আলকাতরার রং শুকোয় নি। সন্দীপ বাড়িটার দিকে আপাদ-মস্তক ভালো করে চেয়ে দেখলে। আহা দেওয়ালে নতুন দামী রং লাগানো হয়েছে। এত ভালো বাড়িটা। এই ক'দিন আগেই বোধহয় অনেক টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে। এমন করে আলকাতরা দিয়ে লিখে বাড়িটাকে নষ্ট করে দিলে কারা? লেখাগুলোর নিচে আরো অনেকগুলো শব্দ ছোট ছোট করে লেখা রয়েছে। সেই শব্দগুলোর দিকে চেয়ে বোঝা গেল না তার মানে কী? শুধু ওই একটা বাড়িতেই নয়, আশে-পাশের প্রায় সব বাড়িগুলোরই ওই একই অবস্থা। কিন্তু সন্দীপের মনে হলো কই, আগে তো কোনও বাড়ির গায়ে এমন সব লেখা থাকতো না। এই ক'বছরের মধ্যে হঠাৎ কারা এমন স্বৈরশাসক হয়ে উঠলো? কোন্ পার্টি?

সন্দীপের মনে পড়লো তাদের বেড়াপোতায় একবার নিবারণকাকা গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটা যাত্রা করেছিল। তার আগে দেওয়ালে দেওয়ালে হাতে হাতে লেখা পোস্টার আটকে দিয়েছিল। এক-আনা করে টিকিট। বেড়াপোতার চাটুজ্জেকর্তার নিজের যাত্রা-থিয়েটার করবার সখ ছিল। সরস্বতী আর দুর্গা পুজো হতো চাটুজ্জেবাড়িতে। সেই উপলক্ষ্যে কর্তারা মোটা টাকা চাঁদা দিতেন। দেওয়ালে দেওয়ালে হাতে লেখা পোস্টার এঁটে দেওয়া হতো। আগামী দুর্গাপূজার মহা-অষ্টমীর দিনে বেড়াপোতা যাত্রা পার্টির অভিনয় হবে। স্থান স্কুল-বাড়ির মাঠ। টিকিটের দাম মাথা- প্রতি এক আনা। পালা 'বিল্বমঙ্গল'।

মনে আছে চাটুজ্জেমশাই-এর ছেলে কাশীনাথ সেজেছিল চিন্তামণি আর নিবারণকাকা সেজেছিলেন বিল্বমঙ্গল। সে অভিনয় এখনো সন্দীপের মনে আছে। একটা দৃশ্যে ছিল বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামণি প্রবেশ করলো। চিন্তামণি জিজ্ঞেস করলে—এই নদী তুমি কী করে সাঁতরে এলে?

বিল্বমঙ্গলবেশী নিবারণকাকা বললেন—এই কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করে—

চিন্তামণিবেশী কাশীনাথ বললে—এ কী, এ যে শবদেহ—

তখন নিবারণকাকা চমকে উঠেছেন। বললেন—

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর-শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী—এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়, প্রাণ দিছি কারে,
কার তরে শবে কবি আলিঙ্গন।
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।
এই ঊষা—ও-ও ছায়া
মিথ্যা-মিথ্যা-মিথ্যা এ সকলি,
হেরি আজ নিবিড় আঁধার
আমি কার, কে আছে আমার?..

সেই ছোটবেলায় বিল্বমঙ্গলের সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল যে ও বিল্বমঙ্গল নয়, নিবারণকাকা। নিবারণকাকার সেই কথাগুলো সন্দীপের জীবনে আজ এত কাল পরে এমন করে সত্যি হয়ে গেল কী করে? সত্যিই তো—তার জীবনে

সবই তো মিথ্যে। মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে। এই সব কিছু। এই নারী—এরও এই পরিণাম, নশ্বর সংসারে। সেদিনকার সেই নিবারণকাকার কথাগুলো এত কাল পরে এমন করে যে সত্যি হয়ে যাবে তা কে জানতো? সত্যিই তো কার জন্যে সে এতকাল এত বছর জেল খাটলো? সত্যিই সব কিছু মিথ্যে। সেই বিশাখা! একলা সেই বিশাখা যে মিথ্যে তাই ই নয়, সেই ছোটবাবুও মিথ্যে। ছোটবাবু মানে সেই ঠাকুমা-মণির নাতি সৌম্য মুখার্জিও মিথ্যে। সৌম্য মুখার্জিকেই তখন বাড়ির চাকর, ঠাকুর-ঝি, দরোয়ান সবাই, ছোটবাবু, বলে ডাকতো।

আরো মনে পড়লো মল্লিকমশাই-এর কথা। আজ মনে হলো সেই বিরাট বাড়িটার মত মল্লিকমশাইও মিথ্যে। অথচ মল্লিকমশাই দয়া না করলে সে কি একটা গরীব লোকের ছেলে হয়ে এই কলকাতা শহরে এসে আশ্রয় পেত? মা যার পরের বাড়িতে রান্না করে পয়সা উপায় করে, সে যদি গরিব না হয় তো সংসারে আর কে গরীব? মা বড় আশা করতো তার সন্দীপ বড় হয়ে অনেক টাকা উপায় করবে। মা'র স্বপ্ন ছিল তার সন্দীপ উকিল হবে—কারণ উকিল হলে চাটুজ্জে-বাড়ির কাশীনাথবাবুর মত অনেক টাকা উপায় করবে। কাশীনাথবাবুর বউ-এর মত সন্দীপেরও একটা সুন্দরী বউ হবে। তখন আর পরের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করতে হবে না মা'কে।

সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করবার পরেই কলেজে ঢোকবার পালা।

কিন্তু বেড়াপোতায় তো কলেজ নেই। কলেজে পড়তে গেলে তো কলকাতায় যেতে হবে। কিন্তু থাকবে কোথায় সন্দীপ? কলেজে পড়বার মাইনে কে যোগাবে? কম করে হলেও পাঁচ-ছ'টাকা তো লাগবেই। সে-টাকা কে দেবে? ছেলে পড়িয়ে অবশ্য কিছু টাকা উপায় করা যায়। কিন্তু ছেলে পড়াতে হলেও তো কলকাতায় বাসা করতে হবে। বাসা ভাড়া, খাওয়া খরচ সব কিছুর জন্যেই তো টাকা চাই।

তাহলে?

প্রথম যেদিন সন্দীপ বিডন্ স্ট্রীটের ওপর বারো বাই-এ নম্বর বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পৌঁছুল তখন মনের মধ্যে কল্পনাও করতে পারেনি যে এই বাড়িটাই তার জীবনের গতিপথ বদলে দেবে। এই বাড়িটার জন্যেই সে উকিল না হয়ে হয়ে গেল ন্যাশনাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। এই বাড়িটাই তাকে শিখিয়ে দিলে যে বেশি টাকা থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না। এই বাড়িটাই তাকে শিখিয়ে দিলে যে টাকার সঙ্গে যেমন সুখের কোনও সম্পর্ক নেই, তেমনি টাকার সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও কোন সম্পর্ক নেই। আর মনুষ্যত্বই যদি না থাকলো, তাহলে মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎটা কোথায় রইল।

নিবারণকাকার চিঠিটা দিতেই মল্লিকমশাই সেটা পড়ে বলে উঠলেন—আরে, তুমি বেড়াপোতা থেকে এসেছ?

তারপর যেন কেমন অসহায়ের মত বললেন—তা বলা-নেই কওয়া-নেই এসে গেলে?

মনে আছে সেদিনই প্রথম এই কলকাতাকে অমন গভীর, অমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে দেখেছিল। কলকাতা শহরের বাইরের চেহারাটা দেখে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই এত বড়-বড় বাড়ি, এই এত চওড়া-চওড়া রাস্তা, এই আলো, এই লোকজন, এই কর্মব্যস্ততা। এর বাইরের চেহারাটা তাকে বড় নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আর আজ?

আজ শুধু এই শহরই দেখেনি সে। এই শহরের মানুষগুলোকেও তার দেখা হয়ে গেছে। এর অলি-গলি, এর মহত্ত্ব, এর দীনতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, ভালোবাসা, সব কিছু দেখা শেষ হয়ে গেছে তার। দেখা বাকি ছিল এক জেলখানাটা তা এখন সেটাও দেখা শেষ হয়ে গেল। এই কলকাতার আর কিছু দেখবার ইচ্ছেও নেই তার। দেখবার লোভও নেই আর এখন।

মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—তা তুমি তো ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে বেড়াপোতা ইস্টিশানে ট্রেন ধরেছ, তাহলে এখনও তোমার কিছু খাওয়াও হয়নি—

সন্দীপ বলেছিল—না, আমি শেয়ালদা স্টেশনে নেমে খেয়ে নিয়েছি—

—কী খেয়েছ?

—মিষ্টি।

মল্লিক-মশাই-এর সামনে ক্যাশ বাক্স খোলা ছিল। বাক্সের ডালাটা সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে তাতে চাবি বন্ধ করে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বাড়ি খুঁজতে তোমার কষ্ট হয়নি তো?

সন্দীপ বললে—না, নিবারণকাকা রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর সব বলে দিয়েছিলেন।

মল্লিক মশাই বললেন— যাই বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঠাকুরকে তোমার খাওয়ার কথা বলে আসি গে—

তারপর সন্দীপের বাঁ হাতটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার হাতে ওটা কী?

—ঘি!

—ঘি? ঘি কী জন্যে?

সন্দীপ বললে—এটা আপনার জন্যে। মা বললে কলকাতায় মল্লিক-মশাই-এর কাছে যাচ্ছো, খালি হাতে যেতে নেই। এই সামান্য জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে যাও—

একটা কালো রং-এর মাটির ছোট হাঁড়ি। তাতেই ঘি'টা ছিল। মা পরের বাড়ি ঝিগিরি করে যে-কটা টাকা পেত তাই দিয়েই কিছু দুধ কিনে ঘি তৈরি করেছিল মল্লিকমশাই-এর জন্যে। সেইটাই সন্দীপ সাবধানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

এতদিন পরে আবার সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। বারো-বাই-এ বিডন্ স্ট্রীট। আগে এখানে দোকান-ঘর ছিল না। সামনেটা ছিল খোলামেলা। দরোয়ান রাত ন'টার সময়েই লোহার গেট বন্ধ করে দিত। রাত ন'টার মধ্যে গেটবন্ধ না করলে দারোয়ানের জরিমানা হয়ে যেত। এ-ব্যাপারে ঠাকুমা-মণির ছিল কড়া হুঁশিয়ারি। ঠাকুমা-মণির হুকুম অমান্য করলে নির্ঘাৎ চাকরি চলে যাবার ভয় ছিল।

মনে আছে সেদিন তার মনে পড়েছিল বহুদিন আগে পড়া একটা গল্পের কথা। সে গল্পটার নাম 'সাহেব বিবি গোলাম'। ওই চাটুজ্জে-মশাইয়ের বাড়ি থেকেই বইটা সে পড়তে নিয়ে এসেছিল। সেই বইটাতেও ঠিক এই রকম ঘটনা ছিল। ভূতনাথ ফতেপুর গ্রাম থেকে কলকাতায় বহুবাজার স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই ভূতনাথের মনেও সেদিন যে- বিস্ময়, যে-কৌতূহল, যে-ভয়, যে-উদ্বেগ আর যে দীনতাবোধের উদ্ভব হয়েছিল, সন্দীপের মনেও সেই একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আশ্চর্য সেদিন সেই গল্পটার লেখক নায়কের যে মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছিল, তার সঙ্গে সন্দীপের মানসিকতার পরিচয় এমন হুবহু মিলে গিয়েছিল কী করে?

মল্লিকমশাই মাটির হাঁড়িটার মুখের ন্যাকড়ার ঢাকনিটা খুলে ডান হাতের কড়ে আঙুলটা ভেতরে দিয়ে বাঁ হাতের তালুর উল্টো দিকে খানিকটা ঘষে নিলেন। তারপর সেই জায়গাটা নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখে বললেন—তাই তো এ যে খাঁটি ঘি দেখছি!

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

মল্লিকমশাই বললেন—তা বেড়াপোতায় এখনও খাঁটি ঘি পাওয়া যায়?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, পাওয়া যায়। এখনও বেড়াপোতার গোয়ালারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে দুধে জল মেশালে গরু মরে যায়—

—ভালো ভালো, এই ভেজালের যুগেও যে এত ভালো লোক আছে, এটাই দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। তা যাক গে, তুমি এই তক্তপোষটার ওপর বোস, আমি বারবাড়ির ঠাকুরকে বলে আসি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করতে—
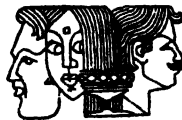
সেই দিন আর আজ! আজ কত তফাৎ! মনে পড়লো জেল-সুপারের একটা কথা। চারদিক নিরিবিলি দেখে একদিন তিনি সন্দীপকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা মিষ্টার লাহিড়ী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

সন্দীপ অবাক হয়ে গিয়েছিল জেল-সুপারের কথা শুনে। সে একজন কয়েদী। তাঁর সঙ্গে এত বড় গর্ভমেন্ট অফিসার অত সমীহ করে কথা বলছেন কেন?

সন্দীপ বললে—বলুন না কী বলবেন—

—জিজ্ঞেস করছি আপনি কি সত্যিই ব্যাঙ্কের একজন ম্যানেজার হয়ে নব্বুই লাখ টাকা চুরি করেছিলেন? আপনাকে এত বছর ধরে দেখে আসছি। সত্যিই ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হয় না—

কথাটার সঙ্গে তার মনে পড়ে গিয়েছিল অলকার কথা। অলকাও একদিন তার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল। কাঁদতে-কাঁদতে অলকার চোখ-নাক-মুখ সব লাল হয়ে উঠেছিল।

সংসারে কেউ আমার নেই। এই বিপদের দিনে তুমি ছাড়া আর কে আমাকে বাঁচাবে বলো! এখন তুমি না বাঁচালে আমি সত্য বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হবো—

সন্দীপ অলকার এ-কথার কোনও জবাব দেয়নি প্রথমে।

অলকা বলেছিল—সত্যিই কি তুমি আমার মরা মুখ দেখতে চাও?

তখনও সন্দীপের মুখে কোনও কথা বেরোয়নি।

অলকা তখন তার পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে।

সন্দীপ বলেছিল—ওঠো অলকা, ওঠো—

সেই দিন সন্দীপের পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়েই অলকা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—আমি কিছুতেই উঠবো না—আগে কথা দাও তুমি আমাকে বাঁচাবে!

সন্দীপ তখন বাধ্য হয়ে অলকার দু'টো হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করেছিল। জীবনে সেই-ই প্রথম অলকার গায়ে হাত দেওয়া। অলকা বলেছিল—আগে বলো তুমি আমাকে বাঁচাবে। আমি যা চাই তুমি তাই-ই আমাকে দেবে?

—কিন্তু...

অলকা সন্দীপের কথা শেষ হতে দেয়নি। বললে—একদিন যে তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবার কথা ছিল। সেই সব কথা মনে করেও না হয় তুমি আমাকে বাঁচাও—

সন্দীপ তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। অলকা তখন নিজেই তার দুটো পা ছেড়ে তার হাত দুটো ধরে সন্দীপের মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বলেছিল—কই, তুমি কিছু কথা বলছো না যে? আমি কি তাহলে তোমার কেউ নই? আমি কি মনে করবো তুমি যা-কিছু এতদিন আমাকে বলেছ সব মিথ্যে? বলো বলো সন্দীপ, চুপ করে থেকো না, সত্যিই কি সে-সব মিথ্যে?

এতক্ষণে সন্দীপের মুখে কথা বেরোল। বলেছিল—আমি তোমাকে কী বলেছি? আমি তো কোনও দিন কখনও তোমাকে কোনও কথা বলিনি?

অলকা বলেছিল—মুখে হয়ত বলোনি, কিন্তু মুখের কথাটাই কি সব? মুখ দেখে কি মনের কথা বোঝা যায় না?

এ-সব অনেক দিন আগেকার কথা। আগের কথা হলেও আজ এত বছর পরে সন্দীপের সব স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সেই অবস্থায় তখন নিবারণকাকার কথাই মনে পড়েছিল সন্দীপের। সেই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয়ে নিবারণকাকার কথাগুলো। মনে পড়েছিল 'চিন্তামণি' আর 'থাকো'র সামনে নিবারণকাকার স্বগতোক্তি...

এই নরদেহ,
জলে ভেসে যায়—
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর-শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী—এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে..

সামনে দাঁড়িয়েছিল অলকা। কিন্তু সেদিন সন্দীপের মনে হয়েছিল ও অলকা নয়, ও যেন বিশাখাও নয়, ও যেন চিন্তামণি! আর সন্দীপ নিজেও যেন তখন বিল্বমঙ্গল। যেন তার জীবনেও তখন বিল্বমঙ্গলের মত এক দারুণ বিপর্যয় নেমে এসেছে। যেন জীবনমৃত্যুর এক সন্ধিক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলখানা থেকে হাঁটতে হাঁটতে তখন সন্দীপ সোজা চলে এসেছে সেই 'বারো-বাই-এ' বিডন্ স্ট্রীটের বাবুদের বাড়িটার সামনে। এতখানি রাস্তা হেঁটে আসতে কতক্ষণ যে সময় লেগেছে, তারও খেয়াল ছিল না সন্দীপের।

এই বাড়িটার ভেতরই যে একদিন সন্দীপের নিজের জীবনের গন্তব্য-পথ চিরকালের মত সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তা কি সেদিন জানতো? সেদিন কি এখনকার মত সে একবারও প্রার্থনা করেছিল যে পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক?

না, সেই অল্প-বয়েসে সেই বঙ্গবাসী কলেজে রাত্রে আই-এ বি-এ পড়বার সময় তার সে জ্ঞান একেবারে হয়নি। তখন সে জানতো না যে মানুষের দেবতাই মানুষের মনের মানুষ। আমরা জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষ পাই। কেবল অন্তরে বিকার ঘটলেই সেই আমার আপন মনের মানুষকে আর সেই মনের মধ্যে দেখতে পাই না।

এ-সব কথা জেলখানার মধ্যে একলা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই সে উপলব্ধি করতে পারেনি। নিজের কাছে নিজেকে নিজের করে পেতে হলে তাই বোধহয় নিঃসঙ্গ হওয়া দরকার।

আসলে 'অলকা' নামটা তো অলকার নিজের নাম নয়। বাবুদের বাড়ির ঠাকুমা-মণিই ওই নামটা দিয়েছিল। অলকা নামটা তার গরীব বাপ-মায়ের দেওয়া নাম নয়। তার নাম রেখেছিল বিশাখা।

ঠাকুমা-মণি বলেছিল—না-না, ও-নামটা ভালো নয়, আমার নাতবউ-এর এমন একটা নাম দিন ঠাকুরমশাই, যে নামটা বড়লোকের বউ-এর মানাবে—

শুধু নাম নয়, ভাবী নাত-বউএর জন্ম-কুণ্ডলীটাও আনিয়ে নিয়েছিলেন ঠাকুমা-মণি। তারপর মল্লিকমশাইকে পাঠিয়েছিলেন বারাণসীতে। বারাণসীতেই মুখুজ্জে-পরিবারের গুরুদেব থাকেন।

গুরুদেব এলে তাঁকে দেখানো হলো কন্যার জন্মকুণ্ডলীটা।

এই জন্মকুণ্ডলীটা দেখে গুরুদেব বললেন—কুমারী বিশাখা গঙ্গোপাধ্যায়।

নামই শুধু নয়, গণ রিষ্টিও দেখলেন।

বললেন—কন্যা পিতৃহন্ত্রী।

ঠাকমা-মণি বললে—ভালো করে কুণ্ডলীটা দেখুন ঠাকুর-মশাই, আমি এই কন্যার সঙ্গেই আমার নাতি সৌম্যের বিয়ে দিতে চাই—

গুরুদেব বললেন—তাহলে শ্রীমানের কুণ্ডলীটা একটু দেখাও মা। আমি যোটক বিচার করে দেখি—

ঠাকুমা-মণি সৌম্যের কুণ্ডলীটাও দেখালেন।

—যোটক-বিচার করে কী দেখলেন ঠাকুরমশাই?

প্রথমে লগ্নপতির অবস্থান দেখলেন, তারপর দেখলেন অষ্টমপতির অবস্থান এবং অষ্টমভাব। খুব কঠিন বিচার। তারপর সপ্তমপতি এবং সপ্তমভাব। জাতক-জাতিকার পঞ্চম-ভাব দেখাও দরকার। কারণ দম্পতির সন্তান-সন্ততির ভালো মন্দ সবই নির্ভর করে পঞ্চমপতি এবং পঞ্চম-

ভাবের ওপর। আর শুধু তো সন্তান-সন্ততি দেখলেই চলবে না, মাতা গৃহ বন্ধু-সুখ বিচার করতে গেলে জাতক-জাতিকার চতুর্থ স্থানের বলাবলও দেখতে হয়। তারপর দ্বিতীয়-পতি একদিকে যেমন ধনপতি তেমনি আবার নিধনপতিও বটে।

প্রথম দিনে বিচার শেষ হলো না। গুরুদেব বললেন—একদিনে হবে না বিচার মা। আরো দু'তিন দিন লাগবে। বড় জটিল কুণ্ডলী—

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কার কুণ্ডলী জটিল ঠাকুরমশাই? পাত্রের না পাত্রীর?

গুরুদেব কুণ্ডলী দু'টোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—বিংশোত্তরী মতে জাতক-জাতিকা দু'জনের কুণ্ডলীরই রাজ-যোটক ফলাদেশ রয়েছে। কিন্তু অষ্টোত্তরীও তো বিচার করতে হবে। অষ্টোত্তরী মতে জাতকের মধ্যে বয়সে রিষ্টির লক্ষণ আছে—

—তার মানে? প্রাণসংশয় আছে নাকি আমার নাতির?

গুরুদেব বললেন—আজ থাক, পরে বিশ্রাম নিয়ে সবিস্তারে ভেবে বলতে হবে—আর দু'তিন দিন সময় লাগবে—

তা সময় লাগুক, তবু দেখতে হবে যদি কোথাও কোনও বাধা থাকে তো তার প্রতিকারও করতে হবে।

শেষকালে দু'দিন ধরে সেই কুণ্ডলী দু'টোর বিচার শেষ করলেন গুরুদেব। তিনি যথারীতি মোটা রকমের প্রণামী এবং দক্ষিণা নিয়ে আবার বারাণসী ফিরে গেলেন। যাবার সময় অন্যান্য প্রতিকারের সঙ্গে একটা কথা শুধু বলে গেলেন। বললেন—এই কন্যা কোথায় থাকেন?

ঠাকুমা-মণি বললেন—খিদিরপুরে, মনসাতলা লেনে। নিজের কাকার কাছে।

—কাকার অবস্থা কেমন?

ঠাকুমা-মণি বললেন—খুবই গরিব। বিধবা মা এই বিশাখাকে নিয়ে দেওরের কাঁছে গলগ্রহ হয়ে আছে—

গুরুদেব বললেন—কিন্তু কন্যার একাদশে চতুর্থ-পতি এবং সপ্তম-পতি বৃহস্পতি তুঙ্গে। সুতরাং অর্থ-ভাগ্য ভালো। সেই বৃহস্পতি লগ্নের তৃতীয় স্থানে বৃশ্চিকে দৃষ্টি দিয়ে আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক স্থাপন করবে আর মকরে সপ্তম দৃষ্টি দিয়ে লগ্নের পঞ্চম-মীনে মানে সন্তান-সন্ততির শুভ সূচনা করছে আর মীনে নিজের গৃহে নবম দৃষ্টি দিয়ে স্বামীরও শুভ করবে—

বলে আবার একটু থামলেন। তারপর কী ভেবে নিয়ে আবার বললেন—সপ্তমপতিই সপ্তমকে দেখছে, এটা খুব শুভ-যোগ—

ঠাকুমা-মণি আবার বললেন—আপনি যে বললেন আমার নাতির মধ্য-বয়সে একটা ফাঁড়া আছে।

গুরুদেব বললেন—এখন তোমার নাতির বয়েস কত মা?

—সৌম্যের বয়েস? সে তো এখন সবে ষোল'য় পড়লো। এখনও ইস্কুলে পড়ে—

গুরুদেব বললেন—তাহলে তো এখন অনেক দেরি। সে তখন দেখা যাবে। এখন থেকে আর অত পরের কথা ভেবে কী হবে। তবে একটা কথা বলতে চাই—

—কী কথা বলুন ঠাকুর-মশাই?

—তোমার ওই ভাবী নাত-বউ-এর 'বিশাখা' নামটা বদলাতে হবে—

—তার বদলে কী নাম দেব বলুন?

—স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' দিয়ে নামকরণ করলে ভালো হয়—

ঠাকুমা-মণি বললেন 'অ' অক্ষর দিয়ে আপনিই একটা নামকরণ করুন না—

গুরুদেব বললেন—তাহলে 'বিশাখা'র বদলে 'অলকা' নাম দাও না—

তা সেই নামই রাখার সিদ্ধান্ত হলো। তখন থেকে নাম হলো 'বিশাখা'র বদলে 'অলকা'।

এ-সব আজ থেকে অনেক দিন আগেকার কথা। মল্লিকমশাই এর কাছে শোনা এ-সব গল্প। সন্দীপ তখন সবে বেড়াপোতা থেকে এই মুখুজ্জেবাড়িতে মল্লিকমশাই এর এক হাঁড়ি ঘি নিয়ে কলেজে পড়তে এসেছিল। ওই লোহার গেটটার বাঁ দিকে ছিল মল্লিকমশাই-এর ঘর। তারই মেঝেতে সন্দীপ রাত্রে শুয়ে থাকতো। আর সারাদিন মল্লিকমশাই এর ফাই-ফরমাস খাটতো। মল্লিকমশাই এর বয়েস হয়ে গিয়েছিল। তার খাটবার ক্ষমতা কমে এসেছিল তখন। ঠাকুমা-মণিকে বলে মল্লিকমশাই-ই এই ব্যবস্থা করেছিল। ঠাকুমা-মণি মল্লিকমশাই-এর কথায় রাজি হয়েছিল। বলেছিল— ঠিক আছে সরকার-মশাই, আপনি যখন বলছেন, তখন আনুন তাকে এখানে।

মল্লিকমশাই বলেছিল— আমার খুব জানাশোনা ছেলে, তারাও ব্রাহ্মণ। বাপ নেই, মা পরের বাড়িতে রান্না-বান্নার কাজ করে যা পায়, সেই পয়সাতেই ছেলেকে মানুষ করে তুলেছে—

—কী নাম?

—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী।

—তা ঠিক আছে। চোর ছ্যাঁচোড় না হলে এখানে খাবে, আর মাস গেলে পনেরো টাকা পাবে। তাতে রাজি হবে তো?

মল্লিকমশাই বলেছিলেন— খুব রাজি হবে, এ-চাকরি পেলে সে বেঁচে যাবে। তার মা'র দুঃখও ঘুচবে—

সেই-ই হচ্ছে সূত্রপাত। সেই সূত্র ধরেই সন্দীপের কলকাতায় আসা এবং এই সামনের বাড়িটার জীবন প্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা।

মল্লিকমশাই তার দফতরে সন্দীপকে রেখে বার-বাড়ির ভেতরে তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে চলে গেল। আর সন্দীপ তখন মল্লিকমশাই-এর তক্তপোষটার ওপর বসে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগলো। কত কাগজপত্র কত খেরো খাতা কত হিসেব-নিকেশের বই র‍্যাকের ওপর যে থরে-থরে সাজানো রয়েছে তার ঠিক নেই। এই এরই মধ্যে তাকে দিনের পর দিন কাটাতে হবে, শু'তে হবে আর চাকরি করতে হবে আর সঙ্গে বঙ্গবাসী কলেজে গিয়ে পড়তে হবে। পড়ে বি-এ পাশ করতে হবে। তারপর ল' পাশ করে উকিল হয়ে সে মা'কে নিয়ে এসে এই কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে জীবন কাটাবে। এই তার স্বপ্ন, এই স্বপ্নকেই সে বাস্তবে রূপ দেবে, আর তারপর... তারপর... তারপর...

হঠাৎ কা'র গলার শব্দে যেন সে চমকে উঠলো।

—কে মশাই আপনি? ওপর দিকে চেয়ে কী দেখছেন?

সব স্বপ্নের জাল যেন ছিঁড়ে ছই-ছত্রাকার হয়ে গেল। সুদূর অতীত-জগৎ থেকে সে এক নিমেষে যেন বর্তমানের কঠোর বাস্তবের পাথরে এসে ছিটকে পড়লো।

—কে আপনি? কী দেখছেন অমন করে ওপর দিকে চেয়ে?

একে তার এই পোশাক, তার ওপর কয়েক দিন দাড়ি কামানো হয়নি, তাই বোধহয় সকলের সন্দেহ হচ্ছে তাকে। সন্দীপ চেয়ে দেখলে সেদিকে। শুধু একজন নয়, আশেপাশের কয়েকজন লোকই বোধহয় তাকে সন্দেহী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। তাদের কথার উত্তর না দিয়ে সন্দীপ সেই 'বারো-বাই-এ' নম্বর বাড়িটার সামনে থেকে সরে গেল। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওরা এ-যুগের ছেলে। ওরা সে সব দিনের কথা জানে না। ওই যে বাড়িটার উল্টোদিকে, সোনা-রূপোর গয়নার দোকান হয়েছে, ওখানে আগে একটা খাবারের দোকান ছিল। তখন খুব বিক্রি হতো খাবার। মিষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তেলেভাজাও বিক্রি হতো একপাশে। আর ওই যে দেয়ালের গায়ে একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান রয়েছে, ওটা তখন ছিল না। কত কী সব বদলে গেছে এই রাস্তার। ওই ...

তা জানে না এখানে একদিন মাঝরাত্রে কী পৈশাচিক একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তখনকার দিনের লোক যারা ছিল তারা সবাই ওই মুখুজ্জে-বাড়ির সামনে ভিড় করেছিল কাণ্ডটা দেখতে। তারা নিশ্চয়ই এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু এখন হয়ত আর রোয়াকে বসে আড্ডা দেবার বয়েস নেই তাদের। এখন যারা এখানকার পাড়ায় দল বেঁধে আড্ডা মারে, ঘটনাটা বললে তারা শুনে চমকে উঠবে। এক-একটা নতুন যুগ আসে আর আগের যুগটা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিই কি তা বাতিল হয়? যে-সূর্যটা দিনের পর দিন উদয় হয়ে অস্ত যায় আর রোজ-রোজ নবজন্ম নিয়ে বিরাজ করে তাকে কি কেউ বাতিল করতে পারে? এমন শক্তিধর ব্যক্তি কি প্রতিষ্ঠান কিছু আছে?

না, এই ছেলে-ছোকরারা কেউ সে ঘটনার কথা জানে না। সে ঘটনার কথা জানতে চায়ও না। কিন্তু সন্দীপ সে-ঘটনার কথা চোখে না-দেখলেও কানে শুনেছে, কাগজের পাতায় পড়েছে। আজ ঠিক আন্দাজ করে সেই জায়গাটাতেই এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রাস্তার লোকের অহেতুক কৌতূহলের ঠেলায় বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারলো না সে। অথচ যদি সবাই জানতে পারতো যে সে নিজেও সেই সেদিনকার খুন-খারাবির সঙ্গে জড়িত তাহলে হয়ত অবাক হয়ে যেত তারা!

ঘড়ির কাঁটাতে রাত ক'টা? রাত একটা কি দু'টো কি তিনটেও হতে পারে। কেউ তা সঠিক বলতে পারবে না। কারণ পাড়ার কেউ-ই তখন জেগে ছিল না। যখন জানা গেল তখন ভোর বোধহয় চারটে। শীতকালের ভোর চারটে মানে চার দিকে তখনও জমাট অন্ধকার।

ইনকাম-ট্যাক্স-অফিসার দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী মিষ্টার বরদারাজন গুরুস্বামী বরাবর ভোর চারটের সময় প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরোন। সেদিনও তেমনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এ তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোজ বিড্‌ন স্ট্রীট ধরে তিনি যেমন কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে বেড়াতে যান সেদিনও তেমনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হাতে একটা ছড়ি। রাস্তা ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। তিনি আপন মনে নানা কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন—

হঠাৎ রাস্তার ওপর ভারি লম্বা একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ভালো করে নজর করে দেখতে গেলেন। কী ওটা? ওটা কী পড়ে আছে ওখানে? কে ফেলেছে? কী জিনিস?

কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন ওটা একটা মানুষ। একটা মানুষ রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি পড়ে আছে। হয়ত শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে—

কিন্তু রাস্তার ওপরে কি কেউ অমন করে শুয়ে থাকে? বিশেষ করে এই শীতকালে। মাথাটা নিচু করে স্পষ্টভাবে দেখতে গিয়েই মিস্টার গুরুস্বামী চমকে দু'পা পেছিয়ে এলেন। লোকটা তো মরে গেছে। তখন কী যে তাঁর করণীয় তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

তাঁর চারপাশে তিনি চেয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। সবাই শীতের জড়তায় লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে আরাম করে ঘুমোচ্ছে—

হঠাৎ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দিক থেকে ঠিক্‌রে আসা একটা গাড়ির হেড্‌-লাইট-এর আলোয় একটু স্পষ্ট হলো সেটা। কিন্তু সে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরেই আবার গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু সেই এক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন ওটা একটা মানুষের মৃতদেহ বটে কিন্তু পুরুষের মৃতদেহ নয়। মৃতদেহ একজন মহিলার।

মিস্টার গুরুস্বামী ওপরের দিকে চেয়ে দেখলেন। যে-বাড়িটার নিচে মৃতদেহটা পড়ে ছিল ঠিক তার ওপরেই একটা তেতলাবাড়ি ঝুল-বারান্দা। ঝুল-বারান্দাটা ফুটপাথের ওপরে তিন-ফুটের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। মনে হয় ওখান থেকেই কেউ মৃতদেহটা ফেলে দিয়েছে। কিংবা মহিলাটি ওই ঝুল-বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে...

মিস্টার গুরুস্বামী তখন এই ভীষণ আবিষ্কারের আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছেন। তিনি বাড়িটার সামনের গেটের পাশের থামের ওপর লেখা বাড়ির নম্বরটা দেখে নিলেন। বারো-বাই-এ বিড্‌ন স্ট্রীট।

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। সোজা কাছাকাছি পুলিশের থানার সন্ধানে বেরোলেন। তিনি জানতেন কোথায় ও-এলাকার থানাটা।

শেষ রাত্রের পুলিশের থানা। থানার লোকরাও শীতে জড়সড় হয়ে আছে। যারা ডিউটিতে ছিল তারাও তখন রাত জেগে ক্লান্ত। শীতের জড়তার সঙ্গে অনিদ্রার জড়তাও তাদের মুখে লেগে ছিল এমন সময় মিস্টার গুরুস্বামীকে দেখে যেন একটু বিরক্ত হয়েছে এমনি তাদের হাব ভাব।

—ও. সি. আছেন?

একজন জবাব দিলে—তিনি কোয়ার্টারে ঘুমোচ্ছেন। কেন?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—একটা কেস লেখাতে এসেছি।

—কেস? কী কেস?

—একটা এ্যাক্সিডেন্টের কেস।

—কী এ্যাক্সিডেন্ট?

মিস্টার গুরুস্বামী বললেন—এ্যাক্সিডেন্ট, কি মার্ডার, কি সুইসাইড, তা জানি না। তবে আমি যা নিজে চোখে দেখেছি তা-ই আপনাদের কাছে রিপোর্ট করতে এলাম।

—আপনার বাড়ি কোথায়? আপনি কোথায় থাকেন? আপনার নাম কী?

মিস্টার গুরুস্বামী নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানা, রাস্তার নাম বললেন। তারপর তিনি কে বা কী কাজ করেন তা বললেন। বললেন—আমি কলকাতার একজন ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার—

এতে বোধহয় একটু কাজ হলো। একটু নড়ে-চড়ে বসলো পুলিশ-ভদ্রলোক। বললে—আপনি বসুন স্যার, বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দাঁড়ান ডায়েরি-খাতাটা বার করি—

বলে গরমের কম্বলটা ঝেড়ে ফেলে খাতা টেনে নিয়ে লিখতে লাগলো।

—কী নাম বললেন?

—বরদারাজন গুরুস্বামী।

—ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার? কোন ডিভিসন?

সব লেখা হলো। তারপর কী দেখেছেন মিস্টার গুরুস্বামী তার বিবরণ। বারো-বাই-এ বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়ির সামনে একটা মহিলার লাশ।

—কী রকম চেহারা?

—অন্ধকারে তা দেখতে পাইনি ভালো করে।

—কী রকম গায়ের রং?

—তাও দেখতে পাই নি।

—বয়েস?

—যা মনে হয়েছে তাই বলতে পারি। পনেরোও হতে পারে পঁচিশও হতে পারে—আপনারা এখনি গেলেই দেখতে পাবেন। লাশটা নিশ্চয়ই এখনও সেই জায়গাতেই পড়ে আছে—

কাজ শেষ করে মিস্টার গুরুস্বামী থানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কী হলো, তা তিনি জানতে পারলেন না।

মনে আছে খবরটা পড়ে সন্দীপ চমকে উঠেছিল। কিন্তু অলকাকেও কিছু বলেনি। কারণ বহুদিন আগেকার সেই যাত্রায় দেখা দৃশ্যটা তখনও তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। নিবারণকাকার সেই অভিনয়, বিল্বমঙ্গলের সেই উপলব্ধি, সেই প্রজ্ঞা, সেই সখেদ স্বগতোক্তি, সে কি ভোলার জিনিস? সারাজীবন ধরে কথাগুলো তার মনে গাঁথা আছে। তাই 'বারো-বাই-এ' বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে স্মরণ করতে লাগলো।

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর-শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়
এই নারী—এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে।...

॥ বিস্তার ॥

দু'তিন দিনের মধ্যেই সন্দীপ এই নতুন বাড়ির হাল-চাল বুঝে ফেললে। বেড়াপোতায় মা'কেও একটা পোস্টকার্ড লিখে পাঠিয়ে দিলে। চিঠিতে লিখলে—'শ্রীচরণেষু মা, আমি নির্বিঘ্নে কলকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মল্লিকমশাই তোমার ঘি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছেন। তুমি আমার জন্য ভাবিও না। আমি এখানে কুশলেই আছি। দু' একদিনের মধ্যে আমি রাত্রিবেলায় কলেজে ভর্তি হইব। লেখা-পড়া এখনও আরম্ভ করি নাই। বাবুরা আমাকে মাসে মাসে পনেরো টাকা মাইনে দিবেন বলিয়াছেন। তুমি আমার প্রণাম জানিবে। ইতি প্রণতঃ—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী।' চিঠির মাথায় ঠিকানা ও তারিখ দিয়ে দিলে।

সন্দীপ জানতো মা চিঠি পড়তে পারবে না। চাটুজ্জেবাড়ির কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেবে। কিংবা নিবারণকাকাকে দিয়েও পড়িয়ে নিতে পারে। গ্রামের ক'জনই বা লেখাপড়া জানে? ক'জনই বা তার মত হায়ার সেকেন্ডারি পাশ!

মল্লিকমশাই বললেন—তুমি মা'কে চিঠি লিখে দিয়েছ?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

মল্লিকমশাই বললেন—আজ বঙ্গবাসী কলেজে গিয়ে ভর্তি হবে তো, তোমার কাছে টাকা আছে? ভর্তি হবার সময় তো কিছু টাকা লাগবে—

সন্দীপ বললে—এখন তো হাতে টাকা নেই। মাইনে পেয়ে তখন না-হয় ভর্তি হবো।

—কিন্তু তখন যদি ক্লাশে আর জায়গা না থাকে, তখন—তখন তো একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে তোমার। তার চেয়ে আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি। সেই টাকাতে ভর্তি হয়ে নাও আজই, পরে মাইনে পেয়ে আস্তে-আস্তে শোধ করে দিও—

মল্লিকমশাই তার হাতে তিরিশটা টাকা দিলেন। সন্দীপ টাকা ক'টা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে রইল। জীবনে একসঙ্গে এত টাকা সে কখনও দেখেনি আগে। মা চাটুজ্জেবাড়ির চাকরি করেও মাসে এত টাকা রোজগার করে না। টাকা ছাড়া অনেক দিন মা ছেলের জন্যে কিছু তরকারি বা কলাটা-মুলোটা হাতে করে নিয়ে আসতো। সন্দীপ তখন থেকেই জানতো বড়লোকেরা কী কী খায়, কত আরামে কাটায়। তাই মাও ভাবতো তার সন্দীপও একদিন চাটুজ্জেবাড়ির ছোট ছেলে কাশীনাথের মতন উকিল হবে। উকিল হয়ে ছেলে কত টাকা উপায় করবে। সেই সব সুদিনের স্বপ্ন দেখেই সমস্ত কষ্ট মুখ বুঁজে সহ্য করতো।

মল্লিকমশাই বললেন—জানো সন্দীপ তোমার বাবা, নিবারণ আর আমি এই তিনজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা সব সময়ে এক সঙ্গে কাটাতুম। আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে যাত্রা করতুম। তোমার বাবা 'ফিমেলপার্ট' করতো। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে তোমার বাবা সাজতো 'পাগলিনী'। খুব ভালো গান করতো কিনা তোমার বাবা। ওর গান শুনেই সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তোমার বাবার গাওয়া গান 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে, টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে' গানটা এখনও আমার কানে লেগে আছে—

সন্দীপের আজো মনে আছে মল্লিকমশাই-এর সেই কথাগুলো। মল্লিকমশাই আরো বলেছিলেন—তোমার বাবার তখন খুব অসুখ, আমি আর নিবারণ তাকে দেখতে গেলুম। অত ভারি শরীর তোমার বাবার, তখন ক'দিনের মধ্যেই একেবারে শুকিয়ে রোগা হয়ে গেছে। নিবারণ সামনে গিয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে বললে—কেমন আছো হরিপদ?

তোমার বাবা কিছু বলতে চাইলে, প্রথমে বলতে পারলে না। তারপর অনেক কষ্টে বললে—নিবারণ, সন্দীপ রইল, ওকে তোরা দেখিস—

বাবার সেই শেষ কথা। তারপরে আর কোনও কথা বলতে পারেনি। কী করে যে কী হলো, কেউ জানতে পারলো না, সাতদিন আগেও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে তোমার বাবা। সেই জন্যেই বলে—মানুষের দশ দশা।

কিন্তু এ-সব কিছুই তখন জানতে পারেনি সন্দীপ। সে তখন খুব ছোট। কিছু বোঝবার বয়েসই তখন হয়নি তার। কিন্তু নিবারণ কাকা বাবার কথা রেখেছেন। যখন মল্লিকমশাই চাকরি নিয়ে এই কলকাতায় চলে এসেছেন, তখন নিবারণকাকাই এই সন্দীপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তুমি তো কলকাতায় যাচ্ছো পরমেশ, ওখানে গিয়ে এই সন্দীপের কথা একটু ভেবো—

সেই পরমেশ মল্লিক এই মল্লিকমশাই। মল্লিকমশাই নিবারণকাকার কথা রেখেছেন। মল্লিকমশাই বললেন—তোমার খাওয়ার কথা ভেতরে ঠাকুরকে বলে এসেছি, বুঝলে? তুমিও খাবে, আর আমিও খাবো—

তারপরে বললেন—তুমি একটু বোস, আমি ঘণ্টা দু'একের মধ্যে একটা কাজ সেরে আসি।

সন্দীপ বললে—আমি একলা বসে-বসে কী করবো, তার চেয়ে আমিও যেতে পারি আপনার সঙ্গে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

—না, আপত্তি আর কীসের, যেতে চাও তো চলো। পরে তো তোমাকে একলাই এসব কাজ করতে হবে। আস্তে আস্তে আমার বাইরের কাজগুলো তো সব একদিন তোমার ওপরেই ছেড়ে দেব—

তখনই তৈরি হয়ে নিলে সন্দীপ। বিডন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে মল্লিকমশাই সন্দীপকে নিয়ে একটা বাসে উঠলেন। বাসের মধ্যে খুব ভিড়, দাঁড়াবার জায়গাও নেই কোথাও। তবু তারই মধ্যে মল্লিকমশাই কোনও রকমে একটা দাঁড়াবার মত জায়গা করে নিলেন। সন্দীপও সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকমশাই-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বাসের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন মল্লিকমশাই। বললেন—দেখে নাও, এই যে বাসটায় আমি উঠলাম, এর নম্বর হচ্ছে, দু'-নম্বর। মনে রেখে দিও—

সন্দীপ বাইরে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ভিড়ের জন্যে বাইরের কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।

খানিক পরে একটা জায়গায় এসে বাসটা থামতেই মল্লিকমশাই বললেন—নামো, সন্দীপ, এইখানে আমাদের নামতে হবে। এই জায়গাটার নাম হলো ধর্মতলা। যা বলছি সব মনে রেখে দাও। একদিন আমি আর তোমার সঙ্গে আসবো না। তখন রাস্তা চিনে তোমাকে একলাই আসতে হবে, বুঝলে?

বাস থেকে নেমে সন্দীপ চারিদিকে চেয়ে দেখলে। এত ভিড়! এত মানুষের ভিড় এখানে? বেড়াপোতাতে রথের মেলাতেও মানুষের এত ভিড় হয় না। সন্দীপ অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

মল্লিকমশাই এবার বললেন—ওই দেখ, ওই যে দোতলা বাসটা আসছে, ওর মাথায় দেখ লেখা রয়েছে তিন নম্বর। ওই বাসটাতেই আমরা উঠবো। তাড়াহুড়ো করো না—খুব ধীরে-সুস্থে উঠবে, তুমি কলকাতায় নতুন এসেছ, এখানকার হালচাল আলাদা, এ কলকাতা, এ তোমাদের বেড়াপোতা নয়, এখানকার লোক কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না—

সন্দীপ কথাটা শুনে বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—কেন? কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—এটা বাঙালীদের চিরকালের স্বভাব। এখানকার সুভাষ বোসকে কত গালাগালি সহ্য করতে হয়েছে তা জানো? এই বাঙালীরাই তাকে সব চেয়ে বেশি গালাগালি দিয়েছে। আর কোনও দেশের লোক তো বাঙালীদের মত এত পরশ্রীকাতর নয়। বাঙালীদের কারোর কিছু ভালো হলে তাদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে—বাঙালীই বাঙালীদের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ততক্ষণে বাসটা সামনে এসে গিয়েছিল। সামনে আসতেই কয়েকটা লোক সন্দীপকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে বাসে উঠতে লাগলো। দু' একজন লোক তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে তার পিঠে চড়ে বাসে উঠলো।

মল্লিকমশাই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন—গেল, গেল, গেল--

সন্দীপ অনেক কষ্টে দুই হাতের জোরে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে ওঠবার আগেই দোতলা বাসটা ছেড়ে দিলে। মল্লিকমশাই তখন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। শুধু ব্যস্ত নয়, ভয়ে তিনি তখন কাঁপছেন। শেষকালে সন্দীপের হাত-পা ভেঙে গেল নাকি? তিনি সন্দীপকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন।

বললেন—কী সব্বোনাশ, দেখি, বেশি লাগেনি তো?

সন্দীপও তখন থর-থর করে কাঁপছে। জামাটার একজায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সে নিজেও তখন নিজের চারদিকে দেখতে লাগলো। এক পলকের মধ্যে যেন একটা মহাবিপর্যয় ঘটে গেছে। কী করে যে কী হয়ে গেল, তা সে ভেবে উঠতে পারলো না। কেন তাকে সবাই এমন করে ঠেলে ফেলে দিলে। কী অপরাধ করেছিল সে? সে তো কারোর কিছু ক্ষতি করেনি। সবাই যেমন বাসে উঠতে গিয়েছিল, সেও তো তেমনি বাসে উঠতে চেষ্টা করেছিল। আর তো কিছুই করেনি। তবে কেন সবাই তাকে ঠেলে ফেলে দিলে?

মল্লিকমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? কেমন বুঝছো এখন? খুব ব্যথা হচ্ছে?

সন্দীপ বললে—না—

মল্লিকমশাই বললেন—পরের বাসে উঠতে পারবে? যদি না উঠতে পারো তো চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিইগে—

সন্দীপ খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। বললে—না, পারবো—

মল্লিকমশাই বললেন --ওঃ, একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে গেল তোমার। তোমাকে তো আগেই বলেছিলুম এ তোমার বেড়াপোতা নয়, এ কলকাতা। এখানে মায়াদয়া বলে জিনিস কারো নেই। এখানে সবাই সবাইকে টেক্কা মেরে টপ্‌কে আগে যেতে চায়। কেমন বোধ করছো এখন?

সন্দীপ বললে—ভালো—

—পরের বাসে যেতে পারবে?

সন্দীপ বললে—পারবো—

পরের বাসটা আসবার আগে মল্লিকমশাই সন্দীপের হাতটা ভালো করে জোরে ধরে রাখলেন, যখন অন্য সব যাত্রীরা বাসের ভেতরে ঢুকে পড়লো, তখন মল্লিকমশাই সন্দীপকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মল্লিকমশাই দাঁড়িয়ে রইলেন সন্দীপের পাশে। জিজ্ঞেস করলেন—কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?

সন্দীপ বললে—না—

মল্লিকমশাই বললেন—আস্তে আস্তে দেখবে সবই সহ্য হয়ে যাবে। এখন কলকাতায় নতুন এসেছ কিনা, তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে। আমি যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলুম, তখন আমারও এমনি অসুবিধে হয়েছিল। এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না—

সন্দীপ এ-কথার আর কী জবাব দেবে। বললে—আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

মল্লিকমশাই বললেন—খিদিরপুরে। আমি তো বরাবর এখানে আসবো না। প্রত্যেক মাসে একবার করে আমি এই খিদিরপুরে আসি। তোমাকে যাতায়াতের রাস্তাটা এবার চিনিয়ে দিচ্ছি। এর পর থেকে প্রত্যেক মাসে একবার করে তোমাকেই এখানে এই খিদিরপুরে আসতে হবে।

সন্দীপ বললে—কেন? আমাকে এখানে আসতে হবে কেন?

—বলবো-বলবো, সব বলবো। এই-সব কাজের জন্যেই তো মা-মণিকে বলে তোমাকে রেখেছি। আমারও তো বয়েস হচ্ছে, এই বয়েসে কি আর এ-সব কাজ পোষায়? তোমাকেই এই কাজগুলো এর পর করতে হবে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব জরুরী কাজ। প্রত্যেক মাসে একশোটা টাকা খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে রাজুবালা দেবীকে দিয়ে আসতে হবে।

সন্দীপের মনে হলো সে যেন রূপকথার গল্প শুনছে। কোথাকার কোন বেড়াপোতায় জন্মে কোন ভাগ্যচক্রে সে এসে পড়েছে কলকাতার বিডন স্ট্রীটের বিখ্যাত এক বংশধরের বাড়িতে। আর কোন ভাগ্যচক্রের খেলায় সে এসে পড়লো খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের আর এক বাড়িতে। এই খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িটার একটা মেয়ের সঙ্গে যে তার জীবন একদিন জড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে তা কি সেদিন সে কল্পনাই করতে পেরেছিল? না কল্পনা করতে পেরেছিল সেদিনকার সেই পরমেশ মল্লিকমশাই!

সত্যিই কোনও দেশের, কোনও জাতির, কোনও সমাজের মত মানুষের জীবনও বোধহয় নানা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গিয়ে একটা অনির্দিষ্ট আর অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। আর সেই অনির্দিষ্ট আর অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার সংগ্রাম মানেই হয়ত মানুষের জীবন। এই অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার বীজ কিন্তু লুকিয়ে থাকে মানুষের জন্ম-সূত্র থেকেই। নইলে কেন সে বেড়াপোতা গ্রাম থেকে কলকাতায় এল? আর যদি কলকাতাতেই এল তো কোন সুবাদে এল মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীর ভাইঝি বিশাখা গাঙ্গুলীর কাছে?

তপেশ গাঙ্গুলীর ভাড়াটে বাড়ি সাত নম্বর মনসাতলা লেন, খিদিরপুরে। তিন নম্বর বাসটা ডিপোয় এসে থামবার পর আর নামতে কোনও কষ্ট হলো না।

মল্লিকমশাই বললেন—এই খানেই এই বাসটা এসে শেষ হলো। এই জায়গার নাম হলো খিদিরপুর। বুঝলে? জায়গাটা ভালো করে দেখে নাও, ভালো করে চিনে নাও। এইখানে তোমাকে পরের মাস থেকে মাসে একবার করে আসতে হবে। ঠিক চিনতে পারবে তো? দেখো, যেন ভুল করো না। ভুল করে যার-তার হাতে যেন টাকাটা দিয়ে দিও না। তাহলে তোমার চাকরি চলে যাবে—

—কার হাতে টাকাটা দেব তাহলে?

—ওই যে বললুম তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে—। এই আমার পকেটে নগদ একশো টাকা মা-মণি দিয়েছেন।

বলে নিজের জামার পকেটের দিকে ইশারা করে দেখালেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কীসের টাকা?

মল্লিকমশাই বললেন—কীসের টাকা তা জেনে তোমার লাভ কী? তোমাকে যা বলছি তাই শুনে নাও। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তোমাকে মা-মণির কাছ থেকে এই একশো টাকা নিয়ে এই মনসাতলা লেনের সাত নম্বর বাড়িতে তপেশ গাঙ্গুলীমশাইকে দিয়ে যাবে—

সন্দীপ বললে—টাকাটা দিয়ে সই করে নেব না?

—হ্যাঁ, সই তো নেবেই। তপেশবাবু একটা কাগজে লিখে দেবেন যে টাকাটা পেলেন। তাঁর লেখার নিচে তিনি নিজের সই দিয়ে দেবেন। সেই সই করা কাগজটা নিয়ে গিয়ে মা-মণিকে দেখাতে হবে। তবেই তোমার ছুটি।

এ এক অভিনব চাকরি! কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যেন রহস্যময় বলে মনে হলো সন্দীপের কাছে। মনসাতলা লেনের বাড়ির বাসিন্দার নাম তপেশ গাঙ্গুলী, আর বিডন স্ট্রীটের বাড়ির বাসিন্দাদের পদবী হলো মুখার্জি। দেবীপদ মুখার্জি। তিনি কতকাল আগে মারা গেছেন তার ঠিক নেই। তাঁরই বিধবা স্ত্রী হলেন মা-মণি। তিনি কেন মাসে মাসে একশো টাকা পাঠাতে যাবেন মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীকে?

এ কি দেনা শোধ? কীসের দেনা? কেন দেনা? অত বড় লোকের গৃহিনী কেন টাকা ধার করতে যাবেন মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীর কাছে?

ততক্ষণে সাত নম্বর বাড়িটা এসে গিয়েছিল।

মল্লিকমশাই বললেন—এই দেখ, বাড়ির গায়ে লেখা রয়েছে বাড়ির নম্বর। ভালো করে দেখে নাও, ভালো করে চিনে নাও, এর পর থেকেই তোমাকেই এ-কাজ করতে হবে। যেন ভুল করে অন্য কোন বাড়িতে যেও না—

সন্দীপ দেখলে বাড়ির গায়ে সাত নম্বরটা আঁটা আছে—মল্লিকমশাই সদর দরজায় কড়াটা খটা-খট করে নাড়তে লাগলেন।

কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক। এই ঘটনার আগেকার ঘটনা আগে বলে নিই।
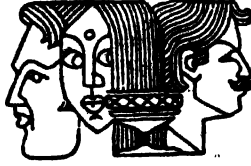
বিডন স্ট্রীটের বারো বাই-এ বাড়িটার মালিক মুখার্জি পরিবারের কর্তা একদিনে বড়লোক হন নি। সে সময়ে দেশের মালিক ছিল ইংরেজ। ১৬৯০ সালের যে ইংরেজরা প্রথম কলকাতার গঙ্গায় বাবুঘাটের কাছে পালতোলা জাহাজ থেকে নেমে কেমন করে আস্তে-আস্তে এখানকার রাজা হয়ে বসলো, সে-কাহিনী আমার 'বেগম মেরী বিশ্বাস' উপন্যাসে লিখেছি। এখন তা আর নতুন করে বলবার দরকার নেই। তখন দেবীপদ মুখোপাধ্যায়ের উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষেরা বাঙলাদেশেরই কোন এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে বসতি করেছিলেন। অজ্ঞাত, অখ্যাত সেই বংশের ইতিহাস কেউ কোথাও লিখে রাখে নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কোথা দিয়ে কেটে গেছে তা টুকরো-টুকরো ভাবে কত লোক লিখে গেছে। আর তারপর যখন কলকাতার পত্তন হলো, এখানে ইংরেজরা জমিয়ে বসলো, তখন থেকে শুরু হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে দরকার হলো ব্যাঙ্কের। ব্যাঙ্কের মালিকরা থাকে বিলেতে। এখান থেকে যা-কিছু মাল-মশলা বিলেতে যায় তার হিসেব থাকে ব্যাঙ্কের লেজারে। তারপর দিনে-দিনে ইংরেজদের ব্যবসা বাড়তে লাগলো। তখন দরকার হলো কেরানীর। কে কেরানীর কাজ করবে? ডাকো ইনডিয়ানদের! তাদের লেখাপড়া শেখাও। লেখাপড়া শিখিয়ে কেরাণী তৈরী করতে গেলে চাই স্কুল-কলেজ। স্কুল-কলেজ করতে গেলে আগে চাই মাস্টার। কিছু ইংরেজ মাস্টার এল বিলেত থেকে। তারাই শেখাতে লাগলো লেখাপড়া। ইংরেজদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চাই ডাক্তার বদ্যি, তার জন্যে চাই মেডিকেল কলেজ। কারখানা চালাবার জন্যে চাই ইঞ্জিনীয়ার। সেই সময় থেকেই কলকাতায় এসে হাজির হতে লাগলো দলের পর দল গ্রামের লোক। গ্রামের ছেলেরা কলকাতায় রাস্তা-ঘাট-বাজার দেখে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তারাও একে- একে ভাল চাকরি পাবার লোভে স্কুল-কলেজে ভর্তি হলো। কেউ-কেউ মেডিকেল কলেজে কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হলো। বেশির ভাগই সব গ্রামের গরীব ছেলে। এই রকম করে কত বছর কেটে গেল। কত যুগ কেটে গেল। কত লাট সাহেব, কত বড়লাট সাহেব এল আর গেল। এমন সময় ভাগ্য পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে এখানে এল আরো একটা ছেলে। তার নাম দেবীপদ মুখার্জি। সেই দেবীপদ মুখার্জি কলেজে পড়ার পর ঢুকলো ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। হাতে একটা পয়সা নেই, কিন্তু বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটুকু আছে। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটুকু সম্বল করে রোজ চার-পাঁচ মাইল হেঁটে যায় কলেজে, আর একটা মেস-বাড়িতে থেকে কোনও রকমে জীবন কাটায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মেসের ভাঙা তক্তপোষে শুয়ে লাখ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

সেই দেবীপদ মুখার্জি। সেই দেবীপদ মুখার্জিই এই আজকের বারো বাই-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়ির মালিক।

এ কী করে হলো? এ সম্ভব হলো কী করে?

এর পেছনেও একটা প্রচণ্ড সংগ্রামের ইতিহাস আছে। সেই ছেলে গ্রাম থেকে পাঠানো পাঁচটাকার উপর নির্ভর করে জীবন চালিয়ে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনাল-পরীক্ষা দিলে, তখন ভাবলে তার সংগ্রাম করা বুঝি এতদিনে শেষ হলো।

সে যে কী কষ্ট, সে যে কী নিদারুণ হতাশা, তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। দেশের বাড়িতে নতুন বিয়ে করা বউ আছে। তখন একটা পোস্টকার্ডের দাম এক পয়সা। পয়সার অভাবে তাকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারেন নি। আর পরীক্ষায় ফেল করার পর তো চিঠি লেখবার প্রশ্নই ওঠে না। দেবীপদ মুখার্জি মেস থেকে বেরিয়ে পড়েন ভোর বেলাতেই। সারা দিন সারা শহরে টো-টো করে ঘোরেন। তারপর যখন মেসে ফেরেন তখন অনেক রাত আবার ভোর হতে না হতেই বাইরে বেরিয়ে যান। মাঝে মাঝে ভাবেন আত্মহত্যা করলে কেমন হয়! যে জীবন দিয়ে কোনও কাজই হবার নয় সে-জীবন রেখেই বা কী লাভ? এক-এক সময় মনে হয় বালিগঞ্জ স্টেশন প্ল্যাটফরমের ওভারব্রীজের ওপর থেকে কোনও চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এমনি সময়ে একদিন চিড়িয়াখানার ভেতরে বেড়াচ্ছেন। কোনও কিছু উদ্দেশ্য নেই; শুধু সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু করারও নেই। হঠাৎ দেখলেন এক জায়গায় একটা লেকের ওপর একটা লোহার পুল তৈরি হচ্ছে। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন ওভারশীয়ার কাজের দেখাশোনা করছেন।

তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন তাদের কাণ্ড।

কিন্তু কিছুতেই তারা লোহার একটা বীম লাগাতে পারছে না। আর সেই লোহার বীমটি লাগাতে না পারলে ব্রীজটাও হবে না। তিন ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। যত কুলী-মজুর সবাই মাথা ঘামাচ্ছে। ওভারশীয়ার ভদ্রলোকটিও অনেক মাথা খাটিয়ে কিছু করতে পারছে না।

যখন বিকেল সাড়ে তিনটে বাজলো তখন দেবীপদ মুখার্জি এগিয়ে গেলেন সামনে। বললেন—আপনারা একটু ভুল করছেন—

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক বললেন —কী ভুল?

দেবীপদ মুখার্জির কথায় প্রথমে কেউই বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। কিন্তু তার কথামত কাজ করতেই অত্যন্ত সহজে কাজটা হয়ে গেল। প্রখর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান না থাকলে এমন হয় না।

খানিক পরেই চিড়িয়াখানার ভেতরে বড় সাহেব এসে হাজির। বললেন—কী, এত দেরি হলো কেন এ-কাজটা করতে? সকালবেলাই তো আমি এসে দেখে গিয়েছি কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে।

ওভারশীয়ার ভদ্রলোক সাহেবকে সেলাম করে বললেন— এই লোহার বীমটা কিছুতেই লাগানো যাচ্ছিল না—

—তাহলে এখন বীমটা লাগানো গেল কী করে?

ওভারশীয়ার বললেন—এই ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন বলেই হলো—বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দেবীপদ মুখার্জীকে দেখিয়ে দিলেন।

সাহেব দেবীপদ মুখার্জীর দিকে দেখলেন। বললেন—হু আর ইউ? তুমি কে?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—আমার নাম দেবীপদ মুখার্জী—

সাহেব কাজ দেখে নিজেও বুঝেছিলেন সাধারণ লোক এই কাজের মোকাবিলা করতে পারবে না। তাঁর ওভারশীয়ার, তাঁর মিস্ত্রী, মজুররা আগে অনেক কাজ করেছে। কিন্তু এ-রকম ব্রীজ তারা আগে কখনও করেনি।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি ইঞ্জিনীয়ার?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—না স্যার, আমি ইঞ্জিনীয়ার নই—

—তাহলে তুমি কী করে এই টেক্‌নিক জানলে? এ তো আমার ভেটারেন ওভারশীয়ারও জানে না—

দেবীপদ মুখার্জী বললেন —স্যার আমি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েছি—

—ও, তুমি ইঞ্জিনীয়ারিং স্টুডেন্ট?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—না স্যার, আমি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েছিলাম, কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করেছি—

সাহেব দেবীপদ মুখার্জীর জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখলেন। বুঝলেন, খুব গরীব লোকের ছেলে এ। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি আবার পরীক্ষা দেবে?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—আর একবার পড়বার টাকা নেই আমার—

—তুমি চাকরি করবে?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—কে আর আমাকে চাকরি দেবে?

সাহেব বললেন—আমি তোমাকে চাকরি দেব।

বলে পকেট থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে দেবীপদ মুখার্জীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

দেবীপদ মুখার্জী ছাপানো কার্ডখানা নিয়ে পড়ে দেখলেন। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম ''স্যাক্সবী ব্রাদার্স লিমিটেড। ইনকরপোরেটেড্ ইন ইংল্যান্ড।'' তার নীচে ক্লাইভ স্ট্রীটের ঠিকানা আর সাহেবের নিজের নাম লেখা রয়েছে। ম্যাক্‌ডোন্যালড্ স্যাক্সবী।

দেবীপদ মুখার্জী তখনও অবস্থাটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দেখছিলেন সাহেবের দিকে। সাহেব বললেন—কাল সকাল ন'টার সময় আমার ওই ঠিকানায় দেখা করতে পারবে?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—হ্যাঁ স্যার, পারবো—

তারপর সাহেব নিজের স্টাফদের সঙ্গে কাজের কথা বলে চলে গিয়ে বাইরে দাঁড়ানো গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

দেবীপদ মুখার্জী পরদিন ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ন'টার সময় 'স্যাক্সবী ব্রাদার্স লিমিটেড ইন্‌করপোরেটেড্ ইন ইংল্যান্ড'-এর অফিসে গিয়ে হাজির। খবর পেয়েই সাহেব ভেতরে ডাকলেন।

দেবীপদ মুখার্জী ঘরে ঢুকতেই সাহেব বললেন—সিট্ ডাউন মুখার্জী—

দেবীপদ মুখার্জী চেয়ারে বসে বললেন—গুড্ মর্ণিং স্যার, গুড্ মর্ণিং—

—ইয়েস, গুড মর্ণিং। কালকে তোমার কাজ দেখে আমি খুব খুশী। আমি তোমাকে আজই এখুনি চাকরি দিতে পারি। তুমি করবে?

দেবীপদ মুখার্জী তখন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেছেন। বললেন স্যার, চাকরি পেলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। আমি খুব অভাবী লোক—

ম্যাক্‌ডোন্যালড্ সাহেব বললেন—মুখার্জী, একটা কথা তোমায় আমি বলছি। বেশ মন দিয়ে শোন। চাকরি দিলে তোমার আর কতটুকু উপকার হবে। আর কতই বা মাইনে পাবে—ধরো, একশো কি দুশো কি বড় জোর পাঁচশো টাকা মাইনে। তার বেশি তো নয়। কিন্তু ধরো যদি আমি প্রথমে তোমাকে একটা ছোট কন্‌ট্রাক্ট্ দিই, তারপরে আস্তে আস্তে বড় কন্‌ট্রাক্ট্ দিতে দিতে তুমি শেষে নিজেই একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম খুলতে পারো। ভাবো তো তখন তুমি মাসে কত হাজার টাকা উপায় করতে পারবে। বেশ ভালো করে ভেবে দেখ চাকরি নেবে, না সাব-কন্‌ট্রাক্ট্ নেবে?

সেদিন দেবীপদ মুখার্জী চাকরি আর ব্যবসার মধ্যে কোনটা ছোট আর কোনটা বড় তা চিনতে ভুল করেন নি। আর ভুল করেন নি বলেই মুখার্জীদের এত সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি। সেই ক্লাইভ স্ট্রীটের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সেই 'স্যাক্সবী ব্রাদার্স লিমিটেড্। ইন্‌করপোরেটেড্ ইন্ ইংল্যান্ড।' সে কোম্পানীও এখন আর নেই, সেই ম্যাক্‌ডোন্যালড্ সাহেবও আর নেই। সেই দেবীপদ মুখার্জীও এখন নেই। তাঁর ছেলে শক্তিপদ মুখার্জীও এখন আর নেই। সেই কোম্পানীটা কেবল আছে কিন্তু তার নামটা শুধু বদলে গিয়েছে। সেই জায়গায় নতুন নাম হয়েছে 'স্যাক্সবী-মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী, ইন্ডিয়া লিমিটেড'। আর তার মালিক হয়েছে তিন জন। একজন স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জীর বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী কনকলতা দেবী, স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জির দ্বিতীয় পুত্র মুক্তিপদ মুখার্জী এবং স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জীর প্রথম পুত্র স্বর্গীয় শক্তিপদ মুখার্জীর একমাত্র পুত্র শ্রীমান সৌম্য মুখার্জী।

কিন্তু সৌম্য মুখার্জী এখন নাবালক। সাবালক হলে সেও কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর হবে। শ্রীমতী কনকলতা দেবী সেই সৌম্যের সাবালক হওয়া পর্যন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সে সাবালক হলেই ঠাকুমা-মণি তার একটা বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এই হচ্ছে বিডন স্ট্রীটের মুখার্জী বাড়ির আদি ইতিহাস। শুধু আদি ইতিহাস নয়, বর্তমান ইতিহাসও বটে। আদি-অন্তহীন মানুষের যে ইতিহাস এই কলকাতায় তিনশো বছর আগে শুরু হয়েছিল তা বুঝি এতদিন পরে আজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আজ বেড়াপোতা থেকে হরিপদ লাহিড়ীর ছেলে সন্দীপ লাহিড়ী এই বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে।

সন্ধেবেলা সন্দীপ মল্লিকমশাই-এর কাছে শোনা এই কথাগুলোই ভাবছিল। এ কোথায় সে এল। এও বোধহয় আর এক বেড়াপোতা। বেড়াপোতারই আর এক বৃহৎ সংস্করণ!

মল্লিকমশাই বললেন—তুমি একটু বোস, আমি পুজোটা সেরে আসি—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় পুজো করবেন? এ-বাড়িতে কি ঠাকুর আছে নাকি?

—কী যে বলো তুমি! মন্দিরও আছে, ঠাকুরও আছে। ঠাকুর না হলে কি ঠাকমা-মণি এক দণ্ড বাঁচবেন?

মল্লিকমশাই চলে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলো আর তার সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ। বেড়াপোতায় চাটুজ্জেবাড়িতেও সন্ধেবেলা ঠিক এই রকম পুজো হতো, কাঁসর-ঘণ্টা বাজতো, শাঁখ বাজতো, মা বাড়ি ফেরবার পর কলাপাতায় করে শশা-কলা বাতাবি লেবু কি আখ-এর দু-একটা টুকরো আর ভেজা মুগ প্রসাদ নিয়ে আসতো।

মা বলতো—এই পেসাদটা খেয়ে নে, খেয়ে মাথায় হাত ঠেকাবি। ঠাকুরের পেসাদ। এ খেলে পুণ্যি হয়। আর খেতে খেতে মনে মনে বল—ঠাকুর, আমার ভালো করো—

মা'র কথামত সন্দীপও মনে মনে তাই বলতো। বলতো—ঠাকুর, আমার ভালো করো—আর সেই ঠাকুরের ইচ্ছেতেই হয়ত কলকাতায় আসার সুযোগ পেয়েছে। এই কলকাতায় না এলে কি এই বিডন স্ট্রীট, এই ধর্মতলা, এই খিদিরপুর, মনসাতলা লেন দেখতে পেত!

মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলী লোকটা কিন্তু ভাল নয়।

সন্দীপ সেই কথাটাই বললে বাড়ি ফেরবার সময়। বললে—মল্লিককাকা আপনি যা-ই বলুন তপেশ গাঙ্গুলীবাবু লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই ভেতর থেকে একটা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলো : কে? কে দরজা ঠেলে?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি তপেশবাবু আমি—

—আমি মানে? আমিটা কে? 'আমি'র নাম নেই?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি পরমেশ মল্লিক, বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্যেবাড়ির সরকার। ঠাকুমা-মণির কাছ থেকে এইছি—

—ও—

বলে তপেশ গাঙ্গুলীবাবু দরজা খুলে দিলেন। সন্দীপ দেখলে তপেশবাবুর পরনে একটা গামছা, বোধহয় চান করতে যাচ্ছিলেন, গলায় একটা ময়লা পৈতে।

বললেন—আসুন আসুন—চলুন, ভেতরে বসবেন চলুন, আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। ভাবলুম, আপনি হয়ত আজ আর এলেন না—শেষকালে চান করতে যাচ্ছিলুম—

মল্লিকমশাই বললেন—সে কি, আজকে তো মাসের পয়লা তারিখ, আমি আসবো না মানে? আমার ঠাকুমা-মণির কড়া হুকুম আছে, ঠিক মাসের পয়লা তারিখে আপনাকে টাকাটা দিয়ে যেতেই হবে। ঠাকুমা-মণির হুকুম কি ঠেলতে পারি?

তপেশবাবু বলেন—না, একটু দেরি হলো কিনা, তাই ভাবছিলুম...

মল্লিকমশাই ততক্ষণে পকেট থেকে টাকাগুলো বার করতে করতে বললেন—বাসে যা ভিড় গাঙ্গুলীমশাই সে আর কী বলবো। ধর্মতলার মোড়ে তিন নম্বর বাসে উঠতে গিয়ে এ তো পড়েই গেল! সবাই এর পিঠের ওপর উঠে এক পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল মশাই, এ নতুন কলকাতায় এসেছে, এর তো এরকম করে ওঠার অভ্যেস নেই—

—এটি কে?

মল্লিকমশাই সন্দীপকে দেখিয়ে বললেন—এটি আমার বন্ধুর ছেলে, আমার ভাইপো'র মতন। এর বাবা আমার বন্ধু ছিল—

তপেশ গাঙ্গুলীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ভাই, কী নাম তোমার—

—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—লেখাপড়া কতদূর করেছ?

সন্দীপ বললে—হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে এইবার কলকাতায় বি. কম. পড়বো। এখনও ভর্তি হইনি—

মল্লিকমশাই বললেন—এই তো সবেমাত্র ও এসেছে! এখনও কলকাতার কিছুই ও জানে না। ওই দেখুন না বাসে উঠতে গিয়ে ঠেলা ঠেলিতে কী-রকম জামা ছিঁড়ে গেছে। ওকে আজ আপনার বাড়িটা চিনিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে করে এনেছি।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—হ্যাঁ, কলকাতা বড় জঘন্য জায়গা হে! আমার তো মনে হয় এ-জাত আর বেশিদিন টিকবে না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করল—কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সে তুমি বয়েস হলে বুঝবে। আসলে এ-জাতটা বড় হুজুগে হে, বড় হুজুগে। এত হুজুগে জাত বোধ হয় আর দুনিয়ায় নেই। এখানে যদি কেউ উন্নতি করতে চায় তো সবাই তাকে গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যখন যে পার্টি ক্ষমতায় থাকবে, তখন সবাই সেই পার্টির পা চাটবে। আবার সে পার্টি ক্ষমতা থেকে চলে যাক...

মল্লিকমশাই এ প্রসঙ্গ থামিয়ে দিলেন। বললেন—আপনি চান করতে যাচ্ছেন, আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না—

বলে পকেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে তপেশ গাঙ্গুলীকে দিলেন, বললেন—দেখুন, ভালো করে গুনে নিন—

তপেশবাবু জিভের থুথু আঙুলে লাগিয়ে একটা একটা করে টাকাগুলো গুনতে লাগলেন। একবার গোনা শেষ হলে আবার গুনতে শুরু করলেন। তখন যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু একটা এক টাকার নোট নিয়ে বার-বার দেখতে লাগলেন। একবার সামনের দিকে উঁচু করে দেখেন তো আর একবার নিচু করে দেখেন। কিছুতেই যেন সন্দেহ ঘুচতে চায় না। বললেন—এ নোটটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে সরকার মশাই—এটা একটু বদলে দিন না—

মল্লিকমশাই বললেন—কই দেখি—

বলে নোটটা নিয়ে তপেশ গাঙ্গুলী [illegible] ফিরিয়ে দেখলেন।

তারপর দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন—কই এ নোটটা তো ঠিকই আছে—আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিতে পারেন

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—না সরকার মশাই, আপনার দেওয়া একটা পাঁচটাকার নোট নিয়ে সেবার বড় মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলুম। কেউ নিতে চায় না। সবাই বললে—এ নোট নেব না—

মল্লিকমশাই বললেন—আমি তো পরের মাসে সে নোটটা বদলে দিয়ে গিয়েছিলাম—সে নোট ভাঙাতে তো আমার কোন অসুবিধে হয়নি—এক কথায় সে নোট তো সবাই নিয়ে নিলে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আপনাদের কথা আলাদা সরকার মশাই। আপনারা বড়লোক মানুষ। আপনাদের কথা বাজারের লোক শুনবে। আমাদের কথা কে শুনতে যাচ্ছে বলুন—

মল্লিকমশাই বললেন—আচ্ছা, দিন আমাকে নোটটা। আর একটা নোট নিন।

বলে খারাপ নোটটা নিয়ে তার বদলে আর একটা এক টাকার নোট দিলেন।

বললেন—এবার হল তো?

তপেশ গাঙ্গুলী খুশী হলেন। বললেন—এই দেখুন, আপনি আসতে দেরি করলেন বলে আমার আপিসে যেতেও দেরী হয়ে গেল।

মল্লিকমশাই বললেন—কেন আমার আসতে দেরি হলো তা-তো আপনাকে বলেই দিলুম। যাক গে, বউমা কেমন আছে একবার বলুন—

ততক্ষণে মল্লিকমশাই-এর খাতায় তপেশ গাঙ্গুলী টাকার প্রাপ্তি হয়েছে এই মর্মে একটা লেখার নিচে স্বাক্ষর করে দিলেন।

তারপর চিৎকার করে ডাকলেন—ও বৌদি, বিডন স্ট্রীট থেকে সরকার মশাই এসেছেন একবার বিশাখাকে পাঠিয়ে দাও—

ভেতর বাড়িতে বোধহয় খবরটা পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। তপেশ গাঙ্গুলীর আওয়াজ পেতেই ভেতর থেকে দুটি মেয়ে এসে হাজির হলো। দুজনেরই বয়েস আট-দশ-বারোর মধ্যে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখতে ভারি সুন্দর। অন্য জনকে দেখতে মোটামুটি। বোঝা গেল আগে থেকেই ফর্সা ফ্রক পরিয়ে তৈরি করে রাখা হয়েছিল।

—করো, নমস্কার করো সরকার মশাইকে—

তপেশ গাঙ্গুলীর কথায় দুজনেই মল্লিকমশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ছোট ছোট মেয়ে সব। দুজনেই বেশ চনমনে। তাদের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দর সে একটু আলাদা স্বভাবের। কেমন যেন একটা আলগা লজ্জা মেশানো নম্রতার ভাব সারা শরীরে।

মল্লিকমশাই তাকেই জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছো বউমা?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ—ভালো।

—শরীর ভালো আছে তো তোমার? আমি বাড়ি ফিরে গেলেই ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করবেন অলকা কেমন আছে। তখন তো আমাকে জবাব দিতে হবে। তাই জিজ্ঞেস করছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা অলকা বলছেন কেন সরকার মশাই, ওর নাম তো বিশাখা—ওটা আমার দাদার দেওয়া নাম, মানে বিশাখার বাবাই মেয়ের ওই নাম দিয়েছিল—

মল্লিকমশাই বললেন—না, ঠাকুমা-মণি ওর ঐ নতুন নাম দিয়েছে। আমার হিসেবের খাতায় আমি 'অলকা' নামই লিখি। ঠাকুমা-মণির তাই-ই হুকুম।

তারপর অলকাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মা ভালো আছেন তো?

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। অর্থাৎ—হ্যাঁ।

তপেশ গাঙ্গুলী সকলকে বললেন—এবার তোমরা সবাই যাও এখান থেকে—

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করলেন—অলকা লেখাপড়া করছে তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—করবে না? লেখাপড়া যদি না করবে তো ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি কেন? টাকা কি অত সস্তা?

মল্লিকমশাই বললেন—একটু দেখবেন দয়া করে, আমি গেলেই ঠাকুমা-মণি আমাকে বার-বার জিজ্ঞেস করবেন বউমা'র কথা। আমাকে তো তার জবাব দিতে হবে, তাই জিজ্ঞেস করা। হ্যাঁ, ভালো কথা। ওকে দুধ ফল-টল খেতে দিচ্ছেন তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—দুধ-ফল-ছানা এসব খেতে দিচ্ছি না তো মাসে একশোটা টাকা কি আমার নিজের গর্ভে ঢালছি?

না, সে-কথা বলছি না। আমি মশাই হুকুমের চাকর। আমাকে বাড়িতে যে যে কথার জবাব দিতে হবে, তাই-ই আপনাকে বলছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা তো বটেই। তবে একটা কথা আপনাকে বলছি, আপনি আপনার ঠাকুমা-মণিকে গিয়ে নিবেদন করবেন।

—বলুন, কী কথা বলবো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—মাসে মাসে আমার ভাই-ঝির নামে ঠাকুমা-মণি যে একশো করে টাকা পাঠান তাতে আজকাল আর কুলোচ্ছে না সরকার মশাই। আপনি নিজেও তো সব দেখছেন। দেশের হাল-চাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাজারে গেলে জিনিস-পত্তরের দাম শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হয়। আমরা আগে আট আনা সের দুধ কিনেছি। সেই দুধই এখন বলে আড়াই টাকা সের। কী করে আপনার বউমা'কে এত দুধ খাওয়াই বলুন তো! যা দুধ কিনি তা সবই আপনাদের বউমা'কেই খাওয়াই। তার ওপরে আছে ফলমূল। আলু, সামান্য আলু তা-ই এখন বারো আনা সের। আমাদের মত মানুষ যারা চাকরি করে পেট চালাই, তাদের কী ভয়ানক অবস্থা ভাবুন তো একবার! আমার নিজের মেয়েকে না খাইয়ে সবই আপনার বউমাকে খাওয়াই, আর কাউকে খেতে দিই না। আমার মেয়ে আপনার বউমার খাওয়ার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বাপ হয়ে তাও আমাকে দেখতে হয়, তা জানেন। তবু আমি বলেছি—সাবধান, অলকার খাওয়ার দিকে যেন কেউ না চেয়ে দেখে। কিন্তু বয়েস এখন কম তো, কাঁদে দুধ খাবার জন্যে। সেও দুধ খেতে চায়। সেও ছানা খেতে চায়। এই তো অবস্থা। আপনি একটু ঠাকুমা-মণিকে সব বুঝিয়ে বলবেন। বলবেন—আমি এই সব বলতে বলেছি। যদি মাসে টাকাটা একশোর বদলে দেড়শো করে দেন, তাহলে একটু সুবিধে হয়—

মল্লিকমশাই বললেন—ঠিক আছে, আমি এই কথা বলবো গিয়ে ঠাকমা-মণিকে—

—হ্যাঁ, বলবেন। যা কিছু তিনি দিচ্ছেন সব তো আপনাদের বউমারই জন্যে। আমার তো কোনও স্বার্থ নেই এতে। দেখুন, দাদা মারা যাবার পর এত বছর ধরে আমিই তো ওদের ভরণ-পোষণ করে আসছি। তারও তো খরচ আছে—

এর পরে আর দাঁড়ালেন না মল্লিকমশাই। উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপও উঠলো।

বাড়ির বাইরে এসে মল্লিকমশাই বললেন—তা হলে চললুম, এই একে দেখে রাখুন। পরের মাসে আমি আর আসবো না, এ আসবে। ওর নাম সন্দীপ কুমার লাহিড়ী—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আপনিও আমার কথাটা মনে রাখবেন। ঐ একশো টাকাটা যাতে একশো পঞ্চাশ টাকা হয় সেইটে একটু আপনার ঠাকুমা-মণিকে বলবেন—

এর পরে আর দাঁড়ান নি মল্লিকমশাই। তিন নম্বর বাস ধরে দু'জনে একসঙ্গে বিডন স্ট্রীটে চলে এসেছিল।
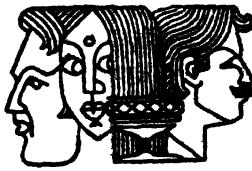
পুজোর কাঁসর ঘণ্টা তখনও বাজছে। মাঝে মাঝে শাঁখও বাজছে। ঘরের মধ্যে একলা বসে বসে সন্দীপ আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এতক্ষণে বেড়াপোতায় মা হয়ত চাটুজ্জেবাড়ির কাজ সেরে বাড়িতে এসে সন্দীপের কথাই ভাবছে। জীবনে এর আগে সন্দীপকে ছেড়ে মা কখনও একলা থাকেনি। সন্দীপও মা'কে ছেড়ে কখনও এমন করে বাইরে থাকেনি।

এক সময়ে পুজোর বাজনার শব্দ থেমে গেল। মল্লিকমশাই এসে গেলেন।

বললেন—চলো-চলো সন্দীপ, খেয়ে আসি গে—

ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব সন্দীপের। বরাবর মল্লিকমশাই একলাই খেয়েছেন, আজ সন্দীপ সঙ্গে এসেছে। দপুরবেলা পেট ভরে খেয়েছিল সে, তবু আবার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল। বড়লোকের বাড়ি। কত লোক বাড়িতে খায়। দিনে-রাতে অসংখ্য লোকের জন্যে খাওয়ার আয়োজন হয়। রান্নাঘরের পাশে আর একটা বড় ঘর। সেখানে দরকার হলে একসঙ্গে পঞ্চাশজন খেতে বসতে পারে। একটা করে কাঠের পিঁড়ি পাতা আছে। আর সামনে কলাপাতার ওপর ডাল-ভাত-তরকারী।

খেতে খেতে মল্লিকমশাই বললেন—লজ্জা করে খেও না সন্দীপ। যা দরকার হবে চেয়ে নিয়ে খাবে—

সন্দীপ সে-কথার উত্তর দিলে না। মল্লিকমশাই বললেন—কী ভাবছো এত?

সন্দীপ বললে—দেখুন মল্লিককাকা, সকালবেলা মনসাতলা লেন-এ যে বাড়িতে গিয়েছিলুম সেই তপেশ গাঙ্গুলী ভদ্রলোক ভালো নয়—

মল্লিকমশাই বললেন—ও-সব নিয়ে তুমি কিছু মাথা ঘামিও না। লোক ভালো হোক মন্দ হোক, তাতে তোমার কী? তুমি চাকরি করবে. মাইনে নেবে আর হুকুম তামিল করবে। চুকে গেল ল্যাঠা।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আপনি ওই ভদ্রলোকের হাতে একশোটা টাকা দিলেন কি জন্যে?

মল্লিকমশাই বললেন—ঠাকুমা-মণির হুকুম।

—কিন্তু কেন? এরা বড়লোক আর ওরা গরীব। ওদের বাড়িতে ঠাকুমা-মণি টাকা প্রত্যেক মাসে পাঠানই বা কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—আস্তে আস্তে তুমি সব কথাই জানতে পারবে। আজ সারাদিন তোমার খুব খাটুনি গেছে, এখন তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গিয়ে—

মল্লিকমশাই-এর ঘরের ভেতরেই সন্দীপের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মেঝের ওপর তোষক পাতা। তার ওপর চাদর। আর মাথার দিকে একটা বালিশ—

আস্তে আস্তে অনেক রাত হলো। বাইরের শব্দ কমে আসতে লাগলো। কখনও কখনও বিডন স্ট্রীট-এর ওপর থেকে চলন্ত গাড়ির হর্ন-এর আওয়াজ আসে। আর তাও অনেক পর-পর।

হঠাৎ ওপরে একজন মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।

—গিরিধারী—

নিচের একতলা থেকে পুরুষের গলার আওয়াজ উঠলো—জী—হুজুর—

—গেট বন্ধ করো। সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেটটা বন্ধ হওয়ার ঘড়-ঘড় শব্দ হলো।

মল্লিকমশাই বললেন—ওই ন'টা বাজলো—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ন'টার সময় গেট বন্ধ হলো কেন মল্লিকমশাই?

মল্লিকমশাই বললেন—ঠাকুমা-মণির হুকুম ঠিক রাত ন'টার সময় গেট বন্ধ করতে হবে।

—গিরিধারী কে?

মুখুজ্জেবাড়ির দারোয়ান। ঠাকুমা-মণির হুকুম কেউ রাত ন'টার পর আর বাড়ির বাইরে থাকতে পারবে না। সে মুক্তিবাবুই হোক আর সৌম্যবাবুই হোক। সকলকে রাত ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে। এ ঠাকুমা-মণির চিরকালের নিয়ম। যদি গিরিধারী রাত ন'টার পর গেট খুলে দেয় তো তার চাকরি খতম হয়ে যাবে—

কে যে মুক্তিবাবু, আর কে যে সৌম্যবাবু, তা সন্দীপ তখনও জানতো না।

খানিক পরেই মল্লিকমশাই-এর নাক ডাকতে লাগলো। বোঝা গেল তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত ক্রমে আরো বাড়তে লাগলো। বাইরে চারদিক আরো নিস্তব্ধ হয়ে এল। সমস্ত বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু সমস্ত বাড়িটাই নয়, সমস্ত কলকাতা শহরটাই যেন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু সন্দীপের কী যে হলো, কিছুতেই তার ঘুম আসতে চাইছে না। জেগে জেগে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। বেড়াপোতায় মা-ও বোধহয় এখন জেগে আছে। জেগে-জেগে কেবল সন্দীপের কথাই ভাবছে। মনসাতলা লেনের বাড়িটার কথাও মনে পড়তে লাগলো। তপেশচন্দ্র গাঙ্গুলী লোকটা ভালো নয়। কেন যে ভালো নয়, তা সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবে না। কিন্তু তার যা মনে হয়েছে তাই সে মল্লিককাকাকে বলেছে। ঠাকুমা-মণি কার জন্যে তপেশ গাঙ্গুলী মশাইকে টাকা পাঠায়? সে কি ওই বিশাখার দুধ খাবার জন্যে? ছানা খাওয়ার জন্যে? কিন্তু মেয়েটাকে দেখতে ভারি সুন্দর। একটা আলগা লজ্জার নম্রতা চোখে-মুখে মাখানো।

হঠাৎ কী একটা শব্দে সন্দীপ সচকিত হয়ে উঠলো। কীসের শব্দ ওটা?

কেউ গেট খুলছে নাকি? কিন্তু ন'টার পর তো আর গেট খোলার নিয়ম নেই। ঠাকুমা-মণির কড়া হুকুম। সন্দীপ অবাক হয়ে কান পেতে রইল।

হ্যাঁ, গেট খোলারই তো শব্দ ওটা!

সন্দীপ একবার ডাকলে—মল্লিককাকা—মল্লিককাকা—

কিন্তু মল্লিকমশাই অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সন্দীপের ডাকেও তাঁর নাক ডাকা বন্ধ হলো না। সারাদিন ধরে পরিশ্রম গেছে তাঁর।

সন্দীপের কী যেন সন্দেহ হলো। সে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে আরো নিঃশব্দে ঘরের দরজার খিলটা খুললে। মল্লিকমশাই তখনো অঘোরে নাক ডাকিয়ে চলেছেন। দরজা খুলে বাইরের উঠোনে গিয়ে পড়লো। সেইখানে পুজোর দালান। সেদিকে যেতে তার ভয় করতে লাগলো, যদি তাকে কেউ দেখে ফেলে? যদি চিনতে পারে। বাঁ দিকে মল্লিকমশাই-এর দফতর। তার পাশ দিয়ে সদরে যাওয়ার রাস্তা।

সন্দীপ আস্তে আস্তে সেইদিকে গিয়ে দেখে দরজাটা খোলা। দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখলে কে যেন একটা গাড়ি চালিয়ে বাইরে যাচ্ছে। লোকটার মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। এই সিগারেটের আলোয় যতটুকু দেখা যায় তাতেই বোঝা গেল লোকটার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। অথচ বয়েস বেশি নয়। বলতে গেলে সন্দীপের মতই বয়েস। সে গাড়িটা চালিয়ে বাইরে যেতেই গিরিধারী লোহার গেট বন্ধ করে দিলে। বন্ধ করে চাবি তালা লাগিয়ে দিলে।

ঠাকুমা-মণির কড়া হুকুম সত্ত্বেও গিরিধারী কেন রাত ন'টার পর গেট খুলে দিলে? এই প্রায় রাত দশটার সময় গাড়িটা যদি বাইরে চলে গেল, তাহলে গাড়িটা ফিরবে কখন? কত রাত্তে ফিরবে? আর যদি গেলই গাড়িটা তাহলে কোথায় গেল? এত রাত্রে তো কলকাতায় সবাই ঘুমুচ্ছে। কেউ তো আর এখন জেগে নেই। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে কে উনি? মুক্তিপদবাবু? মা-মণির ছোট ছেলে? না সৌম্যবাবু—সৌম্য মুখুজ্জে—মা-মণির নাতি? কে?

অনেক ভেবেও সন্দীপ ভাবনার কোনও কূল-কিনারা খুঁজে পেল না। বাইরে যে বাড়ির এত কড়া নিয়ম-শৃঙ্খলা তার আড়ালে কি এতই অনিয়ম? যদি সৌম্য মুখুজ্জে হয় তো এত কম বয়েসে কোথায় যাবে এত রাত্রে?

সন্দীপ সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মল্লিকমশাই-এর দফতরের পাশের রাস্তা দিয়ে পুজোর দালানে পড়লো। সেখানেও কেউ কোথাও জেগে নেই। সেখান থেকে টিপিটিপি পায়ে সন্দীপ আবার নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকলো। তখনও মল্লিকমশাই-এর নাক-ডাকার কামাই নেই। নিঃশব্দে সে ঘরের ভেতর দিকে খিলটা বন্ধ করে নিজের বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিলে। তারপর সেই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে দু'টো চোখের পাতা খুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হলো তার নিজের নিঃসঙ্গ জীবনটার মতই সমস্ত কলকাতাটাও তার দুটো চোখের পাতা খুলে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।
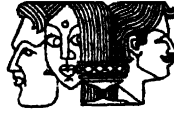
প্রথম প্রথম একটু অবাক লাগতো সন্দীপের। এত বড় বাড়ি। বেড়াপোতায় এত বড় বাড়ি একটাও নেই। অবশ্য বেড়াপোতার সঙ্গে কলকাতার তুলনা করা উচিত নয়। কলকাতার মত এত লোকই কি বেড়াপোতায় আছে। কলকাতায় কে যে কোথায় যাচ্ছে, কে যে কীসের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছুই বোঝা যায় না। কলকাতায় পাশের বাড়ির লোককেও পাশের বাড়ির লোকরা চেনে না।

নিবারণকাকা আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—কলকাতায় যাচ্ছো, সেখানে একটু সাবধানে ঘোরা-ফেরা করবে, যেখানে যাবে সব তোমার মল্লিককাকাকে আগে জিজ্ঞেস করে তবে যাবে।

আসবার সময় মা কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু পাছে ছেলের অকল্যাণ হয় তাই চোখের জল আঁচলে মুছে মুখে হাসি আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সন্দীপের চোখ দু'টোও ভারি হয়ে এসেছিল বইকি, কিন্তু কলকাতায় যেতে পারার আনন্দে সমস্ত কষ্টই সহ্য করতে পেরেছিল।

বারো-বাই-এ বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাবার পরই সন্দীপ বুঝতে পারলে এ-বাড়ির নিয়ম-কানুনগুলো। এ-বাড়ির যিনি মালিক তিনি হলেন ঠাকুমা-মণি। ঠাকুমা-মণির হুকুম মতোই এ-বাড়ির সব-কিছু কাজ-কর্ম চলে। যেন এ বাড়ির ঘড়ির কাঁটাগুলোও ঠাকুমা-মণির হুকুম না পেলে নড়ে না। ঠাকুমা-মণি থাকেন বটে তেতলায় কিন্তু একতলা-দোতলার প্রত্যেকটা প্রাণী তাঁর নির্দেশে ওঠে বসে। একতলা কি দোতলায় যদি কেউ জল নষ্ট করে তো তেতলায় ঠাকমা-মণির টনক নড়ে ওঠে। চিৎকার করে বলবেন—এই কালিদাসী, দোতলার কলঘরে কে জল নষ্ট করে রে?

দোতলার ঝি'দের মাথা হচ্ছে কালিদাসী। দোতলায় কোনও বেআইনী কাজ হলে দায়ী হবে কালিদাসী। আর একতলাটা ফুল্লরার এক্তিয়ারে। একতলার সমস্ত কাজ-অকাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে ফুল্লরাকে। তেতলা থেকেই ঠাকুমা-মণি চিৎকার করে বলবেন—হ্যাঁ রে ফুল্লরা, একতলার সব ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে?

আর একতলার পশ্চিমমুখো যে ঠাকুরবাড়ি আছে, তার বিগ্রহ হচ্ছে দেবী সিংহবাহিনী। ঠাকুরবাড়ির সমস্ত কাজকর্ম কামিনী ঝি'র হেফাজতে। নিত্যপুজোর সব বন্দোবস্ত ঠিক হলো কি না তা সে দেখবে। পুজোর ফুল-বিল্বপত্র যে যোগান দেয় সে হলো কন্দর্প। কন্দর্পের মতো দেখতে হোক আর না হোক তার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম কন্দর্প। সে ঠিক ফুল-বিল্বপত্র নিয়ম করে রোজ দিচ্ছে কিনা তা দেখবার ভার কামিনীর ওপর। যদি না যোগান দেয় তো কামিনী তেতলায় গিয়ে নালিশ করবে ঠাকুমা-মণিকে।

ঠাকুমা-মণি কন্দর্পকে জিজ্ঞেস করবেন—আজ তোমার ফুল-বেলপাতা দিতে দেরি হয়েছে কেন?

কন্দর্প বলবে—আজকে আমাকে মাফ করে দিন ঠাকুমা-মণি, আজকে ভোরবেলা খুব বৃষ্টি হয়েছিল বলে একটু দেরি হয়েছিল, আর কখনও দেরি হবে না ঠাকুমা-মণি।

ঠাকুমা-মণি বলবেন—আর তো তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না কন্দর্প, এরকম দেরি তো তোমার আগেও হয়েছে, আগেও তো তুমি মাফ চেয়েছ—

—আজ্ঞে ঠাকুমা-মণি, সেবার আমার অসুখ হয়েছিল—

ঠাকুমা-মণি বললেন—তা তোমার অসুখ হলে কি ঠাকুর শুনবে? তোমার অসুখ হলে কি ঠাকুর-পুজো বন্ধ থাকবে? আমার ঠাকুর তো তা বলে উপোস করে থাকবে না। তার নিত্য-পুজো, নিত্য-নিত্য নিয়ম করেই করতে হবে, তা সে বৃষ্টিই পড়ুক আর কারো অসুখই করুক।

কন্দর্প তখন কাকুতি-মিনতি করবে। বলবে—আর কখনও এমন হবে না ঠাকুমা-মণি। আমি মাফ চাইছি—

ঠাকুমা-মণি বলবেন—যদি আবার এমন গাফিলতি হয় তো কী করবে?

কন্দর্প বলবে—এবার অসুখ হলে আমি আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব—

—তোমার ছেলের কত বয়স হলো?

—এই দশ বছরে পড়েছে। আমার একই ছেলে। এই ছেলের আগে সব মেয়ে।

ঠাকুমা-মণি বলবেন—ঠিক আছে, এই বারের মত তোমাকে মাফ করলুম বাছা, আবার যদি কোনও দিন গাফিলতি হয় তো তখন কিন্তু আমি অন্য লোক রাখবো, এই তোমাকে বলে রাখছি।

এ-সব তো গেল দোতলা-একতলা আর ঠাকুরবাড়ির ঝি'দের ব্যাপার। কিন্তু তেতলায়?

ঠাকুমা-মণির খাস-ঝি ঠাকুমা-মণির সঙ্গে তেতলাতেই থাকে। তার নাম বিন্দু। বিন্দু আজ তিরিশ বছর ধরে ঠাকুমা-মণির সেবা করে আসছে। বিন্দু তার অতীত ভুলে গেছে ভবিষ্যতের কথাও সে ভাবে না। শুধু বর্তমান নিয়েই সে ভাবে। শুধু বর্তমান নিয়েই সে খুশী। কবে থেকে যে বিন্দু এ-বাড়িতে ঠাকুমা-মণির সেবা আরম্ভ করেছে তাও তার মনে নেই। মনে রাখবার মত সময়ও তার হাতে বড় একটা থাকে না। সত্যিই তো সে কোথায় সময় পাবে? তার কাজ কি একটা? ভোর তিনটের সময় তাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তাকে ভোর না বলে রাত বলাই ভালো। রাত তিনটের সময় যখন বিন্দু ওঠে তখন সারা কলকাতাই অন্ধকার। ঠাকুমা-মণিও তখন ঘুম থেকে ওঠেন। ঘুম থেকে ঠাকুমা-মণি উঠেই ডাকেন—বিন্দু—

বিন্দু তৈরিই থাকে। এই তৈরি হয়ে থাকাই হচ্ছে বিন্দুর চাকরি। এতকাল ধরে বিন্দু নাকি এমনি তৈরি হয়েই থেকেছে। এমনি তৈরি হয়ে থাকার জন্যেই নাকি এখনও বিন্দুর চাকরি যায়নি।

তেতলার আর একজন ঝি হচ্ছে সুধা। তিনতলাটা সুধার একলার এক্তিয়ার। সে মেজবাবু, মেজগিন্নী আর তাদের ছেলে-মেয়েদের তদারকি করে। সুধা বলে—বিন্দু বেশ আছে, ঠাকুমা-মণির হুকুম তামিল করেই খালাস। আমারই হয়েছে যতো জ্বালা। এতগুলো লোকের ফাই-ফরমাস খাটতে খাটতেই আমার গতর গেল।।

কথাগুলো বিন্দুরা কানে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ কর হারামজাদী মাগী, চুপ কর তুই, তোর একলারই বুঝি গতর আছে, আর কারুর বুঝি গতর থাকতে নেই? কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়—আ মরণ আর কি—

ঠাকুমা-মণির কানে এ-সব কথা যায় না। ঠাকুমা-মণি যখন নিচের একতলায় ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরকে প্রাণাম করতে আসেন, তখন বিন্দু আর সুধার গলা সপ্তমে গিয়ে ওঠে। কিন্তু ঠাকুমা-মণির গলার আওয়াজ কানে পৌঁছতেই সব চুপ।

ঠাকুমা-মণি বললেন—কে রে বিন্দু, কে? কার সঙ্গে অত কথা বলছিস?

বিন্দু ঠাকুমা-মণির দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে—কই ঠাকুমা-মণি, আমি তো কারো সঙ্গে কথা বলিনি।

তা হবে, ঠাকুমা-মণির বয়েস হচ্ছে, হয়ত দোতলায় কালিদাসীর গলা শুনতে পেয়েছেন। সারা বাড়ি যেন নখদর্পণে। এককালে এই ঠাকুমা-মণি কিছু-না-হোক চল্লিশবার তিনতলা-একতলা করেছেন। তখন বয়স কম ছিল। দেখবার-শোনবার লোকও কম ছিল। স্বামী দেবীপদ মুখার্জী ভোর থেকেই অফিসের কাজে বেরিয়ে যেতেন, তখন বাড়ির দিকে আর নজর দেবার সময়ই ছিল না তাঁর। শাশুড়ীও অল্প বয়েসে মারা গেছেন। শ্বশুর তো তার আগেই চলে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঠাকুমা-মণি সমস্ত বাড়িটার চাবিকাঠি নিজের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিলেন।

আর এই যে মুখুজ্জেবাড়ির সরকার মল্লিকমশাই, ইনিও সেই তখন থেকেই আছেন।

সন্দীপ এ-সব জানতো না, কিন্তু মল্লিকমশাই-এর এ-সব দেখা ঘটনা। মল্লিকমশাই-এর বয়েস যখন এই সন্দীপের মতন তখনই এই মুখুজ্জে বাড়িতে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন যেমন সন্দীপ

কাজ শিখছে মল্লিকমশাই-এর কাছে, তখন মল্লিকমশাইও তেমনি কাজ শিখতেন তখনকার সরকারমশাই-এর কাছে। তারপর দেখতে দেখতে মল্লিকমশাই-এর বয়েস হলো, এ-বাড়ির হালচালও বদলে গেল। একদিন এ বাড়ির কর্তা দেবীপদ মুখার্জী বলা নেই-কওয়া নেই হঠাৎ মারা গেলেন। তখনই মল্লিকমশাই-এর মনে হয়েছিল, এ-বাড়ির পরমায়ু বুঝি শেষ হয়ে গেল, এ-বাড়ির ইতিহাস বুঝি মাঝপথে থেমে গেল।

কিন্তু না, থামলো না। দেবীপদ মুখার্জীর দুটি ছেলে ছিল। তারা ততদিনে বড় হয়েছে। প্রথমটির নাম শক্তিপদ, দ্বিতীয়টির নাম মুক্তিপদ। তারাই দেখতে লাগলো বাবার ব্যবসা। স্যাণ্ডবি মুখার্জী এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেড। বিরাট কারবার। কর্মচারীর সংখ্যাও অসংখ্য। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার থেকে পিওন পর্যন্ত শক্তিপদ আর মুক্তিপদ'র অধীনে। অফিসের আর ফ্যাক্টরির কাজ দেখে ছেলেরা, আর সংসারে কাজ দেখেন ঠাকুমা-মণি। ছেলেদের অধীনে যেমন অফিস আর ফ্যাক্টরির কর্মচারীরা, বাড়িতে ঠাকুমা-মণির অধীনে তেমনি সবাই। সবাই মানে ছেলে, ছেলের বউরা, নাতি, চাকর, ঝি, ঠাকুর, দারোয়ান, মল্লিকমশাই আর এখন এই সন্দীপ। বাড়িতে সকলের মাথার ওপর ওই একজনই—ওই ঠাকুমা-মণি।

তাই ঠাকুমা-মণিই বাড়ির সকলের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাই ঠাকুমা-মণির কথাতেই বাড়ির সবাই ওঠে বসে। তাই ঠাকুমা-মণি যখন ওপর থেকে চিৎকার করেন—ও কালিদাসী—কালিদাসী, দোতলার কল-ঘরে কে জল নষ্ট করে রে? তখন সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিংবা ঠাকুমা-মণি যখন তেতলা থেকে চেঁচান—হ্যাঁ রে ফুল্লরা, একতলার সব ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে? তখনও সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাজের গাফিলতির জন্যে ঠাকুমা-মণি যে কাউকেই ক্ষমা করবে না তা সবাই জানে বলেই ঠাকুমা-মণিকে সবাই ভয় পায়।

আর মল্লিকমশাই?

মল্লিকমশাইও একই নিয়মের অধীন। মল্লিকমশাই-এর কাজের ওপরেও ঠাকুমা-মণির কড়া নজর। প্রতিদিন একটা বাঁধা টাইমে মল্লিকমশাইকে খাতা নিয়ে যেতে হয় ঠাকুমা-মণির কাছে। বিন্দু ঠাকুমা-মণির পাশেই থাকে সব সময়ে।

মল্লিকমশাই একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একেবারে সোজা চলে যান তেতলায়। সেখানে পৌঁছেই ঠিক বাঁধা সময়ে ডাকেন—বিন্দু-অ-বিন্দু—

বিন্দুর জানা থাকে। জানা থাকে যে ওটা মল্লিকমশাই-এর গলা। ঠাকুমা-মণিও জানেন। ঠাকুমা-মণিও জানেন যে ওই সময়ে মল্লিকমশাই রোজ হিসেবের খাতা নিয়ে আসেন। আগের দিন কী-কী বাবদে কত খরচ হয়েছে, তা খাতা দেখে সব মল্লিকমশাই বলে যাবেন। বাজার-খরচ দেড়শো টাকা। দেড়শো টাকার মধ্যে আলু-পটল-বেগুন থেকে আরম্ভ করে মাছ-পান-তেল-নুন-দোক্তাপাতা সবই ধরা হয়। তারপর কোনও দিন রাজমিস্ত্রীর কাজকর্ম থাকলে সিমেন্ট-ইট-চুন, সুরকি, কাঠ কেনার খরচও থাকে। তা ছাড়া মাস-কাবারি খরচও আছে। যেমন এ-বাড়ির লোকজনদের মাইনে। কন্দর্পের ফুল-বেলপাতার হিসেব। কারো কাশির ওষুধ কিম্বা কারো ট্রাম-বাস ভাড়া। এর ওপর আছে পেট্রলের খরচের হিসেব। প্রত্যেকটা খরচের টাকা-আনা-পাই-কড়া-ক্রান্তির নিখুঁত-নির্ভুল বিবরণ। জমার সঙ্গে খরচের যোগ-বিয়োগ করে যা হাতে রইলো তার মোট জমার অঙ্কটার নিচেয় ঠাকুমা-মণি একটা ঢ্যাঁড়া মেরে সেখানে সই করে দেবেন। এই নিয়মই চলে আসছে কর্তামশাই-এর মারা যাওয়ার পর থেকে।

সেদিনও মল্লিকমশাই জমা-খরচের খাতা বগলে করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলো সন্দীপ, আমার সঙ্গে চলো—

সন্দীপ বললে—কোথায়?

মল্লিকমশাই বললেন—ঠাকুমা-মণির কাছে। জমা-খরচের হিসেব দেখাতে হবে ঠাকুমা-মণিকে—

সেই প্রথম এ-বাড়ির একতলা পেরিয়ে দোতলায়, তারপর দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় যাওয়া। একেবারে যাকে বলে অন্দরমহলে। একতলার ঝি ফুল্লরা সরকারমশাইকে ওপরে যেতে দেখে কিছু বললে না। দোতলায় পৌঁছতেই কালিদাসী বলে উঠলো—কে? কে আসে?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি রে আমি, সরকারমশাই—

—আজ্ঞে যান—ওপরে যান—

ঝি-এরা জানে সব। দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় পৌঁছতেই সুধা বলে উঠলো—কে? কে আসে?

প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা কাজ। তবু জবাবদিহি করতে হয় মল্লিকমশাইকে। বললেন—আমি রে সুধা—আমি—

জবাবটা শুনেই সুধা ঠাকুমা-মণির খাস ঝি-কে ডাকে—অলো বিন্দু, সরকারমশাই, আসুন—

মল্লিকমশাই এর পেছন পেছন সন্দীপও যাচ্ছিল। সেই-ই প্রথম তার ঠাকুমা-মণিকে চাক্ষুষ দেখা। ঠাকুমা-মণির বয়েস হলেও দেখে বোঝা যায় গায়ে শক্তি আছে পুরো মাত্রায়। ওই শরীর নিয়েই ঠাকুমা-মণি রোজ নিচেয় ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর প্রণাম করতে আসেন। আর পুজোর শেষে আবার তেতলায় গিয়ে ওঠেন। গায়ে তসরের একটা থান আর গায়ের রং-এর সঙ্গে সেই তসরের কাপড়ের রং একাকার হয়ে গেছে এমনই ফরসা ঠাকুমা-মণি।

ঠাকুমা-মণি একটা পশমের আসনের ওপর বসে ছিলেন। মল্লিকমশাইও গিয়ে সামনে পাতা শতরঞ্চির ওপরে গিয়ে বসলেন। সন্দীপও বসলো পাশে।

সন্দীপকে দেখে ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—এ ছেলেটি কে?

মল্লিকমশাই বললেন—এই-ই হচ্ছে সেই সন্দীপ, বেড়াপোতা থেকে এসেছে, যার কথা আপনাকে বলেছিলুম—

তারপর সন্দীপকে বললেন—প্রণাম করো, ঠাকুমা-মণিকে প্রণাম করো—

সন্দীপ ঠাকুমা-মণির সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। তারপর দু'টো হাত মাথায় ঠেকিয়ে আবার নিজের জায়গায় বসলো।

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কী নাম তোমার?

—সন্দীপ কুমার লাহিড়ী—

—বাবা-মা আছেন?

সন্দীপ বললে—বাবা নেই, মা আছে—

মল্লিকমশাই বাকিটা বললেন। বললেন—বড় গরীব এই ছেলেটা। এর বাবা মারা যাওয়ার পর এর মা পরের বাড়ি কাজ করে একে মানুষ করেছে। আপনাকে তো আগেই সব বলেছি—

এর পর আর বেশি কিছু বলবার দরকার হলো না। হিসেব-নিকেশের খাতা নিয়ে বসলেন মল্লিকমশাই। ঠাকুমা-মণি সব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর জমার ঘরে একটা ট্যাড়া দিয়ে সেখানে একটা সই দিয়ে দিলেন। মল্লিকমশাই-এর কাজ হয়ে গেল। মল্লিকমশাই বললেন—আর একটা কথা ছিল ঠাকুমা-মণি—

—কী?

মল্লিকমশাই বললেন—কালকে এই সন্দীপকে নিয়ে খিদিরপুরের মনসাতলা লেন-এ তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়েছিলুম। এর পরে তো একেই সে-বাড়িতে টাকা দিতে যেতে হবে। তা তপেশ গাঙ্গুলীবাবু একটা কথা বলতে বললেন—

—কী বললেন?

মল্লিকমশাই বললেন—বললেন জিনিস- পত্তোরের দাম যা বাড়ছে তাতে আপনার দেওয়া ওই মাসে একশো টাকায় আর চলছে না। ওটা একশো টাকার বদলে একশো পঞ্চাশ টাকা করে দেবার জন্যে আপনাকে একটু বলতে বলেছে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—একশো টাকায় এগারো বছরের মেয়ের চলছে না কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—তপেশবাবু যা বলেছেন, তাই-ই আমি আপনাকে বললুম। এখন আপনি যা বলবেন, তাই-ই করবো—

ঠাকুমা-মণি বললেন—আপনি কী করতে বলেন?

মল্লিকমশাই বললেন—আপনি মালিক, আপনি যা বলবেন তাই-ই হবে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, যখন বউমার কাকা বলেছে তখন এর পরের মাস থেকে আরো পঁচিশ টাকা না-হয় বাড়িয়ে দেবেন। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যেন ওই টাকা কাকা-কাকিমা নিজের মেয়েকে না খাওয়ায়।

মল্লিকমশাই বললেন—তা যদি খাওয়ায় তো আমরা আর তা কী করে জানতে পারবো। তাহলে বউমা'কেই জিজ্ঞেস করতে হয়। অন্য লোকদের সামনে তো আর তা জিজ্ঞেস করা যায় না। আবার এও হতে পারে যে বউমাকে জল মেশানো দুধ খাইয়ে খাঁটি দুধটা খাওয়ালো নিজের মেয়েকে।

ঠাকুমা-মণি বললেন—আপনি না-হয় বউমা'কে আড়ালে ডেকেই সব জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করবেন সেদিন কী দিয়ে ভাত খেয়েছে। মাছ মাংস দেয় কি না, ফল-টল দেয় কিনা, তাও জিজ্ঞেস করবেন। খাঁটি দুধ, ফল, মাংস না খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কী করে?

মল্লিকমশাই বললেন—তা-তো বটেই—

—আমি যখন বিশাখাকে ঘরের বউ করে আনবো তখন লোকে বউ দেখে কী বলবে। আমি তো দেখেছি বউমাকে, এত রূপ শরীরে, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় ভালো করে খেতে পায় না। বিধবা মা, দেওরের গলগ্রহ। কে খেতে দেবে? তাই তো ঘি-দুধ-মাছ-মাংস খাওয়াবার জন্যে মাসে মাসে একশো টাকা বরাদ্দ করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম। তা আপনি যখন বলছেন তখন না হয় আরো পঁচিশ টাকা বাড়িয়েই দেবেন—

সেই কথাই রইল। মল্লিকমশাই উঠলেন। তাঁর দৈনন্দিন বরাদ্দ কাজও শেষ হয়ে গেছে তখন, সন্দীপও মল্লিকমশাই-এর সঙ্গে উঠলো। তারপর যে রাস্তা দিয়ে তারা তিনতলায় গিয়েছিল ঠিক সেই রাস্তা ধরেই আবার একতলায় মল্লিকমশাই-এর ঘরে এসে পৌঁছল। মল্লিকমশাই তখন খানিকটা হাল্কা বোধ করছেন। ঠাকুমা-মণির কাছে হিসেব নিয়ে যাওয়াটাই মল্লিকমশাই-এর সারাদিনের সব চেয়ে জরুরী কাজ। সেটাই যখন নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল তখন আর ভাবনা কী?

এক সময়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মল্লিক-কাকা, গাঙ্গুলীবাবুকে আপনি একশো টাকা দিয়ে এলেন কেন? উনি ওই টাকা নিয়ে কী করবেন?

মল্লিকমশাই তখন আর একটা খাতা নিয়ে বসেছিলেন। বললেন—মাসে-মাসে ওই টাকাটা ওঁকে দিয়ে আসতে হয়, ঠাকুমা-মণির তা-ই হুকুম।

সন্দীপ বললে—কেন? উনিও কি এই বাড়ির কোনও মাইনে করা লোক?

মল্লিকমশাই বললেন—আরে, না-না। মাইনে করা চাকর হতে যাবেন কেন উনি? উনি তো রেলে চাকরি করেন। ও ওঁর ভাই-ঝি'র জন্যে—

—ওঁর ভাই-ঝি?

—হ্যাঁ, তপেশবাবুর ভাই-ঝি। ওঁর ভাই-ঝি'কেই তো ঠাকুমা-মণি এ বাড়িতে নাতবউ করে নিয়ে আসবেন।

—তাই নাকি? তা তপেশবাবুর ভাই-ঝি'র বয়েস কত?

—এই ধরো দশ বছর। কি বড় জোর এগারো বছর।

সন্দীপ অবাক হয়ে বললে—এত কম বয়েসের বউ ঘরে আনবেন ঠাকুমা-মণি?

মল্লিকমশাই বললেন—না, না, এখন তো বিয়ে হবে না।

—কবে বিয়ে হবে?

—সে এখন অনেক বছর দেরি আছে। এখন থেকে সম্বন্ধ পাকা করে রাখছেন ঠাকুমা-মণি, এখন থেকে মাসে মাসে একশো টাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সেই টাকা দিয়ে ভাইঝিকে ভালো

জিনিস খাওয়ানো হয়, যাতে সেই টাকা দিয়ে ভালো মাস্টার রেখে লেখাপড়া শেখানো হয়। মুখুজ্জেবাড়ির বউ হয়ে যে আসবে সে যেন সব রকমে এ-বাড়ির যোগ্য হয়, তাকে দেখে কেউ যেন নিন্দে না করে।

মল্লিকমশাই-এর মুখ থেকে কথাগুলো শুনতে শুনতে সন্দীপ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অন্য এক অনাবিষ্কৃত দেশে গিয়ে পৌঁছলো। ঠাকুমা-মণির যে-নাতির সঙ্গে তপেশবাবুর ভাই-ঝির বিয়ে সে কোথায়? তাকে তো সন্দীপ দেখেনি! তাকে কী রকম দেখতে? তার বয়েস কত? সে কী করে? স্কুলে, না কলেজে কোথায় পড়ে?

তিরিশটা টাকা হাতে নিয়ে পরদিনই সন্দীপ রাস্তায় বেরোল। গিরিধারী গেটের পাশে দাঁড়িয়ে-ছিল। গেটের পাশেই তার ঘর। সেখানেই সে থাকতো, ঘুমোতো। সেখানেই সে একটা ছোট্ট উনুনে নিজের খাবার রান্না করতো। আর যখনই একটু ফাঁক পেত, তখনই খেয়ে নিত তাড়াতাড়ি। আর একলা থাকতে থাকতে যখন একটু নিরিবিলি পেত তখনই সে একখানা পুরনো ছাপানো তুলসী দাসের 'রাম-চরিত-মানস' পড়তো। প্রথম প্রথম গিরিধারী তাকে কিছু বলতো না। কিন্তু যেদিন থেকে বুঝলো যে সন্দীপ মল্লিকমশাই-এর দেশের লোক, আর তার মনিবের কাজ করতেই এসেছে, তখন থেকেই একটু সমীহ করতে লাগলো কারণ, মাসকাবারি মাইনে তাকে নিতে হয় সরকারবাবুর ঘরে গিয়ে। গিরিধারী দেখেছে সেখানেও সন্দীপ সরকারবাবুর কাছে থাকে। টাকা গুণে দেয়। সুতরাং এমন লোককে সেলাম করলে তার আখেরে লাভই হবে। তাই তখন থেকেই গিরিধারী সন্দীপকে বাড়ির বাইরে যাতায়াতের সময় সেলাম করতো। সন্দীপ একদিন জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা গিরিধারী, তুমি আমায় দেখলেই সেলাম করো কেন?

গিরিধারী বললে—হুজুর, আপনি তো বড়া আদমী—

—আমি বড় আদমী?

গিরিধারী বললে—জরুর। আপনি তো আমার মালিক আছেন হুজুর—

সন্দীপ বললে—না-না, তুমি আমাকে সেলাম করো না। আমি খুব গরিব লোকের ছেলে। পেটের দায়ে কলকাতা এসেছি চাকরি করতে আর লেখাপড়া...আমি আর তুমি একই রকম।

তবু গিরিধারী সন্দীপের কথা শুনতো না। বলতো—আপনি হুজুর রাত ন'টার আগেই বাড়ি ফিরবেন। ঠাকুমা-মণির হুকুম রাত ন'টার সময় গেট বন্ধ করতে হবে।

সন্দীপ বললে—রাত ন'টার পর হলে তুমি গেট খুলবে না?

—না, হুজুর। ঠাকুমা-মণির হুকুম।

সন্দীপের মনে পড়লো ঠিক রাত ন'টার সময় ঠাকুমা-মণির সেই গলার আওয়াজ। তেতলা থেকে ঠাকুমা-মণি চেঁচাতেন—গিরিধারী, গেট্ বন্ধ করো।

গিরিধারীর খেয়াল রাখতে হয় কখন রাত ন'টা বাজলো। সে নিচের থেকে চেঁচায় গেট্ বন্ধ কর্ দিয়া ঠাকুমা-মণি—

তেতলায় ঠাকুমা-মণি গিরিধারীর সেই কথা শুনে নিশ্চিন্ত হন। তখন ঠাকুমা-মণির শুতে যাবার সময় হয়। তখন বিন্দু পায়ের কাছে বসে ঠাকুমা-মণির পা টিপতে সুরু করে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ঠাকুমা-মণির সমস্ত শরীর। সেই শেষ রাত তিনটের সময়ে আবার ঘুম থেকে তাঁকে উঠতে হবে। চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ছ'ঘণ্টার ঘুমই ওই বয়েসে যথেষ্ট। সেই রাত তিনটের সময়ে ওঠার পরই ঠাকুমা-মণি তৈরি হয়ে নেন। এ তাঁর চিরকালের অভ্যেস। যখন দেবীপদ মুখার্জি বেঁচে ছিলেন তখন থেকেই। সে কতকাল আগেকার কথা। দেবীপদ মুখার্জিকেও তখন ভোরে উঠতে হতো ঘুম থেকে। তাঁর অনেক কাজ তখন। তখন তিনি 'স্যাকস্‌বি মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি, ইন্ডিয়া লিমিটেড্' তৈরি করেছেন নতুন। বেলুড়ে তাঁর কারখানা, কিন্তু অফিস ডালহৌসি স্কোয়ারে। অত বড় কোম্পানি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বললে ভুল হবে। বলতে গেলে ম্যাকডোন্যালড্ সাহেবই কোম্পানিটা তাঁর মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। সে-সব দিনের ভাবনায় তাঁর রাত্রে ঘুম হতো না। সেই সময়ে এই অত বড় সংসার একলা

দেখেছেন ঠাকুমা-মণি। একদিকে একতলা-দোতলা-তিনতলা বাড়ির নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, আর অন্যদিকে তাঁর ঠাকুর-বাড়ির বিগ্রহ সিংহবাহিনীর পুজোপাঠ, আর তার সঙ্গে ভোরবেলা বাবুঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান। সে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক আর ভূমিকম্পই হোক, রোজ ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে সকাল পাঁচটার মধ্যে বাবুঘাটে গিয়ে স্নান করতে হবেই।

এই গঙ্গাস্নান করতে গিয়েই হঠাৎ একদিন ঠাকুমা-মণি আবিষ্কার করলেন ওই মেয়েটিকে। ছোট্ট ফুট-ফুটে ফর্সা চেহারা। বয়েস কত আর হবে। বড় জোর নয় দশ কি এগারো। তার বেশি নয়। গাড়ি থেকে নেমে ঠাকুমা-মণি বাবুঘাটের দালানে গিয়ে ঢুকেছেন, তাঁর [illegible] করা পাণ্ডা আছে ঘাটে। দশরথ তাঁকে দেখতে পেলেই অন্য যজমান ছেড়ে ঠাকুমা-মণিকে আগে অভ্যর্থনা করে।

দশরথ সেদিনও বললে রোজকার মত—আসুন ঠাকুমা-মণি, আসুন—

বলে উঠে দাঁড়ালো। অন্য কোনও যজমানকে দেখলে দশরথ এমন করে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে না। ঠাকুমা-মণির মত এমন শাঁসালো যজমানও তার আর নেই কলকাতায়। সে-সময়ে অন্য যত যজমানই থাক তাকে দশরথ পাশে সরিয়ে দেয়। শুধু যে মাসকাবারি টাকা পায় তাই-ই নয় বছরে পুজোর সময় দশরথ একবার করে বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে এসে মল্লিকমশাই-এর কাছ থেকে একটা ধুতি আর গামছা নিয়ে যায়। আর তা ছাড়া রথের সময়, স্নানযাত্রার দিনেও চার-পাঁচ টাকা বখশিস পায় সে। এটা তার উপরি। এ-ছাড়াও বিপদে-আপদে হাত পাতলে ঠাকুমা-মণি কখনও তাকে না করেন না।

সেদিন বোধহয় একটা বিশেষ যোগ ছিল, তাই বাবুঘাটে অনেক লোকের ভিড় হয়েছে। আর মধ্যে মেয়েদের ভিড়ই বেশি। দশরথ সেদিনও ঠাকুমা-মণিকে অভ্যর্থনা করেছে। অন্যদিনের মত বিন্দুও ছিল সঙ্গে। দশরথের কাছেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠাকুমা-মণি বিন্দুকে বললেন—বিন্দু, দশরথকে জিজ্ঞেস কর তো মেয়েটা কে?

সত্যিই মেয়েটার দিক থেকে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। বিন্দু দশরথকে কথাটা জিজ্ঞেস করে এসে বললে—ও চেনে না বলছে। বলছে ওর মা নাকি ওকে এখানে রেখে গঙ্গায় চান করতে গেছে। একটু পরেই ওর মা এখানে আসবে—

মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর বটে, কিন্তু দেখে বোঝা যায় গরীব ঘরের মেয়ে। গায়ের ফ্রকটা পুরোন। ঠাকুমা-মণি এবার মেয়েটার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—খুকী, তোমরা কোথায় থাকো?

মেয়েটি বললে—খিদিরপুরে—

—খিদিরপুরে কোথায়? বাড়ির ঠিকানা কী?

মেয়েটি ভয় পেলে না। বললে—সাত নম্বর মনসাতলা লেন—

ঠাকুমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটা কী বলো তো মা?

মেয়েটি বললে—প্রথমে আমার নাম ছিল অলকা। ইস্কুলে ভর্তি হবার পর আমার কাকা অলকা নাম বদলে রাখলে বিশাখা—

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

মেয়েটি বললে—তখন আমার বাবা মারা গেলেন কিনা তাই কাকা আমার নামটা বদলে দিলে—

—তোমার বাবা নেই?

—না, শুধু মা আছে।

ঠাকুমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি তোমার কাকার কাছে থাকো?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—।

—তোমার আর ভাই-বোন কিছু নেই?

—না।

ঠাকুমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাকার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?

—হ্যাঁ, আমার এক খুড়তুতো বোন আছে, তার নাম বিজলী। যার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে আমার নাম রাখা হয়েছে বিশাখা।

—তোমাদের বাড়িতে সব সুদ্ধ ক'জন লোক আছে?

বিশাখা বললে—আমি, আমার মা, আমার কাকা, আমার খুড়তুতো বোন বিজলী, আর আমার কাকীমা, মোট এই পাঁচজন—

—তোমার কাকার নাম কী মা?

বিশাখা বললে—শ্রী তপেশ কুমার গাঙ্গুলী।

—তোমরা বামুন তাহলে? তা তোমার কাকা কী করেন? চাকরি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় চাকরি করেন?

—রেলের আপিসে।

—কত মাইনে পান?

বিশাখা বললে—তা জানি না।

তা-তো বটেই, ছোট্ট এইটুকু দুধের মেয়ে, কাকার মাইনের খবর তার জানবার কথাই নয়। সত্যি, কথাটা জিজ্ঞেস করাই উচিত হয়নি ঠাকুমা-মণির। চারদিকে তখন মানুষের ভিড় জমে গেছে। অন্যদিন এত ভিড় হয় না, আর দেরী হলে হয়ত আর স্নান করতেই পারবেন না। চারদিকে মানুষের এত সমস্যা, আর সেই সমস্যা যত বাড়ছে মানুষের ততই গঙ্গাস্নান বেড়ে চলেছে। শুধু গঙ্গাস্নানই নয়, ঠাকুমা-মণি দেখছেন কালিঘাটের মন্দিরেই হোক আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই হোক সব জায়গাতেই মানুষের পুজো দেওয়ার ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। তিনি তারই মধ্যে লোকের ভিড় কাটিয়ে কোনও রকমে স্নান করে নিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বিন্দুকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

বিন্দুকে বললেন—হ্যাঁ রে, দশরথের কাছে সেই মেয়েটাকে তো দেখলুম না! সে কি চলে গেছে নাকি? তুই দেখেছিস?

বিন্দু বললে—হ্যাঁ, চলে গেছে, তার মা'র সঙ্গে চলে গেছে।

সামান্য একটু দর্শন। সেই সামান্য দর্শনেই যেন ঠাকুমা-মণির মনে একটা ছাপ রেখে গেছে মেয়েটা। বাড়িতে সেদিনও সরকারমশাই একতলা থেকে দোতলায় এলেন। কালিদাসী দোতলা থেকে তেতলার সুধাকে খবরটা জানিয়ে দিতেই বিন্দু এসে সরকারমশাইকে ঠাকুমা-মণির কাছে নিয়ে গেল। ঠাকুমা-মণি তৈরি হয়েই বসে ছিলেন। ঠাকুমা-মণির সামনে বসে মল্লিকমশাই যথারীতি দৈনিক হিসেব-নিকেশের খাতা বার করে পড়ে শোনালেন। অন্যদিনের মত ঠাকুমা-মণিও জমা-খরচের অঙ্কের নিচেয় ট্যাঁড়া মেরে একটা সই করে দিলেন। তারপর মল্লিক-মশাই যথারীতি হিসেবের খেরো খাতাটা বগলে পুরে চলে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু ঠাকুমা-মণি যেতে বারণ করলেন। বললেন—একটা কথা আছে সরকারমশাই, আর একটু বসুন—

মল্লিকমশাই বসলেন। ঠাকুমা-মণি বললেন—আজ সকালে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে একটা মেয়েকে দেখলুম। বড় অপূর্ব রূপ, দেখে আমার মন-প্রাণ ভরে গেল। বয়েস এই দশ কি এগারো। দেখে মনে হলো গরীব ঘরের মেয়ে। আমি নাম জিজ্ঞেস করতে সে বললে— তার নাম বিশাখা। বিশাখা গাঙ্গুলী। শুনে মনে হলো ওরা তো আমাদের পাল্টি ঘর। তা ভাবলুম আমার নাতির সঙ্গে ওই বিশাখার বিয়ে দিলে কেমন হয়—

—পাত্রীর বয়েস কত বললেন?

ঠাকুমা-মণি বললেন—এই দশ কি এগারো, তার বেশি নয়। তা বিয়ে আমি তা'বলে এখনই দিচ্ছি না, এখন থেকে কথা বলে রাখছি। যখন শুনলুম যে আমাদেরই পাল্টি ঘর, তখনই কথাটা মনে পড়লো। এমন সুন্দরী মেয়ে পরে হয়ত না-ও পেতে পারি। আর পাত্রীটি যখন বড় হবে তখন

হয়ত কলকাতার অন্য কোন বড় লোক ওই রূপ দেখে নিজের ছেলের বউ করে নিয়ে যাবে। তখন? তখন কী হবে? আপনি কি বলেন?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি কি বলবো ঠাকুমা-মণি, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন—

—তবু আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাইছি। আপনি তো এত বচ্ছর এ-বাড়িতে রয়েছেন, আপনি সবই দেখেছেন আর এখনও দেখছেন। বাড়ির কর্তাকেও তো আপনি দেখেছেন। আপনার কাছে এ-বাড়ির কিছুই লুকোনো নেই। আপনিই বলুন না, এখন থেকে পাত্রী পছন্দ করে রাখা ভালো নয়?

মল্লিকমশাই শুনে কী আর বলবেন, শুধু বললেন—হ্যাঁ নিশ্চয়, খুব ভালো—

ঠাকুমা-মণি বললেন—কর্তা বেঁচে থাকলে আমি আর এ-সব নিয়ে ভাবতুম না—তাঁর সংসার, তিনি যা বুঝতেন তাই-ই করতেন। এই দেখুন না, আমার ছোট ছেলে মুক্তি। মুক্তির বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার কী ফল হলো তা তো আপনি জানেন। কোথায় রইল শক্তি আর শক্তির বউ আর কোথায়ই বা রইল মুক্তি আর মুক্তির বউ। আমার সংসার করবার সাধ চিরকালের মত ঘুচে গেল। এখন আমি এই এত বড় শ্মশানের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছি। তাই ঠিক করেছি এবার আমি সে ভুল করবো না। যা ভুল হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আমি এবার গুরুদেবকে ডেকে এনে পাত্রীর কুষ্ঠি দেখিয়ে যাচাই করে গরীব ঘর থেকে সুন্দরী মেয়ে এনে সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে দেব। আমি ঠিক করছি না?

মল্লিকমশাই কী আর বলবেন। মনিব যা বলছেন তার ওপর তো কিছু বলবার অধিকারই নেই তাঁর। তিনি তো এ-বাড়ির পরিবারের মধ্যেকার কেউ নন। তিনি হলেন মাত্র একজন মাস-মাইনের কর্মচারী। তাঁর নিজস্ব কিছু মতামত থাকতেই নেই, বিশেষ করে বিয়ের মত গুরুতর একটা ব্যাপারে।

ঠাকুমা-মণি বললেন—কই, আপনি তো কিছু কথা বলছেন না—

মল্লিকমশাই বললেন—আপনি যা ভেবেছেন তাই করুন। ছোটখোকার বিয়েটা খুব ভেবে-চিন্তেই দেওয়া ভালো—নইলে আবার ছোটবাবুর মত ব্যাপার হয়ে যাবে—

ঠাকুমা-মণি বললেন—হ্যাঁ, তাই বলুন। কর্তা যে এমন বিচক্ষণ মানুষ হয়ে ছেলেদের কী-রকম বিয়ে দিয়ে গেল আমার হাড়-মাস একেবারে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। বড়লোকদের ঘর থেকে প্রাণ গেলেও আমি আর মেয়ে আনছি না, এই আমি বলে রাখলুম সরকারমশাই, উঃ কী বউ এনেছিলেন কর্তা, আমার নিজের পেটে-ধরা ছেলেকে পর্যন্ত একেবারে পর করে দিলে—

কথা বলতে বলতে ঠাকুমা-মণির গলাটা যেন একটু বুঁজে এল। তবু সেই ধরা গলাতেই বলতে লাগলেন—এমন পিশাচ মা হয়েছে যে নাতনিকে একবার এ-বাড়িতে ঠাকুমা-মণিকে দেখতে পর্যন্ত পাঠায় না। বলি আমি যদি না বিয়ে দিতাম তো কোথায় পেতিস অমন সোয়ামী, শুনি? সরকারমশাই, আপনিই বলুন, আমি কি কিছু অন্যায্য কথা বলেছি? আমারও তো নাতি-নাতনিকে একটু চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে! পুজোর সময় পর্যন্ত এ-বাড়ি মাড়ায় না।

মল্লিকমশাই একটু সান্ত্বনার সুরে বললেন—কিন্তু ছোটবাবু তো আসেন, ছোটবাবু তো পুজোর সময়ে আপনাকে পেন্নাম করে যান—

ঠাকুমা-মণি বললেন—কে? কার কথা বলছেন? মুক্তি? কেন আসবে না, শুনি? কর্তা ওই কোম্পানি করে গিয়েছিলেন বলেই তো এখনও খেতে পাচ্ছে ওরা, এখনও সবাই নবাবি করতে পারছে। আর শুনেছেন তো ছোটবউমাও আবার একটা গাড়ি কিনেছে। ছেলে-বউ দু'জনেরই দুটো গাড়ি, দু'টো করে ড্রাইভার—এ-সব কার দৌলতে হচ্ছে? কে টাকা জোগাচ্ছে? কার জন্যে বাড়ি হলো? কেন এ-বাড়িতে কি জায়গা ছিল না? এ-বাড়িতে কি থাকবার ঘর ছিল না?

ঠাকুমা-মণির এই জ্বালা, এই রাগ, এ বহুদিনের। যতবার এ-প্রসঙ্গ উঠেছে ততবার ঠাকুমা-মণি মল্লিকমশাইকে এ-সব কথা শুনিয়েছেন। সরকারমশাইকে নতুন করে এ-সব কথা শোনানোর

তো কোনও দরকার নেই। তিনি এ-বাড়ির কে? তিনি তো মাত্র একজন বেতনভুক্ কর্মচারী। তিনি তো পর।

মনে আছে যখন মুক্তিপদ'র বাড়ি তৈরি শুরু হলো তখনই ঠাকুমা-মণি রাগে ফেটে পড়েছিলেন। বলেছিলেন—কেন, এ-বাড়িতে কি তোমার জায়গা কুলোচ্ছিল না? নতুন বাড়ি তৈরি করবার মতলব তোমাকে কে দিলে শুনি? ছোট-বউমা?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—তুমি বুঝছো না কেন মা, যে প্রপার্টি বাড়ানো ভালো। ব্যাঙ্কে থাকলে টাকার দাম তো আর বাড়বে না। কদিনে টাকার দাম কমতে-কমতে একেবারে পাঁচ পয়সায় নেমে যাবে—তার চেয়ে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করলে টাকাগুলো তবু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে—

ঠাকুমা-মণি বলেছিলেন—এ-সব কে তোমাকে বলেছে? কে এ বুদ্ধি দিয়েছে শুনি? ছোট-বউমা?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—না-না, এ বুদ্ধি দিয়েছে আমাদের সলিসিটার—

ঠাকুমা-মণি বলেছিলেন—তোমার কাছে তোমার সলিসিটারই বড়ো হলো আজ? আর আমি কেউ না? তা তোমার সলিসিটার কি প্রপার্টি করে মা'কে ছেড়ে আলাদা সংসার করতেও বলে দিয়েছে? যাক গে যা ভালো বোঝ তাই করো, দয়া করে আমার কাছে আর ওই মিথ্যে সাফাইগুলো গেয়ো না। তোমরা বাড়ি আর হাঁড়ি দুই-ই আলাদা করতে চাও, এই সোজা কথাটা বললেই হয়।

এর পর থেকে দোতলার সঙ্গে তেতলার আর কোনও মানসিক বা হার্দিক সম্পর্ক রইল না। আর আর্থিক সম্পর্ক? আর্থিক সম্পর্কের কথাই ওঠে না, কারণ বাড়ির কর্তা দেবীপদ মুখার্জি ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁর স্ত্রী কনকলতা দেবী যেমন একজন ডিরেক্টর, তেমনি ছেলে শক্তিপদ মুখার্জি আর তার স্ত্রী, তারাও ডিরেক্টর। আর ছোট ছেলে মুক্তিপদ মুখার্জি আর তার স্ত্রী, তারাও ডিরেক্টর। সব মিলিয়ে পাঁচজন ডিরেক্টর এই 'স্যাক্সবি মুখার্জি এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর। এই পাঁচজনই এই সম্পত্তির মালিক।

আশ্চর্য, কত স্বপ্নই না দেখে মানুষ, কত স্বপ্নের জালই না বোনে মানুষ নিজের মনে মনে। মল্লিকমশাই-এর আজও মনে আছে যেদিন ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ সাহেব বড়বাবুর হাতে কোম্পানি তুলে দিয়ে বিলেত চলে গেল, সেদিন সাহেবকে বড়বাবু একটা পার্টি দিয়েছিলেন এই বাড়িতে। শুধু একটা সাহেবকে নয় পুরোন বিলিতি সাহেবদের সঙ্গে মেমসাহেবদেরও ডাকা হয়েছিল। কেলনার হোটেলের মালিককে দেওয়া হয়েছিল খাবারের অর্ডার। পার্টিতে যে কত রকমের হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি আর বিয়ার আর সোডার বোতল এসেছিল তার হিসেব নেই। শুধু মদই নয়, তার সঙ্গে ছিল রকমারি মাংস, চিকেন, মাটন, বীফ্। আর বিরিয়ানি, পোলাউ, তন্দুরি প্রণ, আর স্যান্ডউইচ, সুপ, পরিজ আর শেষকালে পুডিং। মল্লিকমশাই সেই ছোটবেলায় ও সব জিনিসের নামও শোনেন নি। আর শুধু কি খানাপিনা? সঙ্গে ছিল ব্যান্ডপার্টি। বিডন্ স্ট্রীট অঞ্চলের কোনও লোক সেদিন শেষ রাত পর্যন্ত বিলিতি-বাজনার আওয়াজে ঘুমোতেই পারেনি। একদিকে পার্টি চলছে আর অন্যদিকে আকাশে উড়ছে একটার পর একটা জ্বলন্ত ফানুস। আর তার ওপর আছে বাজি। কোনও বাজি মাটিতে ফাটে, কোনওটা আকাশের ওপর উঠে ফাটে। ফাটবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন তারার মালা হয়ে আকাশে ভেসে ভেসে মাটিতে নামতে থাকে। সে কী বাহার, সে কী রোশনাই!

সেই দেবীপদ মুখার্জি বিলিতি কোম্পানির মালিক হবার পর তাঁর প্রথম ছেলে শক্তিপদ মুখার্জি সাবালক হলো, একদিন তার বিয়েও হলো, ঘরে বউও এল। সে সাবালক হতেই সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির ডিরেক্টরও হলো, ডিরেক্টর হলো তার বউও।

কিন্তু বউ-এর সঙ্গে বনতো না শাশুড়ির। শ্বশুরের পছন্দ করা বউ শাশুড়ির মনঃপূত হলো না। অশান্তি শুরু হলো বাড়িতে। বাইরে বড়লোকের ঐশ্বর্য আর ভেতরে চাপা আগুন। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু ক্যানসারের মত তা ভেতরে ভেতরে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এর পর মুক্তিপদ যখন বড় হলো, নিয়ম মাফিক সেও ডিরেক্টর হলো। এবং কালক্রমে তারও বিয়ে হলো। কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে সেই বউ-এরও বনলো না।

তখন ঠিক সেই সময়েই বাড়ির কর্তা দেবীপদ মুখার্জি হঠাৎ মারা গেলেন।

সেই দিন থেকেই শুরু হলো ঠাকুমা-মণির জীবনের অমাবস্যা।

তারপর থেকে এই মুখার্জি বাড়িতে যে-অবিশ্বাস্য কাহিনী শুরু হলো তার ওপর ভিত্তি করেই রচনা করা হলো "এই নরদেহ"। এই বিরাট উপন্যাস।

কিন্তু সে-কথা এখন নয়। পরে বলা হবে।
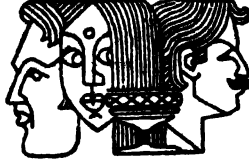
সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

পরমেশ মল্লিকমশাই-এর বন্ধুর ছেলে এই সন্দীপ। এই সন্দীপ লাহিড়ী। এই সন্দীপ লাহিড়ীও আবার ভাগ্যের কোন্ কলকাঠির টানা-পোড়েনে পড়ে এই মুখার্জি বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে পর্যুদস্ত, ধ্বস্ত, জর্জরিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তা কি তখন সে জানতো? জানলে হয়তো দু'মুঠো ভাতের জন্যে কলকাতাতেও আসতো না। আর কলকাতাতে এলেও এই অভিশপ্ত বাড়ির ত্রিসীমানাতেও ঢুকতো না।

মল্লিকমশাই কথা বলতে বলতে বোধহয় নিজেই অতীতের জালে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সন্দীপের প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেলেন।

সত্যিই, অতীতচারণ বড়ই মধুর। সে সুখের অতীতই হোক আর দুঃখের অতীতই হোক তার, সবটুকুই মধুর। মানুষের বয়েস যতই বাড়ে ততই সে অতীতচারী হতে থাকে। পরমেশ মল্লিকমশাই-এর নিজের সংসার করার সাধ মেটেনি, নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটেনি। তিনি শুধু যে পরিবারের মধ্যে এসে আপাদমস্তক জড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই পরিবারের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ দেখে গেলেন। আর যেটুকু দেখতে তাঁর বাকি ছিল তা দেখবার জন্যই বেড়াপোতা থেকে কোন্ এক সন্দীপ লাহিড়ী এসে হাজির হলো বারো-বাই-এ বিড্ন স্ট্রীটে 'স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেড্'-এর বাড়ির অন্দরমহলে।

মল্লিকমশাই-এর কাছে শোনা কথাগুলো এখনও সন্দীপের মনে আছে। মনে আছে মল্লিকমশাই সেইদিনই বিকেলবেলা বিড্ন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন খিদিরপুরে। খিদিরপুরে পৌঁছিয়ে মনসাতলা লেন খুঁজে নিতে দেরি হয়নি। সেই রাস্তার সাত নম্বর বাড়িটাও খুঁজে পাওয়া গেল। একটা পুরোন বালি-খসা পাঁউরুটি রং-এর বাড়ি। বাড়ির সদরের দরজার পাল্লা দু'টো ফেটে চৌচির হয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ধাক্কা দিলেই বুঝি পাল্লা দু'টো আলগা হয়ে পড়ে গিয়ে বাড়ির অন্দরমহলটা রাস্তার পথচারীদের চোখের সামনে একেবারে বেআব্রু হয়ে যাবে। তবু মল্লিকমশাই দরজার কড়া নেড়ে খটাখট শব্দ করতে লাগলেন।

ভেতর থেকে কে একজন মেয়েলি গলায় বললে—কে?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি—

অচেনা গলা, তাই ভেতর থেকে দরজাটা কেউ বিনা আত্মপ্রকাশে খুলে দিলে না। উত্তরে শুধু বললে—কে আপনি?

—আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি বিড্ন স্ট্রীটে মুখার্জিবাবুদের বাড়ি থেকে আসছি।

এবার দরজাটা খুললো। একজন বিধবা মহিলা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মল্লিকমশাই আবার বললেন—এ বাড়িতে তপেশ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামে কেউ থাকেন?

মহিলার মুখটা ঘোমটা দিয়ে আধ-ঢাকা। বললেন—হ্যাঁ, তিনি আমার দেওর। তিনি অফিসে গেছেন, এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

—কোন অফিসে কাজ করেন তিনি?

মহিলা বললেন—রেলের অফিসে—

—কখন এলে তাঁর সঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে?

মহিলাটি বললেন—আর একটু পরেই এসে যাবেন। আপনি আর আধঘণ্টা পরে আসবেন—

মল্লিকমশাই কী করবেন বুঝতে পারলেন না। অতদূর এসে আবার ফিরে যাবেন? কিংবা এখানেই কাছাকাছি কোথাও ঘোরাঘুরি করে না-হয় আধঘণ্টা পরে এলেই হবে। তাই ঠিক করেই চলে যাবার জন্যে মুখ ঘোরালেন। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। পেছন থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কে?

এতক্ষণে মল্লিকমশাই মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন প্যান্ট শার্ট পরা মাঝ-বয়েসী একজন ভদ্রলোক তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দু'জনেই চেয়ে আছেন, তবু কেউ কাউকে চিনতে পারছেন না। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কাকে চান?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি সাত নম্বর মনসাতলা লেনের তপেশ কুমার গাঙ্গুলীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, আমিই তপেশ গাঙ্গুলী। আপনার নাম?

মল্লিকমশাই বললেন—আমার নাম পরমেশচন্দ্র মল্লিক। আমি বিড়ন স্ট্রীটের মুখার্জিবাড়ির ম্যানেজার, মানে সরকার। ওদের পরিবারের সমস্ত খরচ-পত্তরের হিসেব রাখাই আমার কাজ। আপনি 'স্যাকস্‌বি মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড'-এর নাম শুনেছেন তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—হ্যাঁ—

—আমি সেই তাদের ওখান থেকেই আসছি।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু ওদের বাড়ি তো বেলুড়ে—

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ, যিনি বেলুড়ে বাড়ি করেছেন তিনি হচ্ছেন মুক্তিপদ মুখার্জি। কর্তা দেবীপদ মুখার্জি মারা যাওয়ার পর বড় ছেলে শক্তিপদ মুখার্জি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হন। কিন্তু তিনি বেশি দিন বাঁচেন নি, বড় ছেলের বউও কিছুদিন পরে মারা যান। তিনি এক ছেলে রেখে যান। তার নাম সৌম্য মুখার্জি। তার বয়েস এখন কম। সেই নাতি আর কর্তার বিধবা স্ত্রী এই বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে থাকেন। আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি—

তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলেন—তা মা বেঁচে থাকতেই ছোট ছেলে আলাদা হয়ে গেলেন কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—দেখুন, ওদের ফ্যক্টরি তো বেলুড়ে, তাই ফ্যাক্টরির কাছেই বাড়ি করেছেন, যাতে ফ্যাক্টরির কাজ দেখা-শোনার সুবিধে হয়। তা ওই নাতি আর বিধবা ঠাকুমাকে নিয়েই এই বিড়ন স্ট্রীটের সংসার। প্রাণী তো মাত্র দু'জন কিন্তু তারই জন্যে হাজারটা লোক-লস্কর, ঝি-ঝিউড়ি, ঠাকুর-চাকর কত কিছু, বড়লোকের বাড়ি হলে যা হয় আর কি। আমি সেই বাড়ি থেকে এসেছি আপনার ভাইঝি'র সম্বন্ধ নিয়ে—

তপেশ গাঙ্গুলী বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—সম্বন্ধ? কীসের সম্বন্ধ?

মল্লিক-মশাই বললেন—বিয়ের—

তপেশ গাঙ্গুলী যেন আকাশ থেকে পড়লেন—বিয়ের সম্বন্ধ! বলছেন কি মশাই আপনি? আমার ভাইঝি'র বিয়ের সম্বন্ধ? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আমার ভাইঝি'র বয়েস কত জানেন?

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ, সব জানি। আপনার ভাইঝি'র নাম, বয়েস সব কিছু জানি—

—বলুন তো কী নাম?

—বিশাখা।

—বয়েস?

—বয়েস এই দশ কি এগারো—

তপেশ গাঙ্গুলী আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আপনি কী করে এ-সব জানলেন বলুন তো?

মল্লিকমশাই বললেন—আমার ঠাকুমা-মণি কাল বাবুঘাটে গঙ্গাচান করতে গিয়ে আপনার ভাইঝি'কে দেখেছেন আর দেখে এত ভালো লেগেছে যে বিশাখার কাছ থেকে তার নাম-ধাম, কাকার নাম, সব জেনে আজ সকালেই আমাকে ডেকে বিকেলবেলা আপনার বাড়িতে আসতে বলে দিলেন—

তপেশ গাঙ্গুলী তখনও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বললেন—তা বিশাখাকে যে তাঁর পছন্দ হলো তা বুঝতে পারলুম, কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ কার সঙ্গে? পাত্রটি কে?

মল্লিকমশাই বললেন—পাত্রটি হলো আর কেউ নয় আমার ঠাকুমা-মণির নাতি, পাত্রের নাম সৌম্য মুখার্জি। ওই স্যাক্স্‌বি মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড-এর সমস্ত সম্পত্তির একজন অংশীদার—

কথাটা যেন তপেশ গাঙ্গুলীর বিশ্বাস হলো না। আনন্দের অতিশয্যে তাঁর দম বন্ধ হয়ে এল। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—তা এ-রকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ছি-ছি, এই গরমে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? আপনি ঘেমে উঠেছেন, চলুন-চলুন, ভেতরে চলুন, পাখার তলায় গিয়ে বসবেন চলুন, কী কাণ্ড, ভেতরে চলুন তো।

বলে মল্লিকমশাই এর হাতটা ধরে টানতে টানতে একেবারে সদর দরজা পেরিয়ে সামনের এক ফালি উঠোনের ওপর পড়লেন। সেখান থেকেই ডাকতে লাগলেন—ওরে, কোথায় গেলি সব, আমাদের ঘরে দু'কাপ চা দিয়ে যা দিকিনি, ও বউদি, এখ্‌খুনি দু'-কাপ চায়ের জল চড়িয়ে দাও—

বলে সেখান থেকে মল্লিকমশাইকে টানতে টানতে পাশের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঘরের ভেতরে একটা তক্তপোষের ওপরে রাজ্যের বিছানাপত্র গোল করে পাকানো। মশারিটার এক পাশটা খুলে বাকি অংশটা উল্টো দিকের দেয়ালে ঝুলন্ত অবস্থায় দৃশ্যমান। মল্লিকমশাই ঘরে তো ঢুকলেন, কিন্তু কোথায় বসবেন ভাবছিলেন। তপেশবাবু ততক্ষণে হন্তদন্ত হয়ে ঘরের ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল্‌ ফোর্সে ঘুরিয়ে দিলেন। যাতে মল্লিকমশাই একটু আরাম পান, এত বড় একজন অভিজাত ভদ্রলোককে তিনি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কষ্ট দিয়েছেন, এ-কথাটা ভেবেই তিনি আত্মগ্লানিতে একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

মল্লিকমশাই তাঁর নিজের খাতির বেড়ে যাওয়ায় খুব মজা পাচ্ছিলেন। হয়ত এমনিই হয়। হয়ত কেন, এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তিনি এতে মজাই বা পাচ্ছেন কেন? এই তপেশবাবুকে তিনি স্বর্গের চাবি এনে দিয়েছেন, এই অবস্থায় পড়লে মল্লিকমশাই নিজেও তো এমনিই শশব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

ততক্ষণে চা এসে গেল। তপেশবাবু নিজের হাতে একটা চা ভর্তি কাপ তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—আগে চা খান, তারপর কাজের কথা হবে—

মল্লিকমশাই চায়ের কাপটা হাতে নিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলেন এ-বাড়ির দারিদ্র্য শুধু ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, চায়ের কাপে পর্যন্ত তার স্পর্শ লেগেছে। তাঁর মনে হলো তার এখানে এই বাড়িতে আসার আসল কারণটা নিশ্চয় এতক্ষণে এ-বাড়ির সারা আবহাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। নইলে ভেতরে এত ফুস্‌ফুস্‌ গুজ্‌গুজ্‌ আওয়াজ হচ্ছে কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—দেখুন তপেশবাবু, আমি কাজের কথাটা বলে চলে যেতে চাই, সেখানে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—

তপেশবাবু বললেন—বলুন, কী কাজের কথা বলবেন?

মল্লিকমশাই বললেন—আমায় আপনার ভাই-ঝি বিশাখার বাবার নাম, মায়ের নাম আর বিশাখার জন্ম-তারিখ, জন্ম-সময় আজ জন্ম-স্থানটা লিখে দিন একটা কাগজে, সেটা নিয়ে আমি চলে যাই—

তপেশবাবু বললেন—দাঁড়ান, আমি আসছি—

বলে তপেশবাবুর বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। মল্লিকমশাই শুনতে পেলেন তপেশবাবু ভেতরে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন—বৌদি ও বৌদি, দাও বিশাখার জন্ম-তারিখ, সময় আর বাবার আর তোমার নাম লিখে দাও, কোথায় গেলে তুমি? অ-বৌদি।

মল্লিকমশাই সেই বদ্ধ ঘরের ভেতরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। বাড়ির ভেতরে তখন অনেক মেয়েলি গলার আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট করে শোনা গেল না কথাগুলো। খানিক পরে তপেশবাবু একটা কাগজ নিয়ে এলেন। আর তাঁর সঙ্গে পেছন-পেছন দু'টি ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়ে। বয়েস দশ-এগারোর মধ্যে। কাগজটা দেখে মল্লিকমশাই নিজের জামার পকেটে রেখে দিলেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠলেন।

তপেশবাবু বললেন—আপনি কাগজটা একটু পড়ে দেখলেন না সরকারমশাই?

মল্লিকমশাই বললেন—ও দেখে আমি আর কী বুঝবো। আমি ওটা সোজা আমার মনিবকে গিয়ে দিয়ে দেব, তিনি যা ইচ্ছে হয় তাই করবেন—

তপেশবাবু বললেন—না-না, আমি সে-জন্যে বলছি না। ওতে দু'জনের দু'টো জন্ম-তারিখ দেওয়া আছে। একটা আমার নিজের মেয়ে বিজলীর, আর একটা আমার ভাই-ঝি বিশাখার—

—কেন, আপনার মেয়ের জন্ম-তারিখ তো আমি চাইনি।

তপেশবাবু বললেন—তা না-ই বা চাইলেন, আপনি আমার ভাইঝি'র বিয়েটা ঠিক করে দিলেন, আর ওই সঙ্গে আমার নিজের মেয়েরও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না?

মল্লিকমশাই বললেন—দেখুন এ তো বিয়ে নয়, এখন থেকে উনি পাত্রী পছন্দ করে রাখতে চান আর কি। তা ছাড়া আর কিছু নয়—

তারপর হঠাৎ একটি মেয়ের হাত ধরে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন—এই দেখুন, এই আমার মেয়ে বেজলী, এ কি রূপসী নয়? আমার ভাই-ঝি'র চেয়ে এ কি কম রূপসী? বিশাখা তো এর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। একেও দেখুন আর ওকেও দেখুন। আপনিই বিচার করুন কে বেশি রূপসী। মুখে একটু পাউডার-ক্রীম মাখিয়ে দিলেই একেবারে খাঁটি মেমসায়েবের বাচ্চা বলে মনে হবে। বলুন, নিজের চোখে দেখে ভালো করে বিচার করে বলুন। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, বিশাখার চেয়ে কি আমার বিজলী কম সুন্দরী?

মল্লিকমশাই কিছু বলবার আগেই তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললেন—আপনার ঠাকুমা-মণি কি রোজ গঙ্গাচাম করতে যান?

—হ্যাঁ, রোজ।

—কোন্ ঘাটে?

মল্লিকমশাই বললেন—বাবুঘাটে—

—ঠিক আছে, আমিও রোজ মেয়েকে নিয়ে নিজে বাবুঘাটে যাবো। যেতে যেতে একদিন-না-একদিন দেখা তো হয়েই যাবে।

মল্লিক-মশাই আর দাঁড়ালেন না। সেখান থেকে জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে সোজা মনসাতলা লেন ধরে একেবারে বাস-রাস্তায় গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন।

আর এদিকে তপেশবাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকে চেঁচাতে লাগলেন—কই গো তুমি কোথায় গেলে—ওরে বিজু, তোর মা কোথায়?

ভেতরে কোথা থেকে স্ত্রীর গলার আওয়াজ এলো—কী হলো? এই তো আমি, অত ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? কী হলোটা কী?

বিজলী মা'কে খুঁজে বার করলো। বললেন—এই যে বাবা, মা এখানে—

তপেশবাবু হঠাৎ গলাটা নিচু করলেন। বললেন—তোমার বড় জা'-এর মেয়ের তো বিরাট বড়লোকের বাড়ি বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল—

তারপরই হঠাৎ খেয়াল হলো যে তার মেয়ে বিজলী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। বললেন—এই, তুই কী করছিস এখানে? যা এখেন থেকে পালা—

চিরকালের অভাবের সংসারের নদীতে হঠাৎ যেন একটা সাচ্ছল্যের জোয়ার এসে সব-কিছু চঞ্চল করে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনাটা বলে তপেশ গাঙ্গুলী হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন—দেখ দিকিনি, তোমার দিদি গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কেমন নিজের একটা কাজ গুছিয়ে ফেললে, আর তুমি? যদি একদিনও দিদির সঙ্গে বাবুঘাটে যেতে তাহলে এতদিনে বিজলীরও একটা হিল্লে হয়ে যেত—

তপেশ গাঙ্গুলী কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু ও-পক্ষ থেকে কোনও জবাবই এলো না। যেমন বালিশে মাথা গুঁজে শুয়েছিল, তেমনি শুয়েই রইল। তপেশবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—ওগো! কী হলো, অসুখ হলো নাকি আবার?

তবু কোনও উত্তর নেই বিজলীর মায়ের দিক থেকে। তপেশবাবুর বিয়ে হওয়ার পর থেকেই এই অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত। এতদিন যে তাঁর সংসার চলেছে তা শুধু ওই বৌদির জন্যেই। দাদার মৃত্যুর পর থেকে আরো সুবিধে হয়েছে রাণীর। সংসারের কোনও কাজই আর রাণীকে নিজের হাতে করতে হয় না। রাণী চিরকাল অসুখ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাই ডাক্তারের পেছনেই তপেশবাবুর মাসে মাসে গাদা-গাদা টাকা খরচ হয়ে যায়। তপেশবাবু আবার ডাকলেন—রাণী, কী হয়েছে তোমার, বলো না! ডাক্তারবাবুকে ডাকবো? কথার জবাব দাও না—ও রাণী—

বলে রাণীর মাথায় হাত দিয়ে দেখতে চাইলেন শরীর গরম না ঠাণ্ডা? কিন্তু রাণী এক ঝট্‌কায় তাঁর হাতটা দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার জ্বালায় তো অস্থির হয়ে গেলাম। একে মাথার জ্বালায় মরছি তার ওপর আবার ঘ্যানোর ঘ্যানোর... বলি তুমি কি আমাকে একটু শান্তিতে মরতেও দেবে না?

বলে রাণী আবার পাশ ফিরে শুলো।

তপেশ গাঙ্গুলী সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন—রান্নাঘরের কাছে তখন বৌদি বোধহয় ডাল বাছাই-এর কাজ করছিল।

তপেশবাবু সেখানে দাঁড়ালেন। বললেন—বৌদি, তুমি কি কাল বাবুঘাটে চান করতে গিয়েছিলে?

বৌদি বললে—হ্যাঁ, কাল তোমার দাদার বার্ষিক কাজ ছিল কিনা, তাই...

—তা তুমি কি তোমার সঙ্গে বিশাখাকেও নিয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, কেন?

তপেশবাবু বললেন—এই যে যে-ভদ্রলোক এখন এসেছিল, যাকে চা করে দিতে বললুম, ও-ভদ্রলোক কে জানো? কলকাতার এক কোটিপতি বাড়ির ম্যানেজার। সেই বাড়ির মালিকানা বাবুঘাটে তোমার মেয়েকে সেদিন দেখেছে। দেখে খুব পছন্দ হয়েছে, তাই তোমার বিশাখার সঙ্গে নিজের নাতির বিয়ের কথা বলতে লোক পাঠিয়েছিল। সেই জন্যেই তো তোমার মেয়ের জন্মতারিখ-টারিখগুলো দিলুম—

—আমার বিশাখার বিয়ে?

—না, বিয়ে ঠিক নয়, এখন থেকে নাতির জন্যে পাত্রী পছন্দ করে রাখতে চায় আর কি—তোমার কপাল কত ভালো দেখ বউদি, আর তোমার জা?

এ-কথার জবাব কেউ দেয় না, জবাব কেউ প্রত্যাশাও করে না। তপেশবাবু নিজের দুঃখটা প্রকাশ করেই খালাস। তার বেশি তিনি আর কী করতে পারেন। সমস্ত পৃথিবীর ওপর তাঁর রাগ হতে লাগলো। যেন সবাই মিলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। তপেশবাবুর দুচোখ জুড়ে কান্না এসে গেল।

সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমও হলো না তাঁর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল এ-পাশ-ও-পাশ করতে লাগলেন। কখন রাত শেষ হয়েছে টের পান নি। যখন ভোরের দিকে অন্ধকার একটু পাতলা হলো তখন দেখলেন পাশেই রাণী অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

তিনি আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। কোনও শব্দ করলেন না। পাছে স্ত্রী-র ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্যদিন তিনি নিজে উঠেই স্ত্রীকে ডেকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু সেদিন কী যে হলো। কোথাকার কোন্ এক বাড়ির কোন এক মল্লিকমশাই এসে তাঁর ইঞ্চি-মাপা জীবন-যাপনের ধরা-বাঁধা গতিতে যেন এক বিস্ময়কর আবেগ আর রোমাঞ্চের তরঙ্গ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিনও সংসারের দৈনন্দিন কাজ তিনি করলেন বটে, কিন্তু মানুষের মত করে নয়। তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন মেশিন হয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে ভাতগুলো নাকে-মুখে গুঁজে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। অন্যদিন তপেশবাবু পশ্চিম দিকে গিয়ে বাসে ওঠেন। এই-ই তাঁর বরাবরের নিয়ম। ওই দিকেই রেলের বিরাট অফিস। সেই অফিসেই তাঁর জীবনের অর্ধেকটা তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। মন দিয়ে সেই কাজই তিনি এতকাল করে এসেছেন। এখন মনে হলো তিনি ঠকে গিয়েছেন। ভাগ্যের দেবতা তাঁকে কেবল প্রবঞ্চিতই করে এসেছে। তিনি বাস ডিপোর দিকে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা জট পাকিয়ে উঠলো। তিনি কোথায় যাবেন? অফিসে?

কিন্তু না, রেলের অফিসে কেউ যদি কাজ না-ও করে তবুও রেল চলবে। তপেশ গাঙ্গুলীর অভাবে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু তাঁর মেয়ের যদি বিশাখার মত ওই রকম একটা বড়লোক পাত্র না জোটে, তাহলে যে তাঁর সংসারের চাকাই অচল হয়ে যাবে। তিনি আর কোনও দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজা ধর্মতলাগামী একটা বাসের মধ্যে উঠে পড়লেন।
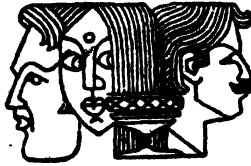
বারো-বাই-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে তখন প্রাত্যহিক কাজের গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। দেবীপদ মুখার্জির আমল থেকেই এ-কাজ চলে আসছে। মাঝখানে ছোট ছেলে মুক্তিপদ সপরিবারে এ-বাড়ি ছেড়ে বেলুড়ে নতুন বাড়িতে চলে যাওয়ার পরেও তার চলার বেগের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। একতলার ফুল্লরার সঙ্গে দোতলার কালিদাসীর সেই কথা-চালাচালি, তেতলার সুধার সঙ্গে বিন্দুর সেই ঝগড়া, সবই তখন পুরোমাত্রায় চলছে। কন্দর্প রোজকার মত নিয়ম করে ফুল যোগান দিয়ে গেছে। ঠাকুরবাড়ির মন্দিরের ঠাকুরবাড়ির ঝি কামিনী ততক্ষণে মন্দির ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে পাথরের পাটায় রক্ত-চন্দন ঘষতে শুরু করেছে। আর সদরের গেট্ দিয়ে ঢুকেই বাঁ-দিকে প্রথম যে ঘরটা পড়ে, তার ভেতরে বসে মল্লিকমশাই খেরো খাতায় রোজকার জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে কার পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। দেখলেন, গিরিধারী।

গিরিধারী বললে—হুজুর, এক আদমী আপনার সঙ্গে মিলতে চায়।

—কে? নাম কী?

গিরিধারী বললে—গাঙ্গুলীবাবু—

—কে গাঙ্গুলীবাবু? কোথা থেকে আসছে?

গিরিধারী বললে—খিদিরপুর থেকে—

এতক্ষণে মল্লিকমশাই বুঝতে পারলেন। মনসাতলা লেন থেকে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু কালই তো তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে পাত্রীর জন্ম-সাল তারিখ নিয়ে

এসেছেন। সেটা এখনও ঠাকুমা-মণিকে দেখানোই হয়নি। এরই মধ্যে আবার তিনি না বলে-কয়ে এ-বাড়িতে এসে হাজির হলেন কেন?

মল্লিকমশাই বললেন—ঠিক আছে, তুমি গাঙ্গুলী, ওকে এখানে নিয়ে এসো—

কথাটা বললেন বটে মল্লিকমশাই কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, তপেশ গাঙ্গুলী এই সকালবেলা কেন এলেন? তাঁর কি অফিস নেই? কিন্তু আর কিছু ভাববার আগেই গিরিধারী তপেশবাবুকে সঙ্গে করে তাঁর ঘরে নিয়ে এসেছে।

তপেশবাবু যেন তখন এক নতুন জগতে এসে ঢুকে পড়েছেন। গেট-এর বাইরে থেকেই তিনি বাড়িটার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভেতরের বার-বাড়িতে যখন ঢুকলেন তখন মনে হলো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ যেমন হঠাৎ কোনও অলৌকিক শক্তিতে একজন মানুষকে জলের তলার প্রাসাদ পুরীতে পৌঁছিয়ে দেয় এও অনেকটা যেন তেমনি। এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সাত নম্বর মনসাতলা লেনের ভাড়াটে বাড়িটার সঙ্গে এই বিরাট বাড়িটার একটা তুলনাসূচক চিন্তা তাঁর মাথায় উদয় হলো। তাঁর নিজের ভাইঝি'র বিয়ে হবে এই বাড়িতে! কথাটা ভাবতেও যেন কষ্ট হলো একটু!

—কী হলো, আপনি হঠাৎ?

মল্লিকমশাই-এর গলার আওয়াজে তপেশবাবুর স্বপ্নের জাল যেন ছিঁড়ে গেল।

—আপনার আজ অফিস নেই?

তপেশবাবু ততক্ষণে তক্তপোষের ওপর বসে পড়েছেন। বললেন—আমাদের রেলের অফিস, কাজ তো তেমন নেই, একদিন না গেলেও কিছুই আসে যায় না। এমনি এসে পড়লুম আপনার কাছে। আমার ভাইঝি'র তো একটা গতি করে দিলেন, ওই সঙ্গে আমার নিজের মেয়েরও একটা গতি করে দিন না?

মল্লিকমশাই বললেন—আমি কি কারো গতি করে দেবার মালিক? আমি সামান্য লোক, পেটের দায়ে পরের বাড়িতে চাকরি করে জীবন কাটিয়ে দিলুম। আপনি বরং ভগবানকে ডাকুন, তিনিই একটা কিছু গতি করে দেবেন—

তপেশবাবুর চোখে জল এসে যাবার মতো হলো। বললেন—তবু আপনি আপনার ঠাকুমামণিকে বলবেন, যেন আমার মেয়ের জন্যে একটা কিছু করেন—

মল্লিকমশাইকে বলতে হলো যে তিনি তা করবেন। বলবেন—আপনি অত বিচলিত হবেন না, আপনি এখন বাড়ি যান, পরে—

হঠাৎ ওপর থেকে সুধার গলার শব্দ এল—ও লো ফুল্লরা, সরকারমশাইকে পাঠিয়ে দে, ঠাকুমা-মণি ডাকছেন।

একতলার ঝি ফুল্লরা ঘরের সামনে ডাকলে—ওপরে ঠাকুমা-মণি ডাকছেন—

মল্লিকমশাই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—ওই তেতলা থেকে ঠাকুমা-মণির ডাক এসেছে, আমি চলি গাঙ্গুলীবাবু, আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, কিছু খবর থাকলে আমি আপনাকে জানিয়ে আসবো, চলি—

তবু তপেশবাবু বললেন—একটু বসবো?

—না না মিছিমিছি বসে থাকবেন কেন? আপনি এখন আসুন। আমি তো বলছি কিছু খবর থাকলে আমি নিজে গিয়ে আপনাকে জানিয়ে আসবো—আমি চলি—

বলে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, সোজা হিসেবের খাতা-পত্তর নিয়ে ওপরে যাবার জন্যে ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। ক্যাশ বাক্সের চাবিটা ট্যাকে আছে কিনা একবার দেখে নিলেন আর তার পরেই ওপরে উঠে গেলেন। তপেশ গাঙ্গুলীও কোনও উপায় না পেয়ে সদর পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।
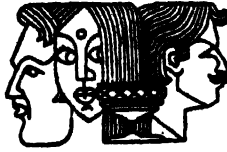
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টা বড় এলোমেলো। তার আগে মোটামুটি এক হাজার বছর শান্তিতেই কেটেছিল। যেটুকু অশান্তি মাঝখানের তিন-চার বছর সৃষ্টি হয়েছিল সেটা নামমাত্র। তাতে পৃথিবীর হাঁড়িতে খাবারের টান পড়েনি। সেই ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের 'ম্যাকডোনাল্ড স্যাক্সবী' কোম্পানির পুরো ডিভিডেন্ট্ পেতে লন্ডনের শেয়ার-হোল্ডারদের কোনও অসুবিধে হয়নি। তাদের ব্রেক্‌ফাস্টের টেবিলে ঠিক সময় হল্যান্ড থেকে বাটার পৌঁচেছে, ইন্ডিয়া থেকে গেছে চা আর ব্রেজিল থেকে কফি। সোরা তৈরির জন্যে মাল-মসলা গেছে বার্ণ কোম্পানির আয়রন-ওর-এর খনি থেকে যথাসময়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সোনা গেছে। কিউবা থেকে গেছে চিনি। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে অরেঞ্জ গেছে, পেরু থেকে সিলভার। কোথাও কোনও অভাব ঘটেনি ব্রিটিশ এম্‌পরারের, তাঁর জৌলুসে কোনও খাদ স্পর্শ করেনি। তাঁর সম্মানে কোনও ঘা লাগেনি।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার সেই ব্রিটেন, সেই 'রুল ব্রিটেনিয়া' খাবারের অভাবে একেবারে থার্ড পাওয়ারে এসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর যেখানে যত কালো চামড়ার লোক মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছে—অয়ং অহম্ ভো, অর্থাৎ আমি এসেছি। আমরাও মানুষ, আমাদেরও পেট আছে, আমাদেরও ক্ষিধে আছে। কবেকার সেই কাহিনী সব। ১৯১৮ সালে ১১ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেছিলেন—এবার আর ভয় নেই। মাভৈঃ। এবার আর্মিস্টিস হয়ে গেছে। আমরা সবাই মিলে 'লীগ্ অব্ নেশনস্' তৈরি করেছি। এবার আমাদের মানুষের সংসারে শান্তি আসবে। কিন্তু আশ্চর্য, তখন কি প্রেসিডেন্ট উইলসন জানতেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার গোকুলে লেনিন নামে আর এক অখ্যাত-অবজ্ঞাত ভদ্রলোক একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে? কিংবা ১৮১৫ সালে যাকে সবাই মিলে এ্যারেস্ট করে নিয়ে সেন্ট্ হেলেনা দ্বীপে বন্দী করে রেখেছিলাম, সে আবার একদিন ১৯৩৪ সালে জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়ে সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলবে ১৯৩৯ সালে? এ সব কথা সেদিন তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইটালির যত কলোনী এশিয়ায় আছে তা হঠাৎ একদিন তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

সে-সব ইতিহাসের কাহিনী সন্দীপ বেড়াপোতার চাটুজ্জেবাড়ির লাইব্রেরীতে বসে বসে পড়তো! অন্য ছেলেরা যখন পাঁচকড়ি দে আর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস গল্প পড়তো, সন্দীপ তখন এই-সব বই নিয়েই মশগুল হয়ে থাকতো। বারবার তার মনে হতো কেন চাটুজ্জে- বাড়ির লোকেরা বড়লোক, আর কেনই বা তার মা গরিব! কেন তার বিধবা মা চাটুজ্জেবাড়িতে ঝি-গিরি করে।

সে মা-কে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—আমরা গরিব কেন মা?

মা ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওমা, তোর মাথায় আবার এ-সব ভাবনা এল কেন? কে তোকে বলেছে এ-সব কথা?

সন্দীপ বলতো—বা রে, বলবে আবার কে? আমি দেখতে পাই না? আমার কি চোখ নেই?

মা বলতো—তোদের ইস্কুলে এই সব কথা পড়ায় বুঝি?

সন্দীপ রাগ করতো। বলতো—ইস্কুলে কেন পড়াবে? আমি তো চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পাই সব। ওদের বাড়িতে গিয়ে আমি তো সব দেখতে পাই। ওদের মা'রা কত ফরসা শাড়ি পরে বেড়ায়—

সত্যিই, সন্দীপ চাটুজ্জেবাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে, ইলেকট্রিক পাখা চলছে মাথার ওপর। গ্রীষ্মকালে পাখার তলায় বসলে কত আরাম। এতটুকু গরম

হয় না। কিন্তু কেন ওদের বাড়িতে অত আলো-পাখা, আর কেনই বা তার নিজের বাড়িতে এত অন্ধকার, এত গরম!

মা বলতো—তুমি ভালো করে লেখাপড়া করো বাবা, ভাল করে লেখাপড়া করলে তোমারও অনেক টাকা হবে, তখন তুমিও চাটুজ্জেদের বাড়ির মত ঘরে আলো-পাখা সব লাগিও। তখন কেউ বারণ করবে না।

তখন মাও জানতো না, সন্দীপও জানতো না যে কেন একজন বড়লোক হয়, আবার সেই সঙ্গে কেন একজন গরিব হয়। দু'জনেই জানতো না যে টাকা উপায়ের মূল উৎসটা লেখাপড়ার শাবল দিয়ে খোঁচাবার বস্তু নয়। সেই টাকা উপায়ের উৎসটার মুখ আরো অনেক গভীরে নিহিত আছে। সেটা খুঁজে বার করতে গেলে একেবারে ইতিহাসের সমুদ্রে ডুবে যেতে হয়। কিন্তু সে সমুদ্র কোথায়?

বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে শুয়ে শুয়ে সন্দীপ অনেক দিন স্বপ্নের মত বেড়াপোতায় মা'র কাছে গিয়ে পৌঁছতো। বেড়াপোতার বাড়িতে হয়ত তখন চাল দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। সেই ঘরের ভেতরে মা হয়ত জেগে জেগে সন্দীপের কথাই ভাবছে। কলকাতায় আসবার দিন মা খুব কাঁদছিল। বলেছিল—বেশ সাবধানে সেখানে থাকবে বাবা। মল্লিককাকার কথা শুনবে।

সন্দীপের চোখ দুটোও কি শুকনো ছিল? কিন্তু মার সামনে সন্দীপ একটুও কাঁদেনি। সন্দীপকে কাঁদতে দেখলে মা হয়ত আরও জোরে কেঁদে ফেলতো।

মা'র শেষ কথা ছিল—পৌঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা।

কিন্তু তখন ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনের চলন্ত চাকার শব্দকে অতিক্রম করে মা'র শেষ কথাগুলো তার কানে তখনও বাজছিল। কেবল শব্দ হচ্ছিল—পৌঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা—পৌঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা—

সেই 'পৌঁছে একটা চিঠি দিস্ বাবা' কথাগুলো যেন একলা থাকলেই এখনও সন্দীপের কানে বাজতে থাকে।

সে দিনও সেই রকম একলা শুয়ে শুয়ে কথাগুলো কানের কাছে বাজছিল। হঠাৎ যেন কোথায় একটা কী রকম শব্দ হলো। ঘরের ভেতরে আর একটা তক্তপোশে মল্লিকমশাই ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি যে ঘুমোচ্ছিলেন তা তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। তিনি সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাঁর ঘুম তো আসবেই।

কিন্তু সন্দীপের কেন অত সহজে ঘুম আসে না? অথচ কলেজ থেকে ফেরবার সময় বড় ঘুম পায়। মনে হয় বাড়িতে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু শোবার পর আর ঘুম আসে না। কোথা থেকে হাজার হাজার ভাবনা-চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ে।

সেদিন কলেজ থেকে ফেরবার পথে মির্জাপুর আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে একটা জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো। দেখলে ফুটপাতের ওপর একটা জায়গায় একটা ফ্রেমে বাঁধানো সাইবোর্ডের ওপর কী সব কথা যেন লেখা রয়েছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ও-দিকটায় কতকগুলো কাপড়-জামার দোকান গজিয়ে উঠেছে। দেশ ভাগের পর যে-সব লোক বাস্তুহারা হয়ে কলকাতায় এসেছে, তারা সার-সার কাপড়-জামার দোকান করেছে। দোকানগুলো সবই বাঁশ আর বাখারি দিয়ে তৈরি। মাথায় তেরপল ঢাকা, বৃষ্টিতে যাতে জল না পড়ে, কিংবা মাথায় রোদ না লাগে।

রাত ন'টার পরই মুখার্জিবাড়ির গেটে জ্বালা পড়ে যায়। তাই কলেজ থেকে বেরিয়ে এ-সব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবার সময় হয় না। কিন্তু এক একটা এমন জিনিসও থাকে, যা দেখবার জন্যে না দাঁড়িয়ে পারা যায় না।

কিন্তু একটু দেরি হলেই মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করেন—এতক্ষণ কী করছিলে? তুমি আসছো না দেখে আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম! সমস্ত রাস্তাটা হেঁটে এসেছ বুঝি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, রাস্তায় একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিলুম।

—কেন? কী হয়েছিল?

সন্দীপ বললে—একটা জায়গায় অদ্ভুত জিনিস দেখলাম ঠিক মির্জাপুর আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে।

—সেখানে কী হচ্ছিল?

মনে আছে সেই রাস্তার মোড়ের ওপরে একটা জায়গায় বেদীর মত তৈরী করা। তাতে একটা ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। পাশে অনেক ফুল ছড়ানো রয়েছে, আর ধূপদানিতে আনেকগুলো ধূপ জ্বলছে। আর সাইনবোর্ডের ওপর লেখা রয়েছে ঃ

"শ্রীশ্রী জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে বিশ্বশান্তি স্থাপনের নিমিত্ত এই দেবস্থানে প্রত্যহ পূজা-পাঠ ও যাজযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে! ঈশ্বরের সেই নির্দেশ পালনের হেতু আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

সোম—ব্রহ্মা	মঙ্গল—বিষ্ণু	বুধ—মহেশ্বর
বৃহস্পতি—লক্ষ্মী	শুক্র—সন্তোষী মা	শনি—বারের দেবতা

সেবাইত: ভূতনাথ দাস (ভূতো)

সন্দীপ সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাগুলো পড়ছিল। সামনের একটা তামার থালার ওপর অনেক খুচরা পয়সা পড়েছিল। এ-রকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি সন্দীপ। কলকাতার আজব দৃশ্য আর এ-রকম লেখা সে আগে কোথাও দেখেনি।

জায়গাটা ছেড়ে সে চলে আসছিল, হঠাৎ কোথা থেকে কে একজন সামনে এসে দাঁড়ালো। বেশ ষণ্ডামত চেহারা। হাতে উলকির ছাপ। হাত গোটানো শার্টের বাইরে উলকির ছবিটা দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা থেকে সরেই যাচ্ছিল সন্দীপ, কিন্তু লোকটা বললে—কী হলো দাদা, কিছু সাহায্য দিলেন না?

সন্দীপ বললে—আমি গরিব ছেলে, আমার কিছু সাহায্য দেবার ক্ষমতা নেই।

লোকটা বললে—স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত পুজো, বিশ্বশান্তির জন্যেই পুজো হচ্ছে। আমাদের কিছু স্বার্থ নেই এতে, সকলের ভালোর জন্যেই করেছি। দেবার ক্ষমতা নেই বলে একটা টাকা অন্ততঃ দিন—মাত্র একটা টাকা। কত দিকে কত খরচ হয়ে যাচ্ছে, আর ভাল কাজের জন্যে একটা টাকা দিতেও আপত্তি? সিনেমা দেখতেও তো কত পয়সা খরচা হয়ে যায়—

এত বলার পর সন্দীপের কেমন যেন একটু লজ্জা হলো। সে যে সিনেমা দেখে না, এই সামান্য কথাটাও সে জানাতে পারলো না। পকেটে হাত দিয়ে একটা দু'আনি বার করে তামার থালাটার ওপর ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলে।

ঘটনাটা সমস্ত শুনে মল্লিকমশাই বললেন—গেলো তো তোমার দু'আনা পয়সা? এটা তোমার বেড়াপোতা নয়, এটা কলকাতা। তোমাদের মত গেঁয়ো লোকদের ঠকাবার জন্যে গুণ্ডারা সারা শহরে জাল পেতে রেখেছে, এখানে সেদিন দেখলে না বাসে ওঠবার সময় সবাই কী-রকম তোমাকে ঠেলে ফেলে মাড়িয়ে দিলে! আর তা ছাড়া তুমি তো এখনও মাইনে পাওনি—

সন্দীপ কী আর বলবে। শুধু বললে—আমার মা'র কথা মনে পড়লো বলেই পয়সাটা দিলুম।

—কেন, তোমার মা আবার কি বলেছিল?

—বলেছিল যখনই বিপদে পড়বি ভগবানকে ডাকবি।

মল্লিকমশাই বললেন—তা আমাদের বাড়িতেই তো ভগবান রয়েছে।

সন্দীপ বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—এ বাড়িতে? এ বাড়িতে ভগবান কোথায়?

মল্লিকমশাই বললেন—কেন, এ বাড়িতে রোজই তো সিংহবাহিনীর পুজো হয়। সিংহ-বাহিনীও তো ভগবান। ভগবান নয়?

তা বটে। কথাট মনে পড়ে গেল। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সন্দীপ আবার মা'র কথা ভাবতে লাগলো। এখনও বোধহয় মা ঘুমোয়নি। জেগে জেগে কেবল তার কথাই ভাবছে। মা আসবার সময় বলে দিয়েছিল—কলকাতায় পৌঁছেই একটা চিঠি দিস বাবা—

মা যতগুলো পোস্টকার্ড লিখেছিল সে-সবগুলোই সে যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে মা'র চিঠিগুলো বাক্স থেকে বার করে পড়তো। অথচ কোনও চিঠিটাই মা'র নিজের হাতে লেখা নয়, চাটুজ্জেবাড়ির বউকে দিয়ে মা'র জবানীতে লেখা।

হঠাৎ অন্ধকার আবহাওয়াটা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

—কে?

একবার মনে হলো হয়তো তার মনের ভুল, কিন্তু কয়েকদিন আগেও তো এই রকম শব্দ হয়েছিল। তবে কি আজকেও ছোটবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে?

সন্দীপ আস্তে-আস্তে তক্তপোষ ছেড়ে উঠলো। পাশের তক্তপোষের দিকে চেয়ে দেখলে। মল্লিককাকা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তারপর টিপি-টিপি পায়ে ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে বেরোল। ভেতরে সবকিছু অন্ধকার। বারান্দাটায় যেন কোথা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। বারান্দা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে বার বাড়িতে যাবার রাস্তা। সেদিকের সদর দরজাটা ফাঁকা কেন? ওটা-তো বরাবর খিল এঁটে বন্ধ করা থাকে।

সন্দীপ আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে উঁকি দিলে। উঁকি দিয়ে দেখলে গিরিধারী লোহার গেটটা খুলে দিয়েছে। আর বাড়ির ছোটবাবু নিজে গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে রাস্তায় বার করলে। তারপর গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে ইঞ্জিন চালিয়ে দিতেই গাড়িটা সোঁ করে চলতে লাগলো। আর গিরিধারী তার আগেই লোহার গেটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়েছে। এমন ভাবে গেটটা বন্ধ করলে যাতে কোনও শব্দ না হয়।

সন্দীপ হতবাক হয়ে সেখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো, বোধহয় ছোটবাবু জানতেন যে তিনি একটা অন্যায় কাজ করছেন, তাই এত সাবধানতা। অথচ ঠাকমা-মণির তো হুকুম ছিল ঠিক রাত নটার সময় গিরিধারী গেট বন্ধ করবে। তা হলে? তা হলে কী?

তারপর আবার আগের রাতে যেমন করেছিল তেমনি করল। টিপি-টিপি পায়ে আবার বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলে। মল্লিককাকা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। তিনি কিছুই টের পেলেন না। সন্দীপ আবার তেমনি নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করল।

কিন্তু ঘুম—ঘুম কি অত সহজে আসে? ঠিক তখন নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকে ভিড় করতে লাগলো। এত রাত্রে ছোটবাবু কোথায় বেরোলেন? আর বেরোলেন যদি তো বাড়ি ফিরবেন কখন? কত রাত হবে তাঁর ফিরতে? আশ্চর্য! রোজই এই রকম করেন নাকি ছোটবাবু?

প্রথম দিন যখন ঘটনাটা দেখেছিল সে তখন এই রকমই অবাক হয়েছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সন্দীপ মল্লিককাকাকে জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ করেছিল। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা মাল্লিককাকা, সেদিন আপনার সঙ্গে যে খিদিরপুরে মনসাতলা লেনে তপেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম, সে বাড়ির মেয়ের সঙ্গে এ বাড়ির কার বিয়ে হবে?

মাল্লিককাকা বলেছিলেন—এ বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে।

—ছোটবাবু? ছোটবাবু কে?

—এই এ-বাড়ির ঠাকমা-মণির নাতি। ঠাকমা-মণির বড় ছেলের ছেলে।

—বড় ছেলে কোথায় থাকে?

—বড় ছেলে মারা গেছে। বড় ছেলের বউও মারা গেছে। ওই এক ছেলে ছাড়া আর কেউই নেই তাঁদের।

সন্দীপ তবু বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—এই ছোটবাবুর নামই কি সৌম্য? এই ছেলের সঙ্গেই কি খিদিরপুরে সেই বাড়ির মেয়ের বিয়ে হবে?

এবার মাল্লিককাকা রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার এত কথার দরকার কী? তুমি এখানে চাকরি করতে এসেছ, একমনে চাকরি করে যাও। বাড়ির ভেতরের কথায় তুমি কান দিতে যাও কেন?

এর পরে আর কোনও কথা বলেনি সন্দীপ। মাল্লিককাকা বলেছিলেন—নাও, এই জমা-

খরচের খাতাটা নিয়ে কত জমা, কত খরচ কষে দাও দিকিনি।

ভেতর-বাড়ির কথা নিয়ে মল্লিককাকাকে সন্দীপ আর বিশেষ কিছু বলেনি বটে, কিন্তু মনে আছে, তার পর থেকেই সে কেমন নিঃশব্দে ওই ছোটবাবু আর ওই বিশাখার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে তো আজ অনেক পরের কথা। যথাসময়ে সে প্রসঙ্গে বলা যাবে! শুধু এইটুকুই এখানে বলা ভাল যে সেদিন সে রাত্রে তক্তপোষের ওপর কখন যে সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তা আর তার খেয়াল ছিল না।
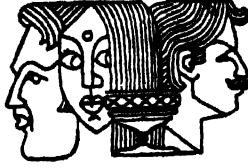
আজ এতদিন পরে সেই-সব দিনের কথা ভাবতে গিয়ে সন্দীপের মনে হলো কেনই বা সে অমন করে এই বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিল, কেনই বা ওই বিডন্ স্ট্রীটের মানুষদের প্রত্যেকটা রক্তবিন্দুর সঙ্গে সে অমন ভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল? তাতে শেষ পর্যন্ত কী লাভ হয়েছিল তার? তা না হলে তো এতদিন তাকে জেলখানায় নিশ্ছিদ্র পরিবেশে এমন করে যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না।

সেদিন তপেশ গাঙ্গুলীমশাই চলে যার পর মল্লিকমশাই উঠলেন। তখন সন্দীপও বাড়িতে আসেনি। এ-সব সেই যুগের কথা, সেই দিনকার কাহিনী। গল্প করেছিলেন মল্লিকমশাই। গল্প শুনতে শুনতে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর কী হলো কাকা?

সেই বাবুঘাটের পাণ্ডা দশরথের সামনে থেকে যে নাটক শুরু হয়েছিল তারই প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যই তখন চলছে।

মল্লিকমশাই বললেন—তারপর আর কী করবো, তপেশ গাঙ্গুলীমশাই চলে যাবার পরই আমি তেতলায় ঠাকমা-মণির ঘরে গেলুম!

ঠাকমামণি বললেন—আপনি গিয়েছিলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলুম।

—কী রকম বাড়ী দেখলেন?

—খুবই গরিবের সংসার। তপেশ গাঙ্গুলীমশাই রেলে সামান্য মাইনের চাকরি করেন। তাঁর নিজেরও একটা মেয়ে আছে, তার নাম বিজলী আর এই ভাইঝির নাম বিশাখা। আমি যা শুনলাম তাতে বুঝলাম যে তপেশ গাঙ্গুলীবাবুর মেয়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে ওই মেয়ের নাম বিশাখা রাখা হয়েছে। তারপর বললেন—আরও একটা কারণ আছে। পাত্রীর বৈশাখ মাসে জন্ম। বৈশাখ মাসে সূর্য যখন বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমা শেষ হয় তখনই ওই মেয়ের জন্ম হয়। তাই শুনে ভাবলাম খুবই সুলক্ষণা।

ঠাকমা-মণি বললেন—আপনি কন্যার জন্ম তারিখ সময় সব কিছু নিয়ে এসেছেন?

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ, এই নিন। এতে সব লেখা আছে, আমি ওঁদের মুখে সব শুনে লিখে এনেছি—বলে কাগজটা ঠাকুমামণির দিকে এগিয়ে দিলেন।

ঠাকুমা-মণি বললেন—এটা আমি নিয়ে কি করবো? ওটা আপনিই ভাল করে নিজের কাছে রেখে দিন। তারপর আজই কাশীর গুরুদেবকে চিঠি লিখে একদিন এখানে আবার আসতে বলে দিন। আর বলে দিন ব্যাপারটা খুবই জরুরী। আর গুরুদেবকে মনি-অর্ডার করে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিন রাস্তা খরচ বাবদ।

মল্লিকমশাই বললেন—আজ্ঞে, তাই-ই করবো—বলে একটু থামলেন। বললেন—আর একটা কথা—

কী? বলুন।

মল্লিকমশাই বললেন—আপনাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল, তাই বলছি। ওদের অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এলুম।

—কী রকম?

মাত্র দু'খানা ঘর ওদের। ওই দু'খানা ঘরেই ওরা পাঁচজন প্রাণী গুঁতোগুঁতি করে থাকে। সেই সেকালের তিরিশ টাকা ভাড়া। পুরনো ভাড়াটে বলেই এত সস্তায় বাড়ি পেয়েছে। তপেশ গাঙ্গুলী রেলের অফিসে কাজ করে। মাইনেও কম পায়। রেলের অফিসে কেরানী মানুষ, তাই আমাকে বলছিল বিশাখার বদলে ওর মেয়েটিকে যদি আপনি ছোটবাবুর জন্যে পছন্দ করে রাখেন—

ঠাকুমা-মণি বললেন, সে কী আমি যাকে নিজে দেখে পছন্দ করেছি, তাকেই আমি নিজের নাত-বউ করব।

মল্লিক-মশাই বললেন—হাজার হোক অভাবী লোক তো। তাই একটু হিংসে হচ্ছে। আজ সকালেও আমার কাছে এসেছিল।

—আজ সকালে? আজ সকালেও এসেছিলেন? এই বাড়িতে?

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ, ঠাকুমা-মণি। আবার অফিসে না গিয়ে খিদিরপুর থেকে একেবারে সোজা এই বিডন্ স্ট্রীট এসেছিলেন।

—কেন? কী দরকার তাঁর?

—আমাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন, পাছে আমি ভুলে যাই, তাই। বড্ড গরিব মানুষ। এই বাড়িতে ভাই-এর মেয়ের বিয়ে হবে যাবে, একদিন সেই ভাইঝি এই বাড়ির বউ হবে, এটা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে আর কি। বলেছিলেন, তাঁর মেয়েকেও যেন এই বাড়ির বউ করা হয়।

—তা বললেন না কেন যে আমার একটাই নাতি।

মল্লিকমশাই বললেন—আমি সবই বলেছি; তবুও নাছোড়াবান্দা।

ঠাকুমা-মণি বললেন—লোকটা তো ভাল নয় দেখছি।

মল্লিকমশাই বললেন—আসলে কী জানেন ঠাকুমা-মণি, অভাবে স্বভাব নষ্ট। ওঁরও তাই হয়েছে।

—তা গরীব ভাইঝিটা'র একটা হিল্লে হয়ে যাচ্ছে এটা দেখে এত হিংসে? অথচ নিজের মায়ের পেটেরই ভাই-তো বটে। ভাইঝি'র বাপ বেঁচে নেই, সেই জন্যে তো একটু আনন্দ হওয়াই উচিত। যাক গে, আমি সব দরকারী খবর নিয়ে এসেছি, যা যা আমাদের দরকার।

ঠাকুমা-মণি বললেন—তা হলে আমার জবানীতে কাশীতে গুরুদেবের কাছে একটা চিঠি লিখে দিন—আর মণি-অর্ডারে পাঁচশো টাকা পাঠাতে ভুলবেন না। তিনি এলে কন্যার জন্মকুণ্ডলী তৈরী করে যা বিচার করবেন, তাই-ই করবো। তিনি যদি বলেন যে এ আমার সৌম্যর পাত্রী হবার উপযুক্ত, তাহলে আমি মাসে মাসে পাত্রীদের মনসাতলা লেনের বাড়ীতে মেয়ের বিধবা মাকে একশো টাকা করে পাঠাবো, যাতে দুধ-মাখন-ঘি-মাছ-মাংস খাইয়ে শরীর ভাল রাখা হয়। একশো টাকায় হবে না? আপনি কী বলেন?

মল্লিকমশাই বললেন—কেন হবে না? হেসে খেলে একশো টাকায় হয়ে যাবে।

—তবে আগে দেখতে হবে মেয়ের জন্ম কুণ্ডলী কি রকম? তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।

তারপর ঠাকুমা-মণি আবাব বললেন—কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন আপনার বন্ধুর একটি বিশ্বাসী ছেলে আছে, তাকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন—বলেছিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে সে—

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ, আমারই বন্ধুর ছেলে। তার নাম সন্দীপ লাহিড়ী। তার বাবার নাম হরিপদ লাহিড়ী। অল্প বয়সে আমার সেই বন্ধু মারা যায়। একটা মাটির ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই তার। ছেলেটির মা বেড়াপোতার জমিদারবাড়িতে রান্না-বান্নার কাজ করে ছেলেটিকে মানুষ করছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে এখন দূরের একটা কলেজে আই. এ.পড়ছে। পরীক্ষার পরই তাকে এখানে নিয়ে আসবো। এখানে এসে রাত্তিরে বি. এ. পড়বে আর আমার কাজেরও সাহায্য করবে।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ঠিক সময়েই তাকে আসতে বলে দেবেন। তার কলেজের মাইনেটাও আমি দেব, তার সঙ্গে কিছু হাত-খরচ বাবদও পাবে, আর এখানে খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত তো আছেই, তাতে আপনারও অনেক সুরাহা হবে, আর তারও ভাল হবে।

মল্লিকমশাই-এর মনে বড় আনন্দ হলো। এতদিন পরে তিনি হরিপদ'র ছেলের জন্যে কিছু একটা করতে পেরেছেন, এটাই তার আনন্দের কারণ। সেই কথাটাই মল্লিকমশাই বেড়াপোতার নিবারণকে লিখে জানালেন। নিবারণকাকা চিঠিটা পেয়েই সোজা সন্দীপদের বাড়ি গিয়ে ডাকলেন—ও সন্দীপের মা, সন্দীপের মা, বাড়ী আছো?

সেদিন রবিবার। কলেজের ছুটি। সন্দীপ বাড়িতেই ছিল। সে বাইরে এসে দেখলে নিবারণ-কাকা। বললে—মা তো বাড়ীতে নেই কাকাবাবু।

নিবারণকাকা বললেন—না থাক, তোমাকেই বলে যাই। তুমি কলকাতা যাবে?

কলকাতায়! হঠাৎ যেন হাতে স্বর্গ পাবার মত অবস্থা হলো তার। বললে—কলকাতাতেই তো আমি যেতে চাই, কিন্তু কে আমায় সে সুযোগ দেবে?

নিবারণকাকা বললেন—আমরা দেব। তোমার বাবার মৃত্যুর সময় আমরা তাকে ভরসা দিয়েছিলুম যে তোমার মাকে আর তোমাকে আমরা দেখবো—নাও, এই দেখ তোমার মল্লিক-কাকা আমার কাছে এই চিঠি লিখেছেন—

বলে চিঠিটা দিলেন সন্দীপের হাতে। সন্দীপ চিঠিটা পড়তে পড়তে কেঁদে ফেললে। নিবারণ-কাকা তার কান্না দেখে বিব্রত হয়ে গেলেন।

বললেন—আরে, তুমি কাঁদছো কেন, তুমি কাঁদছো কেন? এই দেখ দিকিনি—

সন্দীপ কাঁদতে কাঁদতে বললে—আপনারা আমাকে এত ভালবাসেন? আপনাদের এ ঋণ আমি কী করে শোধ করবো কাকা?

বলে নিবারণকাকার পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল, নিবারণকাকা বাধা দিয়ে সন্দীপকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—ছিঃ কাঁদতে নেই, কাঁদতে নেই, কাঁদবার কী আছে? যদ্দিন আমরা আছি, তদ্দিন তোমার কিছছু ভাবনা নেই।

সন্দীপের তখনও কান্নাটা ভাল করে থামেনি।

নিবারণকাকা তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন—এত কম বয়েসেই ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? সামনে কত বড় ভবিষ্যৎ পড়ে আছে তোমার। এখন কেবল আশা করে যাও! এই কম বয়েসে অতীতটা তুচ্ছ, ভবিষ্যৎটাই আসল। যখন তোমার আমার মত বয়েস হবে, তখন অতীতটার কথা ভেবো। এখন কেবল আশা করে এগিয়ে যাও।

তা সেদিনকার সেই চিঠি থেকেই তার এখানে আসার সূত্রপাত।

সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা লোকের গানের আওয়াজ কানে এল। লোকটা বোধহয় মাতাল। এই রাতে গান গাইতে-গাইতে চলেছে—

এসেছিলাম ভবে আমি
ভজবো বলে হরির চরণ
পড়ে ভূমে মকাটি খেয়ে
ভুলে গেল আমার মন।

এই বিডন স্ট্রীট ধরেই লোক নিমতলার শ্মশানঘাটে শবদেহ বয়ে নিয়ে যেত। লোকটা বোধহয় নিমতলার শ্মশানঘাট থেকে মদ খেয়ে ফিরছিল। সেদিন যে গানটিকে মাতালের অসম্বন্ধ প্রলাপ

বলে তার মনে হয়েছিল, আজ এত বছর পরে সন্দীপের মনে হলো, তার জীবনে অত বড় সত্যও বুঝি আর কিছু নেই। সেদিনকার সেই মাতালটা যেন অজ্ঞাতে সন্দীপের ভবিষ্যৎ জীবনের চরম দুর্দশার ইঙ্গিত দিতেই তাকে সচেতন করতে চেয়েছিল। সত্যিই তো, সন্দীপ বেড়াপোতা থেকে কী করতেই বা কলকাতায় এসেছিল আর শেষ পর্যন্ত কী করুণ আর ভয়াবহ পরিণতিই তার হয়েছিল। সে কথা কল্পনা করতেও এখন তার হৃদকম্প হয়। এখন মনে হয় কেন সে কলকাতায় এসেছিল? সত্যিই কেন সে মরতে এসেছিল?

ঠাকুমা-মণির চিঠি পেয়ে কাশী থেকে একদিন নাকি মুখার্জি বাড়ির গুরুদেব এসেছিলেন। সে-সব কাহিনী মল্লিকমশাই-এর কাছ থেকে সন্দীপের শোনা আছে। কাশীর পণ্ডিত এবং দ্রষ্টা শ্রীশ্রী মহাগুরু পাণ্ডেয় ঠাকুমা-মণির গুরুদেব। সাধারণত গুরুদেব কোনও শিষ্যের বাড়ি নাকি যান না। বলতে গেলে কাউকে দীক্ষাও দেন না তিনি। তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর আশ্রমের মধ্যেই বছরের পর বছর একলা কাটান। সব শিষ্য তাঁর কাছে যেতেও অনুমতি পায় না। বর্ষায় যখন গঙ্গায় জল বাড়ে, তখনও তিনি নিজের আসন ছাড়েন না। যদি কখনও গঙ্গার জল খুব বাড়ে তখন, তিনি নাকি একটা ভেলার ওপর ওঠেন। এই মহাগুরু পাণ্ডেয়র সঙ্গে ঠাকুমা-মণির সাক্ষাৎ হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে।

সে অনেক বছর আগের কথা। ঠাকুমা-মণির মনের অবস্থা তখন খুব খারাপ। ঠাকুমা-মণির সুখের ইতিহাসটাই সবাই জানতো। জানতো যে তিনি কোটিপতি মানুষের স্ত্রী। তাঁর স্বামী দেবীপদ মুখার্জি বিরাট কর্মবীর পুরুষ! অল্প থেকে বড় হয়েছেন। বেলুড়ে 'স্যাকস্‌বী মুখার্জি ইন্ডিয়া লিমিটেড্' নামের বিরাট কারখানার মালিক। তাঁর কারখানার তৈরি মালপত্র সারা ইন্ডিয়াতেই শুধু নয়, সারা পৃথিবীতেই চলে। তারপর আছে মিড্‌ল ইস্টের বাজার। ইন্ডিয়া গভর্মেন্টও এই ফ্যাক্টরির দরুন মোটা রেভিনিউ পায়। সব কিছু মিলিয়ে সার্থক সফল মানুষ যাকে বলে তার নমুনা এই দেবীপদ মুখার্জি। তাঁর ফ্যাক্টরিতে যত লোক কাজ করে, তাদের অন্নদাতা তিনি। তাই সমাজে-সংসারে তিনি ছিলেন সকলের নমস্য।

কিন্তু সকলকেই যেমন সব-কিছু শৃঙ্খল-বন্ধন ছেড়ে এই লোক থেকে অন্য লোকে চলে যেতে হয়, তেমনি তাঁকেও একদিন চলে যেতে হলো।

সেদিন ঠাকুমা-মণি অত বড় দুর্যোগেও ভেঙ্গে পড়েন নি। বড় ছেলে শক্তিপদ আর তার স্ত্রী যেদিন একটা মাত্র নাবালক ছেলে রেখে মারা গেল সেদিনও তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। কারণ তখন ভরসা ছিল ছোট ছেলে মুক্তিপদ'র ওপর। তাঁর মনে হয়েছিল মুক্তিপদ থাকতে তাঁর ভয় কী?

কিন্তু মুক্তিপদ'র বিয়ের কয়েক বছর পরেই তারা আলাদা হয়ে তাদের তৈরি নতুন বাড়িতে চলে গেল। এই-ই প্রথম আঘাত পেলেন ঠাকুমা-মণি। তখন সম্বল বলতে মাত্র ওই নাবালক নাতি সৌম্য। কলকাতা তখন ঠাকুমা-মণির কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সৌম্যর ইস্কুলে তখন গরমের ছুটি হয়েছে। এক মাস ছুটি। তিনি তখন কলকাতা ছাড়তে পারলে বাঁচেন। মনস্থ করলেন নাতিকে সঙ্গে করে কাশীতে যাবেন।

মল্লিকমশাই নিজে কাশীতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে রেখে এলেন। তারপর একদিন ঠাকুমা-মণি নাতিকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে গেল বিন্দু, সুধা, ঠাকুর, চাকর সবাই। সেখানে গিয়ে রোজ ভোরবেলা অসি ঘাটে চান করতে যান। সঙ্গে থাকে বিন্দু। সেইখানেই চান করে ওঠার পর হঠাৎ ওই মহাগুরু পাণ্ডেয়র আশ্রমে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতে গেলেন। সেইখানে হঠাৎ দেখা পেলেন গুরুদেবের। তাঁকে দেখে তাঁর মন থেকে কে যেন বললে—ওরে, তোর ঠাকুর রয়েছে, তাঁকে প্রণাম কর।

পাথরের বিশ্বনাথ মূর্তির মাথায় তিনি জল ঢেলে প্রার্থনা করলেন। তারপর যথারীতি রোজকার মত বাড়ি ফিরে এলেন।

রাত্রে নাতিকে পাশে নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ দেখলেন স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুমা-মণি স্বচক্ষে দেখলেন বাঘছাল পরা বাবা বিশ্বনাথ-

এর মূর্তি। হাতে ত্রিশূল, কপালে ভস্মের ত্রিবলী, একটা সাপ বাবার গলাটা জড়িয়ে সামনে ঠাক্‌মা-মণির দিকে চেয়ে আছে আর মাঝে মাঝে জিভ বার করছে।

ঠাক্‌মা-মণি কি বলবেন বুঝতে বুঝতে পারলেন না। বাবার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ এক সময়ে বাবা বলে উঠলেন—কী রে, তুই এ কী করলি? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিলি?

ঠাক্‌মা-মণি তখন কী বলবেন পারলেন না। তাঁর সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছিল। শেষকালে অতি কষ্টে মুখ দিয়ে বেরোল একটা কথা, বললেন—আমার মহাঅপরাধ হয়ে গেছে বাবা, কী করতে হবে বলে দিন।

বাবা বললেন—তুই আমার সামনে গিয়ে চলে এলি, আমায় চিনতে পারলি না?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আমাকে মাফ করো বাবা। আমি হতভাগিনী—

বাবা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন—তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে বেটি! অনেক দুঃখ আছে—

ঠাক্‌মা-মণি বাবার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন হাউ-হাউ করে। বাবা এবার ত্রিশূলটা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরলেন।

বললেন—আর যেন বাবাকে চিনতে ভুল করিস না—

বলে তাঁকে ক্ষমা করে চলেই যাচ্ছিলেন, ঠাকমা-মণি তখন বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বলতে লাগলেন—আমি কী করে তোমাকে চিনবো বাবা, বলে দিয়ে যান আমাকে।

বাবা যেতে যেতে বললেন—তুই সিংহবাহিনীর পুজো করিস তো?

—হ্যাঁ বাবা, করি। রোজই পুজো করি।

—কাল সকালবেলা গঙ্গায় চান করতে গিয়ে যখন আমার আশ্রমে যাবি মূর্তিতে জল দেবার জন্যে, তখন দেখবি আমার পাথরের মূর্তির সামনে আমি বসে আছি।

ঠাকুমা-মণি বললেন—কী দেখে চিনবো তোমাকে?

বাবা বললেন—আমার কপালে দেখবি ত্রিবলী চিহ্ন, আর সামনের বেদীতে একটা শ্বেত পদ্মফুল পড়ে আছে। বুঝবি আমিই সে—

বলে বাবা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাক্‌মা-মণির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অন্ধকারের মধ্যে চারদিক চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই, শুধু সৌম্য তাঁর পাশে শুয়ে অঘোরো ঘুমোচ্ছে।

সেদিন সারা রাত্রে আর ঘুম এল না। রাত থাকতে থাকতে তিনি ঘুম থেকে উঠে বিন্দুকে ডাকলেন। বললেন—ওঠ বিন্দু, গঙ্গায় যেতে হবে।

বিন্দু চারদিক চেয়ে বললে—এখনও তো অন্ধকার রয়েছে মা, এখন তো রিক্‌সাওয়ালা আসবে না।

দৈনন্দিন গঙ্গাস্নানের জন্যে সাইকেল-রিক্‌সাওয়ালার সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত ছিল। সে নিজের গরজেই রোজ ভোর সাড়ে চারটের সময় এসে ঘণ্টা বাজিয়ে হাজিরা দিত। আবার ঠাক্‌মা-মণির স্নান হয়ে গেলে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেত।

কিন্তু সেদিন যখন ঠাক্‌মা-মণি বিন্দুকে ডাকলেন তখন ঘড়িতে চারটেও বাজেনি। মাত্র সাড়ে তিনটে।

তবু ঠাক্‌মা-মণির তাগিদে বিন্দুকে বেরোতেই হলো। ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আজ একটু তাড়া আছে, তাই এত সকালে যাচ্ছি। রাস্তায় যে-কোন একটা রিক্‌সা পাওয়া যাবে।

তা সত্যিই, তা পাওয়া গেল।

কিন্তু অসি-ঘাট তখন নির্জন, নিরিবিলি। অন্য দিনের মত অত ভিড় নেই।

সেদিন আর বেশিক্ষণ ধরে স্নান হলো না। মনে বড় উদ্বেগ। কী হয়, কী হয় ভাব। স্নান সেরে ঘটিতে জল ভরে যখন বাবার মন্দিরে এলেন তখন মনের উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারলেন

না তিনি। মন্দিরে কি দেখতে পাবেন, কেবল সেই-ই চিন্তা। যখন মন্দিরে ঢুকলেন তখন নাকে যেন একটা সুগন্ধ এল। ভাবলেন, বোধহয় ভেতরে ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কই, কোথাও তো ধূপ জ্বলছে না। তাহলে আজ এত সুগন্ধ এল কোথা থেকে?

তিনি দেখালেন, পূজারী পদ্মাসন হয়ে বসে দু'চোখ বুজে মূর্তির দিকে চেয়ে আছেন। মনে হলো, পূজারীর শুচিশুদ্ধ শরীর থেকেই যেন এই অতীন্দ্রিয় সুগন্ধ আসছে। তারপর পূজারীর সামনের বেদীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই ঠাক্‌মা-মণি চমকে উঠলেন। নানা রকম ফুলের মধ্যে একটা আধফোটা শ্বেত পদ্মও রয়েছে।

ঠাক্‌মা-মণি আর দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি সেই পূজারীর পায়ে টলে পড়লেন।

পূজারীর ধ্যান ভেঙে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

—কেন? কে? কায় মাঙতা হ্যায় তু? কী চাস তুই?

ঠাক্‌মা-মণি অজ্ঞান অচৈতন্য। তাঁর কোন্ পাপে তাঁর মুক্তিপদ সপরিবারে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে? যদি সেজন্যে তাঁর নিজের কোনও অপরাধ হয়ে থাকে তো তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত! তুমি আমাকে যা শাস্তি দেবে বাবা, দাও। আমি মাথা পেতে সব স্বীকার করে নেব। হয় তুমি আমার মনে একটু শান্তি দাও, আর তা না হয় তো তুমি আমাকে গ্রহণ করো। আমাকে নিয়েই যদি আমার সুখ-শান্তি ফিরে আসে তো তুমি আমাকেই নাও।

এর পরে আর তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। তিনি সেখানেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখলেন তিনি তাঁর বাড়িতে নিজের বিছানার ওপর শুয়ে আছেন, আর ডাক্তারবাবু বসে তাঁকে পরীক্ষা করছেন।

এ-সব বহুদিন আগেকার কথা। কিন্তু এ-সব কথা আর কারো মনে থাক আর না-ই থাক, ঠাক্‌মা-মণির মনে আছে আর তাঁর পেয়ারের ঝি বিন্দুরও মনে আছে।

সেই তখনই সেই কাশী থেকে টেলিগ্রাম গেল কলকাতায়। গেল মল্লিকমশাই-এর কাছে। টেলিগ্রাম লেখা হলো, টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র কাশীর ঠিকানায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

টেলিগ্রাম পেয়েই মল্লিকমশাই সোজা মেজবাবুর ডালহৌসি স্কোয়ারের হেড-অফিসে চলে গেলেন। টেলিগ্রামখানা মেজবাবুকে দেখাতেই তিনি সোজা কাশীতে একজন লোক দিয়ে মা-র কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

ঠাক্‌মা-মণি টাকাটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের গুরুদেবকে দিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রী মহাগুরু পাণ্ডেয় টাকাটা নিজের হাতে স্পর্শও করলেন না, পাশে আর একজন শিষ্য ছিল, তার হাতে টাকাগুলো তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

বললেন—বাবার পুজোর ভোগ চড়াও।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আপনার মন্দিরটা ভেঙ্গে গেছে, এই টাকায় মন্দিরটা সারিয়ে নিন, মন্দিরটা আরো সুন্দর করে গড়ুন—

মহাগুরু বললেন—আমি বাবার মন্দির সারাবার কে রে বেটি? বাবার মন্দির, বাবাই তাঁর মন্দির সারাবার টাকা দিলেন, আবার বাবাই একদিন মন্দির সারিয়ে নেবেন তুই আমি কে রে বেটি? আমরা সবাই তো সির্ফ হেতু রে বেটি, সির্ফ হেতু হ্যায়—

ঠাক্‌মা-মণি তখন নিজের সমস্ত দুঃখ উজাড় করে দিলেন মহাগুরুর পায়ে।

নিজের সমস্ত জীবনের কাহিনী শুনিয়ে মহাগুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইলেন। তবু মহাগুরু পাণ্ডেয়জীর মনে যেন কোনও রেখাপাত হলো না।

কিন্তু আশ্চর্য, ঈশ্বরের কী লীলা কে জানে, হঠাৎ একদিন তিনি দেহ রাখলেন। শিষ্যরা সবাই কেঁদে আকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু পূজারীর আসন তো কখনও শূন্য থাকে না, থাকতে নেই। সেই আসনে আর একজন শিষ্য বসলেন। তিনিই হলেন সকলের গুরু। তাঁকেই সবাই মহাগুরু বলে

সম্ভাষণ করতে লাগলো। ঠাক্‌মা-মণি একদিন তাঁর কাছে গিয়েই কেঁদে পড়লেন। বললেন—আমার কী হবে গুরুদেব?

মহাগুরু বললেন—দেহ থাকলেই দেহ রেখে একদিন চলে যেতে হয়, এই-ই হচ্ছে ঠাকুরের লীলা।

—কিন্তু আমার যে বরাবর ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে দীক্ষা নেব। বলে নিজের দেখা স্বপ্নের কথা সবিস্তারে বলে গেলেন।

মহাগুরু সমস্ত শুনলেন। তারপর বললেন—তোর যখন দীক্ষা নেবার এত ইচ্ছে তখন আমিই তোকে দীক্ষা দেব। তুই প্রস্তুত?

—হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। বললেন ঠাক্‌মা-মণি।

তারপর একটা শুভ দিন দেখে ঠাক্‌মা-মণি দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা নিয়ে তিনি মহাগুরুকে প্রণাম করে বললেন—গুরুদেব, এবার আমি বড় তৃপ্তি পেলাম। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—

মহাগুরু বললেন—আমি আশীর্বাদ করবার কে? এই বাবাই তোকে আশীর্বাদ করবেন। বলে তিনি বাবার পাদোদক ঠাকমা-মণির মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। ঠাকমা-মণি মহাখুশী। এর পর ছোট নাতির ইস্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি পড়তেই তিনি তাকে নিয়ে মন্দিরে গেলেন। মহাগুরু জিজ্ঞেস করলেন—এ কৌন হ্যায়?

—আমার বড় ছেলে ছিল, তারই ছেলে এ। আমার ছোট ছেলে তো আমাকে ছেড়ে আলাদা হয়ে গেছে। তাই এই নাতিই হচ্ছে আমার একমাত্র আশা-ভরসা। এর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। ভবিষ্যতে এর কপালে কী আছে, আপনি একটু বলে দিন দয়া করে। এর বাবা-মা কেউ নেই, তাই আমার খুব ভয় করে—

গুরুদেব সৌম্যর ডান হাতটা নিজের হাতে ধরে খানিকক্ষণ দেখলেন। তারপর সৌম্যর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—ইস্‌কে লিয়ে জেরা হোঁসিয়ার রহনা চাহিয়ে বিটিয়া।

কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলেন ঠাক্‌মা-মণি। বললেন—কেন বাবা? বলুন না, কী দেখলেন?

গুরুদেব বললেন—ইস্‌কা বুদরত জেরা খতরনাক্ হ্যায়।

ঠাক্‌মা-মণি কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—এ বাঁচবে তো?

গুরুদেব বললেন—জরুর বাঁচে গা তেরা পোতা, লেকিন ইস্‌কা সাদিকা বক্‌ত্ মুঝে থোড়া খবর ভেজনা।

তার মানে হলো—এ বাঁচবে, কিন্তু এর বিয়ের সময় আমাকে একটু খবর দিস।

এর পর গুরুদেব আর কিছু বলেন নি। হাজার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। তখন আর বেশি সময়ও ছিল না হাতে। সৌম্যর ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই কাশী ছেড়ে ঠাক্‌মা-মণি সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু কলকাতাতে এসেও মনের মধ্যে গুরুদেবের কথাগুলো কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করে বিঁধতে লাগলো। তাই সংসারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও সব সময়ে গুরুদেবের কথাগুলো তাঁর মনে পড়তো। তিনি সৌম্যকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। সেইজন্যেই তিনি ঠিক রাত ন'টার সময়ে গিরিধারীকে গেট বন্ধ করতে হুকুম দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল, সৌম্য যেন রাত্রে বাড়ির বাইরে না যেতে পারে। আর তা ছাড়া তিনি সৌম্যর ছোটবেলা থেকেই তার বিয়ের পাত্রী পছন্দ করে রাখবার কথা ভাবছিলেন। তাই যখন গঙ্গার বাবুঘাটে গিয়ে একটা সুন্দর মেয়েকে দেখলেন, তখনই ঠিক করলেন যে মেয়েটি যদি তাঁদের পাল্‌টি ঘর হয় তো তার সঙ্গে নাতির বিয়ে দেবেন। সেই উদ্দেশ্যেই মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে সমস্ত কিছু খোঁজখবর নিতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর মল্লিকমশাইকে মেয়েটির জন্ম-সাল্, জন্ম-তারিখ, জন্ম-সময় আর জন্ম-স্থান উল্লেখ করে গুরুদেবকে চিঠি লিখে দিতে বললেন। আর যাতে সময় নষ্ট না হয়, তাই জন্যে মল্লিকমশাইকেও কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন গুরুদেবকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় আসতে।
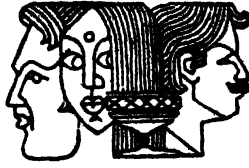
এ-সবই অতীতের গল্প। এই অতীতের গল্পই করছিলেন মল্লিকমশাই।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তারপর, তারপর কী হল মল্লিককাকা?

তারপরের অত কথা কি অত সংক্ষেপে বলা যায়? আর গুরুদেবকেই কি কলকাতায় মানী-গুণী-বড়লোকের বাড়িতে আনা অত সহজ? তবু ভাগ্যের কী অসীম কৃপা যে তিনি সশরীরে এই বিড়ন স্ট্রীটের বারোর-এ নম্বর বাড়িতে তাঁর পদধূলি দিলেন। সারা বাড়িতে তোলপাড় পড়ে গেল। আর বাড়িতে ঠাক্‌মা-মণি আর তাঁর নাতি ছাড়া আর কে-ই বা আছে যে তোলপাড় করবে? আর যারা এ-বাড়িতে আছে, তারা তো এ-বাড়ির কেউ নয়। সবাই তো মাইনে করা লোক। বেতনভুক্‌। কিন্তু তাদের মাথাব্যথাও কম নয়। বাড়ির মালিকপক্ষ তো হুকুম করেই খালাস, কাজকর্ম তো করতে হবে সেইসব বেতনভুক্‌ লোকদেরই।

গুরুদেব দয়া করে আসবেন, সুতরাং দেখতে হবে তাঁর সেবায় যেন কিছু ত্রুটি না থাকে। পান থেকে চুন যেন না খসে। গুরুদেবের জন্যে বিশেষ বিছানাপত্র কিনে আনতে হলো, নতুন খাট, নতুন গদি, নতুন তোষক, নতুন চাদর, নতুন বালিশ। সবই নতুন। তারপর বাড়িতে নতুন করে ভেতরে বাইরে আগা-পাশ-তলা বাহারি চুনকাম করা হলো রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে। তার ওপর আছে পুজোর বাসনপত্র। গুরুদেবের বসবার জন্যে কার্পেট, পশমের ফুলদার আসন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারো বিশ্রাম নেই। সকলেরই দুর্ভাবনা। কখন কী ভুলত্রুটি ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। ভুল হলে আর তার ক্ষমা নেই, জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরি চলে যাবে। গুরুদেব আর ঈশ্বর কি আলাদা? গুরুদেব রুষ্ট হলে ঈশ্বরও রুষ্ট হবেন। তেতলা থেকে ঠাক্‌মা-মণির বকল্‌মা বিন্দু দোতলার কালিদাসীকে হুকুম করে। বিন্দুর বদলে সুধাও মাঝে মাঝে হুকুম করে। আবার কালিদাসী হুকুম করে একতলার ফুল্লরাকে। সেই হুকুম নিয়ে সে ঠাকুরবাড়ির ঝি কামিনীকে গিয়ে দেয়। কামিনী সেই খবর দেয় ঠাকুরবাড়ির পুরুতমশাইকে। যে কন্দর্প রোজ ঠাকুর-বাড়িতে ভোরবেলা ফুল-বেলপাতা দিয়ে যায়, তার ওপর তম্বি করে পুরুতমশাই। পুরুতমশাই বলে দিয়েছিল রোজ বেশি-বেশি ফুল, বেলপাতা আর দুর্বো ঘাস আনতে। তবু কন্দর্প কম ফুল দিত।

সেদিন ফুল দেখে পুরুতমশাই রেগে কাঁই। বললেন—এ কী হলো কন্দর্প? ফুল এত কম কেন? এ-রকম কম ফুল দিলে ঠাক্‌মা-মণিকে নালিশ করবো কিন্তু—তাতে তোমার পয়সা কাটা যাবে, তা বলে রাখছি।

কন্দর্প হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলে। বললে—এবার মাফ করে দিন ঠাকুরমশাই, আজ খুব বৃষ্টি পড়ছিল, তাই বাজারে যেতে পারিনি। এবারের মত আমাকে মাফ্‌ করে দিন ঠাকুরমশাই।

ঠাকুরমশাই বললে—তাহলে আমায় জরিমানা দে—দে জরিমানা—

কন্দর্প গরিব লোক। তিন পুরুষ ধরে এই বাড়িতে ফুল যোগান দিয়ে আসছে। সেই মান্ধাতা আমলের রেট চলে আসছে ফুলের। ফুল যোগানের রেট বাড়াতে বললেই ঠাকুরমশাই রেগে যায়। তখন সেই পাওনার দস্তুরি দিতে হয় ঠাকুরমশাইকে। কন্দর্প মাস কাবারি ত্রিশ টাকা পায়। তার থেকে প্রতি মাসে ঠাকুরমশাইকে পাঁচ টাকা করে ভাগ দিতে হয়। তাতেও খুশি হয়নি ঠাকুরমশাই। কন্দর্প বলেছিল—আর পারছি না ঠাকুরমশাই, ফুলের বাজার বড় টাইট। আগেকার দামে কেউ আর ফুল দিতে চায় না।

ঠাকুরমশাই বললে—তাহলে কিন্তু আমার দস্তুরিও বাড়াতে হবে তোকে।

কন্দর্প বলে—কত দস্তুরি দেব বলুন? আরও এক টাকা বাড়ালে হবে তো?

—দূর পাঁঠা, জিনিসপত্তরের আগুন দাম, এক টাকা দিলে কী করে হবে?

—আচ্ছা, তাহলে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে দেড় টাকাই নেবেন।

ঠাকুরমশাই-এর মন তাতেও গলে না। সত্যিই টাকার ব্যাপারে ঠাকুরমশাই বড় দেমাকি। কন্দর্প বললে—আপনি পুরোনো যজমান হয়ে এমন কথা বলছেন? তাহলে আমরা কোথায় যাই ঠাকুরমশাই? তাহলে আমরা যে মারা যাবো, নির্ঘাত মারা যাবো।

কিন্তু ঠাকুরমশাই এক কথার মানুষ। তার যে-কথা সেই কাজ। ফুল যোগানের তিরিশ টাকা রেট চল্লিশ টাকা হলো, কিন্তু তার নিজের একেবারে পাঁচ টাকা থেকে আরো বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। ছিল পাঁচ টাকা, কিন্তু তখন থেকে হলো দশ টাকা।

তা এতদিন পরে গুরুদেব যখন বাড়িতে আসছেন তখন ফুল-বেলপাতাও বেশি যোগান দিতে হবে কন্দর্পকে, তখন সে আবার পুরুতমশাই-এর কাছে তার পাওনা-গন্ডার অঙ্কটা বাড়াবার আর্জি পেশ করলে।

ঠাকুরমশাইও বললে—তা সে আমি সরকারমশাই কলকাতায় ফিরলে তাঁকে বলে-কয়ে বাড়িয়ে দেব, কিন্তু আমার পাওনা-গণ্ডার কথাটাও মনে রাখবি তো?

গুরুদেব আসবার আগেই ঠাক্‌মা-মণির হুকুমে ঝি-চাকরকে নতুন কাপড়-গামছাও দেওয়া হয়ে গেল। যেন বাড়িতে বিয়ের উৎসব-পর্ব শুরু হয়েছে। এটা বাড়তি পাওনা। এবারের উপলক্ষ্য নাতির বিয়ের জন্যে পাত্রী পছন্দ করা।

শেষকালে সত্যি-সত্যিই মল্লিকমশাই গুরুদেবকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। আগেকার বন্দোবস্তমতো ঠিক সময়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মল্লিকমশাই গুরুদেবকে নিয়ে প্লাটফরমের ওপর নামলেন আর কাছেই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তাইতেই গুরুদেবকে নিয়ে উঠলেন।

আর সেদিনই সকালবেলা থেকে বারোর-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির মাথা থেকে নহবতের সুর বেজে উঠলো। সেদিন সেই নহবতের শব্দ শুনে এ-পাড়ার সমস্ত লোক সাত-সকালেই চমকে উঠলো। সেই সময়ে রাস্তা দিয়েও যারা যাচ্ছিল, তারাও খানিকক্ষণের জন্যে সেখানে থমকে দাঁড়ালো। কী হয়েছে মুখার্জি বাড়িতে? হঠাৎ এখন নহবত বেজো উঠলো কেন? কারো বিয়ে? না, তা কী করে হয়? পৌষ মাসে কি হিন্দু-বাড়িতে বিয়ে হতে আছে? তবে কী? কৌতূহলে সবাই ঠিক খবর জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। কোনও পুজো? না, তাই-ই বা কী করে হয়? এ-মাসে তো কোনও পুজো নেই। তবে কি ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন? না, তাই-ই বা কী করে হবে? ও-বাড়িতে তো কোনও ছোট ছেলে-মেয়ে নেই? তাহলে?

একটা বাড়িকে ঘিরে পাড়ার সমস্ত মানুষের মনের ভেতরে সেদিন একটা অদম্য প্রশ্ন উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে নিঃশব্দে ছটফট করতে লাগলো। কে? কী? কেন?
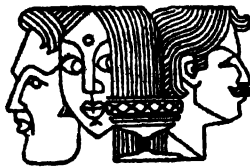
মেষ রাশিতে যখন সূর্য থাকে তখন বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমা শেষ হয়। সেদিন জন্মেছিল বলেই তার নাম হয়েছিল বিশাখা। তবু তাকে নিয়ে বড় ভয় ছিল যোগমায়ার। ও-মেয়ে কি বাঁচবে? ও-মেয়ে তো জন্মেই বাপকে খেয়েছে। ভবিষ্যতে ও-মেয়ের কপালে কী আছে কে জানে? তাই সময়ে-অসময়ে মা দৃশ্য-অদৃশ্য সব দেব-দেবীকে হাত জোড় করে প্রণাম করতো। বলতো—ঠাকুর,

আমার কপালে যা হয় হোক, তুমি আমার ওই মেয়েটার একটা গতি করে দাও। তুমি যদি ওকে আমার কোলে দিলে, তবে ওর ভাল-মন্দটাও তুমিই দেখো। আমি বড় অনাথিনী ঠাকুর। ওকে দেখবার কেউ নেই। আমারও তিন কুলে কেউ নেই। আমি দেওরের ঘরে যত ঝাঁটা-লাথিই খাই আর যত কষ্টই পাই, ও যেন সুখে থাকে, ওর সুখই আমার সুখ। আর কিছু চাই না ঠাকুর তোমার কাছে, আর কিছু চাই না।

অথচ বিশাখা জানেও না যে তার মা'র মতন দুঃখী মানুষ সংসারে আর দু'টি নেই। কিন্তু সে কথা কারো কাছে মুখ ফুটে বলবারও কোন উপায় নেই।

এক একদিন মেয়ে এসে মা'র কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

যোগমায়া তখন উনুনে কড়ায় ডাল চড়িয়েছে। মেয়ের কান্নায় বাধা পড়লো। বললে—কাঁদছিস কেন রে?

—আমাকে জিলিপি দেয়নি।

যোগমায়া বললে—কে?

বিশাখা বললে—কাকিমা।

যোগমায়া বললে—না দিক গে, আমি দেব জিলিপি, তুমি কেঁদো না, ছি, কাঁদতে নেই—

—তাহলে দাও তুমি!

যোগমায়া বললে—এখন জিলিপি কোথায় পাবো? পরে তোমাকে দেব।

বিশাখা তবু বায়না করে। বলে—পরে নয়, এখুনি দিতে হবে।

যোগমায়া বলে—না মা, ও-রকম করতে নেই, ছি, এখুনি জিলিপি কোথায় পাবো? পরে আমি তোমাকে জিলিপি কিনে দেব। তাহলেই তো হবে?

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিজলী জিলিপি কামড়াতে কামড়াতে রান্নাঘরের কাছে এলো। বিশাখাকে দেখিয়ে দেখিয়ে জিলিপি খেতে লাগলো।

বিশাখা বললে—ওই দেখ মা, বিজলী জিলিপি খাচ্ছে, আমাকে দিচ্ছে না—

বিজলী বললে—আমি কেন জিলিপি দেব তোকে? এ জিলিপি তো আমার মা কিনে দিয়েছে।

যোগমায়া সেখানে সেইভাবে বসে বসেই মেয়ের মাথাটা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখলে, যাতে মেয়ে বিজলীর জিলিপি খাওয়া দেখতে না পায়। বললে—ছি, ওদিকে দেখতে নেই।

বিশাখা তখন প্রাণপণে শাড়ির আঁচল থেকে নিজের মাথাকে মুক্ত করতে চাইছে। কিন্তু যোগমায়াও তখন জোর করে চেপে ধরে রেখেছে মেয়ের মাথাটাকে। কিন্তু তবু মেয়ে জিলিপির শোক ভুলতে পারছে না।

বললে—তুমি কেন আমাকে জিলিপি দেবে না, আমি কী করেছি—

শেষকালে যোগমায়া মেয়ের মাথায় জোরে এক চড় মেরে বললে—পোড়ারমুখী নিজের বাপকে খেয়েছে, এখন আবার আমাকে খেয়ে তবে ছাড়বে...

বিশাখা সেই চড় খেয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ যে আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, তাতে যেন হঠাৎ আরো ইন্ধন পড়লো। সে বাড়ি কাঁপিয়ে তখন কান ফাটানো চিৎকার শুরু করলে।

যোগমায়া তখন বিজলীর দিকে চেয়ে বললে—তুমি এখান থেকে সরে যাও তো মা, ওদিকে আড়ালে সরে যাও। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, যাও তো—ওকে, জিলিপি দেখিও না।

বিজলীও তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে গেছে মা'র কাছে। মা তখন মাদুরে শুয়ে শুয়ে একটা সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছিল। মেয়ের কান্না শুনে আঁতকে উঠলো—কী হয়েছে রে? কী হয়েছে? কে মেরেছে?

—বড়মা...

কান্নায় বিজলীর সব কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরোল না।

মা জিজ্ঞেস করলে—বড়মা মেরেছে? কেন মারতে গেল? তুই কী করেছিলি?

বিজলীর চোখ দিয়ে তখন অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কোনও রকমে তার মুখ দিয়ে বেরোল—আমি কিছছু করিনি, জিলিপি খাচ্ছিলুম—

মা বললে—শুধু শুধু জিলিপি খেলে কেউ মারে?

বিজলী অকপটে বললে—সত্যি কিছছু করনি, শুধু জিলিপি খাচ্ছিলুম—

মা মাদুর ছেড়ে এবার অতি কষ্টে উঠে বললে—তোর বড়মা কোথায় রে?

—রান্নাঘরে—ওই তো—

মা এবার মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। বললে—হ্যাঁ বড়দি, এই বেস্পতিবারের বারবেলায় তুমি আমার মেয়েকে মারলে?

যোগমায়ার কোলে তখনও বিশাখা মুখ রেখে কাঁদছে। বললে—কই, আমি মারিনি তো বিজলীকে।

—তুমি মারোনি তো বিজলী কি আমার কাছে মিছিমিছি নালিশ করলে?

যোগমায়া বললে—না দিদি, তুমি বিশ্বাস করো, আমি মারিনি। আমি আমার বিশাখাকে মেরেছি, আমি শুধু বিজলীকে আড়ালে সরে গিয়ে জিলিপি খেতে বলেছি।

—তাহলে কি বলতে চাও আমার বিজলী মিথ্যেবাদী?

যোগমায়া বললে—তা আমি কেন বলবো দিদি। সে-কথা বলবার কি আমার জোর আছে? তা যদি থাকতো, তা হলে ভগবান কি আমার কপাল এমন করে পোড়াতো?

বলে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো যোগমায়া। কিন্তু যোগমায়ার কান্না দেখে রাণী যেন আরো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। বললে—হ্যাঁ, কাঁদো, আরো জোরে জোরে কাঁদো, যেন গেরস্থর অমঙ্গল হয়, যেন তোমার মতন আমারও কপাল পোড়ে! তা ছাড়া আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, আমার ওপর তোমার কত হিংসে? তবে এও বলে রাখছি বড়দি, যদি আমার কপাল পোড়ে তো তুমিও সে-আগুনে রক্ষে পাবে না কিন্তু, আর শুধু তুমি নও, তোমার বিশাখাকেও সে-আগুন থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না—এই বলে রাখলুম—

বলে রাণী যেমন গট্-গট্ করে রান্নাঘরের কাছে এসেছিল, আবার তেমনি গট্-গট করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

যোগমায়া আর থাকতে পারলে না বিশাখাকে কোল থেকে এক হাতে সরিয়ে দিয়ে তার পিঠে দুম্-দুম্ করে কিল মারতে লাগলো আর চিৎকার করে-করে বলতে লাগলো—মর, মর তুই মর। তুই মরতে পারিস নে? এত লোক মরে আর তোকে মরণ দেখতে পায় না? তুই তোর বাপকে খেয়েছিস এবার আমাকেও খা। আমাকে কেন খাচ্ছিস নে? তোর এত ক্ষিধে? এত লোককে যম খায়, আর তোকে খায় না? যমের চোখ কি কানা? মর, মর তুই, আর তোকে যদি যম না খায় তো আমাকেও কেন খায় না?

বিশাখা যত মার খাচ্ছিল, যোগমায়া যেন তত মরীয়া হয়ে উঠছিল। যোগমায়ার চিৎকারে পাড়ার লোকেরাও যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। হয়ত তারা ঘটনাটা জানবার জন্যে বাড়ির ভেতরেই ঢুকে পড়তো, কিন্তু তার আগেই ছোট জা' এসে বিশাখাকে ধরে ফেলেছে।

বললে—কী করছ বড়দি? তুমি কি পাড়ার লোকের কাছে আমাদের বে-ইজ্জত করতে চাও? তোমার মতলবটা কী শুনি? তুমি বিশাখাকে মেরে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছ? তুমি মনে করেছ আমি কিছু বুঝি নে?

সাধারণত যোগমায়া খুব শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। স্বামীর মৃত্যুর পর যেন আরো নির্বাক হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ কী হয়েছিল কে জানে, যোগমায়ার ঘাড়ে যেন ভূত নেমেছিল। সামান্য একটা জিলিপি নিয়ে যে এমন লঙ্কাকাণ্ড বাধবে, তা যেমন ছোট জা' কল্পনা করতে পারেনি, তেমনি বিশাখা কি বিজলীও তা কল্পনা করতে পারেনি। বিশাখা আর বিজলীকে নিয়ে ছোট জা' তখন তার নিজের ঘরে চলে গেল।
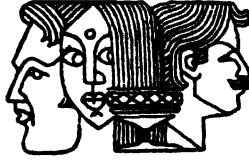
এ-সব ঘটনা অতীতের। এ-সব ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটলেও তা তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু মাঝখান থেকে কী করে যে কী হয়ে গেল, বাবুঘাটে গঙ্গায় মেয়েকে নিয়ে স্নান করতে গিয়ে বিশাখা যে কার সুনজরে পড়ে গিয়েছিল, তা ভগবানই জানেন। যেদিন বিড়ন স্ট্রীট-এর বাড়ি থেকে সে-বাড়ির সরকার-মশাই এসে বিশাখার জন্ম-সময়-তারিখ চেয়ে নিয়ে গেল, সেদিন থেকেই যেন আবার অন্য দিকে ঘটনার মোড় ঘুরলো।

সেদিন থেকেই ছোট জা-র শরীর আরো খারাপ হতে লাগলো। সেদিন থেকেই যোগমায়া যেন আরো নির্বাক হয়ে গেল। আর সেদিন থেকেই ছোট দেওরের মেজাজ যেন কেমন আরো খিট্‌খিটে হয়ে গেল।

বিশাখা কখনও কখনও বিছানায় শুয়ে ডাকে—ও মা, মা—

যোগমায়া বলে—কী হলো? আমাকে ডাকছিস কেন?

বিশাখা বলে—আমার ঘুম আসছে না—

—ভয় করছে? কেন, ভয় করছে কেন?

বিশাখা বলে—তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকো মা, জোরে জড়িয়ে ধরে থাকো।

যোগমায়া দু'হাত দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

বিশাখার তখনও ঘুম আসে না।

হঠাৎ এক সময়ে বিশাখা বলে—আমার নাকি বিয়ে হবে মা?

যোগমায়া চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে—তোকে কে বললে?

বিশাখা চুপ করে থাকে। যোগমায়া বললে—বল্ কে তোকে বললে?

বিশাখা ভয়ে এ-প্রশ্নের কোনও জবাব দেয় না। যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—জবাব দিচ্ছিস না যে? বল্ কে তোকে বললে বিয়ের কথা?

বিশাখা বললে—কাকাবাবু।

—কাকাবাবু নিজে তোকে বলেছে?

বিশাখা বললে—না, কাকাবাবু আর কাকিমা দু'জনে কথা বলছিল, আমি শুনতে পেয়েছি।

—কাকাবাবু আর কাকিমা কী কথা বলছিল?

—বলছিল যেখানে আমার বিয়ে হবে, তাদের বাড়ি কাকাবাবু গিয়েছিল। সে নাকি এক মস্ত বড় বাড়ি। তারা নাকি মস্ত বড়লোক, তাদের বাড়িতে মস্ত বড় মোটর গাড়ি আছে। তাদের নাকি অনেক টাকা আছে, অনেক ঝি-চাকর, দরোয়ান, মন্দির আছে তাদের বাড়িতে, সে মন্দিরে রোজ পুজো হয়—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—আর কী বললে?

—বললে কাকাবাবু নাকি তাদের সঙ্গে বিজলীরও বিয়ে দেবার কথা বলেছিল, কিন্তু তারা নাকি রাজি হয়নি। সে জন্যে কাকিমা খুব রেগে গিয়েছে।

যোগমায়া বললে—কার ওপর রেগে গিয়েছে?

—তোমার ওপর।

যোগমায়া বললে—কেন, আমার ওপর রেগে গিয়েছে কেন? আমি কী করেছি?

বিশাখা বললে—না, তাহলে বোধহয় আমি ভুল শুনেছি। বোধহয় তাদের ওপরই রাগ করেছে।

যোগমায়া বললে—তা যে যা-ইচ্ছে করুক, তুমি এবার ঘুমোও।

বিশাখা একটু থেমে বললে—আমি কিন্তু মা তাদের বাড়ি যাবো না।

যোগমায়া বললে—কে তোমায় সেখানে যেতে বলছে। তোমার ইচ্ছে না হয় তো যেও না।

বিশাখা বললে—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না মা—

যোগমায়া বললে—তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ, বিয়ের পর তো তোমাকে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে মা।

বিশাখা মা-কে আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো।

বললে—না মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

যোগমায়া বললে—ও-সব কথা তুমি এখন ভেবো না। এখন ঘুমোও।

খানিক পরে বিশাখা নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়লো। যোগমায়া ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন—ঠাকুর, এই মেয়ে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি তাকে দেখো ঠাকুর—

তারপর নিজেও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।
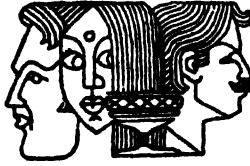
সেদিন সকালবেলাই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। ভেতর থেকে তপেশ গাঙ্গুলীবাবু জবাব দিলেন—কে?

—আমি, বিড়ন স্ট্রীট থেকে আসছি। মল্লিকমশাই—

তাড়াতাড়ি তপেশ গাঙ্গুলী দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন, মল্লিকমশাই সশরীরে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

মল্লিকমশাই বললেন—আপনার বৌদি আর ভাইঝিকে নিয়ে যেতে এসেছি। ঠাক্‌মা-মণির গুরুদেব এসেছেন কাশী থেকে, তিনি একবার আপনার ভাইঝিকে দেখতে চান—

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই তখন একেবারে হতবাক। তিনি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বললেন—আসুন মল্লিকমশাই, আপনি বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ভেতরে আসুন—

মল্লিকমশাই আগেকার দিনের মতন ভেতরে গিয়ে বসলেন। সেই আগেকার মতন তক্তপোশ, সেই বিছানাটা গোল করে গোটানো। সেই সর্বত্র অগোছালো নোংরার পাহাড়—

—বৌদি, অ বৌদি, বৌদি কোথায়? বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে তোমাদের নিতে এসেছেন ওঁরা—

কথাগুলো যে বিদ্যুতের গতিতে বাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে একটা ঝড়ের আভাস সৃষ্টি করবে, তা তপেশ গাঙ্গুলী কল্পনা করতে পারেন নি। রান্না করতে করতে যোগমায়ার কানে কথাগুলো যেতেই সে শিউরে উঠলো, এই বুঝি মাথার ওপর বজ্রাঘাত হলো!

ঘরের ভেতর থেকে রানী বললে—কী বললে? কে এসেছে?

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললেন—বিড়ন স্ট্রীট-এর মুখুজ্জেবাড়ি থেকে এখানে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে—

রানী যেন রোগ-ভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলো। বললে—কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—বৌদিকে আর বিশাখাকে তারা একটু খানির জন্যে নিয়ে যেতে চায়।

—কেন?

—কেন আবার কী? তারা যদি নিয়ে যেতে চায় তো আমি কী বলবো?

রানী বললে—বড়দি গেলে বাড়ির রান্নাবান্না কে করবে? আমি কিন্তু তা পারবো না, তা তোমায় বলে রাখছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তাহলে মল্লিকমশাইকে আমি কী বলবো?

—আমি কী বলবো? যা তুমি ভালো বোঝ তাই বলবে।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা আওয়াজ এল—ঠাকুরপো—

তপেশ গাঙ্গুলী দেখলেন রান্নাঘর ছেড়ে বৌদি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রানীও তা দেখলে। তপেশ গাঙ্গুলী কিছু বলবার আগেই যোগমায়া বললে—তুমি বলে দাও ঠাকুরপো, আমি যাবো না—

—কেন বৌদি, যাবে না কেন?

যোগমায়া বললে—না, আমি যাবো না, সংসারে আমার অনেক কাজ আছে—আমি চলে গেলে কে এ-সব করবে?

—সত্যিই যাবে না?

যোগমায়া বললে—না, সত্যিই যাবো না, তুমি তাই বলে দাও ওদের—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু ওরা খুব বড়লোক, তা জানো? আমি নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে সেদিন দেখে এসেছি, অমন বড়লোকের বাড়ির ছেলে সঙ্গে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ হবে, এটাও তো তোমার সৌভাগ্য—

যোগমায়া আর দাঁড়ালো না সেখানে। রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে বললে—আমার সৌভাগ্য না ছাই, আমার সৌভাগ্য যদি হতো তা হলে কি এমনি করে আমার কপাল পুড়তো?

—কী বললে? কী বললে দিদি? কী বললে তুমি?

বলতে বলতে বিছানা থেকে উঠে এল রানী। তারপর রান্নাঘরের সামনে রোয়াকে বেরিয়ে এসে বলল—তোমার কেন জ্বালা বলো তো দিদি? এত জ্বালা তোমার কীসের? বারবার পোড়া কপালের দোহাই কেন দাও তা আমি বুঝতে পারি নে ভেবেছ? আমার ওপর যদি তোমার এতই হিংসে তো সংসারে কোনও কাজই আজ থেকে তোমায় করতে হবে না। কে তোমায় এত কাজ করতে বলেছে? ভগবান আমার গতর খেয়েছে বলেই তোমায় এত খোসামোদ। তা যাক্‌গে, আজ থেকে আমি হাতা-বেড়ি নাড়বো, আমিই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করবো। নাও, তুমি ওঠো, তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, খাবার সময় তোমাকে ডাকবো, তুমি দয়া করে তখন একটু কষ্ট করে খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করো। ওঠো, ওঠো বড়দি—ওঠো বলছি—

যোগমায়া তবু যা করছিল, তাই করতে লাগলো।

বলে যোগমায়ার হাত থেকে খুন্তীটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতেই নিজের হাতে সেটা রেখে যোগামায়া জোর করে উঠে দাঁড়ালো। বললে—দিদি, তুমি কি আমাকে এই সকালবেলা না কাঁদিয়ে ছাড়বে না? ভগবান সাক্ষী আছেন আমি কখনও তোমাকে হিংসে করিনি দিদি, হিংসে করিনি। যদি কখনও হিংসে করে থাকি তো আমার কপাল যেন এই রকম করে ভাঙ্গে—ভাঙ্গে—

বলে কেউ কিছু বলবার আগেই পাশের সিমেন্টের দেয়ালে ঠাঁই-ঠাঁই করে মাথাটা ঠুকতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে কপালটা কেটে গিয়ে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়তে লাগলো। হয়তো আরো রক্ত পড়তো, কিন্তু তার আগেই তপেশ গাঙ্গুলী বৌদির হাতটা ধরে টেনে নিয়েছেন। বললেন—এ কী করছো! বৌদি, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

যোগমায়া তখন সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই একহাতে নিজের থান দিয়ে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওদিকে ঘরের ভেতরে মুখুজ্জেবাড়ির সরকারমশাই সব শুনতে পাচ্ছেন যে!

রানী বললে—শুনুক না, শুনলে কী হয়েছে? শুনুক যে যাকে নিজেদের বাড়ির নাতির সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করছে তার মা কত দজ্জাল, কত ঝগড়াটে—নিজের কানেই শুনে যাক না, তাতে

ক্ষতি কী?

তপেশ গাঙ্গুলী বাধা দিয়ে গলা নিচু করে বললেন—আঃ, অত চেঁচিও না গো, চেঁচিও না অত, শুনতে পাবে, ওরা খুব বড়লোক—

রানী কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পাড়ার স্কুল থেকে বিজলী আর বিশাখা চেঁচাতে-চেঁচাতে বাড়ি ফিরলো। এ-রকম প্রতিদিন বাড়িতে ফেরার সময় তারা মুক্তির আনন্দে চেঁচাতে-চেঁচাতে ফেরে।

কিন্তু বাড়ীর সকলকে রান্নাঘরে একসঙ্গে ওই অবস্থায় দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। তাদের মুখের কথা যেন মুখেই থেকে গেল।

বিশাখা বললে—এ কি মা, তোমার কাপড়ে রক্ত কেন?

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। সবাই যেন তখন বোবা হয়ে গেছে।

—এ কি মা, তোমার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে কেন?

যোগমায়া আর থাকতে পারল না হঠাৎ যেন রুদ্রমূর্তি হয়ে সে মারমুখী হয়ে উঠলো। এক নিমেষে চেঁচিয়ে উঠলো—পোড়ারমুখী, মরতে তুই আর জায়গা পাসনি, আমার পেটে কেন জ্বালাতে এলি তুই? মর তুই, মর—

বিশাখা এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর অকারণ শাস্তিতে গলা ফাটিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। রানী তাড়াতাড়ি রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে বিশাখাকে কোলে তুলে নিয়ে তপেশকে বললে—দেখলে তো, দেখলে তো তোমার বৌদির কাণ্ড। ঝি'কে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ভেবেছে আমি কিছু বুঝতে পারি না। ওগো, আমিও বুঝি গো, আমিও বুঝি। সংসারে কেউ বোকা নয় বড়দি, কেউ অত বোকা নয়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ বাইরের ঘর থেকে মল্লিকমশাই-এর গলা পাওয়া গেল। মল্লিকমশাই বলছেন—ও গাঙ্গুলীমশাই, আর কত দেরি? আমি যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। সেখানে যে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওই, ওই মল্লিকমশাই ডাকছেন—

তারপর মল্লিকমশাইকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বললেন—এই যে, আর দেরী হবে না, যাচ্ছি—

যোগমায়াকে লক্ষ্য করে তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কই বৌদি, তুমি তৈরি হয়ে নাও, বিশাখাকেও একটা ফরসা ফ্রক পরিয়ে দাও, বড়লোকের বাড়ি, অনেক ভাগ্য করলে তবে অমন বাড়িতে মেয়ের সম্বন্ধ হয়—যাও, আর দেরি করো না—

বলে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে মল্লিক-মশাই-এর কাছে গেল।

যোগমায়া তখনও সেই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে। আর রানী বিশাখাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা ভালো দেখে ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে, চুল আঁচড়ে, লাল রং-এর একটা রিবন মাথার চুলে ফুল করে বেঁধে দিয়েছে।

বিজলী বললে—ওকে সাজিয়ে দিচ্ছ আর আমাকে সাজিয়ে দেবে না?

রানী বললে—দেব-দেব, তোকেও সাজিয়ে দেব। বিশাখা এখুনি চলে যাবে কিনা, তাই ওকে আগে সাজিয়ে দিচ্ছি—

বিজলী তবু কিছু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—ও কোথায় যাচ্ছে?

—ও যাচ্ছে শ্যামবাজারে—

—শ্যামবাজারে—

বলে আর দাঁড়ালো না। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে বড়দি তখনও সেখানে সেই একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে।

বললে—কী হল বড়দি, তুমি তৈরি হওনি এখনও? তৈরি হও তাড়াতাড়ি—

যোগমায়া এবার প্রথম কথা বললেন। বললে—আমি যাবো না।

—যাবে না? যাবে না কেন?

—আমার ইচ্ছে—

রানী বললে—বুঝেছি, তুমি আমাকে জব্দ করতে চাও। তা বেশ, যদি তাই করতে চাও, তো এও আমি বলে রাখছি যে তুমি যদি আমার ওপর রাগ করে সেখানে না যাও তো আমি আজ এ-বাড়িতে জলগ্রহণ করবো না—আমিও এ-বাড়িতে তোমার চোখের সামনে উপোস করে মরবো। দেখি, আমাকে তুমি কত রকমে জব্দ করো—

যে যোগমায়া এতক্ষণ একপাশে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে যেন এ-কথায় একটু সচল হলো। বললে—দিদি, আমি চলে গেলে কে সংসারের কাজকর্ম্ম করবে? তোমরা সবাই খাবে কী?

রানী বললে—তুমি মরে গেলে কি ভেবেছ এ-বাড়ির কেউ খেতে পাবে না? তুমি মরে গেলে কি আকাশে সূর্য-চন্দ্র উঠবে না? যদি তখনও তা ওঠে তাহলে তুমি মরে গেলেও এ-সংসার চলবে, তা বন্ধ হবে না, এটা তুমি জেনে রেখো—

এর জবাবে যোগমায়া কিছুই বললে না। শুধু চুপ করে রইল। রানী বললে—যাও, আর কথা বাড়িও না, ভদ্রলোক বসে আছেন, তুমি একটা ফর্সা কাপড় পড়ে নাও। ওই ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা পরে সেখানে গিয়ে তোমার দেওরকে আর বে-ইজ্জৎ করো না—বলে ছোট-জা সেখান থেকে চলে গেল।
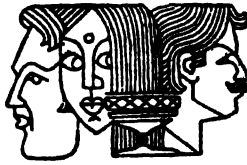
সন্দীপ তখনও জানতো না কাকে বলে সংসার। সে বড়লোকের সংসারই হোক আর ভিখিরির সংসারই হোক। সং সাজাকেই যারা জীবনের সারবস্তু বলে মনে করে, তারাই এ-সংসারে সংসার পাতে। বেড়াপোতাতেও সন্দীপ কত সংসার দেখেছে। চাটুজ্জে বাড়ির ভেতরেও গিয়েছে সন্দীপ কতবার। চাটুজ্জে বাড়ির ভেতরে শাশুড়ি-বউদেরও খুঁটিনাটি নিয়ে মনকষাকষি হয়েছে কতবার। মা'কেও কি চাটুজ্জেগিন্নীর কাছে কম বকুনি খেতে হয়েছে? মা'র সব কাজেই খুঁত ধরতো বাড়ির গিন্নী।

চাটুজ্জেগিন্নী বলেছে—হ্যাঁ গা মেয়ে, এ তোমার কী-রকম ধরনের কাজ বাছা?

চাটুজ্জেবাড়ির রান্নাঘরের ভেতরে বসে রাঁধতে রাঁধতে সন্দীপের মা ভয়ে কেঁপে উঠতো। বলতো—কী করেছি মা?

—কী করোনি তাই আগে আমায় জিজ্ঞেস করো—আঁশের হাতে তুমি দুধের কড়া কী বা ছুঁলে? তুমি আমার জাতধম্ম কিছু আর রাখবে না দেখছি—আমি তো তোমাকে নিয়ে মহা জ্বালা পড়লুম—

কখন মা আঁশের হাতে দুধের কড়া ছুঁয়েছে, আর কখনই বা আঁশের হাত করেছে, তা মা'র খেয়াল থাকতো না। কিন্তু তখন আর কী-ই বা করার ছিল!

গিন্নী বলতো—ঠিক আছে, ওই সব দুধ এখন নর্দমায় ঢেলে দাও মা। আমার জাতধর্ম্ম আগে বাঁচুক, তারপর কথা শুনবো—

সত্যি-সত্যিই শেষ পর্যন্ত সেই পাঁচ সের দুধ মা নর্দমায় ঢেলে ফেলে দিয়েছিল। মা'র তখন একটু মায়াও হচ্ছিল। তখনই সন্দীপের কথা মনে পড়তো মা'র। ছেলেকে মা এতটুকু দুধ কোনও দিন খেতে দিতে পারে না, সেই দুধ নর্দমায় ফেলে দিতে মা'র মনে কষ্ট হবে বইকি!

এই ধরনের ঘটনা যে মাত্র একদিন হতো তা নয়, প্রায় রোজই হতো, আর রোজই ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মা সব কষ্ট সব অপমান মুখ বুঁজে সহ্য করে যেত।

আবার ঠিক এর উল্টো ধরনের ঘটনাও ঘটতো মাঝে-মাঝে। চাটুজ্জেগিন্নীর মুখের যেমন ধার ছিল, তেমনি আবার দয়া-মায়াও বলে জিনিসটা বুকের মধ্যে থেকে মাঝে-মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়তো।

—আচ্ছা, তুমি এ কী রকম মেয়ে বাছা? কাল বাড়িতে অমন পায়েস রান্না হলো সে পায়েস বাড়ির কুকুর-বেড়ালও খেয়ে শেষ করতে পারলে না, ফেলে ছড়িয়ে একসা করলে আর তুমি নিজের পেটের ছেলের জন্যে একটু নিয়ে যেতে পারলে না? আমি তো এমন মা ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি বাছা। দশটা নয় পাঁচটা নয়, ওই একটি মাত্তোর ছেলে, তাকেই এত হ্যালা-ফ্যালা?

সত্যিই, মা যেন বোবা ছিল। নিন্দে-প্রশংসা-অভিযোগ, যা-ই হোক না কেন, কোনও কিছুতেই বিচলিত বা বিগলিত হতে যেন ভাগ্য-দেবতার নিষেধ ছিল। মা'র ভাগ্য-বিধাতা যেন মা'কে জীবনের শুরু থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল যে-মাথা নিচু করে সব-কিছু ন্যায়-অন্যায়-আনন্দ-বিষাদ গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টার নামই হলো জীবন। যদি জয় আসে তাতেও যেমন উল্লসিত হতে নেই, তেমনি যদি পরাজয়ও আসে তাতেও হতমান হতে নেই। দুঃখে, সুখে, আনন্দে, বিষাদে যে অবিচল থাকতে পারে তাকেই তো বলা হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞ। সন্দীপের মা'ও ছিল তেমনি একজন স্থিতধী মানুষ। আজ যে সন্দীপ জীবনের এই পর্যায়ে এখানে এসে পৌঁছিয়েছে, এ তো তার মা'র কাছ থেকেই সে শিখেছে।

সন্দীপ কিন্তু মনে মনে তখন বড় কষ্ট পেত।

বলতো—মা, তোমাকে ওরা অমন করে কথা শোনায়, আর তুমি তখন ওদের কথার কোনও জবাব দিতে পারো না? তোমার কি খুব ভয় করে নাকি?

মা বলতো—তা তুই কোত্থেকে তা শুনতে পেলি?

সন্দীপ বলতো—আমি তো তখন ওদের বাড়ির ভেতরে লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ছিলুম। ওদের বুড়ীটা তোমাকে কী বলছিল সেই সব কথা শুনতে পেয়েছি—

—শুনতে পেয়েছিস বেশ করেছিস।

সন্দীপ বলতো—তোমাকে কেউ কিছু বললে আমার যে খারাপ লাগে, তা তুমি বুঝতে পারো না?

মা বলতো—তুই অত রেগে যাস কেন? না রাগলেই পারিস?

সন্দীপ বলতো—তুমি কিছু বলো না বলেই তো ওরা অত কথা শোনায় তোমাকে। আমি হলে দেখিয়ে দিতুম—

মা তখন ছেলেকে সান্ত্বনা দিত। বলতো—তুই যখন লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে অনেক টাকা উপায় করে আমার হাতে দিবি, তখন ওদের সব কথার জবাব দেওয়া হয়ে যাবে। আমি তো রোজ ঠাকুরের কাছে তাই বলি রে। বলি—ঠাকুর, তুমি আমার মুখ রেখো ঠাকুর! সন্দীপের আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সে যেন বড় হয়ে আমার সব অপমানের, সব দুঃখের বোঝা দূর করে দেয়। সবাই যেন তাকে বলে যে-ওর মা পরের বাড়িতে রাঁধুনীগিরি করে ওকে মানুষ করেছে। শুধু মানুষই করেনি, এমন একজন মানুষ হয়েছে সে, যাতে বেড়াপোতার সমস্ত লোকের মুখ আলো করেছে—

এখন ভাবলে সন্দীপের হাসি পায়। মা তো কিছুই জানতো না। আর জানবেই বা কী করে? সারা জীবন মা সংসারের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, আর সন্দীপের বাবা মারা যাওয়ার পর পরের সংসারের কাজ করেই জীবন পাত করেছে। জানবার কোনও সুযোগই পায়নি মা। তাই মা জানতো না যে টাকা হলেই কেউ মানুষ হয় না। মা এটাও জানতো না যে টাকার সঙ্গে মনুষ্যত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ পৃথিবীতে কত বড়-বড় মহাপুরুষ ছিল যাদের কাছে একটা পয়সাও ছিল না। আর তা ছাড়া, একলা মা'কে দোষ দিয়েই বা কী লাভ? পৃথিবীর সব মানুষেরই তো সে একই ধারণা। আজ পর্যন্ত সন্দীপ যত লোকের সঙ্গে মিশেছে তাদের সকলেরই ধারণা যে টাকাটাই সব। তোমার টাকা থাকলেই আমি তোমাকে খাতির করবো। আমাকে সে-টাকা ধার দিতে হবে না, শুধু একটু খাতির করতে দাও তোমাকে। কারণ তোমার টাকা আছে। অথচ সন্দীপের মা?

মা সত্যিই জানতো না যে টাকা না-থাকার যন্ত্রণার চেয়ে টাকা থাকার যন্ত্রণা আরো বেশি অসহ্য। এই সামান্য সত্যটা জানতে জানতে সন্দীপকে বেড়াপোতা থেকে এই কলকাতায় এসে বিড্‌ন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাড়িতে উঠতে হয়েছিল। আর তার সমস্ত জীবনটাকে এই বাড়ির মানুষদের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে তার কী লাভ হয়েছিল?

তবে শুধু একটা সান্ত্বনা এই যে, লাভ-ক্ষতির হিসেব-কেতাব নিয়ে জীবন-দেবতার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। তার ইচ্ছে হিসেব-কেতাবের নিয়মের বাইরে বলেই তাকে আড়াল থেকে প্রণাম করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

তাই সন্দীপ সারা জীবন ধরে সেই অদৃশ্য জীবন-দেবতার সমস্ত নির্দেশই মুখ বুঁজে সহ্য করে এসেছে। আর সহ্য করেছে বলেই সে আজ এই অতীত-চারণ করতে পারছে। সত্যিই তো কী সে ছিল, আর এখন কী সে হয়েছে! আসলে জীবনে যে কিছু হতে হবে তার কোনও মানে নেই। সে যে মহামানবের মিছিলের একজন দরিদ্র শরিকও হতে পেরেছে, এইটেই কি কম কিছু?

বেড়াপোতায় দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বড় রাগ করতো, বলতো—এতক্ষণ কোথায় ছিলিস রে তুই! আমি তখন থেকে ভাত কোলে করে বসে আছি—তোর কি এতটুকু জ্ঞান নেই? কোথায় গিয়েছিলিস?

আসলে সে তখন চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বই পড়তে ব্যস্ত থাকতো।

চাটুজ্জেবাবুদের বাড়িতে যে অত বই আছে তা সে কী করে জানবে? অনেক দিন মা'কে খোঁজবার জন্যে সে ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো। মা বাড়ির একেবারে অন্দরমহলের শেষ প্রান্তে রান্নাঘরে থাকতো। সেখানে রোদ-আলো-হাওয়া কিছুই পৌঁছুত না। সদর দরজা দিয়ে অন্দর-মহলের রান্নাঘরের দিকে যেতে গেলে বারবাড়ির বৈঠকখানা, লাইব্রেরী, তোষাখানা পেরিয়ে অনেক মানুষের নজর কাটিয়ে তবে যেতে হতো।

একদিন সে ওই রকম সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ পাশের ঘরে দেখলে দেয়াল ভর্তি আলমারিতে থাক-থাক বই সাজানো রয়েছে। চামড়ায় বাঁধানো তার ওপর সোনার জলে নাম লেখা সব বই।

সন্দীপ আর লোভ সামলাতে পারলে না। সে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। একখানা বই নিয়ে সে দেখলে বইটার ওপরে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে—শ্রীভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বেড়াপোতা। বইটার নাম "সাধক কবি রামপ্রসাদ। লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।"

কে এই রামপ্রসাদ? আর কে-ই বা এই ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?

বই-এর পাতাগুলো খুলতেই দেখলে ভেতরে অনেক পদ্য লেখা রয়েছে। খানিকটা পড়েই মনটা আটকে গেল সেই লেখার মধ্যে। মনে হলো এ যে মা'রই কথাগুলো সাধক কবি লিখেছেন—

"ভাল নাই মোর কোন কালে,
ভালই যদি থাকবে আমার
মন কেন কুপথে চলে?"

তারপর আর এক জায়গায় লেখা ঃ

"মন কেন রে ভাবিস এত?
যেন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত
ওরে কালেরও কাল যে মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।"

কথাগুলো যেন সন্দীপের মনে গেঁথে গেল। কতকাল আগে কোন্ এক সাধক কবি রামপ্রসাদ তার মনের কথা কী করে জানতে পারলে? সন্দীপ নিজেও তো তখন ভাবছিল যে সে গরীবের ঘরে জন্ম নিয়েছে, ভবিষ্যতে তার কী হবে? চাটুজ্জেবাবুদের বাড়িতে জন্মালে অন্য কথা। কিন্তু সে তো গরীবের ঘরে জন্মেছে। অন্য ছেলেদের সকলের বাবা-কাকা-মামা কত কী আছে। কিন্তু তার যে কেউ নেই, একা মা ছাড়া। আর মা'ও তো পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে পেট চালায়।

এমন ছেলের ভবিষ্যৎ কী? বইটা পড়ে তার মনে যেন একটু শান্তি এল। তারও যেন বলতে ইচ্ছে হলো 'মন কেন রে ভাবিস এত? যেন মাতৃহীন বালকের মত—ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত। ওরে কালেরও কাল যে মহাকাল, সে-কাল মায়ের পদানত।'

পড়তে পড়তে সন্দীপ সেদিন যেন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। সময়েরও খেয়াল ছিল না তার। সময় কি কখনও স্থির থাকে? এই সূর্য-চন্দ্র-তারা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকে? এমন কি কখনও হয় যে রাত্রির পর ভোর হলো না, দিন হলো অথচ সূর্য উঠলো না? তা যদি কখনও হওয়া সম্ভব তো সন্দীপের জীবনে সেইদিনই তা হয়েছিল। সেই-ই প্রথম। কখন যে সন্ধে হয়েছে, রাত হয়েছে, আলো জ্বলেছে, কিছুরই খেয়াল ছিল না।

—কে? এখানে কে?

স্বপ্নের জগৎ থেকে কে যেন তাকে ছিটকে পৃথিবীর মাটিতে ফেলে দিলে। তখন যেন তার হুঁশ হলো যে সে চাটুজ্জেদের বাড়িতে লাইব্রেরীঘরে বসে আছে।

সন্দীপ চোখ তুলে দেখলে কাশীবাবু। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—ওরে দাসু, এ-ঘরে কে বসে আছে? তোরা কোনও দিকে দেখিস না, যে-সে এসে ঘরে ঢুকে বসে থাকে, তোরা দেখতে পাস না? ও—দাসু কোথায় গেলি সব?

কাশীবাবুর চাকর কোথা থেকে মনিবের ডাক পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসেছে। তারপর সন্দীপকে দেখে বললে—আজ্ঞে ছোটবাবু, এ আমাদের বামুনদিদির ছেলে সন্দীপ—

সন্দীপ তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠলো।

—তুমি আমাদের বামুনদিদির ছেলে?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

দাসু বললে—ও ওর মা'কে খুঁজতে এসেছে—

—তোমার মা'কে খুঁজতে এসেছ তুমি?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কী নাম তোমার?

সন্দীপ বললে—সন্দীপকুমার লাহিড়ী—

—তোমার বাবার নাম?

—বাবার নাম ঈশ্বর হরিপদ লাহিড়ী—

—তোমরা ক'ভাই বোন?

সন্দীপ বললে—আমার ভাই বোন কেউ নেই—

—তুমি ইস্কুলে পড়োটড়ো?

—হ্যাঁ—

— কোন ক্লাশে?

—ক্লাশ নাইনে পড়ি—

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাশীবাবু আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

শেষকালে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী বই পড়ছিলে?

সন্দীপ হাতের বইটা কাশীবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে। কাশীবাবু দেখলেন। বললেন—তুমি এ-বই পড়ে বুঝতে পারছিলে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

কাশীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আরো বই পড়তে চাও?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাশীবাবু বললেন—ঠিক আছে, তুমি এবার যখন পড়তে চাইবে, ...তখন তুমি এই দাসুকে বলবে, বললেই দাসু তোমায় দরজা খুলে দেবে, তারপর যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি পোড়। কেউ তোমায় কিছু বলবে না, যাও, এবার তুমি তোমার মা'র কাছে যাও—তোমার মা রান্নাঘরে আছেন—

দাসু বললে—না ছোটবাবু, বামুনদিদি বাড়ি চলে গেছে—

মা বাড়ি চলে গেছে! খবরটা শুনে সন্দীপ যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরলো না। সে দৌড়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু কাশীবাবুর কথায় আবার সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—আরে শোনো, আর একটা কথা—

সন্দীপ বললে—কী?

কাশীবাবু আবার ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

সন্দীপ প্রশ্নটা শুনে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। সত্যিই তো বড় হয়ে সে কী হবে, তা-তো সে কোনও দিনই ভাবেনি। কিছু হওয়ার জন্যে সে তো মনে মনে তৈরীও হয়নি। কথাটা তখন তার মাথার মধ্যে ঝড় তুলেছে। সে এক বিচিত্র ঝড়। সাধক কবি রামপ্রসাদের মাথাতেও তেমনি ঝড় উঠেছিল কতবার। রামপ্রসাদের মাথাতেও অনেক প্রশ্নের ঝড় উঠতো। ঝড় এলেই রামপ্রসাদ খাতার পাতাতে লিখে ফেলতো ঃ

মা গো আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে
যেতে নারলাম বারাণসী
নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে
মোর ভাগ্যেতে একাদশী—

কাশীবাবু যখন দেখলেন ছোট ছেলেটা তার কথাটার কোনও জবাব দিতে পারছে না, তখন তাকে বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। শুধু বললেন—এখন থেকে ঠিক করে নাও বড় হয়ে কী হবে। একবার সেইটে ঠিক করে নিয়ে তখন থেকে সেই-সব বই পড়া শুরু করবে, বুঝলে?

কা'কে বড় হওয়া বলে আর কাকেইবা ছোট হওয়া বলে, তখন তাই-ই জানতো না সন্দীপ। তাই সেদিন কাশীবাবুর মাথার কোনও উত্তরই দিতে পারেনি সে। শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে ছিল কাশীবাবুর মুখের দিকে।

ছেলেটার হতবুদ্ধি চেহারা দেখে কাশীবাবুর বোধহয় একটু মায়া হয়েছিল, তাই বললেন—যাক গে, ও-সব নিয়ে তুমি এখন মাথা ঘামিও না। এখন শুধু তুমি পড়ে যাও, কেবল বই পড়ে যাও—

কথাগুলো বলে কাশীবাবু হঠাৎ চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্দীপের কথায় আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এই ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে? যাঁর নাম লেখা রয়েছে এই বই-এর মলাটে?

—ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

কাশীবাবু বললেন—ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন আমার ঠাকুর্দার বাবা। তিনিই এই-সব বই পড়তেন, তিনিই এই-সব বই কিনেছিলেন। এই এখন আমাদের যে বাড়ি দেখছো, এ সমস্তই তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর আগে এ-সব কিছুই ছিল না। তিনি ছোটবেলায় খুব গরীব ছিলেন। তোমরা এখন যেমন গরীব, আমার ঠাকুর্দার বাবাও ঠিক তেমনি গরীব ছিলেন।

—তারপর? তারপর কী করে বড়লোক হলেন?

কাশীবাবু বললেন—মনের জোরে—

—মনের জোরে মানে?

কাশীবাবু বললেন—আসলে সবই হচ্ছে-মন। মনের জোরে মানুষ সব-কিছু হতে পারে, তুমি যদি মনে করো তুমি খুব বড় উকিল হবে, তাহলে মনের জোরে খুব বড় উকিল হতে পারবে। কিম্বা তুমি যদি মনে করো তুমি খুব বড় ডাক্তার হবে, তাহলে তুমিও মনের জোরে খুব বড় ডাক্তার হতে পারবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তা ভৈরব চট্টোপাধ্যায়মশাই কী করে বড় হয়েছিলেন? তিনি তো খুব গরীব ছিলেন বললেন—

কাশীবাবুর বোধহয় তখন বেশি সময় ছিল না হাতে। বললেন—সে অনেক লম্বা গল্প, সে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তুমি অন্য একদিন এসো আমার কাছে, আমি বলবো'খন তোমাকে সব—

বলে আর তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

সন্দীপ তারপর সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। দাসু এসে লাইব্রেরীর-ঘরের দরজা যখন তালা-চাবি লাগিয়ে দিলে তখন যেন তার চৈতন্য হলো। তখনও তার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাধক-কবি রামপ্রসাদের সেই কথাগুলো ঃ

মা গো, আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে
যেতে নারলাম বারাণসী
নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে
মোর ভাগ্যেতে একাদশী—

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো সন্দীপ, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

সন্দীপ বললে—না, আমি ঘুমোই নি কাকা, আমি ভাবছি—

—কী ভাবছো?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতার কথা মনে পড়ছে—

মল্লিকমশাই বললেন—মা'র জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? অত ভেবো না। ভেবে তো কিছু করতে পারবে না তুমি, সারা দিন ধকল গেছে তোমার, এখন ঘুমিয়ে পড়ো—

সন্দীপ বললে—তারপর? তারপর কী হলো কাকা?

—কীসের তারপর?

—ওই যে বললেন মনসাতলা লেন থেকে আপনি বিশাখা আর তার মা'কে এই বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। সেই রাজুবালা দেবী মেয়েকে নিয়ে এসেছিল শেষ পর্যন্ত?

মল্লিকমশাই বললেন—বিশাখার মা'র নাম তো রাজুবালা দেবী নয়। তাঁর ঠাক্‌মা ওই নাম রেখেছিলেন, কিন্তু বাবা নাম রেখেছিলেন যোগমায়া।

—আপনার খেরো খাতায় তো রাজুবালাই লেখা আছে!

মল্লিকমশাই বলেছিলেন—আমার খেরোখাতায় ওই রাজুবালা নামটাই আছে। খেরো খাতাটা খুললে দেখতে পাবে সেখানে 'রাজুবালা' নামটাই লেখা আছে, ও-নামটা আর বদলানো হয়নি—

না, সন্দীপও যখন খেরো-খাতায় হিসেব লেখার কাজ করতো তখন ওই রাজুবালার নামেই বরাবর মাসিক এক শত টাকা খরচ লিখে এসেছে। শেষকালে সেই একশো টাকার অঙ্কটা বাড়তে-বাড়তে পাঁচশো-ছ'শো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। আর শুধু পাঁচশো-ছ'শো টাকাই নয়। কোনও কোনও মাসে একহাজার, দু'হাজার টাকাতে গিয়েও দাঁড়াতো। তখনকার কথাই আলাদা। তখন ওই যোগমায়া দেবীরই বা কত সুখ। তাঁর আর তাঁর মেয়ের গায়ে মাখার জন্যে দামী-দামী সাবান, মেয়ের চুলে মাখার জন্যে জবাকুসুম তেল, খাওয়ার জন্যে দেরাদুনের সরু চাল। আর কত কী দামী দামী খাবার! সে-সব খাবার তখন জীবনেও খায়নি সন্দীপ। কিন্তু ঠাক্‌মা-মণির হুকুমে সব কিনে দিতে হতো সন্দীপকে।

ঠাক্‌মা-মণি বলতেন—দেখো, ওদের যেন কোনও কষ্ট না হয়, ওদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

ঠাক্‌মা-মণি আরো বলতেন—দেখ, টাকার জন্যে ভেবো না, যত টাকা লাগে সব আমি দেব—

মনে আছে একদিন মাসিমা বলেছিল—দেখ বাবা, এত আরামে আমাদের রেখেছেন তোমার ঠাক্‌মা-মণি, কিন্তু আমার জামাইকে তো একবার দেখতে পেলাম না—একদিন আমার জামাই বাবাজীকে এখানে নিয়ে আসতে পারো না?

তা সন্দীপ শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই ছোটবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল মাসিমার কাছে। সে এক বিচিত্র ঘটনা।

কিন্তু থাক এখন সে-সব কথা, কারণ সে এর অনেক পরের কথা। মল্লিকমশাই যেদিন রাজুবালা দেবী আর বিশাখাকে নিয়ে বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে এলেন তখন বেলা এগারোটা। গাড়িটা গেট দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই মল্লিকমশাই নামলেন। তারপরে পেছনের দরজা খুলে ধরে বললেন—আসুন মা, আপনারা নেমে আসুন—

বিশাখা যেন স্বপ্ন দেখছিল। সামনের দিকে আকাশে চোখ উঁচু করলে দেখা যায়—এ কতকালের বাড়ি। এত বড় বাড়ি তো সে খিদিরপুরে দেখেনি। আশেপাশে কতকগুলো লোক ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ সানাই বেজে উঠলো মাথার ওপর।

বিশাখা মা'কে জিজ্ঞেস করলেন—মা, এখানে সানাই বাজছে কেন? কারো বিয়ে হচ্ছে নাকি?

মা বললে—তুই চুপ কর—কথা বলিস নি—

মা বিশাখাকে একটা ফর্সা ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে।

মল্লিকমশাই বললে—এদিকে এসো মা, এদিকে—

কোথা দিয়ে কোথায় মল্লিকমশাই তাদের নিয়ে গেলেন যোগমায়া তা বুঝতে পারলে না। একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা, তারপর দোতলা থেকে আর একটা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তেতলায়। তেতলায় কত লোক-জন, কত মেয়েমানুষ।

একটা জায়গায় এসে মল্লিকমশাই বললেন—ঠাক্‌মা-মণি, ওঁদের এনেছি—

ভেতর থেকে শব্দ এল—ওঁদের ভেতরে নিয়ে আসুন—

ভেতরেই গেল যোগমায়া। পেছন পেছন বিশাখা। বিশাখা যা-কিছু দেখে তাতেই আশ্চর্য হয়ে যায়। ঘরের ভেতরে সবাই একজনের দিকে চেয়ে বসে আছে। একজন গেরুয়া-পরা লোক, তার মাথা ন্যাড়া। মেঝেতে গালচে পাতা। চারদিকে ধূপের গন্ধ।

একজন বুড়ি মতন যোগমায়াকে কাছে ডাকলে—মা, তুমিই কি বিশাখার মা?

মা বুড়িটার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বুড়িটা বললে—আগে গুরুদেবকে প্রণাম করো মা, তাহলেই আমাকে প্রণাম করা হয়ে যাবে—

যোগমায়া তাই-ই করল। এ-বাড়ির গুরুদেব তাকে কী বলে যেন আশীর্বাদ করলেন। বিশাখা মা'র দিকে চেয়ে দেখলেন মা তখন কাঁদছে।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তুমি কাঁদছো কেন মা? কেঁদো না।

মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো। বিশাখা সেদিন বুঝতেই পারেনি কেন তার মা অত কেঁদেছিল।

সেই ঠাক্‌মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার নাম কি রাজুবালা?

মা বললে—রাজুবালা আমার ঠাকুরমার দেওয়া নাম। আমার বাবা আমার নাম রেখেছিল যোগমায়া—

—আর তোমার মেয়ের নাম?

—ওর বাবা নাম রেখেছিল অলকা। কিন্তু আমার দেওর ওর নাম রেখেছেন বিশাখা। কারণ ও যেদিন জন্মেছিল সেই দিন বোশেখ মাসের পূর্ণিমার শেষ—

ঠাক্‌মা-মণি গুরুদেবকে সব বুঝিয়ে বললেন। গুরুদেব তখন বিশাখার জন্ম-কুণ্ডলীটা মন দিয়ে দেখছিল আর মাঝে-মাঝে বিশাখাকে দেখছেন। সে বড় জটিল গণনা। ওই জন্মকুণ্ডলীর ভালো-মন্দের ওপর বিড়ন স্ট্রীটের মুখার্জির বংশের সমস্ত ভালো-মন্দ নির্ভর করছে। আগে কখনও দেবীপদ মুখার্জি দুই ছেলেদের বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীদের জন্মকুণ্ডলী বিচার করে

দেখবার কথা একবারও ভাবেন নি। তার যা কুফল হয়েছে তা তিনি না দেখে গেলেও এখন তাঁর বিধবা পত্নী কনকলতা দেবী দেখছেন। বড় শক্তিপদ আর তার বউ ওই একটা নাবালক ছেলে রেখে মারা গিয়েছে। দ্বিতীয় ছেলে আর তার স্ত্রী মারা যায় নি বটে, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আলাদা হয়ে গেছে। তারা এ-বাড়ি ছেড়ে নিজেদের আলাদা বাড়ি করে সেখানেই বসবাস করছে। বাকি রইল একমাত্র ওই বাপ-মা-মরা একমাত্র নাবালক নাতি সৌম্য। সৌম্যের ভবিষ্যত নিয়েই কনকলতা দেবীর যত মাথাব্যথা। সৌম্য বাঁচবে কিনা, সৌম্যর বউ কেমন হবে, তাই-ই তাঁর একমাত্র চিন্তা। এখন কন্যা তো পছন্দ হয়েছে, জাত-কুলও মিলে গেছে। কিন্তু জন্মকুণ্ডলী বা যোটক-বিচার?

গুরুদেব বললেন—এই কন্যা কোথায় থাকেন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—খিদিরপুরে, মনসাতলা লেনে। নিজের কাকার কাছে।

—পিতা?

—পিতা বেঁচে নেই—

—কাকার অবস্থা কেমন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কাকা খুবই গরীব। বিধবা মা এই কন্যাকে নিয়ে দেওরের কাছে গলগ্রহ হয়ে আছে—

গুরুদেব আবার বললেন—কিন্তু কন্যার একাদশে চতুর্থ পতি এবং সপ্তম পতি বৃহস্পতি তুঙ্গী। সুতরাং অর্থ ও বন্ধুভাগ্য ভালো। সেই বৃহস্পতি লগ্নের তৃতীয় স্থান বৃশ্চিকে বন্ধুক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়ে আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে শুভ সম্পর্ক স্থাপন করবে আর মকরে সপ্তম দৃষ্টি দিয়ে সন্তান-সন্ততির শুভ সূচনা করছে আর মীনে নিজের গৃহে নবম দৃষ্টি দিয়ে স্বামীরও শুভ করবে—

বলে আবার একটু থামলেন। তারপর কী ভেবে আবার বললেন—সপ্তম পতি সপ্তমকে দেখছে, এটা খুবই শুভ যোগ—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আপনি যে বললেন আমার নাতির মধ্য-বয়সে একটা ফাঁড়া আছে?

গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন—এখন তোমার নাতির বয়েস কত মা?

—সৌম্যের বয়েস? সে তো এখন সবে মাত্র ষোল বছরে পড়লো। এখনও ইস্কুলে পড়ে—

গুরুদেব বললেন—তাহলে তো এখন অনেক দেরী। সে তখন দেখা যাবে। আর এখন থেকে অত পরের কথা ভেবে কী হবে! তবে একটা কথা বলতে চাই—

—কী কথা বলুন ঠাকুরমশাই?

কিন্তু তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে মল্লিকমশাই-এর দিকে চেয়ে বললেন—সরকারমশাই, আপনি এঁদের দুজনকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন গে—

খাওয়ার কথা কানে যেতেই যোগমায়া কেমন একটু বিচলিত হয়ে পড়লো। কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠাক্‌মা-মণি তার আগেই বলে উঠলেন—মা তোমরা আমার আত্মীয়ের মতন, কিছু আপত্তি করো না, আমার যা-কিছু আয়োজন হয়েছে সমস্তই এই আমার গুরুদেবের প্রসাদ। প্রসাদ খেতে আপত্তি করা উচিত নয় মা। আর তা ছাড়া আর কিছুদিন পরেই তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের নিকট আত্মীয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে—

এর পর আপত্তির আর কোনও কথাই উঠতে পারে না।

মল্লিকমশাই তখন দু'জনকে নিয়ে আবার দোতলায় নেমে এলেন। দোতলার অংশটা পুরোপুরি খালি পড়েই আছে। আগে তেতলায় ছিল বড় ছেলের ঘর। তারা মারা যাবার পর এখন সৌম্য সেই তেতলার ঘরে থাকে।

আর দোতলায় থাকতো মেজ ছেলে। তারা নিজেদের বাড়িতে চলে যাবার পর থেকে কেউ আর সেখানে থাকে না। তবু ঘর-দোর আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখার জন্যে আছে কালিদাসী। কালিদাসীই দোতলাটার জিম্মেদারি পেয়েছে। গুরুদেব বাড়িতে আসার পর অন্যতলার মত এই দোতলাটাও চুনকাম করা হয়েছে। দোতলার জানলা দরজায়ও নতুন করে রং লাগানো হয়েছে অন্য সব তলার মত।

ঘরে ঢুকেই যোগমায়া দেখলে সেখানে শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর রূপোর থালা, বাটি, গেলাস সাজানো। কালিদাসী সমস্ত কিছু নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। যোগমায়া আর বিশাখাকে বললে—আসুন মা, হাত ধুয়ে নিন এখানে—

ঘরের লাগোয়া জলের ব্যবস্থা। সঙ্গে সাবান আর তোয়ালে।

যোগমাযা আব বিশাখা এ-সব যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। বিশাখার বাবার কথা মনে পড়তেই যোগমায়ার চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠলো। মানুষটা যদি এই সময়ে বেঁচে থাকতো তো শেষ জীবনে একটা সান্ত্বনা পেয়ে যেত।

এত রকমের খাবার বিশাখা জীবনে দেখেনি। মা'র পাশে বসে বিশাখা তখনও থালার দিকে দেখছে। মা'ও চুপ করে খাবারের সামনে বসে আছে।

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ বউমা, এ সবই তোমার। লজ্জা করো না, পেট পুরে সব খেয়ে নেবে। দরকার হলে আরও দেওয়া হবে—বুঝলে? শিগগির শিগগির খাও লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

বিশাখার মাথাব ওপব পাখা ঘুরছিল। একটুকু গরম হচ্ছে না। তাদের মনসাতলা লেনের বাড়িতে আলো আছে, কিন্তু পাখা নেই। একটা পাখা আছে, তাও সেটা কাকার ঘরে। বিশাখা মা'ব দিকে চেয়ে বললে—পাখাব তলায় বসে খেতে খুব আরাম লাগে, তাই না মা?

যোগমায়া খেতে খেতে বললে—খাবার সময় অত কথা বলতে নেই, চুপ করে খাও—

বিশাখার বড় ভালো লাগছিল লুচি খেতে। কত দিন যে লুচি খায়নি!

হঠাৎ বলে উঠলো—মা এই দেখ ডালের মধ্যে কিশমিশ রয়েছে—

যোগমায়া বললে—তা থাক, ও-রকম আদেখ্‌লের মত কথা বোল না—

মল্লিকমশাই-এর কানে কথাগুলো গেল। বললেন—আর একটু ডাল নেবে বউমা?

বিশাখা বললে—ডাল নেব না, শুধু কিশমিশ নেব—

যোগমায়া বললে—ছিঃ, তুমি আবার চেয়ে চেয়ে খাচ্ছো? লজ্জা করে না চেয়ে খেতে? আমি তোমাকে বলিনি যে চেয়ে খেতে নেই?

মল্লিকমশাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে ডালের কিশমিশ এনে দিতে বলেছেন। ঠাকুর তখুনি একটা হাতায় করে একগাদা কিশমিশ বিশাখার থালায় এনে দিল।

বিশাখা খেতে লাগলো। এমন ভাবে খেতে লাগলো যেন কতকাল খায়নি সে।

পাশ থেকে মা কানের কাছে চুপি চুপি সাবধান করে দিলে। বললে—ও কি অসভ্যের মতো খাচ্ছো? আস্তে আস্তে খেতে পারো না?

আস্তে আস্তে কথাগুলো বললেও কথাটা মল্লিকমশাই-এর কানে গেল। বললেন—ওকে অত বকছো কেন মা? বউমা এখনও ছেলেমানুষ তো, ও যেমন করে পারুক খাক। এখানে তো বাইরের কোন লোক নেই—আমরা তো সবাই বাড়িরই লোক। আর দু'দিন পরে তো ও আমাদের একেবারে ঘরের বউই হয়ে যাবে—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর দু'টো লুচি দেবে মা?

তার উত্তরে বিশাখা বললে—মাছ নেই?

যোগমায়ার বড় লজ্জা করতে লাগলো। এমন মেয়েকে নিয়ে কোনও বাড়িতে খেতে যাওয়াও তো বিপদ দেখছি।

কিন্তু যোগমায়া কিছু বলবার আগেই মল্লিকমশাই বললেন—না মা, এ তো গুরুদেবের প্রসাদ। তিনি খেয়ে প্রসাদ করে দিয়েছেন, আজকে এ-বাড়িতে সবাই-ই এই প্রসাদই খাবে। আজ ক'দিন ধরে আমরা সবাই নিরিমিষ খাবো—

তারপর একটু পরে আবার বললেন—এবার তাহলে দইটা আনতে বলি—

বিশাখা বললে—দই? দই আছে? মিষ্টি দই?

মল্লিক-মশাই হাসলেন। বললেন—হ্যাঁ, মিষ্টি দই—

বিশাখা বললে—আমি মিষ্টি দই খেতে বড্ড ভালোবাসি—

মল্লিক-মশাই বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তোমাকে দু'বাটি মিষ্টি দই দেব—যত মিষ্টি দই খেতে পারবে তুমি, তত মিষ্টি দই দেব—

দু'বাটি ভর্তি কবে মিষ্টি দই এনে দিলেন ঠাকুর।

বিশাখা বাটিতে হাত ডুবিয়ে দই খেতে লাগলো।

তারপরে এল সন্দেশ। সন্দেশের চেহারা দেখে বিশাখা অবাক হয়ে গেল। বললে—কত বড সন্দেশ দেখ মা, আমাদের খিদিরপুরের সন্দেশ কত ছোট বলো তো?

যোগমায়া মেয়ের কাণ্ড দেখে লজ্জায় আধমবা হয়ে যাচ্ছিল।

বিশাখা বললে—দই দিয়ে সন্দেশ খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি—

মল্লিক-মশাই এবার আর অনুমতি না নিয়েই দু'টো সন্দেশ ফেলে দিলেন। বললেন—খাও, যত সন্দেশ তুমি খেতে পারবে খাও—

বিশাখা বললে—তা হলে কিন্তু আরো দই দিতে হবে—

—তা দেব—

বলে মল্লিক-মশাই ঠাকুরকে আরো এক বাটি দই দিতে বললেন।

বিশাখা মা'র দিকে চেয়ে বললে—তুমি আর একটু দই নাওনা মা—

—তুই থাম্, বক্‌বক্ করিসনি তো... তোর জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলুম—

এর পব একে একে এল রাজভোগ, পানতুয়া, মিহিদানা। আর শেষে রাবড়ি—

যোগমায়া বলে উঠলো—এত দিচ্ছেন কেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—খাও না মা। এতে কিছু খারাপ হবে না, এ ঠাক্‌মা-মণির গুরুদেবের প্রসাদ'।

বিশাখা বলল—মা না খাক, আমাকে দিন—

যোগমায়া আর থাকতে পারলে না। বলে উঠলো—এ তোব কী কাণ্ড বল দিকিনি, তোর কি লজ্জা-সরমেরও বালাই নেইরে? তুই কি আমাকে বে-ইজ্জৎ না করে ছাড়বি না? তোর পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে?

মা'র বকুনি খেয়ে বিশাখার যেন হুঁশ হলো। মুখ কাঁচুমাচু করে মল্লিক-মশাই-এর দিকে চাইলে।

মল্লিক-মশাই বললেন—আর কিছু নেবে তুমি বউমা? লজ্জা কবো না। যা খেতে ইচ্ছে কবছে মুখ ফুটে বলো—আমি সব দেব—

—আমাকে আর একটু মিষ্টি দই—

কিন্তু কথা আর শেষ হওয়ার আগেই যোগমায়া বাঁ হাত দিয়ে মেয়ের মাথার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মল্লিক-মশাই যোগমায়ার হাতটা ঠিক সময়েই ধরে ফেলেছেন।

বললেন—ছিঃ মা, ওকে এত মারছো কেন মিছিমিছি? বউমার বয়েস যখন তোমার মত হবে, তখন দেখবে তোমার মত মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরোবে না—এতটুকু মেয়ে ও সংসারের আর কতটুকু বোঝে?

যোগমায়া বললে—না, আপনি জানেন না, তাই বলছেন। দেওরের বাড়িতে কোনও রকমে মুখ বুঁজে বেঁচে আছি। বাড়িতে যে-গঞ্জনা আমাকে সইতে হয় তা শুধু আমিই জানি, আর ভগবান জানেন। কিন্তু তার ওপর বাড়ির বাইরে এসেও যদি ওর জন্যে আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়, তাহলে আমি কী করে বাঁচি বলুন?

তখন বিশাখা আপন মনে কাঁদছে। সে বুঝতেও পারেনি যে কী জন্যে তার ওই শাস্তি। কী এমন অপরাধ সে করেছে যাব জন্যে মা তাকে শাস্তিটা দিলে।
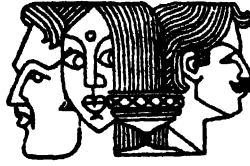
ওদিকে তেতলার ঘরে গুরুদেব তখনও পাত্রীর জন্ম-কুণ্ডলী বিচার করে চলেছেন। গুরুদেব ভাবী পাত্রীর জন্ম-কুণ্ডলী দেখতে দেখতে বললেন—কন্যা পিতৃহন্ত্রী—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ভালো করে কোষ্ঠীটা দেখুন বাবা। আমি এই কন্যার [illegible] আমার নাতি সৌম্যের বিয়ে দিতে চাই—

গুরুদেব বললেন—তাহলে শ্রীমানের জন্ম-পত্রিকাটাও বিচার করি। অর্থাৎ যোটক বিচার [illegible]

ঠাক্‌মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—যোটক-বিচারে কী দেখলেন ঠাকুরমশাই?

গুরুদেব প্রথমে লগ্নপতির অবস্থান দেখলেন, তারপর দেখলেন অষ্টমপতির অবস্থান এবং অষ্টম ভাব। খুব কঠিন বিচার। তারপর সপ্তমভাব এবং সপ্তমপতি। জাতক-জাতিকার পঞ্চম ভাবও দেখা দরকার। কারণ দম্পতির সন্তান-সন্ততি দেখলেই চলবে না, মাতা-গৃহ-বন্ধু-সুখ বিচার করতে গেলে জাতক-জাতিকার চতুর্থ-স্থানের বলাবলও দেখতে হয়। তারপর দ্বিতীয়পতি একদিকে যেমন ধনপতি, তেমনি আবার নিধনপতিও বটে।

বললেন—একদিনে শেষ বিচার হবে না মা, আরো দু'তিন দিন লাগবে। বড় জটিল কোষ্ঠী—

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কার কোষ্ঠী জটিল ঠাকুরমশাই? পাত্রের না পাত্রীর?

গুরুদেব বললেন—বিংশোত্তরী মতে জাতক-জাতিকা দু'জনের কুণ্ডলীরই রাজ-যোটক ফলাদেশ রয়েছে। কিন্তু অষ্টোত্তরী মতেও তো বিচার করতে হবে! অষ্টোত্তরী মতে জাতকের মধ্য বয়সে রিষ্টির লক্ষণ আছে—

—তার মানে? প্রাণসংশয় আছে নাকি আমার নাতির?

গুরুদেব বললেন—আজ থাক, পরে বিশ্রাম নিয়ে সবিস্তারে ভেবে বলতে হবে। আর দু'তিন দিন সময় লাগবে—

—তা সময় লাগুক, কিন্তু দেখবেন যদি কোনও বাধক কোথাও থাকে তো তার প্রতিকারও আপনাকে করতে হবে—

শেষকালে সেই কুণ্ডলী দু'টোর বিচার শেষ করলেন গুরুদেব। তিনি যথারীতি মোটা রকমের প্রণামী এবং দক্ষিণা নিলেন। তারপর মল্লিকমশাই আবার গুরুদেবকে নিয়ে বারাণসী পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

যাবার সময় গুরুদেব বললেন—কিছু ভাবিস নি মা, আমি আশ্রমে গিয়ে তোর নাতির কল্যাণের জন্যে হোম-যজ্ঞ করবো—সব ঠিক হয়ে যাবে।
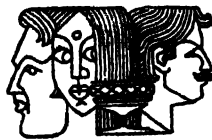
সন্দীপ তখনও একমনে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

বিড্‌ন স্ট্রীটের মুখার্জিবাড়ির বাবুরা বলতে গেলে একেবারে প্রথম যুগের লোক। এই মুখার্জি-বাড়ি ধনে-জনে পরিপূর্ণ হওয়ার কিছু কাল পর থেকেই মল্লিকমশাই এ-বাড়িতে আছেন। দেবীপদ

মুখার্জির পত্তনটা দেখেন নি। যখন এ-বাড়ির প্রতিষ্ঠা হলো, তখনকার কালও দেখেন নি। যখন এ-বাড়িতে সিংহবাহিনীর মূর্তি স্থাপিত হলো তখনও তিনি এ-বাড়িতে আসেন নি। বেড়াপোতায় যে-বছর খুব বন্যা হলো, ক্ষেত-খামার বাড়ি-বসতি-ইস্কুল-কলেজ সব জলে ডুবে গেল, তখন যে যেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে লাগলো। চাটুজ্জেবাড়ির লোকেরা পয়সাওয়ালা লোক। বেড়াপোতার বাইরেও তাদের বাড়ি-ঘর আছে। তারা সেখানে গিয়ে জীবন-সম্পত্তি বাঁচালো। কিন্তু যাদের কোথাও মরবার জায়গাও নেই, তারা কোথায় যাবে? তাদের মধ্যে কেউ গেল আসামে চা-বাগানে কুলির কাজ করতে, কেউ গেল ঝরিয়ায় কয়লার খনিতে কাজ করতে, আবার কেউ-কেউ বা কলকাতার পথে-পথে ভিক্ষে করতে গেল। আর সে এমন এক সময় যখন কে যে কোথায় গেল তার হিসেবও কেউ রাখতে পারলে না। সেই সঙ্গে কত লোক যে মারা গেল তার সহজ হিসেব রাখার লোকও কোথাও পাওয়া গেল না। সেই সময়ে মল্লিকমশাই কেমন করে এসে ঢুকে পড়লেন এই বাড়িতে। প্রথমে অল্প মাইনে। কিন্তু তাতে আপত্তি কল্লেন নি।

দেবীপদ মুখার্জি বললেন—কত টাকা মাইনে হলে আপনার চলে?

সেদিন মল্লিকমশাই মুখার্জি সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। মাইনের কথা তখন তাঁর মনেও আসেনি। তখন মাথার ওপর একটা ছাদ, আর দু'বেলা দুটি খাওয়া। এইটুকু পেলেই তিনি তখন খুশী, এমনই তখন তাঁর অবস্থা।

তিনি বলেছিলেন—একটু থাকার আর খাওয়ার বন্দোবস্ত হলেই আমি খুশী হবো, আর কিছু আমি চাই না—'

তখন দেবীপদ মুখার্জির সৌভাগ্যসূর্য জীবনের মধ্য গগনে। ব্যবসা, সুনাম, অর্থ-সামর্থ্য, স্বাস্থ্য, সব দিক দিয়েই তিনি কলকাতার বাঙালী সমাজে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর কাছে সবাই একটু কৃপা-দৃষ্টি পেলেই ধন্য হয়ে যেত। সেই তাঁর মত লোকের কাছে আশ্রয় পাওয়া নেহাৎই দৈব ছাড়া আর কী বলা যায়?

সুতরাং এই বাড়িতেই তিনি রয়ে গেলেন। প্রথমে গৃহিণীর ফাই-ফরমাজ খাটা আর দরকার হলে মাঝে-মাঝে বাজারে যাওয়া, রান্নাবাড়ির দৈনন্দিন কেনা-কাটা করতে। তিনি বাজার করা আরম্ভ করতেই বাজার-খরচ কমতে লাগলো। গৃহিণী বুঝলেন ছেলেটি সৎ। সুতরাং তখন থেকেই কর্তা-গিন্নী সকলেরই মল্লিকমশাই-এর ওপর আস্থা বাড়তে লাগল। ক্রমে-ক্রমে তিনিই একদিন এই মুখার্জিবাড়ির সরকারের পদটি পেয়ে গেলেন। আর তখন থেকেই পরিবারের আয়-ব্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব পড়লো তাঁরই ওপর।

তারপর কত কাণ্ড ঘটে গেছে এই পরিবারের ইতিহাসে। কত বিপদ, কত দুঃখ, কত শোক, কত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সে-সব। দেবীপদ মুখার্জি মারা গেছেন, তারপর মারা গেছেন বড় ছেলে শক্তিপদ, কিছুদিন পরে মারা গেছেন তার স্ত্রীও। এর পর মেজ ছেলে মুক্তিপদও সপরিবারে এ-বাড়ি ছেড়ে নিজের তৈরি বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এ-বাড়ির সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা হয়ে গেছে। যে-সংসার একদিন ঠাক্‌মা-মণি নিজের তিল তিল রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, সেই সংসার তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁরই চোখের সামনে ভেঙ্গে যেতে দেখেছেন তিনি। কিন্তু তবু তিনি নিজে ভেঙ্গে পড়েন নি। তাঁর কেউ নেই, তিনি আজ একলা। তবু তাঁর সঙ্গে আছেন একমাত্র সাহায্যকারী এই মল্লিকমশাই।

তাই যখনই কথা উঠতো তখনই তিনি মল্লিকমশাইকে বলতেন—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না সরকারমশাই। একটা কাজই শুধু আমার বাকি আছে, সেই কাজটা শেষ করতে পারলেই আমার ছুটি।

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করতেন—কী কাজ ঠাক্‌মা-মণি?

—আমার ওই সৌম্যর বিয়ে। সৌম্যর একটা ভালো বিয়ে দিতে পারলেই আমার ছুটি সরকারমশাই, তার পর যেন গুরুদেবের নাম স্মরণ করে সংসার থেকে হাসিমুখে চলে যেতে পারি—

আশ্চর্য! ঠাক্‌মা-মণি কি তখন একবার ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে ওই সৌম্যর বিয়েটাই তার জীবনে একটা চরম বিপর্যয় হয়ে দেখা দেবে! সৌম্যর বিয়ের আগে তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে আরো কত বিপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সত্যিই পৃথিবীর বিয়ের ইতিহাসে সেই বিয়ে নিয়ে যে-দুর্ঘটনাটা ঘটলো তা বোধহয় আর কখনও আর কারও বিয়েতে কোথাও ঘটেনি।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

তার আগে গুরুদেবের বিদায়ের দিনের ঘটনাগুলো বলা দরকার। ঠাক্‌মা-মণি যথারীতি সেদিনও গঙ্গাজল দিয়ে গুরুদেবের পা দুটো ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে মুছে দিলেন। গুরুদেব সেদিনও যথারীতি বিশাখার কুণ্ডলীটা নিয়ে বসেছিলেন। কুণ্ডলীটা দেখতে দেখতে বলেছিলেন—একটা কথা বলতে চাই বেটি—

—কী কথা, বলুন ঠাকুর-মশাই?

—তোমার ওই ভাবী নাত-বউ-এর বিশাখা নামটা বদলাতে হবে—

—তার বদলে কী নাম দেব বলুন?

গুরুদেব বললেন—স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' দিয়ে নামকরণ করলে ভালো হয়—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা 'অ' দিয়ে আপনিই একটা নামকরণ করে দিন না—

গুরুদেব বললেন—তাহলে 'বিশাখা'র বদলে 'অলকা' নাম দাওনা মা—

তা সেই নামই রাখবে সিদ্ধান্ত হলো। তখন থেকে 'বিশাখা' নামটা বদলে হলো 'অলকা'।

মনে আছে সেদিন মল্লিকমশাই যখন রাজুবালা দেবীকে আর বিশাখাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে দোতলায় গেলেন দেখলেন বিশাখা কাঁদছে—

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করলেন—এ কি, বিশাখা কাঁদছে কেন মা? কী হলো ওর? যোগমায়া বললেন—মুখপুড়ীর ওই দশা। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে না খেয়ে ও মেয়ে ছাড়বে না। সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছে, আবার এখনও জ্বালাচ্ছে—

মল্লিকমশাই বিশাখার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে বলো তো মা, আমাকে বলো না তুমি কী চাও?

বিশাখা তখনও কাঁদছে। যোগমায়া বললেন—ও বলছে ও বিয়ে করবে না।

মল্লিকমশাই বললেন—তা কে তোমায় বলছে বিয়ে করতে? এখন তো বিয়েটা হচ্ছে না। তুমি যখন বড় হবে তখন তোমার বিয়ে হবে। সে তো অনেক বছর পরে। এখন ও নিয়ে ভাবছো কেন? চলো, এবার তোমাদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—গাড়ি তৈরি—

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতেই বললে—আমি মাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

যোগমায়া মেয়েকে আবার বলতে লাগলেন—মুখপুড়ী, আমি কি তোর সঙ্গে তোর শ্বশুর বাড়িতে যাবো বলতে চাস্। কারো মা কখনও মেয়ের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়িতে যায়?

বিশাখা বললে—না, আমি চিরকাল তোমার কাছে থাকবো মা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না—

যোগমায়া রেগে গেলেন। বললেন—বুড়ী ধুমসি মেয়ে হতে চলেছে, এখনও ন্যাকামি গেল না, এই ন্যাকামি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়—

মল্লিকমশাই আর কথা বাড়াতে দিলেন না। বললেন—চলুন-চলুন, আপনাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, শিগ্‌গির-শিগ্‌গির আপনাদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই—চলো মা—চলো—

এর পর সবাই উঠলো। দোতলা থেকে একতলায় নেমে ডান দিকে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দির। তার সামনে উঠোন। উঠোনের সামনে বার-বাড়ির দরজা। সেখানে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল—

মল্লিকমশাই দরজা খুলে দু'জনকে গাড়ির পেছনের সীট-এ বসিয়ে দিয়ে নিজে সামনে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। তারপর গাড়ি চলতে লাগলো। ড্রাইভার জানে কোথায় কোন্ অঞ্চলে এদের নিয়ে যেতে হবে। সে গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর তার পরে

একেবারে সোজা খিদিরপুর বরাবর। গাড়ি চলতেই যোগমায়া নিজের কৌতূহল আর চাপতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—মল্লিকমশাই, বিশাখার কোষ্ঠী দেখে গুরুদেব কী বললেন?

মল্লিকমশাই পেছন দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন—গুরুদেব? গুরুদেব তো আপনার মেয়ের কুষ্ঠী দেখে খুব ভালো বললেন।

—খুব ভালো না ছাই! আর কুষ্ঠী যদি ভালোই হবে তো এ মেয়ে জন্মেই বাপকে খেলে কেন? এর জন্মের পর থেকেই তো আমার কপাল ভাঙলো। আর এই মেয়ের জন্যেই তো আমি দেওরের বাড়িতে ঝি-গিরি করছি—

মল্লিকমশাই বললেন—তা হোক। কিন্তু আপনার মেয়ের স্বামী-ভাগ্য খুব ভালো—

—কিসে স্বামীভাগ্য ভালো হলো?

মল্লিকমশাই বললেন—কিসে স্বামী ভাগ্য ভালো হলো আমি কী করে জানবো মা? আমি তো কুণ্ডলী বিচার করতে জানি না। গুরুদেব আমার সামনে যা বললেন, আমি তাই-ই আপনাকে বললুম—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর তা ছাড়া আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনার জামাই-এর কত বড় বাড়ি। কত ঠাকুর, কত চাকর, কত ঝি, কত বড় পুজোর দালান। আর বংশের কথা যদি বলেন তো এত বড় ডাকসাইটে বংশ কলকাতায় আর ক'টা আছে, তাই বলুন? এই সব সম্পত্তির মালিক তো একদিন আপনার মেয়েরই হবে! সেই তখনকার কথা একবার ভাবুন তো। আপনার মেয়ের ওপরেই বা ঠাক্‌মা-মণির নজর পড়বে কেন? আর আপনিই বা ঠিক সেই দিনই ঠিক ওই একই ঘাটে একই সময়ে মেয়েকে নিয়ে চান করতেই বা যাবেন কেন? কলকাতায় কি গঙ্গার আর কোনও ঘাট ছিল না? বলুন?

যোগমায়া বললেন—কী জানি কী হবে!

মল্লিকমশাই বললেন—এত ভাববেন না, যা হবে তা ভালোই হবে! ভগবানের ওপর ভরসা রাখুন। তিনি মঙ্গলময়, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।

হঠাৎ বিশাখা কেঁদে উঠলো। বললে—আমি বিয়ে করবো না মা—

যোগমায়া রেগে উঠে বললেন—তুই চুপ কর তো মুখপুড়ী! আর মড়া-কান্না কাঁদতে হবে না—

তারপর মল্লিকমশাইকে বললেন—তা মেয়ে দেখে আপনার ঠাকমা-মণির পছন্দ হয়েছে তো?

মল্লিকমশাই বললেন—আমার ঠাক্‌মা-মণির তো আগেই পছন্দ হয়েছিল। তাই তো আপনাদের খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতে আমাকে পাঠিয়েছিলেন পাত্রীর জন্ম তারিখ, সাল, সব কিছু জানতে। সেই জন্যেই তো কত হাজার টাকা খরচ করে কাশী থেকে গুরু মহারাজকে নিজের বাড়িতে আনিয়েছেন।

যোগমায়া অনেক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা কবে বিয়ে হবে?

মল্লিকমশাই বললেন—সে এখন অনেক দেরি আছে। এখন ঠাকমা মণির নাতিও তো ছোট। তার বিয়ের বয়েস আগে হোক, তবে তো! তারপরে পাত্র পৈত্রিক কারবারে ঢুকবে। আর ততদিন আপনার মেয়েকেও মুখুজ্জে বাড়ির উপযুক্ত করে লেখাপড়া শিখিয়ে তৈরি করিয়ে নেবেন ঠাকমা-মণি—

যোগমায়া বললেন—লেখাপড়া আর কে শেখাবে? লেখাপড়া শেখাতে কি কম খরচ আজকাল? আমার দেওর তাতে রাজি হবে না

মল্লিক মশাই বললেন—আপনার দেওর রাজি না হলেই বা। তাঁর তো নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হচ্ছে না। আপনার মেয়ের খাওয়ানো-দাওয়ানো লেখাপড়া শেখানো থেকে শুরু করে ফ্রক [illegible] গ্রাউন্ডের জন্যে যা-কিছু খরচা হবে সব খরচা দেবেন আমার ঠাকমা মণি। [illegible] মুখুজ্জে-বাড়ির যোগ্য হয়, বুঝলেন না? লোকে যেন বউ দেখে [illegible] আমাকে [illegible] ঠাকমা মণি। [illegible]

তো একটা ইজ্জৎ আছে! বিয়ের সময় কলকাতার আরো পনেরো-বিশটা বাড়ির বড়লোকেরা তো আসবে! তাদের কাছে যেন তাঁর মাথা হেঁট না হয় তাও তো তাঁকে দেখাতে হবে। বিশাখা যদি চায় তো মাস্টার রেখে তাকে গানও শেখাবো।

যোগমায়া মুগ্ধ হয়ে সব কথা শুনছিলেন।

বললেন—তাই নাকি? আমার মেয়ে গান শিখবে?

মল্লিকমশাই বললেন—তাতে আপনার কিসের আপত্তি। তার জন্যে আপনাকে তো টাকা খরচ করতে হচ্ছে না। ঠাকুমা-মণি টাকা দেবেন। ঠাকুমা-মণির কি টাকার অভাব? ঠাকুমা মণি তো মুখার্জি-স্যান্স্রবি কোম্পানির একজন ডিরেক্টারও। আপনি মুখার্জি-স্যান্স্রবি কোম্পানির নাম শোনেন নি?

যোগমায়া বললেন—না—

—ওমা তাহলে আর বলছি কী? সাবালক হলে আপনার জামাইও তো একজন ডিরেক্টর হবে। আপনার জামাইকেও কারবারের ব্যাপারে কত দেশ-বিদেশে যেতে হবে। সঙ্গে আপনার মেয়েও যাবে—

—আমার মেয়েও যাবে?

মল্লিকমশাই বললেন—তা যাবে না? মেজবাবু তো তাঁর বউকে নিয়ে কত জায়গায় যান।

—কোথায়-কোথায় যাবে আমার মেয়ে?

মল্লিকমশাই বললেন—লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, সুইজারল্যান্ড ও টোকিও সব জায়গায় আপনার জামাই-এর সঙ্গে আপনার মেয়েও যাবে।

—জাহাজে করে যাবে?

মল্লিকমশাই বললেন—জাহাজে করে কেন? উড়ো জাহাজে যাবে। মানে এরোপ্লেনে চড়ে যাবে। আজকাল জাহাজে করে বিদেশে যাওয়া তো উঠে গেছে। সে-সব আপনি এখন ভাববেন না মা! আগে বিয়ে হোক, তখন সে-সব ভাববেন আপনি—

হঠাৎ বিশাখা আবার কেঁদে উঠলো। বললে, আমি বিয়ে করবো না মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—

যোগমায়া আবার ধমকে উঠলেন—থাম মুখপুড়ি, থাম তুই। আমি কোথায় তোর ভালোর জন্যে ভেবে ভেবে মরছি, আর..

ঠিক সেই সময়ে গাড়িটা এসে খিদিরপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ির সামনে থেমে গেল। তখন গাড়িটা তারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছেছে।
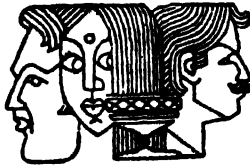
সন্দীপ একমনে গল্পটা শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

কিন্তু তার পরেরও তো তারপর আছে। সন্দীপের কলকাতায় আসার আগেকার কথা শুনতে খুব ভালো লাগতো। আগেকার কথা মানেই তো ইতিহাস। বেড়াপোতার চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে সন্দীপ সেই ইতিহাসের বইগুলোই বেশি পড়তো।

কিন্তু কেন ও-সব বই তার ভালো লাগতো?

এই 'কেন'র উত্তর সে নিজেই জানতো না। স্কুলের অন্য ছেলেরা যখন পাঁচকড়ি দে'র লেখা 'নীলবসনা সুন্দরী' আর 'হত্যাকারী কে' পড়তো তখন সে ভিনসেন্ট স্মিথের বই পড়তো, এডওয়ার্ড

গীবনের বই পড়তো, কটন সাহেবের বই পড়তো, টড্ সাহেবের রাজস্থানের বই পড়তো! তখন তার মনে হতো যেন সে সমস্ত পৃথিবীটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। তার যে কেন এ-সব পড়তে ভালো লাগতো, তা সে নিজেও বুঝতে পারতো না। কী করে আর কীসের জন্যে একটা জাতের উত্থান হয়, আর কী জন্যেই বা একটা দেশের পতন হয়, তা জানতে পেরে তার যেন রোমাঞ্চ হতো! আর চাটার্জিবাবুরা কেন এত বড়লোক আর সন্দীপরাই বা কেন এত গরীব তা জানতে পেরেও তার ভাল লাগতো। ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়ের এই কাহিনী তার বুকে যেন ঝড়ের মত উত্তাল দোলা দিয়ে যেত!

তা এর পরের বার সন্দীপকেই টাকা নিয়ে যেতে হলো খিদিরপুরের মনাসতলার বাড়িতে। একশো পঁচিশ টাকা! দশখানা দশ টাকার আর পাঁচটা পাঁচ টাকার নোট। মল্লিকমশাই ভালো করে কাপড়ে কোঁচাব খুঁটে বেঁধে দিতেন। বলতেন—খুব সাবধানে যাবে বাবা, এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো, যেন হারিয়ে না যায়, দেখো!

সন্দীপ বলতো—না, হারাবে না কাকাবাবু—

মল্লিকমশাই বলতেন—কলকাতা তোমার বেড়াপোতা নয়, এখানে পথে ঘাটে চোর-জোচ্চোর আর গুণ্ডা-বদমাইশের আড্ডা। এখানকার মানুষ বড্ড খারাপ তা জানো? এখানে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। যাও—দুর্গা শ্রীহরি—

তখন কলকাতায় ওই একজন মাত্র মানুষই তার হিতৈষী আর শুভাকাঙ্ক্ষী। মল্লিকমশাই ছাড়া সন্দীপ আর কাউকেই ভালো করে চিনতো না। সে-ও মল্লিকমশাই-এর অনুকরণে নিঃশব্দে 'দুর্গা-শ্রীহরি' কথাটা উচ্চারণ করলে। যেন 'দুর্গা-শ্রীহরি' কথাটা উচ্চারণ না করলে তার যাত্রা অশুভ হয়ে যাবে।

এখন কথাটা ভাবলে তার হাসি পায়। এই এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে যে সেই দিনের মত অমন অশুভ বোধহয় তার জীবনে আর কখনও হয়নি।

বাড়ি থেকে আগের মাসের মত ধর্মতলায় বাস বদলাতে হলো। কিন্তু এবার আর কেউই তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে দিলে না। সে সহজেই বাসে উঠে পড়তে লাগলো। আর বাসটা যখন খিদিরপুরে গিয়ে যাত্রার শেষ বিন্দুতে পৌঁছলো, তখন সে আস্তে-আস্তে বাস থেকে রাস্তায় নামলো। এখানে এসে পৌঁছে বাস আর সামনে এগোবে না। এখানেই তার যাত্রা শেষ। তারপর সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ি। বাড়িটার সামনে যেতেই সন্দীপ দেখলে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—সেই বিশাখা।

বিশাখা সন্দীপকে ঠিক চিনতে পারলে। সন্দীপকে দেখে হেসে ফেললে।

সন্দীপ বললে—হাসছো কেন? তুমি আমায় চিনতে পেরেছ বুঝি?

বিশাখা বললে—চিনতে পারবো না? তুমি তো গেল মাসে সেই বুড়োটার সঙ্গে এসেছিলে!

সন্দীপ বললে—বুড়ো বলছো কেন? উনি তো আমার কাকা—

বিশাখা বললে—তোমার কাকা হলো তো আমার বয়ে গেল! বুড়োকে বুড়ো বলবো না তো কী ছেলেমানুষ বলবো?

সন্দীপ বললে—তবু তা বলতে নেই। একদিন তো সবাই-ই বুড়ো হয়ে যাবে। আর তুমিই কি চিরকাল এই রকম খুকী হয়ে থাকবে? একদিন তুমিও তো বুড়ী হ'য়ে যাবে। একদিন তোমারও বিয়ে হবে—

বিশাখা বললে—তুমি কিছছু জানো না। আমাকে মা বলেছে আমি এখন যেমন ছোট, পরেও তেমনি ছোট হয়ে থাকবো। মা কি কখনো মিছে কথা বলে? মা বলেছে বিয়ে হলেই মানুষ শ্বশুরবাড়ি চলে যায়—আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো না—

সন্দীপ মেয়েটার কথায় হেসে ফেললে। জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা কোথায়?

বিশাখা বললে—আমি জানি তুমি কী করতে এসেছ—

—কী কবতে এসেছি আমি?

—আমার মাকে টাকা দিতে। তোমাদের বাড়িতে একটা ছেলে আছে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। আমি সব শুনেছি—

সন্দীপ বললে—তুমি ঠিকই শুনেছ—তা তোমার মা'কে এখন একবার ডেকে দাও। বলো যে আমি বিড়ন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়ি থেকে এসেছি—

এমন সময় আর একটা অলকারই বয়েসী মেয়ে এসে হাজির হলো সেখানে। বললে—কে রে বিশাখা? কার সঙ্গে কথা বলছিস তুই?

অলকা বললে—এই দ্যাখ্ না, আমার নাম বিশাখা, এরা আমার নাম বদলে দিয়ে রেখেছে অলকা। কী বিচ্ছিরি নাম রেখেছে দেখ—

সন্দীপ বললে—নাম তো আমি বদলাই নি। নাম বদলে দিয়েছেন ঠাক্‌মা-মণির গুরুদেব। তিনি বলেছেন ওই 'অলকা' নাম রাখলে ওর জীবন সুখের হবে।

—সুখের হবে মানে?

সন্দীপ বললে—সে-সব আমি জানি না, তুমি তোমার মা'কে গিয়ে বল যে আমি তাঁকে টাকা দিতে এসেছি—

হঠাৎ ভেতর থেকে পুরুষ-মানুষের মতন গলায় বললে—কে রে? এখানে কার সঙ্গে কথা বলছিস রে তোরা?

বলে বাইরে আসতেই সন্দীপ দেখলে সেই আগের মাসের দেখা ভদ্রলোক। সেই তপেশ গাঙ্গুলী- মশাই। সন্দীপকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেই আগের বারে মল্লিকমশাই-এর সঙ্গে এসে যে ঘরে বসেছিল, এ সেই ঘর।

সেই দিনকার মতই এ তেমনিই নোংরা, তেমনিই অপরিষ্কার।

তপেশ গাঙ্গুলীর পেছনে-পেছনে বিশাখা আর বিজলী এসে ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—টাকা এনেছ ভাই?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, এনেছি। অলকার মা কোথায়? রাজুবালা দেবী?

—কত টাকা এনেছ?

সন্দীপ বললে—আপনি একশো টাকাটা বাড়িয়ে দেড়শো করে দিতে বলেছিলেন কিন্তু আমাদের ঠাক্‌মা-মণি পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি এনেছি একশো পাঁচিশ টাকা। সরকার মশাই আমাকে বলে দিয়েছেন রাজুবালা দেবীর হাতে টাকা দিতে—আর কারো হাতে দিতে বারণ করে দিয়েছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে যেন কোনও কথাই বেরোল না—

তারপর বললেন—কেন? আমাকে টাকা দিলে কি আমি সে-টাকা খেয়ে ফেলবো?

সন্দীপ বললে—তা জানি না, আমাকে সরকারমশাই যা বলে দিয়েছে, তাই-ই আপনাকে বললাম—

তপেশ গাঙ্গুলী তার জবাবে আর কী বলবেন! খানিক পরে বিশাখাকে বললেন—এই বিশাখা, তোর মা'কে ডেকে আন তো, বলবি বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে নতুন সরকারমশাই মাসকাবারি টাকা নিয়ে এসেছে, তোর মা'কে ডেকে আন—

বিশাখা'র আগেই বিজলীই দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বললেন—চা আনবো? চা খাবে তুমি?

সন্দীপ বললে—না, আমি গাঁয়ের ছেলে, চা খাই নে—

—ভালো-ভালো, চা না-খাওয়াই ভালো। শুধু চা কেন, কোনও নেশাই করা ভালো নয়। এই দেখ না, আমিও কোন নেশা করি না ভাই, নেশা করা মানেই যত টাকার ছেরাদ্দ করা। ও-সব বড় লোকদেরই পোষায়—

বলে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই ভেতরে চলে গেলেন। সাধারণতঃ মাসের পয়লা তারিখটাই এ

বাড়িটা একটা উৎসবের রূপ ধারণ করে। সেই দিন বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়ি থেকে একশো টাকা আসে। এই একশোটা টাকা একেবারে ফালতু টাকা। এর জন্যে কোনও দিন কাউকে পরিশ্রম করতে হয় না। কাউকে খোসামোদও করতে হয় না। সত্যিই এ একেবারে ফালতু টাকা। এই মাসের পয়লা তারিখটাতেই তপেশ গাঙ্গুলী মশাই-এর বাড়িতে মাংস রান্না হয়, সরু চালের পায়েস হয়। টাকাটা আসে আসলে বিশাখার সূত্রে, কিন্তু তা ভোগ করে সবাই মিলে। তা নিয়ে যোগমায়া কোনও দিন কিছু অনুযোগ করা দূরের কথা, মুখ ফুটে কখনও কিছু বলেও না। একে তো বিধবা মানুষ, তাতে এই বাসাবাড়িতে যে বিনে ভাড়ায় থাকতে পেয়েছে, মা আর মেয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারছে সেইটেই তো যথেষ্ট। বিশাখার দরুন মাসে-মাসে যে এতগুলো টাকা আসছে, তার জন্যে যে কেউ একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তা নয়। উল্টে কেন আরো বেশি টাকা আমদানি হচ্ছে না, তাই নিয়েই বরং আরো চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে দেওর। যেন যোগমায়া মুখে একটু বললেই টাকার অঙ্কটা বেড়ে যাবে।

তপেশ গাঙ্গুলী মাঝে মাঝে বলতেন—তুমি একটু বলতে পারো না বৌদি যে যদি আর পঞ্চাশটা টাকা ওরা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে একটু সুবিধে হয়। তা সেই কথাটা বললে কী দোষ?

যোগমায়া বলতো—আমার হয়ে না হয় তুমিই বলে দিও, আমি মেয়েমানুষ হয়ে কি কিছু বলা ভালো?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতেন—তুমি হলে বিশাখার মা, তুমি নিজে বললে যা হবে তা কি আর আমি বললে হবে? আমি তো অনেকবার বলেছি—

যোগমায়া জানতো যে বুদ্ধিটা আসলে তার দেওরের নয়, ছোট জায়ের। ওই একশোটা টাকা বাড়িতে আমদানি হওয়ার পর থেকেই ছোট জা সংসারের কাজ একেবারে ঢিলে দিয়ে দিয়েছে। তখন থেকেই ছোট জায়ের ঘন-ঘন মাথাধরা হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই ছোট জায়ের কোমরে ব্যথা করতে শুরু করেছে। বাড়িতে গলগ্রহ বিধবা বড় জা থাকতে কোন্ ছোট জা-ই সুস্থ থাকে? হয় গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্, নয় তো মাথা টিপ-টিপ, একটা কিছু লেগে থাকাই তো স্বাভাবিক! সে-ব্যাপারে যোগমায়া কোনও দিন মনে মনে বললেও মুখ ফুটে বলবার ভুল করেনি।

কিন্তু টাকা? টাকার ব্যাপারটা কী করে যে ওদের সরকারমশাইকে বলে? টাকাটা যে মাসে-মাসে দিচ্ছে এইটেই তো যথেষ্ট। যদি কোনও দিন টাকা দেওয়া বন্ধই করে দেয় তো তাতেই বা যোগমায়ার কী বলবার থাকবে? মুখার্জিবাড়ির ঠাক্‌মা-মণি কি এমন ধার করেছে যে নিয়ম করে মাসে-মাসে বছরের পর বছর ধরে এমনি করে দিয়ে যাবে?

তাই যোগমায়াকে দিয়ে কথাটা বলানোর কোনও চেষ্টাই তপেশ গাঙ্গুলীর সফল হয় নি।

বাণী স্বামীকে বলেছে—কেন বলবে শুনি? কেন কথা বলে মুখ নষ্ট করবে? তুমি তো দুটো মানুষের খাওয়া-পরার খরচ যুগিয়েই যাচ্ছো, তাহলে কেন আবার তা বলে ইজ্জত খোয়াবে? তোমার ইজ্জত না থাকতে পারে, কিন্তু বড়দির তো একটা ইজ্জত আছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বলেছেন—তা বটে, বুঝেছি—

বাণী বলেছে—ছাই বুঝেছ, তা আমি বলে যদি তোমারা ঘটে একটু বুদ্ধি হয়।

অথচ কম টাকা বলে কখনও টাকাগুলো নিতেও আপত্তি করেনি কেউ। বরং মল্লিকমশাই মাসের পয়লা তারিখে একশোটা টাকা নিয়ে এলে তাঁকে চা দিয়ে বিস্কুট দিয়ে খাতিরই করা হয়েছে। কারণ শেষকালে যদি টাকার আমদানিটা বন্ধ হয়ে যায়? কিছু না-দেওয়ার চাইতে তো কিছু দেওয়াও ভালো!

কিন্তু সেবারই প্রথম তপেশ গাঙ্গুলীমশাই কথাটা শ্রীহরি'র নাম স্মরণ করে মল্লিকমশাইকে বলেই ফেলেছিলেন।

তাইতেই তো পঞ্চাশটা টাকা না বাড়িয়ে পঁচিশটা টাকাও বেড়েছে। তা-ই বা কম কী? ওই পঁচিশটা টাকাতে তপেশ গাঙ্গুলী মশাই-এর এক জোড়া চটিও হয়ে যাবে। কিংবা রাণীর একটি দামী ব্লাউজপিস। যথা লাভ।

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই যোগমায়ার কাছে গিয়ে বললেন—এই দেখ বৌদি, তুমি তো টাকার কথা ওদের বললেই না। সেই আমাকেই মুখ নষ্ট করতে হলো শেষ পর্যন্ত। এই দেখ, টাকাটা এবার ঠিক বাড়িয়ে দিয়েছে বুড়ী—

যোগমায়া বললে—কত?

—কত? কত আর? পঁচিশ টাকা—তা পঁচিশ টাকাই বা কম কীসে বলো? এক কোপে তো গলা কাটা ঠিক নয়, একটু সইয়ে-সইয়ে গলা কাটতে হয়। তাতে হাতের সুখ হয়। এখন পঁচিশ টাকা বাড়লো, এর পরে সইয়ে-সইয়ে মব্‌লগ দুশো টাকায় গিয়ে তুলবো—

তারপর হাতের কাগজটা আর কলমটা যোগামায়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও এইখানটায় একটা সই করে দাও—

যোগমায়া অন্যবারের মত কাগজের ওপর যথাস্থানে কোনও রকমে সইটা করে দিলে। সই করার পরই যোগমায়ার কর্তব্য শেষ। তার পরেই আবার নিজের রান্না। ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললে—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি, ওদের সরকারমশাইকে একটু বসতে বলে এসো ঠাকুরপো—

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই বললেন—না-না, চা করতে হবে না, এ কি সেই আগেকার বুড়ো সরকারমশাই, একটা ছোকরা মানুষ। আমি আগেই জিজ্ঞেস করেছি, এর চায়ের নেশা-টেশা নেই—

সামনের বারান্দা দিয়ে যাবার সময়েই রাণীর সঙ্গে দেখা। এই রকম প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখেই রাণী এই টাকাটার অপেক্ষায় থাকে। তপেশ গাঙ্গুলীমশাই কাছে যেতেই রাণী জিজ্ঞেস করলে—কত দিলে?

তপেশ গাঙ্গুলী সমস্ত টাকাগুলো রাণীর হাতে দিয়ে বললে—গুণে নাও, একশো পঁচিশ টাকা আছে। দশ খানা দশটাকার নোট, আর পাঁচ খানা পাঁচটাকার নোট, মোট একশো পঁচিশ—আমার সামনে গোনো—

প্রতিবার এই রকমই হয়। যার নামে টাকা সে কিন্তু এ-টাকার চেহারাও দেখতে পায় না। দেখবার ইচ্ছে হলেও দেখতে চায় না। তার শুধু কাজ। আর কাজ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করাও যেন তার পাপ। সুতরাং সেই টাকা নিয়ে কী হলো, কী ভাবে তা খরচ করা হলো, তা ভাবতেও চায় না সে! ভগবান যেন তাকে সেকথা ভাবতেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

শুধু রাতটাই তার একলার।

সেই রাতগুলোতেই যোগমায়া যেন নিজেকে খুঁজে পায়। তখন মনে পড়ে সেই মানুষটার কথা। সেই মানুষটাই একদিন বলেছিল—দেখ যোগমায়া, আমি যদি কোনও দিন চলেও যাই তো তোমার কিছু ভাবনা নেই। আমার ভাই তপেশ তো রইল। তাকে আমিই ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি। সে তোমাকে দেখবে—

সেদিন স্বামীর কথাতেও যোগামায়া যেমন কাঁদেনি, আজ সে-মানুষটা চলে যাবার পরও তেমনি কাঁদে না। সুখ-দুঃখ সব সমান ভাবে মাথা পেতে সহ্য করে যায়। তার ঠাকুর যদি কোনও দিন মুখ তুলে চান তো চাইবেন, আর যদি মুখ তুলে না চান তো চাইবেন না! তাতে কারো ওপর কোন অভিযোগ-অনুযোগ করার ভুল সে করবে না। শুধু এইটুকু বিশ্বাস নিয়েই জীবনের শেষ ক'টা বছর চলবে। ঠাকুর মঙ্গলময়। ঠাকুর যা করেন তা সমস্তই মঙ্গলের জন্যে।

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই রাত্রে বললে—কই, ঘুমোলে নাকি?

—আবার কী?

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই বললেন—না, বলছিলুম কি, তুমি তো অনেক দিন ধরে বলছিলে কানের এক জোড়া সোনার ঝুমকো গড়াবে, তা এবার তো কিছু টাকা জমলো, এবার গড়াও না—

রাণী বললে—না-না, এত আদিখ্যেতা করতে হবে না। খুব হয়েছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—অত রাগ করছো কেন? কী এমন রাগের কথা বলেছি?

রাণী মুখ-ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো—রাত দুপুরে আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না। তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছে তখনই বুঝেছি আমার কপাল পুড়েছে...

তপেশ গাঙ্গুলী স্ত্রীর কথায় বিব্রত হয়ে বললেন—আহা কী করেছি আমি, সেটা বলবে তো!

রাণী বলে উঠলো—দয়া করে এবার চুপ করবে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। আমার কথাও শুনবে না, আবার নিজেও কিছু বলবে না। তাহলে আমি কী করি? আমি কী করবো সেইটে অন্তত তুমি বলে দাও—

—তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি দয়া করে একটু ঘুমোতে দাও আমাকে—বলে রাণী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোতে লাগলো।

এ শুধু যে এই-ই প্রথম তা নয়। যেদিন থেকে বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ির মল্লিকমশাই এসে বিশাখার বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়ে গেছেন, সেইদিন থেকেই রাণী এই রকম হয়ে গেছে। ভালো কথা বললেও ঝগড়া করবে। যা-ইচ্ছে তাই বলে মেয়ের সামনেই তপেশ গাঙ্গুলীকে অপদস্থ করবে। অফিসে গিয়েও যে মন দিয়ে একটু কাজ করবে তারও উপায় নেই। সেখানে কাজ করতে করতেও বাড়ির কথা ভেবে তপেশ গাঙ্গুলী অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। গয়না কিনে দেবার কথাও শুনবে না, আদর করতে গেলেও ঠেলে ফেলে দেবে!

তবু বৌদি ছিল বলে ঠিক সময়ে রান্না ভাত খেতে পাচ্ছেন তপেশ গাঙ্গুলী। ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারছেন! রেলের অফিস হলেও যত দেরিই হোক চিরকাল তো অফিস কামাই করলে চলে না। দিনে অন্তত একবার কিছুক্ষণের জন্যেও তো অফিসে যেতে হবে। ওই অফিসের ওপরেই তো তাঁর খাওয়া-পরা চলছে সখ-সৌখিনতা চলছে, লোক-লৌকিকতা চলছে, অফিসটাই তো হলো তাঁর লক্ষ্মী! ওই অফিসটাই তো তাঁর জীবনের সিঁথির সিঁদুর। ওই সিঁদুরের জন্যেই তো তিনি এখনও পৃথিবীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! যদি ওটা না থাকত!

সে কথাটা আর তপেশ গাঙ্গুলী ভাবতে পারেন না, সে-অবস্থার কথাটা ভাবতে গেলেই তাঁর মাথা ধরে যায়। না, আর দরকার নেই সে-সব কথা ভেবে। তিনি সকালবেলার কথাগুলো ভুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভোলা কি অত সহজ? ভুলতে পারলে তো কবে তিনি সংসার ছেড়ে বনে চলে যেতেন। আর আগেকার মত বনই কি আছে এখন? এখন তো কলকাতা শহরটাই বন হয়ে গেছে। বনের মধ্যে যেমন বাঘ-সিংহ-ভল্লুক ঘুরে বেড়ায়, তেমনি এখন কলকাতা শহরের মধ্যেই তো বাঘ-সিংহ-ভল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতা শহরের বাঘ-ভল্লুকরা তো বনের বাঘ-সিংহ-ভল্লুকের চেয়েও ভয়ানক। প্রত্যেক দিন বাজারে গিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর তাই-ই মনে হয়! তিনি সকলের মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখেন। তারা বাইরে থেকে দেখতে মানুষেরই মতো, কিন্তু ভেতরে?

পাশে রাণীর নাক ডাকতে লাগলো। তপেশ গাঙ্গুলী বুঝতে পারলেন রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যিই, বেশ আছে মেয়েরা। যত ঝক্কি পুরুষদের। বউ-এর গয়না যুগিয়ে মন যুগিয়ে, শাড়ি-ব্লাউজ যুগিয়েও তাদের মন পাওয়া যায় না। যাক্ জাহান্নামে যাক সব, জাহান্নামে যাক সংসার। মানুষ যে কেন সাধ করে সংসার করতে যায় কে জানে! আগে জানলে কোন্ শালা সংসার করতো!
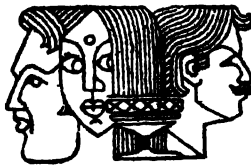
বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ির মল্লিক-মশাই এ বাড়িতে আসবার পর থেকেই তপেশ গাঙ্গুলীর পৃথিবী যেন বিষ হয়ে গিয়েছিল

কিন্তু কত তুচ্ছ সেই ঘটনাটা! আর কত সামান্য! কত নগণ্য!

এই এতদিন পরে এত কাণ্ডের পর সন্দীপের মনে হলো এই তুচ্ছ সামান্য আর নগণ্য ঘটনাটা কেমন করে তাব জীবনের ওপর একটা প্রচণ্ড বিপর্যয়েব সৃষ্টি করলে। আর সন্দীপই বা কেন অকারণে সেই বিপর্যয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল! আর শুধু সন্দীপই বা কেন, কে জড়িয়ে পড়েনি? ওই ঠাকমা-মণি, ওই সৌম্য মুখার্জি, ওই তপেশ গাঙ্গুলী, ওই রাণী গাঙ্গুলী, ওই বিশাখা বা অলকা, ওই রাজুবালা দেবী বা যোগমায়া, ওই মল্লিকমশাই, কেউ-ই তো বাদ পড়েনি!

মনে আছে সন্দীপ তখন টাকা ক'টা তপেশ গাঙ্গুলীমশাইকে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

পেছনে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই সদর-দরজাটা ভেজিয়ে দিতে এসেছিলেন।

বললেন—আসছে মাসে আবার পয়লা তারিখে আসছো তো ভাই?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো—

—তাহলে ভাই একটু সকাল-সকাল এসো, বুঝলে?

—কেন? আপনাব অফিসে যেতে দেরি হয়ে গেল বুঝি?

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই বললেন—হ্যাঁ, তবে কী জানো, আমাদের রেলের অফিস তো, কাজ তেমন কিছু নেই বটে, কিন্তু অফিস গিয়ে একবার হাজিরা তো দিতে হবে। তাই বলছি, এর পরের বারে একটু সকাল-সকাল আসতে চেষ্টা কবো। আর যদি পারো তো ওই টাকাটা একশো পঁচিশ টাকার বদলে একশো পঞ্চাশ করে দিলে ভালো হয়, এইটেই বলো—

তাবপর আর কিছু বলেনি সন্দীপ। তপেশ গাঙ্গুলীমশাই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সন্দীপ মনসাতলা লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে বাস ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাড়িটার পেছন দিকের গলিটা থেকে কে একজন ডাকলে—এই সন্দীপ, সন্দীপ—

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে—বিশাখা তাকে ডাকছে।

সেইখানে সেইভাবে বিশাখাকে দেখে সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ ও ওখানে কোথা থেকে এল? তাব নাম ধরে তাকে ডাকছে। মেয়েটা খুব পাকা তো! যাকে বলে একেবারে এঁচোড়ে পাকা!

সন্দীপ মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? তুমি আমাকে ডাকছো?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, তোমার নাম তো সন্দীপ—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—কিন্তু তুমি তা জানলে কেমন করে?

বিশাখা হাসলো। বললে—আমি সব জানি।

—কী জানো?

বিশাখা বললে—তুমি আগের বাব তো সেই বুড়োটার সঙ্গে এসেছিলে। এবার থেকে তো তুমিই এসে মা'কে টাকা দিয়ে যাবে!

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

বিশাখা বললে—তুমি তো এবারে একশো টাকাব বদলে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে গেলে!

সন্দীপ বিশাখার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—তুমি সবই জানো দেখছি—

—হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি যে আমি সব জানি। আব কী জানি বলবো?

সন্দীপ বললে—বলো—

বিশাখা বললে—তুমি যে-টাকা দিয়ে গেলে না, ও-টাকা দিয়ে কী হবে, জানো?

—কী, কী হবে?

বিশাখা বললে—তোমাদের দেওয়া সব টাকা কাকীমা নিজের বাক্সোতে জমিয়ে রেখেছে। এখন সেই জমানো টাকা দিয়ে কাকীমার কানেব এক জোড়া সোনার ঝুমকো হবে।

—সত্যি?

- হ্যাঁ, এখন কানের ঝুমকো হবে। পরে একটা সোনার হার হবে কাকীমার...

কথাগুলো বলেই বিশাখা বললে—একটু নিচু হও- একটু নিচু হওই না –

সন্দীপ কিছুতেই বুঝতে পারলে না কেন বিশাখা তাকে নিচু হতে বলছে।

বললে— কেন, নিচু হয়ে কী করবো?

বিশাখা বললে— তোমার কানে-কানে একটা কথা বলবো—নিচু হও না –

সন্দীপ এবার সত্যিই নিচু হলো। বিশাখা নিজের দুটো হাত দিয়ে সন্দীপের মাথার দুটো দিক ধরলে। তারপর মাথাটা নিজের মুখের কাছে এনে কানে কানে ফিস্-ফিস করে বললে— কাউকে যেন বলো না, বুঝলে? বলো, কাউকে বলবে না- -

সন্দীপ সেই ভাবেই মাথা নিচু অবস্থায় বললে— না, কাউকে বলবো না -

—আগে দিব্যি গালো! বলো—মা-কালীর দিব্যি—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, মা-কালীর দিব্যি গেলে বলছি, কাউকে বলবো না—

—তোমার ঠাক্‌মা-মণিকেও বলতে পারবে না।

—না, ঠাক্‌মা-মণিকেও বলবো না, কথা দিচ্ছি।

বিশাখা বললে—তবে শোন, তোমার ঠাক্‌মা-মণি তো মাসে মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছে। কিন্তু তোমাদের ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না—

সন্দীপ চমকে উঠলো। বললে—সে কী? কেন? ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না কেন?

বিশাখা বললে—তা আমি বলবো না। বললে তুমি সকলকে বলে দেবে—

সন্দীপের তখন কথাটা শোনবার জন্যে আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। বললে—না, আমি কথা দিচ্ছি, আমি কাউকেই বলবো না—

—তাহলে আবার মা কালীর দিব্যি গালো।

সন্দীপের হাসি এল বার বার দিব্যি গালার কথা শুনে। বললে—আচ্ছা-আচ্ছা, আবার মা কালীর দিব্যি গালছি, আমি কাউকেই বলবো না—

—তবে শোন—

বলে বিশাখা সন্দীপের মাথাটা আবার দু'হাতে ধরে নিজের মুখের আরো কাছে নিয়ে এসে বললে—আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আর কাকাকে টাকা দেবে না—তখন কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?

কথাটা শেষ হবার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলি গলার শব্দ এল—ওরে বিশাখা, কই? কোথায় গেলি তুই? ও বিশাখা...

--ওই আমাকে ডাকছে, আমি যাই—

বলে বিশাখা আর সেখানে দাঁড়ালো না। পাঁই পাঁই করে এক ছুটে পেছনের খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

সন্দীপ খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইল কে জানে! যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখতে পেলে চারদিকে যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডটা এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে স্থাণু হয়ে গিয়েছিল তা যেন আবার তার স্বাভাবিক গতিপথে ঘুরতে শুরু করলো। সন্দীপ দেখতে পেলে সে খিদিরপুরে সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িটার সামনে একলা দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনের রাস্তা দিয়ে দলে-দলে মানুষ, সাইকেল, গরু, রিক্‌শা, ঠেলাগাড়ি স্রোতের মত বয়ে চলেছে আপন মনে। এতক্ষণে তার মনে পড়লো সে যে শহরে রয়েছে তার নাম কলকাতা। আর আরো মনে পড়লো তার নাম সন্দীপ, সন্দীপ লাহিড়ী। তার বাবার নাম হরিপদ লাহিড়ী। আরো মনে পড়লো সে বেড়াপোতা থেকে কলকাতা শহরে লেখাপড়া করতে এসেছে। সে যেখানে যে বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে সে-বাড়ির ঠিকানা বারোর-এ বিডন স্ট্রীট, সেখানে আছে ঠাকমা মণি, আছে মল্লিককাকা, আর সে নিজেও সেখানে থাকে।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। সন্দীপের জীবনে এ ধরনের অনুভূতি এই-ই প্রথম। আস্তে আস্তে সে ট্রাম-রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। সেখানে গিয়ে তাকে বাস ধরতে হবে। চলতে চলতে সে শোনা কথাগুলোই ভাববে। আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আর কাকাকে টাকা দেবে না, তখন কাকীমা কোন টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?

কথাগুলো যেন সন্দীপের মস্তিষ্কের মধ্যে গুন-গুন করে গুঞ্জন করতে লাগলো। কখন সে বাসে উঠেছে, কখন সে বাসের ভাড়া দিয়েছে, কখন সে ধর্মতলার বাস বদলেছে, আবার কখনই বা সে বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছেছে কিছুই তার মনে ছিল না। কেবল তার কানের কাছে একটা কথা গুন-গুন করছিল—আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আর কাকাকে টাকা দেবে না। তখন কাকীমা কোন টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?

এ পাপ! সব রাস্তাটা ধরে সন্দীপের অনুভবের ফ্রেমে কেবল একটা কথাই মনে মনে আঁকা হয়ে গেল। সে-কথাটা হচ্ছে—এ পাপ! সংসারে পাপ কাকে বলে?

সামাজিক ভালো-মন্দের, সামাজিক সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবেই আমরা পাপ-পুণ্যের তারতম্যের বিচার করি। চরিত্রকে আমরা এমন করে গড়ে তুলি যাতে আমরা লোকসমাজের কাছে উঁচু স্তরে থাকি। কিন্তু লোকের চোখের বাইরে কি এমন কোনও গোপন জায়গা নেই যেখানে আমরা সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়ে ভাবি আমার আসল আমিকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না?

সেদিন খিদিরপুরের মনসাতলা লেন থেকে ফেরার সময় সন্দীপকেও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছিল। সে ভাবছিল এই যে এতগুলো লোক বাসের মধ্যে ফরসা জামা-কাপড় পরে চলেছে কেউ কি বুঝতে পারছে কী অনুতাপের জ্বালায় সে জ্বলছে!

কিন্তু কীসের অনুতাপ? কী পাপ সে করেছে?

অনেক সময়েই সন্দীপের এই রকম আত্মগ্লানি হতো। কীসের জন্যে যে তার আত্মগ্লানি তা সে জানতো না। খুব ছোটবেলাতেও তার এই রকম হতো।

মা, বলতো—কী রে? মুখটা অমন করে আছিস কেন? অসুখ করেছে?

সন্দীপ বলতো—না—

--কেউ কিছু বলেছে তোকে?

--না।

—তাহলে? ক্ষিদে পেয়েছে?

শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় দেখতে না পেয়ে সন্দীপ মিথ্যে কথাই বলে উঠতো। বলতো—হ্যাঁ—

--তা ক্ষিদে পেয়েছে তোর, সে কথা বলবি তো!

মা কিন্তু ছেলেকে বুঝতো না। আসলে সন্দীপকে কেউই বুঝতে পারতো না। হয়ত তাকে কেউ বুঝতে চাইতোও না। চাটুজ্জেবাবুদের বাড়িতেও কেউই বুঝতে পারতো না। তার মত ছেলেকে কেই-বা বুঝবে? সন্দীপকে কেউ মনে করতো—বোকা, কেউ মনে করতো—অহঙ্কারী, আবার কেউ মনে করতো—লাজুক। আসলে সে যে কী তা সে নিজেও জানতো না।

হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে--এই সন্দীপ!

সন্দীপ পেছন ফিরে তাকালো। প্রথমে কেমন একটু সন্দেহ হলো, তারপর ভাবলে সে কী করে সম্ভব হবে!

—আমায় চিনতে পারছিস না?

—গোপাল! তুই এ-রকম হয়ে গেলি কী করে?

সত্যিই যেন গোপাল কী রকম হয়ে গেছে। অথচ বেড়াপোতাতে কত সহজ স্বাভাবিক ছিল সে। গোপাল তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে। সন্দীপ ভাবতে লাগলো সেই বেড়াপোতার গোপালেব কথা। কত দিন গোপালের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছে। বেড়াতে গিয়ে কখন বিকেল হয়েছে, কখন সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে দু'জনের তা খেয়াল থাকতো না। গোপালই কেবল বলে চলতো। বলতো—জানিস, আমি একদিন পালিয়ে যাবো। তুই কাউকে বলিসনি যেন!

—না কাউকে বলবো না। কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাবি?

গোপাল বলতো—কলকাতায়—

সন্দীপ বলতো—কলকাতায় গিয়ে কোথায় থাকবি? কেউ আছে তোব কলকাতায়?

—না।

—তা যদি না থাকে তো কে তোকে খেতে দেবে? কোথায় ঘুমোবি রাত্তিরে? তোর থাকবার তো একটা জায়গা চাই।

গোপাল বলতো—কলকাতায় কি থাকবার জায়গার অভাব আছে রে? রেলের ইস্টিশান আছে, সেখানে রাতের বেলায় থাকবো, আর খাওয়া? কলকাতায় গেলে খাওয়ার কোনও অভাব হয় না কারো! কলকাতায় দেদার টাকা। টাকা সেখানে বাতাসে উড়ছে। শুধু কুড়িয়ে নিতে জানলেই হলো।

সন্দীপ অবাক হয়ে শুনতো গোপালের কথাগুলো। কলকাতায় নাকি কেউ না খেতে পয়ে মরে না। এত টাকা এখানে যে যদি কেউ সমস্ত দিন ঘুমিয়ে থাকে তো হাজার-হাজার টাকা সোঁ-সোঁ করে তার জামার পকেটে ঢুকে পড়ে। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে দেখে পকেট দুটো টাকায় ভরে গেছে। তখন সেই টাকা নিয়ে হোটেলে গিয়ে যা ইচ্ছে কিনে খেয়ে নাও। কত খাবে খাও না, কেউ তোমায় বারণ করবে না। কেউ তোমায় জিজ্ঞেস করবে না এত টাকা তুমি কোথায় পেলে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—সেখানে চোর-ডাকাত নেই? কেউ টাকা চুরি করে নেবে না?

গোপাল বলতো—চুরি করতে যাবে কেন? টাকার অভাব থাকলে তবেই তো লোকে টাকা চুরি করে, কারোর তো টাকার অভাব নেই।

সন্দীপও তখন সেই ছোট বয়েসে গোপালের কথাগুলো বিশ্বাস করতো। সন্দীপও যদি কোনও রকমে কলকাতায় যেতে পারে তো তাহলে তার মা'কেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তাহলে মা'কে আর পরের বাড়িতে রান্নাব কাজ করতে হবে না। সে আব মা দু'জনে হোটেলে গিয়ে ভাত, ডাল-তরকারি কিনে খাবে, আর আবাম করে ঘুমিয়ে থাকবে। আর কিছু কবতে হবে না। তখন আব এত কষ্ট কবে লেখাপড়া করতে হবে না। আর এগজামিনে কষ্ট করে পাশ করতেও হবে না। খুব আরাম হবে তখন তাদের।

তারপর একদিন গোপালকে দেখে সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কী রে, তুই কলকাতায় গেলি না?

গোপাল বলেছিল—দাঁড়া আগে বাবাটা মরুক—

গোপালের মা ছিল না, কিন্তু বাবা ছিল। বাবার ছিল হাঁপানী রোগ। হাঁপানি-রোগের যে কত কষ্ট তা সন্দীপ জানতো। রাত্তিরে অনেক দিন যখন চারদিকে নিশুতি হয়ে আসতো সেই সময়ে গোপালের বাবার হাঁফানির কাশির শব্দে পাড়ার সব লোকেব ঘুম ভেঙ্গে যেত। গোপালের ভাই-বোন কেউ ছিল না। সেই বুড়ো মানুষটা হাটেব দিন হাটে গিয়ে মাটির হাঁড়ি-কলসী বেচতো। অন্য দিনে লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কত কী জিনিস ফেরি করতো। অনেকে দয়া করে কিছু কিনতো। যখন যা পেত তাই ফেরি করতো। কোনও বাঁধাধরা জিনিস বেচতো না। সব লোকই দয়া-মায়া করতো গোপালের বাবাকে। লোকে ডাকতো—হাজরা-বুড়ো—

হাটের পাশে যেখানে বাঁধা দোকান আছে, সেখানে একটা দোকানের দেওয়ালের গা ঘেঁষে চালা তুলে নিয়ে তার তলায় বাপবেটায় থাকতো। চেয়েচিন্তে যা দুটি মেলে তা-ই সময় পেলে নিজের হাতে রান্না করে নিত হাজরা বুড়ো।

ইস্কুলের ছেলেরা বিশেষ ভিড়তো না গোপালের কাছে। মাস্টারমশাইরাও বিশেষ পাত্তা দিত না গোপালকে। গরীব লোকদের কে-ই বা পাত্তা দেয়? সন্দীপকেও কেউ পাত্তা দিত না। এতে রাগ করবার কী-ই আছে। এইটেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল সন্দীপ। গোপালও তাই-ই ধরে নিয়েছিল। আর এইখানেই এই এক জায়গাতেই ছিল দু'জনের মিল। এই মিলের ওপরেই ভিত্তি করে তাদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সন্দীপ যখন কাশীবাবুদের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসে বই-এর পাতার মধ্যে নিজের জীবনের ব্যর্থতাব ভুলতে চাইতো, গোপাল তখন স্বপ্ন দেখতো টাকার। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ টাকার স্বপ্ন, যে টাকা উপার্জন কববার জন্য কোনও লেখাপড়া বা কোনও পরিশ্রম করবার দরকার হয় না, সেই টাকার স্বপ্ন।

সন্দীপ যে গোপালের সঙ্গে মিশুক, এটা সন্দীপের মা'র পছন্দ হতো না, মা বলতো—তুই ওই হাজরা বুড়োব ছেলেটার সঙ্গে অত মিশিস কেন?

সন্দীপ বলতো—কে বললে আমি হাজরা-বুড়োর ছেলের সঙ্গে মিশি?

—কে আবার বলবে? সেদিন তো তোকে খুঁজতে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

এর পর সন্দীপ গোপালকে তাদের বাড়িতে আসতে বারণ করে দিয়েছিল। বলেছিল—তুই ভাই আর আসিস না আমাদের বাড়িতে—

গোপাল জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

সন্দীপ বলেছিল—না, আমার মা তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়েছে—

—কেন? আমি গরীব বলে?

—হ্যাঁ!

গোপাল বলেছিল—আচ্ছা, ঠিক আছে, একদিন আমি তোর মা'কে দেখিয়ে দেব যে আমিও মানুষ, আমারও টাকা আছে। যদি টাকা থাকাটাই পৃথিবীতে বড় গুণ হয় তো আমি সেই টাকা উপায় করেই তোর মা'কে দেখিয়ে দেব। দেখিযে দেব কাকে বলে বড়লোক হওয়া! আমি একদিন কলকাতাতেই যাবো, দেখে নিস—

তখন কে জানতো যে গোপাল সত্যি সত্যিই কলকাতাতে চলে যাবে। গরীব বুড়ো বাপকে বেড়াপোতাতে ফেলে রেখে গোপাল সত্যি সত্যিই কলকাতাতে চলে যাবে!

আর শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল।

একদিন গোপালকে আর দেখতে পেলে না কেউ। আর ইস্কুলেও গোপাল এল না তার পর থেকে। তার খোঁজে একদিন সন্দীপ গোপালের বাড়িতেও গিয়েছিল। কিন্তু তখন কেউ ছিল না তাদের বাড়িতে। গোপালের বাবাও ছিল না। বোধহয় বাজারে সওদা বিক্রি করতে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আর কখনও গোপালের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। সন্দীপের জীবন থেকে গোপাল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপ ভেবেছিল তার জীবন থেকে গোপাল চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। আর গোপালের বাবা? সেই হাজরা-বুড়ো?

সেই হাজরা-বুড়োরই বা কী মর্মান্তিক পরিণতি! একদিন হঠাৎ হাটের দিন বাঁধা দোকানগুলোর দিক থেকে কী রকম একটা দুর্গন্ধ সকলের নাকে এল। কীসের দুর্গন্ধ? কেউই আন্দাজ করতে পারে না দুর্গন্ধটা কীসের! তারপর দেখা গেল হাজরা-বুড়োর ঘরের ভেতরে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পিঁপড়ে সার বেঁধে ঢুকছে। অত পিঁপড়ে ভেতরে এমন কী লোভনীয় মুখরোচক খাবারের সন্ধান পেলে? দরজা ভেতরে থেকে বন্ধ।

হাটের লোকরা শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ফেললে শাবলের গুঁতো দিয়ে। পল্‌কা জারুল কাঠের দরজা। একবার ধাক্কা দিতেই ভেঙ্গে দু'খানা হয়ে পড়ে গেল। দরজাটা ভেঙ্গে পড়তেই

সবাই অবাক হয়ে দেখলে ভেতরে হাজরা বুড়ো মরে পচে আছে। সারা শরীরটা তার পচে ঢোল হয়ে আছে। তার ওপর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পিঁপড়ে মরা শরীরটার ওপর থিক-থিক করছে। কখন হাজরা-বুড়ো মরেছে, কবে মরেছে কেউ-ই তা টের পায়নি।

সন্দীপরাও দল বেঁধে গিয়েছিল দেখতে। তখন সকলের মনে পড়ে গিয়েছিল গোপালের কথা। গোপাল থাকলে এ-রকম ঘটতে পারতো না। গোপাল থাকলে অন্ততঃ মরবার আগে বুড়োর মুখে একটু জল পড়তো, কিংবা হয়ত ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা হতো।

কিন্তু তখন আর ও-সব কথা ভাববার সময় ছিল না। যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল। সেই দিনই বেড়াপোতার হাটের লোকজন চাঁদা তুলে গোপালের বাবার শেষ সৎকারটুকু করে দিয়েছিল। আর তারপরেই সবাই সে-কথা ভুলে গিয়েছিল। সন্দীপেরও আর মনে ছিল না গোপালের কথা।

সেই গোপালের সঙ্গে এতদিন পরে আবার দেখা হবে এ-যেন বিশ্বাস হবারও কথা নয়। তাই গোপালকে দেখে সে খুব চমকে উঠেছিল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তুই কোথায় থাকিস্ কলকাতায়?

ছোটবেলায় ওই গোপালই বলেছিল—কলকাতায় টাকা উড়ছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো। কলকাতায় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুয়ে-শুয়েই জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, বাড়ি ভাড়া করবারও দরকার হয় না। সেই গোপাল কত কাল আগে এখানে এসেছে, নিশ্চয় হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমে থাকে।

গোপাল বললে—তুই কোথায় থাকিস?

সন্দীপ বললে—আমি তো বিড়ন স্ট্রীটে একটা বাড়িতে থাকি! বারোর-এ নম্বর বিড়ন স্ট্রীট। বেড়াপোতার পরমেশ মল্লিক আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তিনিই ওখানে আমাকে থাকতে দিয়েছেন।

গোপাল বললে—চাকরি? চাকরি করিস?

সন্দীপ বললে—না, ঠিক চাকরি নয়, বঙ্গবাসী কলেজে বি. এ. পড়ি আর ও-বাড়ির ফাইফরমাস খাটি। তাই কলেজের মাইনে আর সামান্য হাত-খরচের টাকা, আর থাকা-খাওয়া ফ্রী। কিন্তু তুই কী করিস কলকাতায়? চাকরি?

গোপাল বললে—দূর, চাকরি করলে কি আর বড়লোক হওয়া যায়। আমি ব্যবসা করি—

—ব্যবসা!

বলে সন্দীপ গোপালের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টি দিয়ে আবার চেয়ে দেখলে। গোপাল যে-ধরনের সার্ট-প্যান্ট্ পরে আছে তা অনেক টাকা না হলে কেনা যায় না। পোশাক-আশাক দেখেই বোঝা যায় গোপাল ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কীসের ব্যবসা?

গোপাল জবাব এড়িয়ে গেল। বললে—সে তুই বুঝবি না। ও সব লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা। আমি তো বাসে ট্রামে চড়ি না, আমার তো গাড়ি আছে...

—তোর গাড়ি আছে!

—গাড়ি না থাকলে কলকাতার মতন শহরে যাওয়া-আসা করা যায়? গাড়ি বিগড়েছে তাই সেটা কারখানায় দিয়েছি। যদ্দিন না সেটা মেরামত হয়, তদ্দিন কষ্ট করে বাসে-ট্রামে চড়তে হবে।

আর একটু থেমে আবার বললে—আর গাড়িটাও পুরোন হয়ে গিয়েছিল—ভাবছি এবার আর একটা নতুন গাড়ি কিনবো—

সন্দীপের গাড়ি সম্বন্ধে কোনও ধারণাও নেই। বোকার মত জিজ্ঞেস করলে—একটা গাড়ির দাম কত রে?

গোপাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—বেশি নয়, এই এগারো-বারো হাজারের মতন!

সন্দীপ কথাটা শুনে আরো চমকে উঠলো। এগারো-বারো হাজার টাকার কথাটা এমন ভাবে গোপাল বললে যেন ওই টাকার অঙ্কটা খুব তুচ্ছ তার কাছে।

—তুই তোর ঠিকানাটা বল, একদিন আমি যাবো তোর বাড়িতে।

গোপাল বললে —তার আগে আমি তোদের বাড়িতে একদিন যাবো। আমি কখন কোথায় থাকি তারা তো ঠিক নেই।

সন্দীপ বললে—জানিস, তোর বাবা মারা গেছে—

গোপাল কথাটা শুনে আশ্চর্য হলো না, শুধু বললে— তাই নাকি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ রে, তুই শুনিসনি কিছু?

গোপাল বললে—না তো—

সন্দীপ বললে—সে খুব দুঃখের ব্যাপার জানিস গোপাল বললে— সেটা আর নতুন কথা কী। বয়েস হলেই মানুষ মরবে—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। নিজের বাবার মৃত্যুর খবর শুনেও কেউ এমন নির্লিপ্ত থাকতে পারে। বললে —শেষকালে কী হয়েছিল, জানিস?

—কী আর হবে। নিশ্চয়ই রোগ-ভোগ কিছু হয়েছিল। বুড়ো বয়েসে সকলেরই তো রোগ ভোগ হয়—

—না তা নয়, সে অন্য রকম ব্যাপার।

গোপাল বললে—সে শুনে আর কী করবো।

—তবু তোর শোনা ভাল—

—কেন? শোনা ভালো কেন?

সন্দীপ বললে—হাজার হোক, তোর নিজের বাবা তো।

কথাটা শুনে গোপাল বললে—দ্যাখ, তোকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। সংসারে কেউ কারো নয়। তা সে বাপই হোক, মা ই হোক আর ভা-ই হোক আর বোন-ই হোক, আসল জিনিস হলো

বলতে গিয়েও গোপাল চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে থেমে গেল।

সন্দীপ বললে—আসল জিনিসটা কী?

গোপাল সন্দীপের কানের কাছে মুখটা এনে বললে- সবাই আমাদের কথা শুনছে, তাই চুপি চুপি বলবো, শোন

বলে অস্ফুট স্বরে বললে—টাকা—

সন্দীপকে কিছু বলতে না দিয়েই গোপাল আবার বললে—ভগবান-টগবান সব বাজে। কোনটা কিসসু নয় টাকা থাকলে সব ব্যাটা জব্দ। টাকা থাকলে বাপ মা-ভাই বোন-ব্যাটা বেটি সবাই তোকে ভালবাসবে।

তখন বাসটা এক জায়গায় এসে থামতেই গোপাল বাইরের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো। বললে-- আমি চলি রে, এখানেই আমাকে নামতে হবে--

বলে সেখানেই নেমে পড়লো। তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়েই বললে—যাবোখন একদিন তোদের বাড়িতে, জানিস। আমি যাবো খ'ন—

ততক্ষণে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। সন্দীপ সেই চলন্ত বাসে বসে-বসেই গোপালের কথাগুলো ভাবতে লাগলো। সেই হাজরা বুড়োর ছেলে গোপাল। গোপাল লেখাপড়া কিছুই শিখলো না, অথচ কলকাতা শহরে টাকা উপায় করছে। আর শুধু টাকাই উপায় করছে না, আবার গাড়িও আছে তার। গাড়ি চালাতে তো অনেক টাকা লাগে। অত টাকা কী করে উপায় করে গোপাল? ব্যবসাই যদি সে করে তো কীসের ব্যবসা? ব্যবসা করতে কে তাকে শেখালে? ব্যবসা করতে গেলেও তো তা হাতে-কলমে শিখতে হয়। অনেক ভেবেও সন্দীপ তার ভাবনার কূল কিনারা পেলে না বাসটা তখনও একমনে সামনের দিকে ছুটে চলেছে
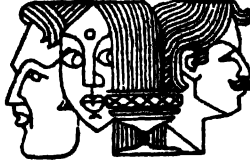
দুদিন ধরে সন্দীপ মনে মনে ভাবতে লাগলো মনসাতলা লেনের বাড়ির কথাটা মল্লিককাকাকে সে বলবে কিনা। আর যদি বলেও তো মল্লিককাকাই বা কী ভাববে! তার কাজ তো বাড়িতে গিয়ে টাকাগুলো দিয়ে আসা। তার বেশী কিছু করাব অধিকার তার নেই। সে শুধু বাহক। তার একমাত্র কাজ টাকাগুলো নিয়ে মনসাতলা লেনের বাড়িতে গিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিয়ে দেওয়া।

কিন্তু সেই সামান্য একটা কাজ যে পরে একটা অসামান্য কাজ হয়ে উঠবে. তা যদি সন্দীপ জানতো, তা যদি সে আগে টের পেত।

মল্লিককাকা শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন টাকাটা দিয়ে এসেছ?

সন্দীপ বলেছিল—হ্যাঁ—

—তা হলে সই করা কাগজটা দাও—হিসেবের খাতায় তুলতে হবে—

সন্দীপের কাছ থেকে নিয়ে মল্লিককাকা খরচটা হিসেবের খাতায় রাজুবালা দেবীর নামে জমা দিয়ে দিলেন। ওটা খরচ। ওই খরচটা খাতায় তুলতে হবে আর প্রতিদিন অন্যান্য খরচের সঙ্গে মোট খরচটা ঠাক্‌মা-মণিকে গিয়ে শোনাতে হবে। সব জমা সব খরচের খতিয়ানটা শুনে ঠাক্‌মা-মণি জমা-খরচের ওই তারিখের পাতায় ঢ্যাড়া সই মেরে দেবেন।

সেদিনও মল্লিকমশাই যথারীতি তেতলায় জমা-খরচের খাতা নিয়ে গেছেন। ফিরে এসে মল্লিককাকা আবার নিজের সেরেস্তার কাজ নিয়ে বসেন। আর সেই সময়টাতে সন্দীপ তার কলেজের বইপত্র নিয়ে পড়তে বসে। তারপর অন্যান্য কাজ সেরে যখন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয় তখন খেয়ে নেয়। কিন্তু সেদিন মল্লিককাকা তেতলা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। বললেন—ও সন্দীপ, তোমার ডাক পড়েছে—

ডাক পড়েছে! কীসের ডাক পড়েছে তা বুঝতে পারলে না সন্দীপ। সন্দীপের মুখের প্রশ্নবাচক চেহারা দেখে মল্লিককাকা বললেন—হাঁ করে দেখছো কী? তোমাকে ঠাক্‌মা-মণি একবার ডাকছেন—

ঠাক্‌মা-মণি! আমাকে ডাকছেন! কেন?

—বাঃ, তুমি খিদিরপুরে গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িতে গিয়ে টাকাগুলো দিয়ে এলে, সে-সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?

সন্দীপ বললে—আমি তো আপনাকে বলেছি সেখানে কাকে গিয়ে টাকাটা দিয়ে এলুম। তপেশবাবুর বউদির হাতের সইও তো আপনার কাছে জমা দিয়েছি—

—তা দিলেই বা। ঠাক্‌মা-মণি তবু সেই কথাটা তোমার মুখে শুনতে চান—

তারপর মল্লিকমশাই-এর সঙ্গে সন্দীপকেও আবার যেতে হলো। ফুল্লরা কালিদাসী সুধাকে পেরিয়ে একেবারে ঠাক্‌মা-মণির খাস-ঝি বিন্দুর এক্তিয়ারে।

বিন্দু খবর দিতেই ঠাক্‌মা-মণি বসবার ঘরে এলেন। মল্লিককাকা আর সন্দীপ দাঁড়িয়ে ছিল। বললেন—বসুন মল্লিকমশাই, বসুন—

বলে নিজে আগে বসলেন। তাঁকে বসতে দেখে মল্লিককাকা আর সন্দীপ তাঁর সামনে বসলো।

মল্লিকমশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন—এই-ই হলো সন্দীপ, মনসাতলা লেনে গিয়ে এই সন্দীপই তপেশ গাঙ্গুলীবাবুর হাতে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে এসেছে। সব আমাদের খরচের খাতায় জমা করে নিয়েছি--

সন্দীপ উঠে ঠাক্‌মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সন্দীপের মনে হলো ঠাক্‌মা-মণি তার ব্যবহারে যেন সন্তুষ্ট। জিজ্ঞেস করলে—তুমিই গিয়ে টাকাটা দিয়ে এসেছো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—টাকা পেয়ে বউমা'র কাকা কিছু বললেন?

সন্দীপ বললে—না,—

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—আমি যে পঁচিশ টাকা বেশি পাঠালাম, তার জন্যে তিনি খুশী?

সন্দীপ বললে—তা বুঝলাম না—

—একশো টাকার বদলে একশো পঁচিশ টাকা পেয়ে খুশী হলেন না?

সন্দীপ বললে—মুখে তো কিছু বললেন না। খুশী নিশ্চয়ই। খুশী না হলে তো কিছু বলতেন—

—আমার বউমা তোমার সামনে এসেছিল? বউমাকে তুমি দেখলে?

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারলে না। বাইরের ঘরে বসে গাঙ্গুলীবাবুর ভেতর-বাড়ির অনেক কথাই তো সন্দীপ শুনতে পেয়েছিল। তারপর খিড়কীর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিশাখা তার কানে-কানে কী কথা বলেছিল তা-ও তখন তার মনে ছিল। শুধু মনে থাকা নয়, তখনও যেন তার সামনে, শরীরে মনে কথাগুলো গুন্‌গুন্‌ করে গুঞ্জন করছিল। কেবল মনে হচ্ছিল সে যেন তখনও কানে শুনতে পাচ্ছে—জানো আমার কাকা-কাকীমা তোমাদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না—

সন্দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? বিয়ে দেবে না কেন?

—বাঃ, বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমাদের বাড়ির গিন্নী আর মাসে-মাসে এত টাকা পাঠাবে না। বিয়ের পর তো এই রকম মাসে-মাসে টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে—

—তা বন্ধ তো হয়ে যাবেই—

বিশাখা বলেছিল—টাকা পাওয়া বন্ধ হলে কাকীমা কোন টাকা দিয়ে সোনার গয়না গড়াবে?

এর পরে বিশাখার সঙ্গে আর কোনও কথা হয়নি। সন্দীপ বাসে উঠে বাড়িতে চলে এসেছিল। আর সেই দেখা হয়ে গিয়েছিল বেড়াপোতার গোপালের সঙ্গে। সেই গোপালও কলকাতায় চলে এসেছিল টাকা উপায়ের জন্যে। আর মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীবাবুও নিজের ভাই-ঝি'র বিয়ের সুবাদে টাকা উপায়ের পথ খুঁজে পেয়েছিল। তা হলে কলকাতার সব লোকই কি টাকার ধান্দায় ঘুরছে?

ঠাকমা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কী ভাবছো তুমি? কথা বলছো না যে? বউমাকে দেখলে তুমি? বউমা তোমার সামনে এসেছিল?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—কী রকম দেখলে তুমি তাকে?

সন্দীপ বললে—দেখলেম তো ভালো—

—তোমার সঙ্গে বউমার কিছু কথা হলো?

কী বলবে সন্দীপ এ-প্রশ্নের জবাবে? শুধু বললে—না—

মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে কথাগুলো যেন জিভে আটকে গেল।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আচ্ছা যাও, এর পরের মাসের পয়লা তারিখে যখন যাবে তখন তুমি কথা বলবে, বুঝলে? বউমা কথা বলুক আর না বলুক তুমি নিজে থেকে কথা বলবে—

সন্দীপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—আমি কী কথা বলবো?

—জিজ্ঞেস করবে বউমা কেমন আছে। বলবে, ঠাক্‌মা-মণি জানতে চেয়েছেন দুধ খাচ্ছে কিনা, মাছ-মাংস খাচ্ছে কিনা, ফল-টল খাচ্ছে কিনা, এই সব। আরো জিজ্ঞেস করবে লেখাপড়া কেমন শিখছে। সব কথা জিজ্ঞেস করবে তুমি, বুঝলে? ওই-সব কথা যদি জিজ্ঞেস না-ই করবে তাহলে তুমি ও বাড়িতে যাচ্ছো কেন? শুধু কি টাকা দিতেই যাচ্ছো? তা তো নয়। টাকা তো মনি-

অর্ডার করেও পাঠানো যায়, মনি-অর্ডার করে টাকা না পাঠিয়ে তোমার হাত দিয়ে টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি দেখে আসবে বউমাকে, বউমার সঙ্গে কথা বলবে। সব দরকারী কথা জিজ্ঞেস করবে, সেই জন্যেই তোমাকে পাঠানো—বুঝছো?

সন্দীপ বাধ্য ছেলের মত মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ, বুঝেছি—

তারপর মল্লিককাকার সঙ্গে আবার তেতলার সিঁড়ি বেয়ে একতলায় খাজাঞ্চিখানায় এসে হাজির হলো। নিজের ঘরে এসে মল্লিককাকা বললে—তুমি কী রকম ছেলে গো? তুমি শুধু টাকাটা দিলে আর চলে এলে? কিছু বললে না।

সন্দীপ অপরাধীর মত চুপ করে রইল। কোনও কথাই বললে না। আসলে বিশাখার সঙ্গে সত্যিই যে-সব কথা হয়েছিল, তা-তো আর কাউকে বলা যায় না?

মল্লিককাকা আবার বলতে লাগলেন—এই মাসে-মাসে যে এক কাঁড়ি টাকা পাঠানো হচ্ছে বউমার কাছে তো সে-টাকা কাকে খাচ্ছে, না বকে খাচ্ছে, তা দেখতে হবে না? এ-সব কথাও কি তোমাকে বলতে শিখিয়ে দেওয়া হবে? তোমারও তো নিজস্ব একটা বুদ্ধি আছে—তুমি তো আর ছেলেমানুষটি নও—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমি বিশাখার কাকার সামনে ও-সব কথা কী করে জিজ্ঞেস করবো? শুনলে বিশাখার কাকা রেগে যাবে না? আমাকে যদি তারা দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়?

মল্লিককাকা বললেন—তা কড়া কথা যদি বলেই তো তাহলে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়বে?

সন্দীপ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমার ভুল হয়ে গেছে—

মল্লিককাকা বললেন—না-না, তুমি মনে কিছু কোর না। এ-সব কাজ একটু বুদ্ধি খরচ করে করতে হয়—

মল্লিককাকার বেশী কথা বলার সময় ছিল না। তিনি আবার হিসেবের গোলকধাঁধার মধ্যে ডুবে গেলেন।
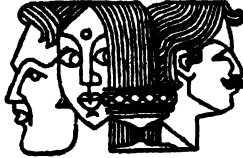
স্কট লেনে কলেজ থেকে বেরিয়ে সন্দীপ আমহার্স্ট স্ট্রীটে এসে পড়লো। এই রাস্তা দিয়ে এসে-এসে রাস্তাগুলো সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল তার। এ যেন অনেকটা মানুষের জীবনের মত। জন্মাবার পর একটু জ্ঞান হলেই মানুষ অনেক কিছু দেখে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একই সময়ে সূর্য ওঠা, একই সময়ে সূর্য ডোবা, গ্রীষ্মে গরমে ঘামে ভিজে যাওয়া, শীতে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপা, এ-সব ঘটনা মানুষের মনে কোনও রকম প্রভাব বিস্তার করে না। সমস্ত বিশ্বের তাবৎ নিয়ম-নীতিগুলো তার চোখে একঘেয়ে ঠেকে।

কিন্তু কিছু কিছু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে কেন সূর্য ওঠে, কেন সূর্য ডোবে, আবার কেনই-বা গ্রীষ্মে সূর্য অত আগুন ঢালে, আর শীতকালেই বা সেই সূর্যের আলো আবার কেনই-বা মিষ্টি লাগে!

যাঁদের মনে এই প্রশ্ন জাগে তাঁরাই হন কোপারনিকাস, গ্যালিলিও। তাঁরাই হন নিউটন, আর আইনস্টাইন—

সেদিন সন্দীপের মনে এই প্রশ্নটাই কেবল জাগতো। কেন মনসাতলা লেনের বাড়িতে ঠাক্‌মা-মণি মাসে মাসে অত টাকা পাঠান? ওই বিশাখার মধ্যে এমন কী সৌন্দর্য দেখছেন, ঠাকমা-মণি?

আর ওই সৌম্য? সৌম্য মুখার্জি? ঠাকুমা-মণির নাতি?

মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি কৌতূহল সন্দীপের। একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের কেন এত তফাৎ? ঠিক এক রকম মানুষ তো দু'জন হয় না, যত গুলো মানুষ তত রকম স্বভাব। এক স্বভাব কেন দু'জনের হয় না? কেন বেড়াপোতাতে হাজরা বুড়োর মত মানুষ একজনও আর ছিল না? ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের বংশধররা সবাই কেন একরকম নয়? কেউ উকীল, কেউ বসে বসে টাকার সুদ খায়? তার মা যেমন চাটুজ্জেবাড়িতে রান্না করতে যেত, পাড়ার মধ্যে আর কারো মা তো পরের বাড়িতে রান্না করতে যেত না।

আর এই যে বারোর-এ নম্বর বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে যারা থাকে, তারা কেন এত চাকর-বাকর পোষে?

সেদিন সন্দীপ হঠাৎ খোকাবাবুকে দেখে ফেললে। অত বড় বাড়িটার রং করা হচ্ছিল। রাজমিস্ত্রীরা বাঁশের ভারা বেঁধে তার ওপর বসে বাড়িটার চেহারা ফিরিয়ে দিচ্ছে। এটা প্রতি বছরে একবার করে করা হয়।

সন্দীপ বাইরে থেকে বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল, পাশে কে একজন দাঁড়িয়ে বোধহয় রাজমিস্ত্রীদের কাজের তদারক করছিল তখন।

সন্দীপকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—কে যায়? কে ভেতরে যায়? কে আপনি?

সন্দীপ থমকে দাঁড়ালো। ভদ্রলোককে ভালো করে দেখলে। তারপর বললে—আমি সন্দীপ—

সন্দীপকে ভদ্রলোক চিনতে পারলেন না। বললে—সন্দীপ? সন্দীপ মানে?

গিরিধারী দারোয়ান এগিয়ে এসে বললে—হুঁজুর, ইনি সরকারমশাইয়ের লোক—

সেই-ই বলতে গেলে খোকাবাবুর সঙ্গে সন্দীপের প্রথম পরিচয়। শুধু প্রথম পরিচয়ই নয়, বলতে গেলে সেই-ই প্রথম মুখোমুখি দেখা।

সন্দীপ বলে উঠলো—আমার পুরো নাম সন্দীপকুমার লাহিড়ী। আমি মল্লিকমশাই-এর কাজকর্ম দেখি আর রাত্তিরে বঙ্গবাসী কলেজে বি. এ. পড়ি, আর মল্লিকমশাই-এর সঙ্গে থাকি

—ও—

সন্দীপ ভালো করে দেখে বুঝতে পারলে খোকাবাবুকে সত্যিই সুদর্শন মানুষ বলা চলে। এর সঙ্গে মনসাতলা লেনের বিশাখার বিয়ে সত্যিই ভালোই মানাবে। এমন চমৎকার চেহারার লোক আগে আর কখনও দেখেনি সন্দীপ।

—আপনার দেশ কোথায়?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতা গ্রামের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ।

—বাড়িতে কে-কে আছে আপনার?

সন্দীপ বলল—আমার এক মা ছাড়া আর কেউ নেই। ছোটবেলায় আমার বাবা মারা গেছেন। আমি বাবাকে দেখিনি।

সৌম্যবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ির অবস্থা ভালো?

সন্দীপ বললে—আমার মা খুব গরীব, আমাদের গ্রামে চ্যাটার্জিবাড়িতে মা রান্না করে আমাকে লেখাপড়া করিয়েছে—

—ও—

বলে কী যেন ভাবলেন। তারপর অন্যদিকে চেয়ে আবার রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখতে লাগলেন। কিন্তু সন্দীপ চলে আসার পরেই হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলেন—আর একটা কথা শুনুন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ আপনার নামটা কী বললেন?

—সন্দীপকুমার লাহিড়ী—

সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। এই এঁরই সঙ্গে বিয়ে হবে মনসাতলা লেনের বিশাখার। যে বিশাখার কাকাকে সন্দীপ মাসোহারা দিয়ে এসেছিল এই সেদিন। এর বিয়ের জন্যেই ঠাকমা-মণির এত দুশ্চিন্তা। এত গুরুদেবভক্তি, এত টাকা-পয়সা খরচ এত গঙ্গাস্নান। এই-সব ভবিষ্যৎ ভেবেই ঠাকমা-মণির এত উদ্বেগ। এই যা-কিছু সম্পত্তি সমস্তরই মালিক এই মানুষটা।

সন্দীপের যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। বিশাখাকে সে খিদিরপুরে গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে, সে বিশাখা তার কানে-কানে বলেছে যে তার কাকা এ বিয়ে হতে দেবে না, সেই বিশাখার সঙ্গে এরই বিয়ে হবে। কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে সন্দীপ যেন ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলো। সে যদি বেড়াপোতা থেকে এই কলকাতায় না আসতো তাহলে তো এই জিনিস দেখতে পেত না। এতদিন কলকাতায় এসেছে কিন্তু এই সৌম্য মুখার্জির মত সুপুরুষ চেহারা তো সন্দীপ আর কাউকে দেখতে পায়নি।

মল্লিকমশাই তখন বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছ থেকে হিসেব বুঝে নিচ্ছিলেন। যে কন্দর্প পুজোবাড়িতে ঠাকুরের ফুল বেলপাতা যোগায়, যে দশরথ গঙ্গার বাবুঘাটে ঠাকমা-মণির কপালে চন্দনের ফোঁট লাগিয়ে দেয়, যে কামিনী ঠাকুরবাড়ির মেঝে ঝাড়াপোঁছ করে গঙ্গাজল দিয়ে যায়, তাদের সকলের দাবী, তাদের সকলের নালিশ রোজই না কিছু তাঁকেশুনতে হয়। তাদের দাবী যেমন কিছু কিছু মেনে নিতে হয় মল্লিকমশাইকে, তেমনি আবার তাদের বহু অভিযোগেরও প্রতিকার করতে হয়, কারো মাইনে বাড়াবার দাবী, কারো নালিশের তদন্ত, কারো অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা। তার ওপর আবার বাড়ি মেরামতের দরুন যথাবিধি চুন-সরকি-সিমেন্টের যোগানের ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে।

সন্দীপ ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে তাই-ই দেখছিল। মল্লিকমশাইকে কথাগুলো বলবার জন্যে একটু সুযোগ খুঁজছিল। মালিকের বিয়ের ব্যাপারে মল্লিককাকার এত হেনস্থা, যার বিয়ের ব্যাপারে মল্লিককাকাকে কাশীধামে গিয়ে ঠাকমা মণির গুরুদেবকে কলকাতায় নিয়ে আসবার আর আবার তাঁকে কাশীধামে পৌঁছিয়ে দেবার পরিশ্রম করতে হয়েছিল, সেই সৌম্য মুখার্জিকে যে সন্দীপ দেখেছে সেই সংবাদটা তাঁকে বলতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু সকালবেলাটা মল্লিককাকার এই রকম ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। আর হঠাৎ তাঁর অমনোযোগিতার ফলে যদি কোথাও কিছু ত্রুটি থেকে যায় তো তার জন্যে তো ঠাকমা-মণির কাছে তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে।

সন্দীপ অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এ-সব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা দেখে দেখে তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এ-বাড়িতে এতদিন একটানা থাকার পর সন্দীপ দেখে বুঝে নিয়েছিল যে যারাই মল্লিকমশাই-এর কাছে আসে তাদের সঙ্গে মল্লিকমশাই-এর মাত্র একটাই সম্পর্ক ছিল- আর সে সম্পর্কটা হলো টাকার। বোধ হয় টাকার শেকল দিয়েই আষ্টে-পৃষ্ঠে সকলের সঙ্গে সকলের গাটছড়া বাধা ছিল। আর তখনই সন্দীপ বুঝে নিয়েছিল যে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সঙ্গে তাবৎ মানুষের সম্পর্কের যোগসূত্রটাই হচ্ছে টাকা। আর এই যে সে বেড়াপোতার গ্রাম থেকে বারোর এ বিডন স্ট্রীটের মুখার্জি বাড়িতে এসেছে আর থাকা-খাওয়া পাচ্ছে এর পেছনেও সেই টাকা। আর শুধু সে-ই নয়, পৃথিবীর সব ছেলে মেয়েই পরস্পরের সঙ্গে টাকা দিয়েই বাঁধা। নইলে বিশাখার সঙ্গে এ বাড়ির সৌম্যর কেন বিয়ে হচ্ছে? বিশাখার বিধবা মা তো জানতেও চায়নি যে যার সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, সে কেমন মানুষ, সে কেমন দেখতে। জামাইকে যোগমায়া দেবী তো দেখতে চায়ও নি! আর দেখা দূরের কথা, দেখতে চাওয়ার অধিকারও হয়ত তার নেই। শুধু এইটুকু জেনেই তাকে খুশী থাকতে হয়েছিল যে ভাবী জামাই-এর অনেক টাকা আছে, আর সেই টাকা থাকাটাই তার সবচেয়ে বড় গুণ। পাত্রের চেহারা কেমন, পাত্রের চরিত্র কেমন, পাত্রের ঠিক বয়েস কত, তা আমার জানবার দরকারও নেই। আমি শুধু এইটুকুই জানতে চাই যে, যে-বাড়িতে, যে-বংশে আমার বিশাখার বিয়ে হবে, সে-বাড়ির বউ হবার পর আমার মেয়ের যেন কখনও অর্থকষ্ট না থাকে। যেন আমার মেয়ে স্বচ্ছলভাবে খেতে-পরতে পায়।

সন্দীপের মনে তখন থেকেই একটা প্রশ্নচিহ্ন বরাবর চোখের সামনে ভাসতো। সেই প্রশ্নচিহ্নটা কেবল তাকে শাসাতো। বলতো — তুমিও এ বাড়ির অন্য সকলের মত আরো একটা চাকর। তোমার এ সব জানতে চাওয়ার অধিকার নেই। এ বাড়ির নাতির সঙ্গে যারই বিয়ে হোক, তাতে তোমার কোনও কৌতূহল থাকা অন্যায়। তোমার কাজ শুধু হুকুম তামিল করা। তুমি শুধু চোখ-মুখ বুজে হুকুম তামিল করে যাবে, এইটেই তোমার কপালের লিখন।

কাজের ভিড়ের মধ্যে মল্লিকমশাইকে প্রশ্নটা করবার সুযোগ হলো না। কিন্তু মনের ভেতরে প্রশ্নটা কেবল খোঁচা দিতে লাগলো। সুযোগ মিললো বিকেলের দিকে যখন মল্লিককাকা একলা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সারা দিনের পরিশ্রমের পর মল্লিকমশাই তখন বোধহয় ক্লান্ত ছিলেন। সন্দীপ তার সামনে বসে জিজ্ঞেস করলে — মল্লিককাকা, সারা বাড়িতে খুব রাজমিস্ত্রী খাটছে কেন?

মল্লিককাকা বললেন — এ তো ফি বছরেই হয়। এ বাড়ির বরাবরের নিয়ম এই।

— এতে তো অনেক টাকা খরচ হয়?

মল্লিককাকা বললেন — তা তো হবেই, সে টাকা খরচ করবার জন্যেই তৈরি হয়েছে।

সন্দীপ বললে — টাকা থাকলেই কি খরচ করতে হবে?

মল্লিককাকা বললেন — কে তোমাকে বললে এতে টাকা নষ্ট হয়?

সন্দীপ বললে — বাড়িটা তো নতুন ছিল, পাঁচ বছর পরে রাজমিস্ত্রী লাগালেই হতো। তাহলে এতগুলো টাকাও বেঁচে যেত।

মল্লিককাকা কথাটা শুনে হাসলেন। বললেন — দেখো সন্দীপ, তুমি ছেলেমানুষ বলেই ও কথা বললে। যখন তোমার অনেক বয়েস হবে তখন বুঝতে পারবে অনেক সময় টাকা খবচ করলেই অনেক টাকা লাভ, এই মুখুজ্জেবাড়ির এত টাকা যে এরা যত টাকা নষ্ট করবে তত এদের লাভ হবে।

—তার মানে? টাকা নষ্ট করলে আবার টাকা লাভ হবে কী করে?

—সে-সব এখন তুমি বুঝবে না।

—কবে বুঝবো?

মল্লিককাকা বললেন—তুমি যখন আরো বড হবে, যখন সংসারে ঢুকবে, তখন জানতে পারবে 'ইনকাম-ট্যাক্স' বলে আমাদেব দেশে একটা জিনিস আছে। সেই 'ইনকাম ট্যাক্সের' আইনে যত তুমি টাকা খবচ কববে, যত তুমি মদ খাবে, যত টাকা ওড়াবে, তত তুমি গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে 'ট্যাক্সে'র সুবিধে পাবে, তত তুমি ট্যাক্সো থেকে বেহাই পাবে। বেহাই পাওয়া মানেই লাভ। কথাটা বুঝলে?

সন্দীপ কিছুই বুঝতে পারলে না। বোকার মত চেয়ে রইল মল্লিককাকার দিকে। এবার হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা। সন্দীপ বললে—মল্লিককাকা, আজকে এতদিন পরে এ বাড়ির খোকাবাবুকে দেখলাম—সৌম্যবাবুকে—

—কোথায়?

—এই যে বাড়িটায় রং লাগানো হচ্ছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রীদের কাজের তদারকি করছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কে?

—তুমি কী বললে?

সন্দীপ বললে—আমি সব কথা বললুম! আচ্ছা কাকা, এবার খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের যে মেয়েটির কাকাকে টাকা দিয়ে এলুম, তার সঙ্গেই বুঝি এর বিয়ে হবে? ভারি চমৎকার দেখতে কিন্তু সৌম্যবাবুকে। দু'জন খুব মানাবে—

কথাগুলো শুনে মল্লিককাকা খুশী হতে পারলেন না। বললেন—তুমি ও-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? কার সঙ্গে কার বিয়ে হলে কেমন মানাবে, কি মানাবে না, তোমার ও-সব ভেবে লাভ কী?

সন্দীপ বললে—আমি ভাবছি না, শুধু বলছি আপনাকে—

—না, তোমাকে ও-সব কথা বলতেও হবে না-আলোচনাও করতে হবে না—

কথাটা বলতে বলতে মাথা পথে বাধা পড়লো। বাজমিস্ত্রী ঘবে ঢুকে বললে—সবকাববাবু, আবো চাব বস্তা সিমেন্ট চাই।

মিস্ত্রী ও আবো কী সব কাজেব কথা বলতে লাগলো। কিন্তু সন্দীপেব সে সব কথা শুনতে ভালো লাগলো না। সে ঘব ছেড়ে চলে গেল। তাব চোখেব সামনে তখনও ভাসতে লাগলো সৌম্য মুখাজ্জি [illegible] মুখ, এত সুন্দবও হয়।
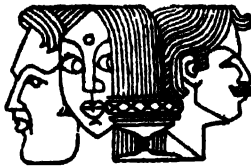
কলেজ থেকে সেদিন ঠিক সময়েই ফিবে এসেছিল সন্দীপ, কলেজেও সমস্তক্ষণ কেবল তাব মনে পড়ছিল সৌম্য মুখার্জিব চেহাবাখানা। সেদিন গোপালেব চেহাবা দেখে যেমন হয়েছিল, এও তেমনি। অথচ কত বন্ধু হয়েছিল তাব কলেজে ঢুকে।

কত বকমেব ছেলে সব। বেশিব ভাগই চাকবি কবে। দিনেব বেলা চাকবি, আব বাত্রে কলেজে পড়ে। কিন্তু তাদেব সঙ্গে বেশি কথা বলবাব সময় থাকে না। বিডন্ স্ট্রীটেব বাড়িতে বাত ন'টাব আগে ফিবতে হয়, নইলে গিবিধাবী লোহাব গেট বন্ধ কবে দেবে।

মল্লিককাকা বলেন—আব একটু আগে আসতে পাবো না? তোমাব জন্যে খাবাব ঢেকে বাখতে হয়—

সন্দীপ বলে—তাহলে যে ট্রামে কি বাসে আসতে হয়, মিছিমিছি পযসা নষ্ট কবতে ভালো লাগে না।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। সন্দীপ স্কট লেন থেকে প্রায দৌড়তে দৌড়তে আসে। আমহার্স্ট স্ট্রীট ধবে এলে অনেক সময বাঁচে। আমহার্স্ট স্ট্রীটেব ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে দোকানেব ঘড়িগুলোব দিকে চেয়ে দেখে সে। ঘড়িব কাঁটাটা যত ন'টাব দিকে যেতে থাকে তত হাঁটাব গতিব বেগ বাড়িয়ে দেয়। তাবপবে বাড়িব গেট পেবিয়ে ভেতবে উঠোনে ঢুকে একটা স্বস্তিব দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

[illegible] এলেন বাবুজী?

সন্দীপেব সঙ্গে সঙ্গে যেন গিবিধাবীও স্বস্তিব নিঃশ্বাস ছাড়ে। ততক্ষণে সিংহবাহিনীব মন্দিবে নিত্যপূজা শেষ হয়ে গেছে। তাবপবই খাওয়া। খেতে বেশি সময লাগে না। কিন্তু তাবপবে আব [illegible] মশাবি টাঙিয়ে দিয়ে মল্লিকমশাই শুয়ে পড়েন। সন্দীপও সেই একই ঘবে শোয। খানিক পবে মল্লিককাকাব [illegible] শব্দ হয। কিন্তু সন্দীপেব তখনও ঘুম আসতে চায না। তখন সাবা পৃথিবীব বাজ্যেব ভাবনা মাথায চেপে বসে। কখনও মনে পড়ে মা'ব কথা। মা বোধহয এতক্ষণে চাটুজ্জেবাড়ি থেকে ভাত এনে খেযে-দেযে বাসন-কোসন মেজে বিছানায শুযে পড়েছে।

ওপব থেকে হঠাৎ ঠাঁক্মা-মণিব গলার আওয়াজ আসে—গিরিধারী, গেট বন্ধ করে দাও।

আব তাবপব লোহাব গেট বন্ধ কবার ঘড়ঘড় শব্দ। সমস্ত বাড়িটা তখন নিঝুম, নিঃস্তব্ধ হয়ে আসে। তখন সন্দীপেব মনে হয কাবোব ইঙ্গিতে যেন এত বড় বাড়িটা একটা মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হযে গেছে। সে চুপ কবে শুযে থাকে। তাবপর আব কতক্ষণ কেটে যায় কে জানে। হয়ত ঘড়িতে তখন বাত দশটা কি এগাবোটা বাজে। ঠিক সেই সমযে লোহাব গেটটা খোলাব শব্দ হয আবাব।

সেদিনও আবাব সেই একই বকম শব্দ হলো। কিন্তু সেদিন আব সন্দীপ চুপ কবে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলো না। পাশেই মল্লিককাকাব নাক ডাকছে। সে টিপি-টিপি পায়ে বিছানা ছেড়ে

উঠলো। তারপর আস্তে-আস্তে দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। চারদিক অন্ধকার। দেখলে বাইরের গ্যারেজ-এর দরজা খুলে গিরিধারী একটা গাড়ি ঠেলতে-ঠেলতে গেট-এর বাইরের রাস্তায় বার করে নিয়ে গেল। পাশেই সৌম্যবাবু শার্ট-প্যান্ট পরে দাঁড়িয়েছিল। গাড়িটা রাস্তায় বেরোতেই সৌম্যবাবু গাড়িটার ভেতরে গিয়ে বসলো। আর গাড়িটাকে সৌম্যবাবু চালিয়ে নিয়ে চলে গেল—এমন করে চালিয়ে নিয়ে গেল যাতে বেশী শব্দ না হয়!

গিরিধারী আবার গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সন্দীপকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলো। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—গিরিধারী—

গিরিধারী বললে—আপনি সব দেখেছেন নাকি বাবুজী?

সন্দীপ বললে—ও কে গিরিধারী? খোকাবাবু গেলেন না?

গিরিধারী বললে—আপনি এখনও ঘুমোন নি?

সন্দীপ বললে—আমি তো ঘুমোচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তোমার গেট খোলার শব্দ পেয়েই উঠে পড়লুম।

গিরিধারী আবার গেটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে চাবি বন্ধ করে দিলে। বললে—কাউকে যেন বলবেন না বাবুজী। সবকারবাবু যেন জানতে না পারেন—

অন্ধকারের মধ্যেই সন্দীপ দেখলে, ভয়ে যেন গিরিধারীর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—বলো না গিরিধারী, খোকাবাবু এত রাত্তিরে গেলেন কোথায়?

গিরিধারী ভয় পেয়ে কথার জবাবটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইলো। যেন একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে, এমনি তার মুখের চেহারা। সন্দীপ বললে—ঠাক্‌মা-মণি তো রোজ ন'টার সময় তোমাকে দরজা বন্ধ করতে হুকুম করেন?

গিরিধারী বললে—কী করবো বাবুজী, আমি তো হুকুম কা নোকর, মাঈজী তো ন'টার সময় গেট বন্ধ করবার হুকুম করেন, কিন্তু খোকাবাবু? খোকাবাবু ভি তো হামার মালিক! খোকাবাবু হুকুম করলে কি তামিল না করে থাকতে পারি? উও দোনো হি তো মেরা মালিক—

এর কোনও জবাব সন্দীপের মুখে যোগালো না। আর কী-ই বা জবাব ছিল সন্দীপের? সন্দীপের নিজের অবস্থাটাও তো ওই গিরিধারীর মতই। ঠাক্‌মা-মণিও তার মালিক, আর সৌম্যবাবুও তার মালিক। যেদিন ঠাক্‌মা-মণি থাকবে না তখন তো এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে ওই খোকাবাবুই, ওই সৌম্য মুখার্জিই। ওই যার সঙ্গে খিদিরপুরের বিশাখার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে। তখন? তখন কী হবে? তখনকার কথা ভেবেই তো কাজ করতে হবে গিরিধারীকে। শুধু গিরিধারীকেই নয়, সন্দীপকেও তার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তো এখন থেকে কাজ করতে হবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এখন তো সৌম্যবাবু গেলেন, তা ফিরবেন কখন?

গিরিধারী বললে—তা কি বাবুজী হামি বলতে পারি? রাত তিন বাজতেও পারে, কভি-কভি রাত চারটেও বাজতে পারে!

—তাহলে তো তোমাকে পুরো রাতই জেগে থাকতে হয়?

—তা তো হয়ই বাবুজী! লেকিন হামি কী করবো? আসলি তো হামি লোগ নোকর আছি মালিক কা—

সন্দীপের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে কোথায় যান খোকাবাবু?

গিরিধারী বললে—কেয়া মালুম বাবুজী, খোকাবাবু কোথায় যান—

তা-তো বটেই! সন্দীপের মনে হলো—সত্যিই তো, খোকাবাবু কোথায় যান তা গিরিধারী কেমন করে জানবে! গিরিধারী তো একজন চাকর মাত্র। আর সন্দীপ নিজেও তো একজন চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবু কৌতূহল কি এত সহজে যায়? বিছানায় শুয়ে শুয়েও সন্দীপের মনে হতে লাগলো—এত রাত্রে কোথায় যায় সৌম্যবাবু? রাত্রে তার কী এত কাজ? এমন কী কাজ থাকতে পারে যাতে

ঠাক্‌মা-মণিকে লুকিয়ে, কাউকে না জানিয়ে, এত বড়লোকের বাড়ির ছেলে রাত দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় রাত কাবার করে সকাল হবার আগেই লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে ফেরে? কোথায় যায় সৌম্যবাবু? যায় কোথায়? যেখানে যায় সেখানে কীসের আকর্ষণ আছে? টাকার না মেয়েমানুষের? কে সন্দীপের এই কৌতূহলের জবাব দেবে?
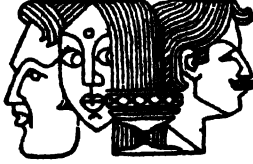
তার পরদিন থেকেই সন্দীপের কেমন যেন এক ধরনের অন্যায় কৌতূহল সারা মনে পরিব্যাপ্ত হয়ে রইল। তাহলে এই-ই হলো খোকাবাবু। অর্থাৎ এরই নাম সৌম্য। সৌম্য মুখার্জি। মুখার্জি-স্যাক্‌সবি ইন্ডিয়া লিমিটেডের একজন ডাইরেক্টর। এরই বিয়ের জন্যে ঠাক্‌মা-মণি খিদিরপুরে মনসাতলা লেনে পাত্রী পছন্দ করে রেখেছেন! এরই জন্যে পছন্দ করা পাত্রীকে এত বছর ধরে মাসোহারা টাকা মাসে-মাসে দিয়ে আসছেন ঠাক্‌মা-মণি।

কেমন যেন খট্‌কা লাগলো সন্দীপের মনে! এই-ই যদি পাত্র হল তো এ কী রকম পাত্র! বাড়ির আইন তো এই যে এ-বাড়িতে রাত ন'টার পর কেউই এ-বাড়িতে ঢুকতেও পারবে না, আবার কেউ এ-বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতেও পারবে না। তাহলে?

যদি এত রাত্রে কেউ এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে এ খবরটা কি ঠাক্‌মা-মণি জানে? নাকি ঠাক্‌মা-মণিকে না জানিয়েই বাইরে যায় খোকাবাবু! বাইরে গেলে কেন বেরোবার সময় গাড়ির শব্দ হয় না? কেন গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে সেটাকে ঠেলে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়?

তাহলে গিরিধারী নিশ্চয়ই সব জানে! গিরিধারী তো আজ্ঞাবহ চাকর। তার কাছে ঠাক্‌মা-মণি যেমন মালিক, তেমনি খোকাবাবুও তো তার একজন মালিক। সে কী করে খোকাবাবুর হুকুম অমান্য করে?

পর-পর কদিনই সন্দীপ এই ঘটনা লক্ষ্য করলে। মল্লিককাকা যখন বিছানায় শুয়ে নাক ডাকায় তখন সন্দীপ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। প্রতি রাত্রেই সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! প্রতি রাত্রেই সেই অন্ধকারের মধ্যে গিরিধারীর গেট খুলে দেওয়া, তারপর সেই গাড়িটা ঠেলে রাস্তায় পৌঁছিয়ে দেওয়া আর প্রতি রাত্রেই সৌম্যবাবুর সেই গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়া।

অথচ সন্দীপ যখন কলেজ থেকে বাড়িতে ফেরে গিরিধারী তখন কত বিনয়ী, কত ভদ্র। যেন ভাজা মাছও উল্টে খেতে জানে না।

বলে—রাম-রাম বাবুজী, রাম-রাম—

সন্দীপও জবাবে বলে—রাম-রাম গিরিধারী, রাম-রাম—

যে গিরিধারী রাত্রে ঘুষ খেয়ে বেআইনী কাজ করে, সকালবেলা তাকে দেখে বোঝাও যায় না যে সে অত গর্হিত অপরাধে অপরাধী। তার মুখে সে-অপরাধের কোনও চিহ্নও থাকে না। সে তখন স্নান করে কাচা কাপড় পরে শুদ্ধ হয়ে তার নিজের কোঠরে বসে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' পড়ে। সে সুর করে পড়ে—

সীয়ারামময় সব জগ জানি
করহু প্রণাম জোরি যুগ পাণি।

আ, গলার সুরে তখন সে কী ভক্তি, সে কী আর্তি! সে যেন তখন ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হয়ে কেঁদেই ফেলবে। অথচ রাত্রিবেলাই তার আবার অন্য রূপ। অন্য চেহারা। সে তখন আবার অন্য মানুষ!

সেদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল।

সন্দীপ কলেজ থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসছিল। ন'টার মধ্যে যাতে বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছতে পারে, তার জন্যেই তার খুব দুশ্চিন্তা ছিল। হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে আসতেই চারিদিকে হৈ-চৈ শব্দ শুনে সে চমকে উঠলো। রাস্তার ওপরেই অনেক লোকের ভিড়। আশেপাশে পুলিস লাঠি নিয়ে সকলকে তাড়া করছে। পুলিসের তাড়া খেয়ে একদল ছেলে একদিকে পালাচ্ছে, আর ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে আর একদল ছেলে এসে পুলিসের ওপর ঢিল ছুঁড়ছে। একদিকে পুলিস আর অন্য দিকে ছেলের দল। এদের মধ্যে পড়ে গিয়ে সন্দীপ দিশেহারা হয়ে পড়লো। সে রাত ন'টার আগে কী করে বাড়ি ফিরবে? যদি গেট বন্ধ হয়ে যায়? যদি সে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়? সে কী খাবে? সে কোথায় শোবে? কলকাতা শহরে তার তো এমন কোনও জানাশোনা বন্ধুর বাড়ি নেই যেখানে গিয়ে সে রাত কাটাতে পারে! তার কাছে কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই। রাত্রে খুঁজলে হয়ত কিছু চায়ের দোকান কি পাঞ্জাবীদের হোটেল খোলা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দু'তিন টাকা পকেটে না থাকলে সে কোন্ মুখে সেখানে ঢুকবে!

একটা লোক পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য করে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই এখানে?

লোকটা ছুটতে-ছুটতে বললে—পালিয়ে যান, এখখুনি পুলিস গুলি চালাবে—

কেন পুলিস গুলি চালাবে, তা বললে না লোকটা। কথাটা বলেই লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে-ওদিকে আরো কিছু মানুষের দৌড়োদৌড়ি-হুড়োহুড়ি দেখে সন্দীপেরও কেমন ভয় করতে লাগলো। তাহলে কি আমহার্স্ট স্ট্রীট ছেড়ে সে অন্য রাস্তা দিয়ে যাবে? আশেপাশে উত্তর দিকে যাবার অনেক গলি-ঘুঁজি আছে, সে দেখেছে। কোনও গলিতে সে ঢুকবে নাকি?

কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে অচেনা-অজানা গলিতে ঢুকে যদি সে বিপদে পড়ে, তখন কী হবে? বড় রাস্তায় তবু সব-কিছু দেখতে পাচ্ছে সে। সামনে-পেছনে অনেক মানুষ, অনেক ট্রাম-বাসের ভিড়। তার কিছু বিপদ হলেও কেউ-না-কেউ তাকে বাঁচাতে আসতেও পারে। কিন্তু অন্ধকার বাঁকা-চোরা গলিতে কেউ যদি তাকে খুনও করে যায় তো কে তাকে দেখবে? কেউ দেখবার আগেই তো সে মরে ভূত হয়ে যাবে। তাহলে?

সন্দীপ ঠিক করলে, না, ও পথে সে যাবে না। শেয়াল'দা দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড দিয়েও বিডন্ স্ট্রীট-এ যাওয়া যায়। আবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়েও যাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে যাওয়াই ভালো।

হঠাৎ কোথায় বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ হলো। আর কোথাও বিকট শব্দ হলে যেমন পায়রার ঝাঁক ঝট্-পট্ করে পাখা উড়িয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে শুরু করে, রাস্তায় যে-ক'টা মানুষ তখনও যাতায়াত করছিল তারা আর দেরি করলে না, যে যেদিকে রাস্তা পেলে সেইদিকেই ছুটে পালালো। মহাত্মা গান্ধী রোডে তখন আর ট্রাম-বাস কিছু চলছে না। সামনে-পেছনে, উত্তরে-দক্ষিণে কেউ কোথাও নেই। যে-ক'টা সোনার গয়নার দোকান অত রাত্রেও খোলা থাকে, তা-ও গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। চারদিকের আবহাওয়া দেখে সন্দীপ খুব ভয় পেয়ে গেল। রাত ন'টার আগে সে বাড়িতে পৌঁছতে পারবে না। যদি রাত ন'টার আগে তাকে বাড়ি পৌঁছতেই হয় তো একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়ার টাকা কোথায় পাবে? অন্ততঃ চার টাকা কি পাঁচ টাকা তো লাগবেই। হয়ত তার বেশিও লাগতে পারে! সে টাকা সে কোথা থেকে দেবে?

অন্য উপায় না পেয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে সোজা কলেজ স্ট্রীটের দিকে চলতে লাগলো। সেখান থেকে বিড্ন স্ট্রীটের দিকে যেতে অন্ততঃ কম করেও কুড়ি মিনিট সময় তো লাগবে! তখনও সমস্ত রাস্তা আতঙ্কে থম্থম্ করছে। জনপ্রাণী কম। বলতে গেলে সব-

রাস্তাতেই লোকচলাচল কমে এসেছে। একটু পরেই একেবারে নির্জন হয়ে যাবে রাস্তাটা। তার আগেই তাকে গিয়ে পৌঁছতে হবে বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কর্পোরেশনের বাজারটার সামনে আসতেই একজন লোক তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে- হ্যাঁ মশাই, ওদিকে কী হয়েছে বলতে পারেন?

সন্দীপ বললে—কী হয়েছে বলতে পারি না, তবে শুনলাম পুলিসের সঙ্গে মারামারি হচ্ছে—

লোকটা বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কী নিয়ে মারামারি হচ্ছে?

সন্দীপ বললে—তা জানি না। তবে ওদিকে না-যাওয়াই ভালো। পুলিস গুলি ছুঁড়তে পারে।

—কেন? কী হয়েছে?

কে একজন লোক পেছন থেকে বলে উঠলো—সরকারী বাসে একটা ছোট ছেলে চাপা পড়েছে, তাই পাড়ার ছেলেরা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই খবর পেয়েই পুলিস এসেছিল—

—তারপর?

—তারপর গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ!

যে-ভদ্রলোক শেয়ালদার দিকে যাচ্ছিল, এ-কথা শুনে সে আর ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে না। বললে—তাহলে আবার হাওড়াতেই ফিরে যাই—

পেছনের ভদ্রলোক বললে—আরে মশাই, অত ভয় করলে কি আর চলে। কলকাতায় বাস করতে গেলে ও-রকম খুন-জখম তো লেগেই থাকবে, তা বলে কি লোকে হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকবে? চোর-ডাকাত-সাধু-মোহান্ত সব-কিছু নিয়েই তো এই কলকাতা।

কথাটা বলে লোকটা নিজের কাজে চলে গেল। আর যে লোকটা প্রথম প্রশ্নটা করেছিল সে তার পরে কী করলে, তা আর দেখা হলো না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর যদি আবার সকলের সব কথা শুনতে হয়, তাহলে তো আর কারোর কোনও কাজকর্মই করা চলে না।

সন্দীপ সোজা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলো। আজ যেন বড় তাড়াতাড়ি রাত গভীর হয়ে গেছে। বড় তাড়াতাড়ি যেন রাতটা নিশুতি এসে গেছে। সন্দীপ তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো সামনের রাস্তা ধরে।

হঠাৎ পাশ থেকে একটা গাড়ি তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—কে রে? তুই সন্দীপ না?

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল! বললে—কে?

গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে কে ভেতরে বসে রয়েছে। তাকে চিনতে পারলে না সন্দীপ। বললে—কে?

—তুই সন্দীপ তো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আমার নাম সন্দীপ—আপনি কে?

—আরে আমায় তুই চিনতে পারলি না? আমি গোপাল—

গোপাল হাজরা! গোপাল গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তার হাতটা ধরে ফেললে নিজের হাত দিয়ে। অনেক দিন পরে আবার দেখা হয়েছে বলে খুব যেন খুশী হয়েছে।

সন্দীপ এবার জিজ্ঞেস করলে—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

গোপাল হাজরা! গোপাল গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তার হাতটা ধরে ফেললে নিজের হাত দিয়ে। অনেক দিন পরে আবার দেখা হয়েছে বলে খুব যেন খুশী হয়েছে।

সন্দীপ এবার জিজ্ঞেস করলে—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

গোপাল বললে—আমাকে তো সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। একদিন তো তোর সঙ্গে খিদিরপুরের বাসে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তুই এদিকে এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দীপ বললে—আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি—

—এত রাত্তিরে?

—রাত্তিরেই তো আমার কলেজ। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি ফিরতে গিয়ে রাস্তায় আট্‌কে গিয়েছি। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম, হঠাৎ ওখানে পুলিস গুলি চালাচ্ছে বলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এদিকে বাস-ট্রামও চলছে না - তাই হেঁটে-হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলুম—

গোপাল বললে—তুই পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলে এত ভয় পেয়েছিস। কলকাতায় ক'দিন থাকলেই এ-সব তো গা-সওয়া হয়ে যাবে। তুই আয়, গাড়িতে উঠে বোস—

—কার গাড়ি?

একটু বোধহয় সঙ্কোচ হচ্ছিল সন্দীপের। তখন মনে পড়লো গোপালের যে গাড়ি আছে, সেদিন তার মুখ থেকেই সন্দীপ শুনেছিল। কথাটা যে সত্যি এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল!

গাড়িটা ছেড়ে দিলে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করল—এত রাত্তিরে কোথায় যাবি?

গোপাল বললে—আমি তো রোজ রাত্তিরে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই—

—তুই রাত্তিরে ঘুরে বেড়াস কেন?

গোপাল বললে—রাত্তিরে ঘুরে বেড়ানোই তো আমার কাজ রে—

গোপাল রাত্রে ঘুরে বেড়ায়, এ রকম অদ্ভুত কথা সে কারো মুখ থেকে শোনেনি। জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে তোর কী কাজ এত?

গোপাল বললে—চল্ না দেখবি—নিজের চোখেই সব দেখতে পাবি—

গাড়িটা চলতে-চলতে এক জায়গায় থামলো। চারটে রাস্তার মোড় সেটা। গাড়িটা থামতেই কোথা থেকে একটা পুলিস তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। আর গোপাল তাকে কী যেন বললে। কী বললে তা বুঝতে পারলে না সন্দীপ! কিন্তু একটা কথা ভেবে সন্দীপ বড় সমস্যায় পড়লো। পুলিসের সঙ্গে গোপালের এত ভাব কীসের? কেন এত ঘনিষ্ঠতা?

গাড়িটা আবার সামনের দিকে চলতে লাগলো। সন্দীপের খুব ভালো লাগছিল ঘুরতে। কেবল ভাবছিল সেই বহুদিন আগেকার সেই বেড়াপোতার গোপালের কথা। সেদিনকার সেই গরীব বাপের ছেলে এমন হঠাৎ এত বড়লোক হয়ে উঠলো কী করে? অথচ লেখাপড়া তো কিছুই করলে না সে। তাহলে লেখাপড়া না করলেও কি টাকা উপায় করা যায়? টাকা উপায় করে এই রকম বড়লোকও হওয়া যায়? তবে যে মা তাকে অন্য কথা বলতো? তার মা-ই তো তাকে শিখিয়েছিল যে ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখলে চ্যাটার্জিবাবুদের মত তারও অনেক টাকা হবে। সেই টাকা উপায় করে সন্দীপ তার মা'কে এনে কলকাতায় রাখবে। কলকাতায় তখন সন্দীপ বাড়ি ভাড়া করবে। তখন মা আর সে খুব আরাম করে সেই বাড়িতে থাকবে। কিন্তু এতদিন পরে গোপালকে দেখে তার সব স্বপ্ন, সব আদর্শ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আর একটা চৌমাথার কাছে এসে গাড়িটা আগেকার মত আবার থেমে গেল। গাড়িটা থামতেই কোথা থেকে একটা পুলিস এসে দাঁড়ালো গোপালের পাশে আর গোপাল নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো নোট বার করে দিলে পুলিসটার হাতে। পুলিসটা নিঃশব্দে একবার গোপালকে সেলাম করলে। আর তারপর গোপাল আবার গাড়িটা নিয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলো।

একটা কথা সন্দীপ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না যে পুলিসদের সঙ্গে গোপালের এত ঘনিষ্ঠতা কীসের? বুঝে উঠতে পারলে না গোপাল এই রাত্তিরবেলা সব জায়গায় পুলিসদের টাকা দিচ্ছে কেন?

শেষকালে সন্দীপ আর থাকতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, পুলিসদের তুই মাঝে-মাঝে গাড়ি থামিয়ে কী দিচ্ছিস? টাকা?

—কেন, তুই এ-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সন্দীপ বললে—আমি তো দেখছি সব, তা তোর সঙ্গে পুলিসদের এত সম্পর্ক কীসের? ওরা তোর কাছে বার বার টাকা নিচ্ছে কেন?

গোপাল বললে—ওরা তো খুব কম টাকা মাইনে পায়। এতে ওদের পেট চলে না। তাই আমি ওদের টাকা দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করি—

—তা তোর এত টাকা হলো কোত্থেকে? তুই কী চাকরি করিস?

গোপাল বললে—আমি তো চাকরি করি না, ব্যবসা করি—

—কিন্তু সে ব্যবসায় এত টাকা?

—ব্যবসাতেই তো টাকা, চাকরিতে ক'টা টাকা উপায় হয়—

—কীসের ব্যবসা তোর?

গোপাল বললে—সে সব বলবো তোকে একদিন। তুই যদি নিজে ব্যবসা করিস তো বল্

সন্দীপ বললে—দূর, ব্যবসা করতেও তো টাকা লাগে। আমি সে টাকা কোথায় পাবো? আমাকে কে টাকা দেবে? তা ছাড়া আমি তো ভালো করে এখনও লেখাপড়াই শিখিনি——

—লেখাপড়া? বলছিস কী তুই? আমিই বা ঘোড়ার ডিমের কত লেখাপড়া শিখেছি? টাকা উপায়ের সঙ্গে লেখাপড়ার কী সম্পর্ক?

সন্দীপ যেন নতুন কথা শুনলো। মা তো তাকে সেই কথাই বরাবর বলে এসেছে যে সে লেখাপড়া শিখলে তবে বড় চাকরি পাবে, আর বড় চাকরি পেলে অনেক টাকা উপায় করবে। গোপাল অন্য কথা বলছে কেন তবে?

হঠাৎ গোপাল বলে উঠলো—তুই শ্রীপতি মিশ্রের নাম শুনেছিস?

শ্রীপতি মিশ্র? সন্দীপ অনেক ভেবেও শ্রীপতি মিশ্রের নাম মনে করতে পারলে না। বললে—শ্রীপতি মিশ্র কে? কোথাকার প্রফেসার? কোন্ কলেজে পড়ায়?

—দূর, তুই কোনওই খবর রাখিস না, তোর দ্বারা কিছুই হবে না।

গোপাল হতাশ হয়ে গেল সন্দীপের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আবার বললে,—সত্যিই তোর দ্বারা কিস্সু হবে না। আরে, প্রফেসারদের কি টাকাওয়ালা লোক মনে করিস তুই, ওদের আমরা মানুষই মনে করি না।

—কেন?

—যাদের টাকা নেই তাদের আমরা মানুষই মনে করি না। তারা জানোয়ার—

সন্দীপ তবু কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—তাহলে মানুষ কারা?

—মানুষ হলো শ্রীপতি মিশ্র। শ্রীপতি মিশ্র হলো মাল্‌দা জেলার একজন লোক। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি। তিন-তিনবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল আর তিন বারই ফেল করেছিল। দেশের সব লোক তাকে তখন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। কেউ তার দিকে তখন ফিরেও চায়নি। সে খেতে পেলে কি খেতে পেলে না তা নিয়েও মাথা ঘামায়নি। শেষকালে যখন ভোটে জিতে মিনিস্টার হলো তখন সবাই মিলে তাকে মাথায় তুলে নাচতে আরম্ভ করলো—

—কেন? মিনিস্টার হলে কি তার অনেক টাকা হয়?

—হয় না? কী বলছিস তুই?

—কেন মিনিস্টারদের তো কই মাইনে বেশি হয় বলে শুনিনি। পাঁচশো কি ছ'শো বড় জোর।

গোপাল বললে—তুই একটা পাগল! আস্ত পাগল।

সন্দীপ বললে—মিনিস্টারদের আন্ডারে যে-সব অফিসার চাকরি করে তারা শুনেছি মাসে দু'হাজার, তিন হাজার কি চার হাজার টাকা মাইনে পায়। মিনিস্টারদের চেয়ে চার-পাঁচ ডবল বেশি মাইনে পায়—

গোপাল বললে—সে-সব গান্ধীর যুগের কথা তুই ভুলে যা। ও-সব ছেঁদো কথা তুই ছেড়ে দে—

—কেন? এরাও তো কংগ্রেস পার্টির লোক!

—দূর, তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করে মাল্‌দা জেলার সেই শ্রীপতি মিশ্র মাসে কত টাকা উপায় করে জানিস?

—কত?

—কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সন্দীপ চমকে উঠলো কথাটা শুনে। বললে—কী করে? ঘুষ খেয়ে? শ্রীপতি মিশ্র কি ঘুষ খায় নাকি?

—দূর!

কথাটার জবাব দেবার আগেই গাড়িটা আর একটা চৌমাথার পাশে এসে দাঁড়ালো আর ঠিক আগেকার মতই আবার একটা পুলিস এসে পাশে দাঁড়ালো। গোপালও ঠিক আগের বারের মত এক মুঠো নোট দিলে পুলিসটার হাতে, আর সে গোপালকে সেলাম ঠুকে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো।

সন্দীপ সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখছিল আর গোপালের মুখ থেকে শোনা কথাগুলো ভাবছিল। কলকাতায় এসে হঠাৎ যেন তার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। এতদিন কলকাতায় এসেছে সে কিন্তু এ সব ব্যাপার তো সে আগে কখনও দেখেনি, আর এ-সব কথাও কখনও আর কারো মুখ থেকে শোনেও নি। তবে কি কলকাতার সব লোকই খারাপ? তবে কি সব লোকই ঘুষ নেয়?

সন্দীপ বললে—একটা কথা বলবি গোপাল? ওই পুলিসগুলোকে তুই টাকা দিচ্ছিস, ওটা কি ঘুষ?

গোপাল বললে—কে বললে তোকে ঘুষ?

—কিন্তু ঘুষ না তো কী? ও-টাকাগুলোর জন্যে কেউ তো কোনও রশিদ তোকে দিলে না। আমি এক ভদ্রলোকের বাড়িতে মাসে-মাসে একশো পঁচিশ টাকা করে দিয়ে আসি। তা তিনি তো তার রশিদ দেন—

গোপাল—যারা বোকা তারাই শুধু রশিদ দেয়, ইনটেলিজেন্ট্ লোকেরা রশিদ দেয় না।

—কিন্তু আমি তো শুনেছি টাকা দিয়ে রশিদ না নিলে সেটাকে বলে ঘুষ—

গোপাল বললে—তুই কিছুই জানিস না। যেটা দান বলে দিচ্ছি তার রশিদ চাইলে তখন আর দান বলা চলবে না। কালীঘাটের মা-কালীকে যে লোক কত টাকা প্রণামী দেয়, তার জন্যে কি মা-কালী তাদের রশিদ দেয়? না পাণ্ডাদের কাছ থেকে কেউ রশিদ চায়?

একটু থেমে গোপাল আবার বললে—আরো কিছুদিন কলকাতায় থাক তুই তখন তোরও দিব্যজ্ঞান হবে! তুই এখনও সেইরকম পাড়াগেঁয়েই আছিস। জানিস এত ভালো হওয়া ভালো নয়, সংসারে ভালো লোকদের অশেষ দুর্গতি—

হঠাৎ যেন এতক্ষণে সন্দীপের নেশার ঘোর কাটলো। গোপালের হাত-ঘড়িটার দিকে চাইতেই সে চম্‌কে উঠেছে। কী হবে?

—হ্যাঁরে, তোর ঘড়িটা ঠিক আছে?

গোপালও ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে—কেন? এখন তো সাড়ে এগারোটা। এটা তো ইলেকট্রনিক সিটিজেন কোয়ার্টজ ঘড়ি, দেড় হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি এটা খারাপ হবে মানে?

সন্দীপ তখন ভয়ে থর-থর কাঁপছে। বললে—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই—

—কেন? কী সর্বনাশ হয়েছে তোর?

—আমাদের বাড়ির সদর-গেট যে রাত ন'টার সময় বন্ধ হয়ে যায় ভাই। গিরিধারী দারোয়ান যে ঠিক ন'টার সময় গেটে চাবি বন্ধ করে দেবে। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকবো কী করে?

ভয়ে কথা বলতে বলতে সন্দীপ কেঁদে ফেললে।

গোপাল বললে—একটা রাত বাড়িতে না ঢুকলে তোর ক্ষতি হবে?

—আমার খাবার যে ঢাকা রয়েছে। মল্লিককাকা যে ভাববে।

গোপাল বললে—কলকাতা শহরে খাওয়ার কি অভাব রে? কী খাবি তাই আমাকে বল্ না; পাঁঠা, মুরগী, বীফ, হ্যাম্—টাকা ফেললে কলকাতায় যখন-তখন সব জিনিস খেতে পাওয়া যায়। আর ক্ষিধের চোটে তুই একেবারে কেঁদেই ফেললি? চল্, এখুনি তোকে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। দেখবি সেখানে আমাকে সবাই কত খাতির করবে। চল্—

বলে গোপাল গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌লে—বল্, কোন্ হোটেলে খাবি?

সন্দীপের তখন আর গোপালের কথার জবাব দেওয়ার মত ক্ষমতা নেই। সে তখন বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাবুদের বাড়ির কথাই ভাবছে। মল্লিককাকা নিশ্চয়ই এখন সন্দীপের কথা ভাবছে। এমন দেরি করে বাড়ি ফেরার ঘটনা আগে তো কখনও ঘটেনি। সত্যিই, মল্লিককাকা কী ভাবছে! কলকাতা শহরে তো হামেশাই লোকে গাড়িচাপা পড়ছে, হামেশাই পুলিসের গুলিতে মরছে। তারপরে আছে পথ-অবরোধ। যে-কোনও একটা ছুতো পেলেই যে কোনও একটা পাড়ার লোক রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে ট্রাম-বাস আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। আর সন্দীপও কলকাতায় নতুন মানুষ, এ-কলকাতার নিয়ম-কানুন সন্দীপ জানে না। মল্লিককাকা তাই সবসময় সন্দীপকে সাবধান করে দিয়েছেন, আর বলেছেন— খুব সাবধানে থাকবে সন্দীপ, খুব সাবধানে কলেজে যাতায়াত করবে। এ কলকাতা শহর, এ তোমাদের বেড়াপোতা নয়, এখেনে কেউ কারোর ভাল্লো দেখতে পারে না। কলেজ থেকে বেরিয়েই আর কোনও দিকে চাইবে না, সোজা বাড়ি চলে আসবে—

আর শুধু কি তাই? যেখানে সেখানে খাওয়া সম্বন্ধেও সাবধান করে দিয়েছেন। কখনও কোথাও কোনও দোকানে কিছু খাওয়া উচিত নয়। চায়ের দোকানে আর হোটেলের ছড়াছড়ি এখানে। দেখবে রাস্তার ধারেই কত লোক ধুলো-ময়লার মধ্যে বসে রুটি-তরকারি তৈরি করছে, আর কত লোক পাশের বেঞ্চির ওপর বসে বসে সেই-সব খাচ্ছে। কলকাতাও একরকম শ্রীক্ষেত্র। কিন্তু তুমি ও-সব খেও না। ক্ষিধে পেলেও যেন ও-সব খাওয়ার নাম কোরো না, বুঝলে? সব সময়ে মনে রাখবে এ কলকাতা শহর। কলকাতা শহর বাঙালীদের শহর। আর বাঙালীদের মত হতচ্ছাড়া জাত আর ভূভারতে নেই। এই বাঙালীরাই হচ্ছে বাঙালীদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই বাঙালীরাই একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে পাগল বলে গালাগালি দিয়েছে, এই বাঙালীরাই একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে গরুখোর বলে নিন্দে করেছে। এই বাঙালীরাই সুভাষ বোসকে হিটলারের দালাল বলে প্রচার করেছে.

হঠাৎ গাড়ীটা একটা ঝাঁকুনি দিতেই সন্দীপ যেন আবার বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে এল। সন্দীপ দেখলে একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে গোপাল তার গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে। বললে—এখানে নাম তুই সন্দীপ—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এ আমরা কোথায় এলুম ভাই?

গোপাল বললে—তুই যে বললি তোর ক্ষিধে পেয়েছে, তাই তো.

তারপর সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গোপাল অবাক হয়ে গেল। বললে—কীরে, তুই কাঁদছিস?

সন্দীপ কান্নার চোটে কিছু জবাব দিতে পারলে না। গোপাল বললে—কীরে, কাঁদছিস কেন?

সন্দীপ বললে—এত রাত হয়ে গেল, এত রাত্তিরে আমি বাড়ি যাবো কী করে? মল্লিক-কাকাকে আমি কী বলবো?

গোপাল বললে—আগে তুই ভেতরে খেয়ে নে; তারপর ও-সব কথা ভাববি। কাঁদিস নি, চোখ মোছ। তোকে কাঁদতে দেখলে হোটেলের সব লোকে কী ভাববে বল দিকিনি—

সন্দীপ চোখের জল মুছে বললে—আমি মল্লিককাকাকে কী বলবো বল্ তো ভাই? যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে রাত্তিরে আমি কোথায় ছিলুম তখন কী বলবো?

—সে-সব পরে ভাবিস, এখন চল্—ভেতরে চল্—

মনে আছে গোপালের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে সেদিন সন্দীপের মনে হয়েছিল সে যেন আরব্য উপন্যাসের কোনও এক আশ্চর্য শহরে গিয়ে ঢুকেছে। রাত্রের কলকাতার অন্ধকারের মধ্যে যে এত জাঁকজমক আর রোমাঞ্চ থাকতে পারে তা কি তখন সে কল্পনা করতে পেরেছিল! বিধবা গরীব মায়ের অপোগণ্ড ছেলে হয়ে জন্মাবার অপরাধে তার তো সারাজীবন দুঃখবোধের যন্ত্রণা সহ্য করে অতি কষ্টে বেঁচে থাকারই কথা। তাকে ওই স্বপ্নলোকের পরিবেশের দৃশ্য কেন সেদিন দেখিয়েছিল গোপাল?

সন্দীপ ভেতরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে গেল।

বললে—এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলি ভাই তুই? এ কোন্ হোটেল?

গোপাল বললে—চল্, ওই ফাঁকা টেবিলটায় গিয়ে বসি—

তখন ভেতরে পুরুষ আর মেয়েদের হুড়োহুড়ি চলছিল। সন্দীপ চেয়ে দেখতে দেখতে ভাবছিল—এ আবার কোন্ কলকাতা? এ কলকাতার দারিদ্র্যের রূপ সে দেখে এসেছে সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে। ঐশ্বর্যের রূপ দেখেছে বারোর-এ বিড়ন স্ট্রীটের 'মুখার্জি-স্যাক্সবি ইন্ডিয়া লিমিটেডে'র বাড়িতে। কিন্তু এটা? তাহলে কলকাতার ক'টা মুখ?

আর ওই মেয়েরা? যারা হুল্লোড় করছে আর লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে আর গেলাস নিয়ে বেটাছেলেদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে? ও সব গেলাসে লাল-নীল রং-এর ও সব কী? কী খাচ্ছে ওরা?

হঠাৎ গোপালের গলার আওয়াজে সন্দীপের জ্ঞান হলো।

—কীরে? খা—

এতক্ষণে সন্দীপের নজরে পড়লো টেবিলের সামনে একটা ডিশ্-এ তার জন্যে কী একটা রয়েছে। সন্দীপ বললে—এটা কী?

—তুই যে বলছিলি তোর ক্ষিধে পেয়েছে, তাই তোকে খাবার দিতে বলেছিলুম। তুই তো ছেলেমানুষের মত ক্ষিধের জ্বালায় একেবারে কেঁদে ফেলেছিলি—

সন্দীপ বললে—আমি ক্ষিধের জ্বালায় কাঁদিনি, কেঁদেছিলুম ভয়ে—

—কীসের ভয়?

ওই বাবুদের বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। রাত ন'টার সময় ওদের বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যায় কিনা, তাই—

তারপর ডিশ্টার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এটা কী রে?

গোপাল বললে—এটা নান্—মানে রুটি—

সন্দীপ বললে—এ কী রকম রুটি?

গোপাল বললে—এ রুটি তুই আগে কখনও খাসনি, এ অন্য রকম রুটি। খেয়ে দেখ্ খুব ভালো খেতে—

—আর এটা কী? এটা কীসের তরকারি?

গোপাল বললে—এটা তরকারি নয়, মাংস। মাংসের শিক্-কাবাব—

সন্দীপ তবু দ্বিধা করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলে—কীসের মাংস?

কীসের আবার? চিকেনের—

—চিকেনের মানে?

গোপাল বললে—তোকে নিয়ে মুশ্কিলে পড়া গেল। চিকেন মানে মুরগীর—

সন্দীপ বললে—মুরগী? মুরগীর মাংস তো আমি খাই না—

—না খাস্ তো একদিন না-হয় খেয়েই দ্যাখ্। মুরগী খেলে তো জাত যায় না। সবাই-ই তো খায়—

সন্দীপ বললে—না ভাই, আমার মা জানতে পারলে খুব বকবে—মা বলেছে বামুনের ছেলে হয়ে মুরগী খেলে তার জাত যায়—

গোপাল এ-কথার কোনও প্রতিবাদ করলে না। শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে লাগলো। বললে—তোদের মত ছেলে আমাদের দেশে জন্মালে দেশটা উচ্ছন্নে যাবে। নে, শিগ্গির-শিগ্গির খেয়ে নে। আমার আবার তাড়া আছে।

সন্দীপ বললে—সত্যি বলছি ভাই, এ-সব আমি খাবো না। আমি শুধু এই দু'খানা রুটি খাবো। এখানে যদি দুধ পাওয়া যেত তো ভালো হতো—

—কেন, দুধ দিয়ে কী হবে?

—আমি দুধে রুটিটা ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতুম তাহলে।

গোপাল বললে—এখানে দুধের কথা বললে এরা হাসবে।

—কেন?

—ওই যে মেয়েগুলো গেলাসে করে ওখানে যা খাচ্ছে, এখানে শুধু ওই জিনিস পাওয়া যায়।

—সন্দীপ বললে—ওটা কী?

—মদ!

সন্দীপ আরও অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—মেয়েরাও এখেনে মদ খায় নাকি?

গোপাল বললে—মেয়েরাই তো আজকাল মদ বেশি খায়—

সন্দীপ কথাটা শুনে গোপালের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে রইল। বললে—সত্যি?

গোপাল বললে—তুই দেখছি কলকাতার কিছুই দেখিসনি এখনও—

সত্যিই সে কলকাতার কিছুই দেখেনি তখনও। সে বিড্‌ন্ স্ট্রীটের কলকাতা দেখেছিল আর ওদিকে খিদিরপুরের মনসাতলা লেন দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মানুষদেরও কিছু কিছু দেখেছিল। আর যা দেখেনি তা কিছু-কিছু মল্লিককাকার কাছ থেকে শুনেছিল। বাকিটুকু দেখেছিল স্কট লেনের বঙ্গবাসী কলেজে যাওয়া-আসার পথে ভিক্ষে-চাওয়ার নতুন ধরনের এক কায়দাও দেখেছিল সে মীর্জাপুর স্ট্রীটে—বিশ্বশান্তি যজ্ঞের নাম করে নানা দেবদেবীর পুজোর ফন্দী করে। ভেবেছিল তার বুঝি সম্পূর্ণ কলকাতা দর্শন হয়েই গেছে।

কিন্তু এ-কলকাতা? এ-কলকাতার এই দৃশ্য কি কখনও বেড়াপোতায় থাকতে সে কল্পনাও করতে পেরেছিল? এখানে এত রাত্রে মেয়েমানুষেরা হুড়োহুড়ী করে যে মদ খায় তা কি স্বপ্নেও সে একবার ভাবতে পেরেছিল?

দুধ যখন এখানে পাওয়া যাবে না, তখন শুধু শুকনো রুটিই সন্দীপ খেতে লাগলো। কিছু না কিছু তো খেতেই হবে!

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—তুই শিক-কাবাব্ খাবি না?

সন্দীপ বললে—ও খেলে আমার বমি হয়ে যাবে ভাই। বরং তুই-ই ওটা খেয়ে নে—আমি ওটা এঁটো করিনি—

গোপাল বললে—ঠিক আছে, তুই যখন খাবি না তখন আমিই খেয়ে নিই। বাড়িতে গিয়ে তো আমি আমার খাবার খাবোই—

—তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে না তো?

গোপাল বললে—না, আমি নিজেই তো আমার বাড়ির মালিক, আমার যখন ইচ্ছে আমি তখন বাড়ি ফিরবো।

—তুই কি হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমেই রাত কাটাস?

—দূর! তোর দেখছি সেই-সব ছোটবেলাকার কথা এখনও মনে আছে!

—কিন্তু তুই ওই পুলিসদের এত টাকা দিলি কেন এত রাত্তিরে? পুলিসদের কেন এত টাকা দিলি? ওরা তোর কী কাজ করে?

—সে অন্য একদিন তোকে সব বলবো। ওদের জন্যেই তো সব-কিছু হয়েছে। ওদের জন্যেই আমার গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে—

তবু সন্দীপ কিছু বুঝতে পারলে না। হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগলো গোপালের দিকে। বললে...

কিন্তু কিছু বলবার আগেই হঠাৎ ঘরের ভেতরের সব আলো নিভে গেল। সমস্ত ঘরময় যত মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সব হৈ-হৈ করে চিৎকার করতে লাগলো। কেউ কেউ শিস দিচ্ছে, কেউ কাঁচের গেলাস সিমেন্টের দেয়ালে ছুঁড়ে মারতেই কাঁচ ভাঙার ঝন্-ঝন্ শব্দ উঠলো। সে এক বীভৎস কাণ্ড বেঁধে গেল ঘরটার মধ্যে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ভাই, হঠাৎ আলো নিভে গেল কেন? চুরি-ডাকাতি হবে নাকি?

গোপাল বললে—ভয় পাসনি, ও কিছু নয়—

—কিছু না মানে?

গোপাল বললে—ও একটা মজা হচ্ছে। এবার দ্যাখ্ না কী হয়—

কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকার পর আবার হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। সন্দীপ দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে যেন সমস্ত ঘরটার আবহাওয়া একেবারে বদলে গেছে। যে যেখানে বসে ছিল সেখানেই সে আর নেই। কারোর গায়ে ব্লাউজ নেই, কারোর আবার মাথার চুল উস্কো-খুস্কো হয়ে গেছে।

তারই মধ্যে হঠাৎ একটা জায়গা থেকে খুব জোরে একটা চিৎকার উঠেছে। কে যেন মদের নেশায় মেঝের ওপর পড়ে গেছে। সন্দীপ মহা ভাবনায় পড়লো।

গোপাল বললে—ও কিছু না ও রকম কাণ্ড হয় এখানে—

—লোকটা পড়ে গেল নাকি?

গোপাল বললে—ও নিয়ে ভাবিস নি, মাতাল হয়ে গেলে যা হয় তা-ই হয়েছে আর কি। মদ খাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু তা বলে অত বেশি খাওয়া কি ভালো?

সন্দীপ বললে—মদ খেয়ে যদি হুঁশই না থাকে তো ও-জিনিসটা লোকে খেতে যায় কেন?

গোপাল বললে—যাদের বাপ-ঠাকুর্দার অনেক টাকা তারা কী কববে? টাকা না উড়িয়ে তারা করবেটা কী?

কেন, কোনও আশ্রম-টাশ্রমে দান করলেই পারে। বামকৃষ্ণ মিশনে টাকা দিয়ে দিতে পারে, সৎকাজে খরচ হবে—

গোপাল বললে—ওঠ, এবার চলি—

সন্দীপও উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভিড়ের দিকে নজর পড়তেই সে কেমন হয়ে গেল। কয়েকজন লোক একটা ভদ্রলোককে তুলে ধরে দাঁড় করিয়েছে। লোকটাকে দেখেই সন্দীপ কেমন নিজের অজান্তেই চম্‌কে উঠলো।

—খোকাবাবু না?

গোপাল বললে—কী দেখছিস ওদিকে? ও-রকম কাণ্ড এখানে রোজ হয়, তুই চলে আয়—

সন্দীপ তাড়াতাড়ি পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গোপালও অগত্যা চলতে লাগলো তার পেছন-পেছন। ভিড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছতেই সন্দীপ ভদ্রলোককে গিয়ে ধরে ফেলল।

গোপাল বলে উঠলো—ও কাকে ধরছিস রে?

সন্দীপ বললে—আমাদের খোকাবাবু—

—খোকাবাবু কে?

—আমাদের বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়ির ঠাক্‌মা-মণির নাতি—খোকাবাবু। মুখার্জি-স্যাক্‌সবি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টার। আমি তো এদেব বাড়িতেই থাকি—কী সর্বনাশ—

এতক্ষণে গোপালও অবাক হয়ে গেল।

বললে—তাহলে তোদের বাড়ির মালিকও এই নাইট্‌-ক্লাবে আসে নাকি?

সন্দীপ বললে—আমি তো আগে জানতুম না। ভাগ্যিস তুই আমাকে এখানে নিয়ে এলি, তাই তো দেখতে পেলুম—

আরো অনেক লোক তখন ধরে রয়েছে খোকাবাবুকে। সন্দীপকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে? হু আর ইউ?

সৌম্যবাবুর তখনও জ্ঞান ছিল একটু। সৌম্যবাবু সন্দীপকে দেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—আরে ব্রাদার, তুমিও এখানে?

সন্দীপ তখন দুই হাতে ভালো করে ধরেছে সৌম্যবাবুকে। বললে—চলুন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি—

সৌম্যবাবু জড়ানো গলায় বললেন—কিন্তু তুমি এখানে কেন ব্রাদার? তুমিও কি তাহলে ডুবে-ডুবে জল খাও—তুমিও সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার? সবাই দেখছি ডুবে ডুবে জল খায়, কলিকালে এ কী হলো ব্রাদার কলকাতার?

এ-কথার কিছু উত্তর দেওয়া বৃথা। সন্দীপ সৌম্যবাবুকে আরো ভালো করে দুই হাত দিয়ে ধরে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললো।

গোপাল কিছুক্ষণ ব্যাপারটা দেখলে। তারপর যখন বুঝলো যে সন্দীপ তার বাড়ির মনিবকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত, তখন তার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল। থাক্, সন্দীপ তার খোকাবাবুকে নিয়ে যাক, এখন সে নিজের ধান্দা দেখতে পারে, সন্দীপটা দেখছি এখনও সেই আগেকার মতই উজবুক হয়েই আছে। আশ্চর্য, এখন এই বয়েসেও সে নাবালক হয়ে আছে। দুনিয়াদারি যে কত বদলে গেল সে-দিকে খেয়ালই নেই তারা বেড়াপোতা থেকে কলকাতায় এসেও তার এতটুকু উন্নতি হলো না। ধিক, ধিক!!

সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামতেই গোপাল দেখলে সন্দীপ তার মনিবকে ধরে-ধরে তার গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছে—

গোপাল আর সেখানে দাঁড়ালো না। গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে সোজা তার যাবার পথের দিকে চলে গেল।

সন্দীপ তখন তার সৌম্যবাবুকে নিয়েই ব্যস্ত। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী করে বাড়ি যাবেন খোকাবাবু? গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কি?

সৌম্যবাবু তখন হেসে ফেললে। বললে—কী বলছো ব্রাদার? আমি তো রোজই নিজে গাড়ি চালাই। তা তুমি কি আমার গাড়িতে উঠবে? ভয় নেই, ব্রাদার, আমি মাতাল বটে, কিন্তু তালে ঠিক আছি, কখনও বেতালা বাজি না—

সন্দীপ বললে—চলুন—

সত্যি মাতাল হলেও সৌম্যবাবুর জ্ঞান ছিল টনটনে। সৌম্যবাবু গাড়ি চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু পাশে বসে সন্দীপের বড় ভয় করছিল। যদি হঠাৎ কোনও গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দেয়। যদি কোনও লোক চাপা পড়ে? তখন কী হবে? সৌম্যবাবুর মুখে তখন জ্বলন্ত সিগারেট, হাতে স্টিয়ারিং।

গাড়িটা চলছিল সোজাড! সৌম্যবাবুর পা টলছিল বটে, কিন্তু হাতটা পাকা। সত্যিই পাকা ড্রাইভার সৌম্যবাবু।

সৌম্যবাবু গাড়ি চালাতে-চালাতেই বললে—কী, ভয় করছে নাকি ব্রাদার?

সন্দীপ মনে-মনে যা-ই বলুক, মুখে বললে—না—

—না, ভয় পেও না ব্রাদার, একদিন তো মরতেই হবে। তুমিও মরবে, আমিও মরবো, কারো বেঁচে থাকবার রাইট্ নেই এই দুনিয়ায়। তা মরতে যখন হবেই তবে ফূর্তি করেই মরি। কী বলো, ব্রাদার?

সন্দীপ আর এ-কথার কী জবাব দেবে। সৌম্যবাবু আবার বললে—তা তুমিও কি ব্রাদার ডুবে-ডুবে জল খাও? মানে সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার?

মনে আছে সৌম্যবাবু সেদিন সোজা নিজে গাড়ি চালিয়ে আসছিল ঠিক পথ চিনে চিনে। আর সন্দীপ তার পাশে বসে বসে ভাবছিল দৈবের এ কী বিধান! ঠাক্মা-মণি এই নাতির বিয়ের জন্যেই কি এত হাজার-হাজার টাকা খরচ করে কাশী থেকে গুরুদেবকে এনে জন্ম-কুণ্ডলী দেখালেন। এর জন্যেই কি মনসাতলা লেনের বাড়ির বিশাখাকে বেছে নিলেন নিজের নাত-বৌ করবার জন্যে! আর সেই মেয়ের মা'কে তিনি সেইজন্যেই কি মাসে-মাসে একশো পঁচিশ টাকা করে পাঠিয়ে চলেছেন? এই-ই কি সেই নাতি? এই মাতাল সৌম্যবাবুই কি তাঁর বংশে বাতি দেবে? তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে?

কিন্তু ঠাক্মা-মণি তো তাঁর নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন। গিরিধারীকে তো তিনি এই জন্যেই রাত ন'টার সময় লোহার গেট বন্ধ করে তালা-চাবি লাগিয়ে দিতে হুকুম করেছেন। কিন্তু তাঁর নাতিই যদি সে-নিয়ম ভেঙ্গে বাড়ির বাইরে গিয়ে রাত কাটায় তো সে জন্যেও কি তিনি দায়ী!

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপের চোখের সামনে বিশাখার মুখটা ভেসে উঠলো। সন্দীপ যেন কানে শুনতে পেল বিশাখার সেই কথাগুলো—তোমাদের ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না—

—কেন? ছোট খোকাবাবুর সঙ্গে কেন তোমার বিয়ে হবে না?

বিশাখা বলেছিল—আমার বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমরা আমার কাকাকে মাসে-মাসে আর এ-টাকা দেবে না। তখন কাকীমা কোন্ টাকা দিয়ে নিজের গয়না গড়াবে?

হঠাৎ গাড়িটা বারোর-এ বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই খোকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে টলতে-টলতে ঢুকে পড়লো। আর গিরিধারী তখন গেট খুলে বাইরে এসে সন্দীপকে দেখেই অবাক।

বললে—বাবুজী আপ?

কিন্তু তখন আর বেশি কথা বলা বা তাব কথার জবাব দেওয়ার সময় নেই। সন্দীপ সৌম্যবাবুকে দুই হাতে ধরে তাকে ভেতর বাড়িতে ঢুকিয়েছে—

সৌম্যবাবু তখনও জড়ানো গলায় বলেছে—ব্রাদার তুমিও তাহলে আমাদের দলে? তুমিও তাহলে মাল খাও?

বলে মাতালের মত হাসতে লাগলো ফিক-ফিক করে—
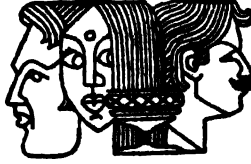
সেদিন ভোরবেলা যোগমায়া তখন গঙ্গার বাবুঘাটে বিশাখাকে নিয়ে গেছে। বিশাখাকে ব্রত করতে শেখাতে হয়। যেদিন থেকে মুখুজ্জে-বাড়ির ঠাক্‌মা-মণির কাছ থেকে বিশাখার নামে মাসে-মাসে টাকা আসছে সেই দিন থেকেই শুরু হযেছে বিশাখার এই ব্রতপালন।

বিশাখা বারবার আপত্তি করেছে। বলেছে—আমি ও-সব ছাই-পাঁশ বলবো না—

যোগমায়া বলেছে—মুখপুড়ী, তোর ভালোর জন্যেই আমি বলি নইলে বলতে আমার দায় পড়েছে—

তারপরে মেয়েকে বলে—বল্—আমার সঙ্গে মুখে মুখে বল্—

সীতার মত সতী হবো
রামের মত পতি পাবো
কৌশল্যার মত শাশুড়ি পাবো
দশরথের মত শ্বশুর পাবো
লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো—

বিশাখা মুখ গম্ভীর করে বসে ছিল। কিছুই বলছিল না—

যোগমায়া ধমকে উঠলো। বললে—কী রে মুখপুড়ী, মুখ বুঁজে আছিস কেন? বোবা নাকি? বল্—

বাবুঘাটে চারিদিকে লোকের ভিড়। সেদিনও যোগমায়া ঘাটে এসেছে মেয়েকে নিয়ে। বাড়িতে এ-সব ব্রত উদ্‌যাপন করলে নানা কথা ওঠে। তাই যোগমায়া যেদিনই সময়-সুযোগ পায় বিশাখাকে নিয়ে গঙ্গার বাবুঘাটে আসে। এখানে এসে ঘাটের এক কোণে বসে মেয়েকে দিয়ে ব্রত করায়। ভগবান যদি মেয়ের কপালে একটা বর জুটিয়ে দিয়েছেন তো মেয়ে যেন কপালদোষে তা না হারায়। সুবিধে-সুযোগ পেলেই যোগমায়া মনে-মনে ভগবানকে ডাকে। বলে—ভগবান, তুমি যদি একবার মুখ তুলে চেয়েছ তো এইটুকু দেখো আমার বিশাখা যেন বিয়ের পর সুখী হয়। আমি ছাড়া বিশাখার তো কেউ নেই, তুমি তাকে দেখো ভগবান, তুমি তাকে দেখো—

কিন্তু মেয়েও তেমনি আকাট হয়েছে যোগমায়ার। মায়ের একটা কথাও যদি শোনে মন দিয়ে। বিশাখা বলে—তুমি কেন অত ভগবানকে ডাকো শুনি? ভগবান কি কানে শুনতে পায়? তোমার ভগবান তো কালা—

—চুপ কর মুখপুড়ী! ঠাকুর-দেবতাকে গাল-মন্দ করলে তোর কি ভালো হবে ভেবেছিস?

বিশাখাও তেমনি। বলে—তোমার ভগবান যদি এত ভালো তাহলে আমার বাবা মরে গেল কেন? কেন তোমাকে কাকীমা অত কথা শোনায়? কেন তাহলে তোমাকে পরের বাড়ী রাঁধুনীগিরি করতে হয়?

—থাম্ মুখপুড়ী, শিলের নোড়া দিয়ে তোরা দাঁত ভেঙ্গে দেব! যত বড় মুখ না তত বড় কথা! ভগবান যদি কথা শুনতে না পায় তো কে তোর বিয়ের বর জোগাড় করে দিলে শুনি? কে অত বড়লোকের বাড়ি তোর বিয়ের সম্বন্ধ করলে? কে করলে তাই বল্?

বিশাখা বললে—তুমি ওই আনন্দেই থাকো! আমার বিয়ে হবে নাকি ও-বাড়িতে—কলা হবে—

—কেন? হবে না কেন? ওদের বাড়ি গিয়ে তো তুই দেখেছিস্! কাশী থেকে গুরুদেব এসে তোর কুষ্ঠি দেখে বলেছে ওখেনে তোর বিয়ে হবেই—

—ছাই হবে, ছাই—ওখেনে আমার বিয়ে হবে না।

—কে বললে তোকে হবে না?

এ-সব কথা শুনতে ভালো লাগে না যোগমায়ার। বলে—এইটুকু মেয়ের কত পাকা-পাকা কথা দেখ। মেয়েমানুষের অত পাকা-পাকা কথা ভালো নয় রে। অত পাকা-পাকা কথা ভালো নয়। বুঝছি তোর কপালে অনেক দুঃখু আছে—তা আমিই বা আর কী করবো আর আমার ভগবানই বা কী করবে। দেখবি একদিন তোর এই কথার জন্যেই তোকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে, এই তোকে আজ বলে রাখলুম—

তবু হাল ছেড়ে দেয় না যোগমায়া। তবু কোনও কোনও দিন সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গে গেলেই বিশাখাকে নিয়ে গঙ্গার বাবুঘাটে নিয়ে গিয়ে ব্রত করায়। কত রকমের যে ব্রত আছে তার কি ঠিক আছে। এক-এক মাসে, এক-এক ঋতুতে, এক-এক রকমের ব্রত। বিশাখা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না সে-সব ব্রত-কথার মানে, তবু মায়ের কাছে মার খাবার ভয়ে ব্রত করে যায়। 'পুণ্যিপুকুর ব্রত', 'কুল্ কুলুতি ব্রত', 'শিবরাত্রি ব্রত' 'ষাট্ পঞ্চমী ব্রত', 'রামনবমী ব্রত', 'জল সংক্রান্তি ব্রত', 'অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত', 'সত্য-নারায়ণ ব্রত', 'হিতসাধিনী ব্রত'—ব্রত-কথার কি শেষ আছে?

সব ব্রতই মা'র মুখস্থ। কিন্তু দেওরের বাড়িতে ব্রতপাঠ করবার উপায় নেই। নানা লোকের মুখে নানা কথা উঠবে। যোগমায়ার নিজের জীবনে ব্রতকথা পাটের কোনও সুফল ফলেনি। তা না ফলুক, বিশাখার জীবনে যেন সে সুফল ফলে। বিশাখা যেন স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার করতে পারে। যোগমায়া নিজে যে সুখ-সৌভাগ্য পায়নি, তার মেয়ে বিশাখা যেন সে-সুখ-সৌভাগ্য পায়। তাই গঙ্গার বাবুঘাটে যোগামায়া মেয়েকে ব্রত করায়। বলে—বল্, আমার সঙ্গে -সঙ্গে মুখে বল্—

সীতার মতো সতী হবো
রামের মতো পতি পাবো
কৌশল্যার মত শাশুড়ি পাবো
দশরথের মত শ্বশুর পাবো
লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো...

রোজ ভোরবেলা থেকেই বাবুঘাটে স্নান পুজো আহ্নিক জপ-তপ করবার জন্যে লোক জমে যায়। কিন্তু ততক্ষণে ব্রতপাঠ শেষ হয়ে যায় বিশাখার। বিশাখা চারদিকে চেয়ে দেখে বলে—মা, ওরা সবাই দেখছে যে আমাদের—

যোগমায়া বলে—দেখুক গে, তাতে তোমার কী?

বিশাখা বলে—ওরা দেখলে যে আমারা লজ্জা করে—

যোগমায়া তবু একই জবাব দেয়। বলে—দেখুক গে—আমি যা বলছি তুইও তাই বল্—

রোজ রোজ যোগমায়ার স্নান করতে যাবার সুযোগ হয় না। যেদিন বাড়িতে সাংসারিক কাজের তাড়া থাকে সেদিন আর ব্রত পালন করার সময় পায় না যোগমায়া। বাড়িতে কি যোগমায়ার কাজ একটা? খেতে মাত্র সব মিলিয়ে পাঁচটা প্রাণী। তার মধ্যে খাওয়ার লোক পাঁচটি হলেও কাজ করবার মাত্র ওই একটিই লোক। রেশনের দোকান থেকে সপ্তাহে একদিন রেশন আনতে হবে। কে যাবে রেশন আনতে? ওই যোগমায়া। কে আটার কলে গম ভাঙ্গাতে যাবে? ওই যোগমায়া। কেরোসিন তেলের দোকানে লাইন দেবে কে? ওই যোগমায়া। কে মাসকাবারি ইলেকট্রিকের বিলের টাকা জমা দিতে যাবে? ওই যোগমায়া। বাজারটা না হয় কর্তা নিজের হাতে করে, কিন্তু কে তরকারী কুটবে? কে মাছ কুটবে? ওই যোগমায়া। তারপর বাড়ির এতগুলো মানুষের গেঞ্জি, রুমাল, আন্ডারওয়ার, তোয়ালে, বালিশের ওয়াড়, সায়া, ব্লাউজ সাবান-কাচা কে করবে? ওই যোগমায়া। খাবার পর বাসন-কোসন-হাতা-খুন্তি-বেড়ি কে মাজবে? ওই যোগমায়া।

এত কাজ করেও ছোট জা'র মন জয় করতে পারে না যোগমায়া। সেই বহুদিন আগে বিশাখার বাবার শেষ কথাগুলো মনে পড়তো।

বিশাখার বাবা যাবার আগে বলে গিয়েছিল—দেখ বড় বউ, আমি তোমার জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলুম না বলে কিছু ভাবনা করো না। আমার ভাই তপেশ তো রইল। আমি তপেশকে আমার সর্বস্ব দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছি, মানুষ করেছি। বাবা ছেলের জন্যে যা করে, বাবা নেই বলে আমি বড় ভাই হয়ে তার বাবার কাজই করে গেলুম। সরকারী অফিসে তার পাকা চাকরি করে দিলুম, তার বিয়ে দিয়ে দিলুম, সে তোমাকে দেখবে, কিছু ভয় নেই তোমার—

মানুষ চিরকাল থাকে না, একদিন তাকে চলে যেতেই হবে। কিন্তু তা বলে বিশাখার বাবার মত তাকে একলা ফেলে এমন করে যেতে হয়?

স্বামী অনেকেরই থাকে না। স্বামী না থাকলে যোগমায়া শুনেছে সে-কালে তার স্ত্রীকেও সহমরণে যেতে হতো। সেই-ই তো ভালো ছিল! সে যন্ত্রণা তবু খানিক-ক্ষণের জন্যে; কিন্তু এ যে চিরকাল ধরে জ্বালা। এও কি এক রকমের সতীদাহ নয়?

যত জ্বালা হয়েছে বিশাখাকে নিয়ে। বিশাখা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো! বিশাখা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তবু একটা ভবিষ্যতের আশা থাকতো। ছেলের বড় হওয়ার পব তার বিয়ে দিয়ে বউ-এর সেবা পাওয়ার একটা ক্ষীণ ভরসাও থাকতো। কিন্তু মেয়ে? মেয়ে হয়েছে বলে তার বিয়ে দেওয়ার একটা সমস্যা আছে। সে সমস্যা কে মেটাবে?

তাই ছোটবেলা থেকেই যোগমায়া বিশাখাকে দিয়ে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ব্রত করাতো।

প্রথম প্রথম বিশাখা বলতো—বিজলী তো ব্রত করে না, আমি কেন করবো?

যোগামায়া বলতো—তা না করুক, তুমি করো।

—আমাদের ইস্কুলের কেউ করে না—বিজলী করে না, শিখা করে না, বাসন্তী করে না, বন্দনা করে না। কেবল আমি কেন করবো?

যোগামায়া বলতো—তাদের সবাই আছে যে' তারা কেন করবে? তাদের বাবা আছে, ভাই আছে, বোন আছে। কিন্তু তোমার যে কেউ নেই মা। যার কেউ নেই তার ভগবান আছে। সেই জন্যেই তোমাকে ব্রত করতে বলি—

—আমার কেউ নেই কেন মা?

যোগামায়া বলতো—সকলের কি সব থাকে মা? তুমি ব্রত করে যাও, দেখবে তোমার যখন সংসার হবে তখন তোমার সব হবে। তোমার স্বামী হবে, তোমার শ্বশুর হবে, তোমার শাশুড়ী হবে, তোমার দেওর হবে, তোমার ছেলে হবে, তোমার মেয়ে হবে—ধনে-জনে তোমার লক্ষ্মীলাভ হবে। সোনা-রূপো-হীরে-মুক্তোতে তোমার ঘর উথ্‌লে উঠবে—

বিশাখা বলতো—তুমিও ছোটবেলায় ব্রত করেছ?

—হ্যাঁ, আমার মা'ও আমাকে দিয়ে ব্রত করিয়েছে—

—তাহলে তোমার ওসব হয়নি কেন?

যোগমায়া তখন বলতো—আর কথা বলে না, অনেক রাত হয়েছে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো। কাল আবার ভোরবেলা তোমাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাবো। কাল আবার তুমি ব্রত করবে—

এমনিই চলছিল। এমন সময় বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে বাড়ির গিন্নীর নজরে পড়ে গেল বিশাখা। ব্রত করার পর যখন বিশাখা একলা দশরথ পাণ্ডার কাছে দাঁড়িয়েছিল তখন ঠাক্‌মা-মণি এসে তার নাম, কাকার নাম, বাড়ির ঠিকানা, সব নিয়ে চলে গিয়েছিল। আর তারপরই পরমেশ মল্লিকমশাই এই খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের বাড়িতে এসে বিশাখার জন্মকুণ্ডলী চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর থেকেই যখন ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেল তখন ঘন ঘন অসুখ হতে লাগলো ছোট জায়ের। তার গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করতে লাগলো, তার মাথা টিপ্‌টিপ্ করতে লাগলো। তখন থেকে বিজলীকে দিয়েও ব্রত করাতে লাগলো রাণী। ব্রত করলেই যদি বড়লোকের বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ হয় তো বিজলীও ব্রত করুক।

রাণী একদিন বললে—তোমার মেয়ের সঙ্গে যদি বিজলীও ব্রত করে তো কী এমন তোমার ক্ষতি বড়দি? বিজলীও তো তোমার আপন দেওরের মেয়ে! আমি না হয় পর হলুম, পরের বাড়ি থেকে এইছি, কিন্তু তোমার আপন দেওর তো আর পরের বাড়ি থেকে আসেনি। সে তো তোমার শ্বশুরেরই আর এক ছেলে, আর বিজলীও তো তোমার শ্বশুরের নাতনী! সে আর কী এমন দোষ করলে যে তার দিকটা একটু দেখলে না। আর খরচ-পত্তরের কথা যদি বলো...

যোগমায়া ছোট জা'র কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—অমন কথা বোল না দিদি, ওতে আমার বিশাখার পাপ হবে। ঠাকুরপো আমাদের জন্যে যা করছে সে-ঋণ কি আমি জীবনে শোধ দিতে পারবো? ভগবান কি আমার সে ক্ষমতা দিয়েছেন?

রাণী বললে—অত কেঁদো না বড়দি, অত কেঁদে আর গেরস্ত'র অকল্যাণ করো না, ঢের হয়েছে—

এর পরে আর যোগমায়া ও-কথা উত্থাপন করেনি।

তা একজন ব্রত করাও যা আর দু'জন ব্রত করাও তাই-ই। তাই তারপর থেকে যখন যোগমায়া গঙ্গার বাবুঘাটে গিয়েছে, তখন দু'জনকে নিয়েই গিয়েছে। দু'জনকেই ব্রত করতে শিখিয়েছে। বিশাখার যেমন ভালো বর মিলেছে, বিজলীরও তেমনি মিলুক। তাতে ছোট জা'ও খুশী হবে।

তখন থেকে সকালবেলাই বাড়িতে তোড়জোড় পড়ে যেত। ছোট জা'ও বিজলীকে সাজিয়ে দিত, আর বিশাখাকে সাজিয়ে দিত বিশাখার মা যোগামায়া। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে হয়ত বিজলীকে নিয়ে বিজলীর মা'ও যেত। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন বড় জা'-এর ওপর ভরসা করতে হতো।

স্নান করে বাড়িতে আসতেই রাণী মেয়েকে জিজ্ঞেস করতো—কীরে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছে তোকে?

বিজলী কিছু বুঝতে পারতো না। বলতো—কী জিজ্ঞেস করবে?

রাণী বলতো—যারা ঘাটে চান করতে গিয়েছিল, তারা কেউ তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি? জিজ্ঞেস করেনি তোর বাবার নাম কী, কোথায় কোন্ পাড়ায় থাকিস, এই-সব কোনও কথাই কেউ জিজ্ঞেস করেনি?

বিজলী বলতো—না—

রাণী বলতো—সে কী রে, তোকে এত ভালো করে সাজিয়ে দিলুম, সিল্কের ফ্রক পরিয়ে দিলুম, তবু কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করেনি?

ছোট মেয়ে বিজলী, মায়ের এই প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারতো না। প্রত্যেক দিনই বলতো— কেউ কিছুই জিজ্ঞেস না করলে আমি কী করবো?

—কেন, ঘাটে অন্য অনেক লোক ছিল না? বড়লোকের বাড়ির কোন বুড়ী মানুষ চান করতে আসেনি?

বিজলী বলতো—তা আমি দেখিনি!

রাণী রেগে যেত। বলতো—তা কেন দেখবে! যেমন আমার পোড়া কপাল, তেমনি হয়েছে আমার ধিঙ্গী মেয়ে, সবাই মিলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তবে ছাড়বে।

বলে অতিষ্ঠ হয়ে বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো।
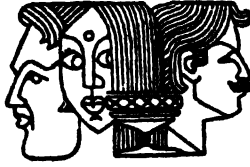
সেদিন সকালবেলা থেকেই মল্লিকমশাই-এর ঘরে মানুষের ভিড়। মাসকাবারি মাইনের দিন। সবাই এসে একে-একে মাইনে নিয়ে যেত সরকারমশাই-এর কাছ থেকে। এই মাইনে নেওয়ার পালা শুরু যে সকালবেলাটাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়। বলতে গেলে দিন-ভরই সে-পর্ব চলতো। যার যখন অবসর মিলতো ছুটি পেলে, তখনই সে আসতো। মন্দিরের পুরুতমশাই-ই আসতো প্রথম। তার সকালবেলার দিকে কোনও কাজ থাকতো না। যত কাজ বিকেলের পর থেকে। সকালবেলাটায় কন্দর্প আসতো ফুল-বেলপাতা নিয়ে। সে-সব রোজ হিসেব করে নেওয়া এবং তা আবার বেতের চুবড়িতে রেখে কামিনীকে দিয়ে দেওয়া। সে-সব ফুল-বেলপাতা কামিনীর জিম্মায় থাকতো সারাদিন। তার আগে ঠাকুরমশাই সামান্য আরতি-টারতি যা করবার করতো। সেটা পাঁচ মিনিটের কাজ। সে-কাজটা সারা হলেই তখন কামিনীর ঘাড়ে সব ফেলে ঠাকুরমশাই নিজের কাজে চলে যেত। তখন অন্য পাড়ায় অন্য বাড়িতে কিছু খুচরো পুজোর ব্যবস্থা ছিল। তা থেকেও কিছু বাড়তি আয় হতো তার।

মল্লিকমশাই সেদিনও একে-একে সকলকে মাসকাবারি মাইনে দিলেন। একে-একে কামিনী এল। এল গিরিধারী। এল একতলার ঝি ফুল্লরা, এল দোতলার ঝি কালিদাসী, এল তেতলার ঝি সুধা, এল ঠাক্‌মা-মণির খাস্ ঝি বিন্দু। আসতে আর কারো বাকি রইল না। তারপর অনেক বেলা করে এল বাবুঘাটের পাণ্ডা দশরথ। যার যা পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দিলেন মল্লিকমশাই। কাজের চাপ যখন একটু কমলো তখন হঠাৎ মনে পড়লো সন্দীপের কথা।

তাই তো, সন্দীপ তো কাল রাতে বাড়ি আসেনি। সন্ধেবেলা সে তো রোজকার মত কলেজে চলে গিয়েছিল যেমন যায়। তারপর তো আর আসেনি সে!

পুজোবাড়িতে সন্ধেবেলা সিংহবাহিনীর আরতির সময় তেতলা থেকে ঠাক্‌মা-মণি নিচেয় এসে রোজকার মত পুজো দেখে ঠাকুরকে প্রণাম করে গেলেন। তারপর সবাই প্রসাদ পেলে। তারপর ঘড়িতে সন্ধে সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, সাড়ে আটটা বাজলো। তারপর রান্নাবাড়ি থেকে দু'জনের খাবার ডাক এল। মল্লিকমশাই-এর আর সন্দীপের খাবার দেওয়া হয়েছে।

মল্লিকমশাই বললে—ঠাকুর, সন্দীপবাবু তো এখনও আসেনি—বাবু এলে দু'জনে একসঙ্গেই খাবো'খন—

ঠাকুর বললে—আপনি খেয়ে না নিলে আমাদের হাত-জোড়া হয়ে থাকে। বাবুর খাবার না হয় আমি ঢাকা রেখে দেব। তিনি এলে তখন খাবেন—

তা বটে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একলাই খেয়ে নিয়ে ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু মনে ভাবনা রইল। এমন তো কখনও হয় না। বরাবর সন্দীপ বাতে ন'টাব মধ্যেই কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে। সে জানে যে ঠিক ন'টার সময় গিরিধারী দরজা বন্ধ করে দেয়। তবু কেন তার দেরি হচ্ছে?

শেষকালে তিনি গিরিধারীকে ডাকলেন।

বললেন—গিরিধারী, দেখ আমাদের সন্দীপবাবু তো এখনও ফিরলো না। তা তুমি তো ঠিক ঘড়ি দেখে রাত ন'টার সময় গেট বন্ধ করে দেবে। বাবু যদি তার পরে বাড়ি ফেরে তখন কী হবে?

গিরিধারী সে-কথার জবাবে কী আর বলবে।

মল্লিকমশাই বললেন হয়ত বাবু রাস্তায় কোথাও আটকে গেছে। আজকাল কখন কোথায় কী হয় তা তো বলা যায় না। কেউ কিছু জানতেও পারে না বাইরে থেকে। তা আমি যদি ঘুমিয়েও পড়ি তো একটু গেট্‌টা খুলে দিও। বুঝলে?

গিরিধারী বললে—জী হুজুর। আমি গেট খুলে দেব—আপ্ চিন্তা মাত্ কীজিয়ে—

বলে গিরিধারী চলে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও মল্লিকমশাই কি চিন্তা না করে থাকতে পারেন? সারাদিনের পরিশ্রমের পব ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু কানটাকে সজাগ রাখলেন। পরের ছেলেকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন, তার যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তখন তো তাঁরই ওপর দোষ পড়বে। আজকাল কথায় কথায় যেমন পট্‌কা বোমা ফাটছে, তাতে কখন কার ভাগ্যে কী ঘটবে, কেউ কিছু আগেভাগে বলতে পারে না। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তা তাঁর খেয়ালও ছিল না। সকাল থেকে বাড়ির লোকজনদের সকলকে মাইনে দিতে হবে, সে-টাকাগুলো তিনি দুপুরবেলাই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন।

আর তারপর যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল, তখন একেবারে সকাল। রাত্রে কিছুই তিনি টের পাননি। একেবারে মড়ার মতন ঘুমিয়েছেন। তারপর তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুয়ে সকালবেলা সব করণীয় কাজ সেরে যখন সেরেস্তা-ঘরে এসেছে তখনই কন্দর্প এসে হাজির। তারপর কন্দর্প গেল তো এল ঠাকুরমশাই। তারপর একে একে কামিনী, ফুল্লরা, কালিদাসী, সুধা, বিন্দু থেকে শুরু করে গিরিধারী পর্যন্ত টিপ্-ছাপ দিয়ে মাসকাবারি মাইনে নিয়ে গেল।

গিরিধারীকে দেখেই মনে পড়ে গেল কথাটা। জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা গিরিধারী, সন্দীপবাবু কি কাল রাত্তিরে বাড়ি ফিরেছে?

গিরিধারী কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারলে না।

মল্লিকমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—ফেরেনি, না?

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরের ছেলেকে নিজের কাছে এনে রাখার বিপদই এই। শুধু তো থাকা-খাওয়া-পডার ব্যবস্থা করাই নয়, তার ভালো-মন্দ সব-কিছুর দায়িত্বই তো নিতে হবে।

তারপব বললেন—কোথায় গেল বলো তো বাবুজী? এমন তো কখনও হয় না। গাড়ি চাপা পড়লো, না পুলিসে ধরলো, না হাসপাতালে গেল বোমা-গুলি খেয়ে। আজকাল তো কলকাতায় সবই সম্ভব—

এতক্ষণে গিরিধারী বললে—না সরকাববাবু, বাবুজী বাড়ি এসেছে—

—বাড়ি এসেছে? কোথায়? কখন? রাত্তিরে, না সকালে?

গিরিধারী বললে—কাল রাত দো বাজে—

—রাত দুটোর সময়?

—জী হুজুর।

—তা তুমি তো আমাকে বলোনি সে-কথা।

গিরিধারী সরকারবাবুর সামনে কথাগুলো বলে অপবাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

—কোথায়? সন্দীপবাবু কোথায়?

গিরিধারী বললে—বাবুজী আমার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন।

—তোমার ঘরে? কেন?

গিরিধারী বললে—মালকিন্ জানতে পারলে গোঁসা করবে, তাই বাবুজীকে চুপি চুপি আমার ঘরে শুইয়ে রেখেছি হুজুর—

মল্লিকমশাই কথাটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর যেন একটু সম্বিৎ পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা বাড়ি ফিরতে দেরি হলো কেন তা কিছু বলেনি সন্দীপবাবু?

গিরিধারী বললে—তা পুছিনি হুজুর—

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করলেন—তা এখন কোথায়?

গিরিধারী বললে—এখনও বাবুজী আমার ঘরে ঘুমোচ্ছেন—

মল্লিকমশাই বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন জাগাতে হবে না, ঘুম ভাঙ্গলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—
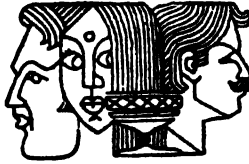
সে সব কত কাল আগেকার কথা। কিন্তু এখনও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা পর্যন্ত সন্দীপের মনে আছে। ওই বারোর-এ বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে সে কত দিন কত মাস, কত বছর কাটিয়েছে। কত আনন্দ কত বেদনা, কত সুখ কত দুঃখ, কত আশা কত ভয় নিয়ে মুহূর্ত যাপন করেছে, সে-সব কথা এখন একে একে তার মনে পড়ছে। সেদিন যখন গিরিধারীর ঘরে তার ঘুম ভাঙ্গলো, তখন চারদিকে চেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছে। মনে হয়েছিল এ কোথায় সে শুয়ে আছে। গিরিধারীর ঘর তেমন বড় নয়। একটা লোক কি বড়জোর দুটো লোক সে-ঘরে থাকতে পারে। ঘরের ভেতরে গিরিধারীর নানা জিনিসপত্রও ছিল। বলতে গেলে একটা ঘরের মধ্যেই তার সংসার। সে শুধু যে সেখানে শোয় তাই-ই নয়, সেখানে সে সংসারও করে। রাঁধে, খায়, রামচরিত পড়ে, বিশ্রাম করে। এক কথায় সেই ঘরটাই তার জগৎ। সন্দীপ অনেক দিন গিরিধারীর ঘরে গিয়েছিল। অনেক দিন তার রামচরিতমানস পড়া শুনেছিল। কিন্তু এমন করে কখনও রাত কাটায়নি সে ঘরে।

আগের রাতের কথাটা মনে পড়তেই সন্দীপ খুব লজ্জায় পড়ে গেল।

প্রায় সারা রাতটা এ-রকম করে বাড়ির বাইরে কাটানো সেই-ই প্রথম। সৌম্য মুখার্জির সঙ্গে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখা হয়েছিল। বাড়িতে রাজমিস্ত্রী খাটছিল সেই কাজ দেখাশোনা করবার সূত্রেই সৌম্যবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—কে আপনি? কী চান?

এই বাড়িতে সন্দীপ এতদিন কাটালো, তবু বাড়ির কর্তাও জানতে পারলে না সন্দীপ কে?

সন্দীপের পরিচয় গিরিধারীই শেষ পর্যন্ত দিয়েছিল। বলেছিল যে সরকারমশাই-এর দেশের লোক সে। এর পরে সৌম্যবাবু আর কোনও কথা বলেনি।

কিন্তু কাল রাত্রে?

কাল রাত্রে সেই একই সৌম্যবাবু যেন একেবারে নতুন মানুষ। যে লোক বাড়িতে অত গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সেই লোকই আবার নাইট্-ক্লাবে একেবারে অন্য মানুষ।

মনে আছে সৌম্যবাবু বলেছিলেন—এ কি ব্রাদার, আপনিও এখানে? শেষকালে আপনিও সিংকিং-সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার?

অর্থাৎ—শেষকালে আপনিও ডুবে ডুবে জল খান?

সৌম্যবাবু কী ভাবলেন কে জানে। সন্দীপ যে ঘটনাচক্রের এক অনিবার্য আবর্তে পড়ে ওখানে গিয়েছিল তা কে তাকে বোঝাবে? কলকাতার কোন্ তল্লাটে যে গোপাল তাকে নিয়ে গিয়েছিল, কোন্ তল্লাটে কোন্ নাইট্-ক্লাবে যে গোপাল তাকে খাওয়াবার জন্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা তার একেবারেই মনে নেই। তবে অন্য কিছু মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে সেখানে অনেক মেয়েমানুষ অনেক বেটাছেলে ছিল, আর সবাই মিলে হাল্লাগুল্লা করছিল আর মদ খাচ্ছিল। আর যখন হঠাৎ ঘরটাতে আলো নিভে গেল তখন সে কী হাসি, সে কী হুল্লোড়, আর সে কী চিৎকার! মনে হলো যেন সকলের চেঁচামেচিতে ঘরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

সন্দীপ নান্ খেতে খেতে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল মনে আছে।

সন্দীপ ভয় পেয়ে গোপালকে জিজ্ঞেস করেছিল—এ কী হচ্ছে রে গোপাল? মারামারি হচ্ছে নাকি? আমাদের মারবে না তো?

গোপাল বলেছিল—দূর, এ তো মজা হচ্ছে রে! ওরা মজা করে ওই রকম করছে—

—তা হঠাৎ ঘরের আলো নিভে গেল কেন?

গোপাল বলেছিল—ও তো ইচ্ছে করে ওরা আলো নিবিয়ে দিয়েছে—

—কেন? ইচ্ছে করে আলো নিবিয়ে দিয়েছে কেন?

গোপাল বলেছিল—ওইটেই তো মজা—

—কেন? মজা কেন?

গোপাল বলেছিল—মজাই তো। এখন সব ছেলেরা মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে। কে কার গায়ে হাত দিচ্ছে, তা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কেউ কাউকে চিনতেও পারছে না যে কেউ-কাউকে কিছু বলবে—

—এর পর কী হবে?

গোপাল বলেছিল—একটু পরেই দেখবি হুইসেল্ বেজে উঠবে, আর হুইসেলের শব্দ শুনেই সবাই সাবধান হয়ে যাবে। তখন সবাই আবার সাধু-পুরুষ সাজবে, যেন কেউ ভাজা মাঝ উল্‌টে খেতে জানে না—

আর খানিক পরে ঠিক তাই-ই হলো। অন্ধকারে কোথা থেকে একবার হুইসেল বেজে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সব আলো জ্বলে উঠলো। অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের যে-সব গান-বাজ্‌না চুপ হয়ে গিয়েছিল, তা আবার গম্-গম্ করে বেজে উঠলো। আর হঠাৎ কোথা থেকে একটা আর্তনাদ সন্দীপের কানে ভেসে এল। সবাই সেই আর্তনাদটার কেন্দ্রস্থলে দৌড়ে গিয়ে দেখলে কে একজন মদের নেশায় ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

সন্দীপ দেখতে যাচ্ছিল ওদিকে কে অমন আর্তনাদ করে উঠলো।

কিন্তু গোপাল বলেছিল—ওদিকে যাস্‌নি, যাস্‌নি ওদিকে—

—কেন? চল্ না দেখি গিয়ে কী হলো ওখানে—

গোপাল বলেছিল—দূর, কেউ হয়ত কাউকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ও-রকম এখানে রোজ হয়, তুই দেখিসনি ও সব—

কিন্তু সন্দীপ গোপালের কথা শোনে নি। শেষ পর্যন্ত যে-জায়গাটায় সবাই গিয়ে ভিড় করেছিল, সেইখানে গিয়ে উঁকি মারতেই দৃশ্যটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ তো তাদের বাড়ির খোকাবাবু! সৌম্যবাবু!!

সৌম্যবাবুকে সেই অবস্থায় দেখে সন্দীপ কী করে চুপ করে থাকে।

বলেছিল—গোপাল, এ যে আমাদের বাড়ির খোকাবাবু রে—

—কে খোকাবাবু? কোথাকার খোকাবাবু?

সন্দীপ বলেছিল—আমি যে-বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির মালিক সৌম্যবাবু। সৌম্য মুখার্জী! ইনি এখানে এসেছেন কেন?

—তুই ছেড়ে দে ওকে। ও-সব যত বড়লোকের বাড়ির বখাটে ছেলেরাই এখানে-মদ খেয়ে ফূর্তি করতে আসে—মেয়েদের নিয়ে মাতাল হতে আসে। চলে আয়—

সন্দীপ বলেছিল—না ভাই তুই বাড়ি যা, আমি সৌম্যবাবুর কাছে থাকি—

বলে সন্দীপ সৌম্যবাবুকে দুই হাতে ধরে কোনও রকমে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। ভাগ্য ভালো যে সৌম্যবাবুর বেশি চোট লাগেনি। বেশি চোট লাগলে হয়ত আর নিজে গাড়ি চালাতে পারতেন না।

তারপর বাড়ির দরজার সামনে আসার পরই গিরিধারী দেখতে পেয়েছিল সব। সে তাড়াতাড়ি গেট খুলে বাইরে এসে খোকাবাবুকে ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। সন্দীপও ছিল পাশে পাশে। তারপর গিরিধারী গাড়ীটাকে ঠেলে কোনও রকমে গ্যারেজের ভেতরে পুরে দিয়েছিল।

সন্দীপ তখনও বুঝে উঠতে পারেনি সে কী করবে!

গিরিধারী খোকাবাবুকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এসে বললে—বাবুজী, আপনি খোকাবাবুর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলেন?

সে-কথার জবাব দেওয়ার আগেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করছিল—সরকার-মশাই কি তোমার কাছে আমার খবর নিয়েছিল গিরিধারী?

গিরিধারী বলেছিল—হ্যাঁ বাবুজী, সরকারমশাই বহোত্ দফে আমাকে আপনার বাত্ পুছেছে—

—সরকারমশাই ঘরের দরজা খুলে রেখে শুয়েছে?

—আচ্ছা, আমি দেখে আসি—

বলে গিরিধারী অন্ধকারের মধ্যেই ভেতরে গিয়ে দেখে এসে বলেছিল—না বাবুজী, দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়েছে।

তা তো বন্ধ করবেনই। অনেক টাকা থাকে মল্লিকমশাই-এর কাছে। দরজা খোলা রেখে শুলে টাকা খোয়া যাবার ভয় থাকে। রাত্রে বোধহয় সন্দীপের জন্যে মল্লিকমশাই অনেক রাত জেগে জেগে অপেক্ষা করেছেন। তারপর যখন অনেক রাত হওয়ার পরও সে আসেনি, তখন বুড়ো মানুষ আর জেগে থাকতে পারেন নি। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

গিরিধারী তখন বলেছিল—আপনি বাবুজী আমার ঘরে শুবেন?

সন্দীপ বলেছিল—তোমার এখানে কি জায়গা হবে?

গিরিধারী বলেছিল—রামজী কিরপা করলে কেন জায়গা হবে না বাবুজী? লেকিন আপনার থোড়া তক্‌লিফ্ হবে—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনও কষ্টই হয়নি সন্দীপের। কখন কোথা দিয়ে যে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল, তা টেরই পায়নি সন্দীপ। সকালবেলার দিকে তন্দ্রার মধ্যেই আগের রাত্রের সব কথা মনে আসছিল। তখনও যেন সৌম্যবাবুর সেই কথাগুলো তার কানে ভাসছিল—এ কি ব্রাদার? আপনিও এখানে? আপনিও তাহলে সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার? আপনিও ডুবে ডুবে জল খান?

তারপর যখন ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, তখনই ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে সন্দীপ।

হঠাৎ গিরিধারী এসে সন্দীপকে জেগে বসে থাকতে দেখে বললে—আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে বাবুজী?

সন্দীপ বললে—ছিঃ কত বেলা হয়ে গেল, তুমি আমাকে ডেকে দাওনি কেন গিরিধারী? মল্লিকমশাই এখন কী করছেন?

গিরিধারী বললে, আজকে তো আমাদের মাইনের দিন, তাই সকাল থেকেই সবাই মাইনে নিচ্ছে—

তাই তো বটে! আজই তো মাসের পয়লা তারিখ। আজই তো খিদিরপুরে যেতে হবে। সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে গিয়ে আজই তো বিশাখার টাকাটা তার মাকে দিয়ে আসতে হবে।
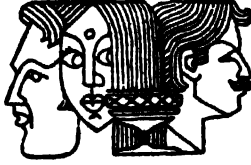
সত্যি মনে আছে সেদিন মল্লিকমশাই খুবই রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন—ছিঃ, ছিঃ, তোমার এতটুকু দায়িত্বজ্ঞানও নেই! তুমি একবারও বাড়ির কথা ভাবলে না! তোমার মা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আর তুমি কিনা কলকাতায় এসে এই রকম বে-আক্কেলের মত বাড়ির বাইরে রাত কাটালে? তুমি একবার আমার কথাও ভাবলে না? রাত্তিরে তোমার জন্যে ভেবে-ভেবে আমার কতক্ষণ ঘুমই হলো না, তা জানো? শেষকালে কতক্ষণ আর জেগে থাকবো, তাই শেষকালে ঘরের দরজায় খিল বন্ধ করে দিলুম। আমার ক্যাশবাক্সে কত টাকা থাকে, তাও তুমি ভালো করেই জানো। তা ছাড়া আজকে আবার বাড়ির সকলের মাইনের তারিখ। সে-সব টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে ক্যাশবাক্সে রেখেছিলুম—তা বলো তো কোথায় ছিলে তুমি? কলেজ থেকে ফিরতে এত দেরিই বা হলো কেন তোমার? কোথায় গিয়েছিলে?

সন্দীপ সব ঘটনা খুলে বলেছিল মল্লিকমশাইকে। মল্লিককাকা বরাবরই কম কথার মানুষ। সব শুনে বলেছিলেন—তারপর?

সন্দীপ বলেছিল—আমহার্স্ট স্ট্রীটে তখন পুলিশের গুলি চলছিল, তাই বাস-ট্রাম সবই বন্ধ। তখন আর কী করবো। ভাবলুম কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে হেঁটেই আসবো। সেখান দিয়ে হেঁটে-হেঁটে আসছি, এমন সময় গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপালকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন—

—গোপাল? কে গোপাল?

আমাদের বেড়াপোতায় হাজরা-বুড়ো থাকতো, বাজারে শাক-পাতা বিক্রি করতো। তারই ছেলে! আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়তো—

মল্লিকমশাই বললেন—তা সে কলকাতায় এলো কী করে?

সন্দীপ বললে—তা জানি না। সে কলকাতায় এসে খুব বড়লোক হয়ে গিয়েছে, অনেক টাকা করে ফেলেছে। একটা গাড়িও কিনেছে সে—

মল্লিকমশাই বললেন—গাড়ি কিনেছে? গাড়ির তো অনেক দাম! অত টাকা সে পেলো কোত্থেকে?

—তা জানি না।

—তারপর?

সন্দীপ বলতে লাগলো—তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো যে রাত ন'টা বেজে গিয়েছে, জানতুম রাত নটার সময় গিরিধারী বাড়ির গেট বন্ধ করে দেয়। তখন খুব ভাবনায় পড়লুম। সে বললে—ভাবনা কী এখুনি খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারে সে। বলে আমাকে খাওয়াবার জন্যে একটা হোটেলে নিয়ে গেল—

মল্লিকমশাই বললেন—সে কী? সে তোমাকে খাওয়াবার জন্যে হোটেলে নিয়ে গেল আর তুমিও হোটেলে গেলে? তারপর কী হলো? তুমি সেখানে খেলে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

মল্লিকমশাই বললেন—ছিঃ ছিঃ, তুমি হোটেলে খেলে কী বলে? আমি তো এতকাল ধরে কলকাতায় আছি, একদিনের জন্যেও হোটেলে খাইনি। হোটেলের ভেতরটা কেমন, তাও কখনও এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত দেখলুম না। তা খেলে কী?

সন্দীপ বললে—নান্—

—নান্ মানে? নান্ কী জিনিস?

—আমিও তা জানতুম না। গোপালই বললে নান্ মানে এক রকমের রুটি, ময়দা দিয়ে তৈরি করে—

—তার দাম কত?

সন্দীপ বললে—তা আমি জানি না।

—দাম তুমি দিলে?

সন্দীপ বললে—না, আমি পয়সা কোথায় পাবো? গোপালই আমার হয়ে পয়সা দিলে। তার সঙ্গে মুরগীর মাংসের শিক্কাবাব দিয়েছিল, তা আমি খাইনি। সেটা গোপাল খেলে—

—তারপর?

সন্দীপ বলতে লাগলো—তারপর আমি চলে আসতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ চারদিকে একটা গোলমাল উঠলো, ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আর সেই অন্ধকারের পর যখন আবার আলোগুলো জ্বললো, দেখি একটা জায়গায় অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছে। কী হয়েছে দেখতে গিয়ে যেই কাছে গিয়েছি, তখনই দেখলুম আমাদের বাড়ির খোকাবাবু—

মল্লিকমশাই কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠেছেন। বললেন—খোকাবাবু? বলছো কী তুমি? খোকাবাবু? আমাদের সৌম্য? এ-বাড়ির ঠাক্‌মা-মণির নাতি?

—হ্যাঁ, সৌম্যবাবু—

—তাঁকে তুমি চিনলে কী করে? তুমি তো কখনও দেখনি তাকে—

সন্দীপ বললে—না, আমি তাঁকে আগে দেখেছি—

—কোথায়? কোথায় দেখেছ?

—আমাদের এই বাড়িতেই। কিছুদিন আগে তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাজমিস্ত্রী খাটাচ্ছিলেন, তখন আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কে, আমি কী করে এ-বাড়িতে—আরো সব অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে সব কথা বলেছিলাম। তারপর থেকে আর কোনও দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ ওইখানে দেখা হয়ে গিয়েছিল—

—উনি তোমায় চিনতে পারলেন?

—কপাল দিয়ে তখন ওর রক্ত বেরোচ্ছিল। মদের ঝোঁকে মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় হয়ত খুব চোট্ লেগেছিল।

—মদ? খোকাবাবু মদ খেয়েছিলেন নাকি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, গোপাল বললে ওখানে তো সবাই মদ খেতেই যায়। সমস্ত রাত নাকি ওখানে সবাই মিলে মদ খায়। অনেক মেয়েম'নুষও ছিল সেখানে—

—মেয়েমানুষরাও মদ খাচ্ছিল নাকি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ!

মল্লিকমশাই কথাগুলো শোনার পর মনে হলো, যেন খুব অবাক হলেন, আবার যেন মনে মনে খুব কষ্টও পেলেন। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন-- হোটেলটা কোথায় বলো তো, কোন জায়গায়?

সন্দীপ বললে—তা বলতে পারবো না। আমি তো কলকাতার সব রাস্তা চিনি না। গোপাল গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলুম। ও বললে, ওটা নাকি নাইট ক্লাব একটা—

—নাইট ক্লাব? নাইট-ক্লাব মানে?

সন্দীপ বললে—তা আমি জানবো কী করে? নাইট-ক্লাবে কী হয়, সবাই কেন যায় সেখানে, তাও জানি না—

মল্লিকমশাই কথাগুলো শুনে আবার যেন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষকালে জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? তারপর নাইট-ক্লাব থেকে বাড়ি এলে কী করে?

—গাড়িতে করে। সৌম্যবাবু কোনও রকমে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এলেন। তারপর গিরিধারী সৌম্যবাবুকে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে গেল। আপনার ঘরের দরজা বন্ধ, তাই গিরিধারী তার ঘরেই শুতে বললে—

মল্লিকমশাই খানিক পরে বললেন—তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছ সন্দীপ, খুব অন্যায় কাজ করেছ। এখানে তোমার মা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে বিশ্বাস করে। এই কলকাতা বড় আজব জায়গা। বিশেষ করে তোমার মত কম বয়েসের ছেলেদের কাছে। এখানে যদি কেউ গোল্লায় যেতে চায় তো তার রাস্তা চিরকালের মত খোলা আছে। আবার এখানে যদি কেউ সৎপথে নিজের উন্নতি করতে চায় তো তার রাস্তাও খোলা আছে। এ-সব নির্ভর করছে নিজের নিজের মনোবৃত্তির ওপর। তুমি যদি নিজের ভালা চাও তাহলে আমি যা বলবো তাই করবে! তুমি এই মুখুজ্জেবাড়ির আশ্রিত। এদের মঙ্গলেই তোমার মঙ্গল, এদের ক্ষতিতেই তোমার ক্ষতি। এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে। সৌম্যবাবু মদ খান আর যা-ই খান, সেদিকে তোমার দেখবার দরকার নেই। যারা তোমার উপকার করছে তাদের সব সময়ে তুমি মঙ্গল কামনা করবে। এইটুকু জানবে যে এদের ভালোতেই তোমার ভালো আর এদের খারাপ হলে তোমারও খারাপ। তা যদি না করো তো তুমি হবে নেমক-হারাম। তুমি ভবিষ্যতে এ-বাড়িতে থাকো আর না থাকো, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন এ-বাড়ির কল্যাণই কামনা করবে, এ-বাড়ির লোকদের ভালোই চাইবে। তুমি তোমার প্রাণ দিয়েও এ-বাড়ির ইজ্জৎ বাঁচাবার চেষ্টা করবে, বুঝলে? আমার কথাগুলো সারাজীবন মনে রেখো। তোমার মা তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমাকে এত কথা বল্য—আজকে আমার কথাগুলো মনে রাখলে তোমারই ভালো হবে সন্দীপ, তোমারই ভালো হবে, তোমারই ভালো হবে—
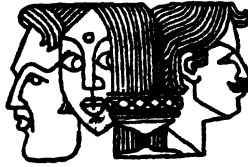
জীবনের চার ভাগের তিন ভাগ অতিক্রম করে আজ যদি সন্দীপ পেছন ফিরে দেখতে চায় তো সে কী দেখবে? সে কি বিড্‌ন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাড়ির মঙ্গল চেয়ে এসেছে, না অমঙ্গল চেয়ে এসেছে? যারা দুঃখের দিনে তার উপকার করেছিল, তাকে আশ্রয় দিয়ে, অন্ন দিয়ে তার তখনকার দিনগুলোকে সহজ করেছিল, সে কি তাদের ভালো চেয়েছে না মন্দ চেয়েছে? অনেক আঘাত অনেক অপমান সহ্য করেও সে তো তাদের শুভ-কামনাই করে এসেছে বরাবর। সে তো নিজের প্রাণ দিয়েই শুধু নয়, নিজের সর্বস্ব দিয়েই তো তাদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে এসেছে।

মল্লিকমশাই আজ বেঁচে থাকলে সন্দীপ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলতো—মল্লিককাকা, আমি আপনার সেদিনকার কথা রেখেছি। আমার প্রাণই শুধু নয়, আমার সারা জীবনের সর্বস্ব দিয়ে আমি মুখুজ্জেবাড়ির ইজ্জৎ রেখেছি। এবার বলুন আমি আর কী করতে পারি? আমি আর কত দিতে পারি? আমার দিতে আর কত বাকি আছে?

এখনও মল্লিকমশাই-এর শেষ কথাগুলো তখনও কানে বাজছে—আজকে আমার বলা কথাগুলো মনে রাখলে তোমারই ভালো হবে সন্দীপ, তোমারই ভালো হবে, তোমারই ভালো হবে...

মনে আছে, এর পর মল্লিক-মশাই বলেছিলেন—আজ মাসের পয়লা তারিখ, সেটা তোমার মনে আছে তো? আজকে আমারও অনেক কাজ ছিল। এ-বাড়ির সকলের মাসকাবারি মাইনে দিয়ে দিয়েছি আজ। আজকে তোমাকে আবার এখুনি খিদিরপুরের মনসাতলা লেনে গিয়ে

যোগমায়া দেবীর মাসকাবারি পাওনাটা দিয়ে আসতে হবে। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, দেরি করলে আবার তপেশবাবু অফিসে চলে যাবেন। তাঁর অফিসেও তো আবার আজ মাইনের দিন—

সন্দীপের মনে পড়ে গেল কথাটা। সত্যিই তো আজ আবার সেই গেল মাসের মত বিশাখাদের বাড়ি যেতে হবে। সে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। মল্লিকমশাই গুণে-গুণে একশো পঁচিশ টাকা সন্দীপের হাতে দিলেন। বললেন—বেশ সাবধানে যাবে বাবা, বুঝলে? আবার কাল রাত্তিরের মত যেন না-হয়, টাকাটা দিয়ে শিগ্‌গির-শিগ্‌গির ফিরে আসবে। তুমি এলে তখন আমরা এক সঙ্গে খেতে বসবো—তুমি না-আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু একলা তোমার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্‌ করবো—দেরি করোনো যেন—

তারপর বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও সন্দীপকে সাবধান করে দিলেন। বললেন—এ কলকাতা শহর, এ তোমার বেড়াপোতা নয়, এখানে সবাই চোর-ডাকাত। যদি কেউ একবার গন্ধ পায় যে তোমার কাছে টাকা আছে, তা হলে আব প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পাববে না—

তারপর অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে বললেন—দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—

সন্দীপ জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।
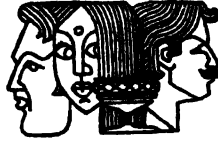
মল্লিকমশাই ছিলেন ঠিক তাঁবা মায়ের মত। সন্দীপের মা'ও সব সময়ে সন্দীপকে সাবধান করে দিত। মা-ও বলতো—খুব সাবধানে যাবে বাবা—

আব অদৃশ্য কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে বলতো—দুর্গা শ্রীহরি—

মল্লিকমশাই আর তার মা যত বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষী হোক, সন্দীপের ভাগ্যবিধাতা যে সে-সব আশীর্বাণী শুনে অলক্ষ্যে যে নিঃশব্দে হাসতেন, তা কে তখন কল্পনা করতে পেরেছিল? আজ মনে হয় সন্দীপ যদি সেদিন বেড়াপোতা ছেড়ে কলকাতার এই বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে না আসতো তা হলে বোধহয় তার জীবনের ধারা অন্য খাতে বইতো। সন্দীপও তাহলে আজ যা হয়েছে তা না হয়ে একেবারে অন্য রকম মানুষ হতো।

খিদিবপুরের সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে এমনিতেই মাসের পয়লা তারিখটা একটু সোরগোল পড়ে যেত। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখ যেমন তপেশ গাঙ্গুলী রেলের অফিসে দুপুর-বেলায় মাইনে পেয়ে যেতেন, তেমনি সকালবেলাতেও মল্লিকমশাই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে মাসকাবারি পাওনা-টাকাটা তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিয়ে আসতেন। হাজার ঝড়বৃষ্টি হোক, হাজার কনকনে শীত পড়ুক, পৃথিবীতে হাজার ভূমিকম্প হোক, এই পয়লা তারিখে দুতরফ থেকে টাকা পাওয়াটার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখটাতেই তপেশ গাঙ্গুলী সকাল-সকাল বাজাব সেরে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে মল্লিকমশাই-এর আসার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। এক মিনিট দেরি হলেই সদর দরজাটা খুলে রাস্তার ফুটপাথে গিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে তীর্থের কাকের মত চেয়ে থাকতেন। কত লোক আসতো-যেত, কিন্তু মল্লিকমশাইকে কখনও দেখা যেত না। অনেকক্ষণ পর যখন অনেক দূরে মল্লিকমশাই-এর চেহারাটা দেখা যেত, তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতেন। চিৎকার করে বলতেন—বউদি, মল্লিকমশাই এসে গেছে—

তখন আনন্দের চোটে তিনি নিজের শোবার ঘরেও ঢুকে পড়তেন। বলতেন—ওগো, ওঠো উঠে বসো, মল্লিকমশাই আসছে—

রাণী বলতো—মল্লিকমশাই আসছে তো আমি তাব কী করবো? নাচবো?

বাণীর জবাবটা তপেশবাবুর আনন্দের উত্তাপের ওপর কেউ যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিত। আর তিনি যেন হতাশায় ফাটা বেলুনের মত চুপ্‌সে যেতেন। বলতেন—আচ্ছা, আমার সব কথাতেই তুমি অমন ফোঁস করে ওঠো কেন বলো তো? আমি তোমার কী ক্ষতিটা করেছি?

বাণী সঙ্গে সঙ্গে ফুট্ কাটতো। বলতো—তুমি চুপ করো তো। একে আমার সকাল থেকে মাথা টিপ-টিপ করছে, তার ওপর আবার তোমার ভ্যান্ ভ্যান্

তপেশ গাঙ্গুলী মুখটা চুন করে আবার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। এই কথাটা ভেবেই কেবল তাঁর কান্না পেত যে তিনি এত-কিছু করেও স্ত্রীকে খুশী করতে পারলেন না। মল্লিকমশাই-এর দেওযা পুরো টাকাটা বাণীর হাতে তুলে দিলেও যেমন তার মন পাওয়া যেত না, অফিসের পুরো মাইনেটা তার হাতে তুলে দিয়েও ঠিক তেমনি তার মন পাওযা যেত না। কী পেলে যে বাণীর মন পাওযা যেত, তা বোধহয় বাণীর বিধাতা-পুরুষেরও অগোচর ছিল।

সেদিন সকালবেলাই বাণী রান্নাঘরের দাওযার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে—হ্যাঁ বড়দি, আমার বিজলী কি তোমার আপন দেওর-ঝি নয?

যোগমাযা তখন ঠাকুরপো'র অফিসের ভাত-তরকারি নিয়ে ব্যস্ত। বললে—আমাকে বলছো দিদি?

—তা তোমাকে বলছি না তো কি ও পাড়ার নাজিরদের বাঙামাসীকে বলছি? তা এও বলে রাখছি বড়দি, আমারই বুকের ওপর বসে আমারই নাক কাটবে, তা আমি করতে দেব না—

যোগমাযা বললে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, দিদি তুমি কী বলছো?

বাণী বললে— তা বুঝতে পারবে কেন? বুঝতে পারলে যে আমার সুখ হবে—

যোগমাযা বললে—একটু খুলে বলো না দিদি, আমি কী অন্যায় করেছি—

—অন্যায় তো তুমি করোনি বড়দি, অন্যায় করেছি আমি। আমি আর-জন্মে অনেক অন্যায় করেছিলুম বলেই এ-জন্মে আমার এত ভোগান্তি। নইলে এত বাড়ি থাকতে আমি এ-বাড়ির বউ হতে যাবো কেন?

যোগমাযা উনুনের কড়াটা মেঝেতে নামিযে বললে—তোমার পাযে পড়ি দিদি, তুমি আমায খোলসা করে বলো আমার কী অন্যাযটা হয়েছে। আমি যদি জেনে শুনে কোনও অন্যায করে থাকি তো নাকে খত দিযে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো, আর ভগবানের কাছে হাতজোড় করে বলবো যেন নরকেও আমার ঠাঁই না হয—

এমন সময তপেশ গাঙ্গুলী চান করে এসে দাঁড়ালো। বললে—আবার কী হলো তোমাদের? সকাল থেকেই আজ তোমরা ঝগড়া শুরু করে দিলে?

বাণী স্বামীকে ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি কেন আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে আসো শুনি? তুমি অফিস যাচ্ছো যাও না—ব্যাটাছেলে হযে তুমি মেয়েছেলেদের কথার মধ্যে নাক গলাও কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আজকে মাসের পযলা তারিখ সেটা জানো? মাসের এই পযলা তারিখটাতেও কি তোমরা আমাকে একটু শান্তি দেবে না?

বাণী এবার স্বামীকে ধমকে উঠলো—তুমি থামো তো। তোমার অফিস-কাছারি আছে, তুমি তাই নিযে মাথা ঘামাও গে। সংসার জ্বলেপুড়ে ছাই হযেই যাক আর গোল্লাযই যাক, তাতে তোমার কী?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা এ সংসার কি শুধু তোমাদের একলারই? আমার সংসার নয? সংসারের যত হ্যাপা কি আমাকেও সইতে হয না?

বাণী বলে উঠলো—তুমি সংসারের কোন্ হ্যাপাটা সহ্য করো শুনি, কোন হ্যাপাটা সহ্য করো? এই যে তোমার বৌদি নিত্যি নিজের মেয়েকে গঙ্গার ঘাটে নিযে গিযে তাকে দিযে ব্রত করায, সে খবর কি তুমি রাখো?

—ব্রত? ব্রত কীসের?

বাণী বললে—ব্রত যদি না-ই জানবে তো তাহলে সে-কথায় নাক গলাতে আসো কেন? বিশাখার যাতে ভালো বরে, ভালো ঘরে বিয়ে হয়, তাই তোমার বৌদি লুকিয়ে-লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ব্রত করায়। কেন, তোমার নিজের মেয়ে বিজলীর কি ভালো ঘরে, ভালো বরে বিয়ে হতে নেই? সে কি বানের জলে ভেসে এসেছে? সে কি তোমার বৌদির কেউ নয়? সে কি পর?

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে বাণী হাফাচ্ছিল। এর জবাবে তপেশ গাঙ্গুলী কী বলবে, কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে বলবে, তা কিছু বুঝতে পারলে না। তাই যোগামায়ার দিকে চেয়ে বললে—বৌদি—

কিন্তু হঠাৎ সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওই ওই বোধহয় বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের বাড়ি থেকে টাকা দিতে

ফলে রণভঙ্গ দিয়ে সদর-দরজার দিকে পালিয়ে বাচলেন—

বললেন—যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি—

প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখটা তপেশ গাঙ্গুলীর এই রকম করেই কাটে। ঠিক বুঝে বুঝে ওই তারিখেই যেন যত রকম উটকো ঝামেলা এসে হঠাৎ উদয় হয়। তাঁর সব সময় কেবল মনে হয় ওই বুঝি মুখুজ্জেবাড়ির থেকে লোক এসে তাঁকে ডেকে ডেকে না পেয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হয়। তাঁর প্রার্থিত টাকা তিনি পেয়ে যান। তাই যখন তাঁর বাড়ির দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো, তিনি ভেবেছিলেন ও নিশ্চয়ই বিডন স্ট্রীটের বাড়ির লোক। তিনি দরজার দিকে যেতে-যেতেই বলতে লাগলেন—যাচ্ছি, যাচ্ছি, এত দেরি কেন আজ?

কিন্তু না এ মুখুজ্জেবাড়ির লোক নয়।

তপেশ গাঙ্গুলী দরজা খুলেই হতাশ হয়ে গেলেন। বললেন—আরে তুমি? তুমি কি নতুন লোক নাকি? সদর দরজায় কেন? খিড়কি দরজা দিয়ে এসো—

আসলে লোকটা কয়লার দোকানের। এক বস্তা কয়লা নিয়ে এসেছিল।

—ও বৌদি কয়লা নিয়ে এসেছে, খিড়কির দরজাটা খুলে দাও তো—

সংসারের সব কাজের ভারই ওই এক যোগামায়ার ওপর। ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা, কয়লা ভাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাপড় কাচা, তরকারি কোটা সমস্ত কিছু কাজ।

সেদিন যখন বিশাখার ব্রত করানো নিয়ে এই বাড়িতে তুমুল কাণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, ঠিক তখনই ঈশ্বর কয়লাওয়ালাকে পাঠিয়ে সেই তুমুল কাণ্ডর ভয়াবহ পরিণতিকে খানিকক্ষণের জন্যেও অন্তত শান্ত করেছিলেন। তপেশ গাঙ্গুলী খেতে-খেতে বলেছিলেন—তা বৌদি, তুমি যেমন বিশাখাকে ব্রত করাচ্ছ তেমনি বিজলীকেও করাও না। খরচ-পত্তোর যা লাগে তা না-হয় আমিই দেব—

যোগমায়া বললে—খরচ-পত্তোরের কথা বলো না ঠাকুরপো, বিশাখা আমার মেয়ে বটে, কিন্তু বিজলীও নিজের মেয়ের মত।

বাণী বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী তাকে বাধা দিয়ে বললেন—ওই কথাই রইল বৌদি, তাহলে কাল সকালবেলা বিশাখার সঙ্গে তুমি বিজলীকেও নিয়ে যেও। যাবে তো?

যোগমায়া বললে—ব্রত করতে কষ্ট করে আর গঙ্গার ঘাটে যেতে হবে কেন ঠাকুরপো? এই বাড়িতে বসেও তো ব্রত হয়—

—তাহলে তুমি বিশাখাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাও কেন কষ্ট করে?

যোগমায়া বললে—কষ্ট কি আর সাধ করে করি? বাড়িতে ব্রত করার অনেক ঝামেলা। দিদি যদি বলে তাহলে আমি বাড়িতেই ব্রত করবো। আমার মা তো আমাকে দিয়ে বাড়িতেই ব্রত করাতো—

তপেশ গাঙ্গুলীর খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। রাণীর দিকে চেয়ে বললে—কই গো কোথায় গেলে তুমি?

রাণী তার আগেই চিরাচরিত নিয়মের মত নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। তপেশ গাঙ্গুলী মুখ-হাত-পা ধুয়ে সেই ঘরে গেলেন। বললেন—কী গো, তুমি শুয়ে পড়লে যে? কথা বলছ না কেন? বিজলী তাহলে বিশাখার সঙ্গে বাড়িতেই ব্রত করবে তো?

রাণী বললে—কে কোথায় কী করবে, তা আমি কী জানি? আমি কে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি কে মানে? তুমিই তো এবাড়ির আসল গিন্নী। তোমার মত না হলে কি এ-বাড়ির কোনও কিছু চলে? তুমিই তো সব?

তপেশ গাঙ্গুলী অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেও রাণীর কাছ থেকে যখন কোনও জবাব পেলেন না তখন বললেন—কী গো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? বিজলী কী বাড়িতে ব্রত করবে?

রাণী কথাগুলো শুনতে পেলে কি শুনতে পেলে না, তা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও জানা গেল না—

তপেশ গাঙ্গুলী আবাব জিজ্ঞেস করলেন—কী গো, বলো কী বলবে?

রাণী বললে—আমি এ-সংসারের কে? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি এ-সংসারের কর্তা, তুমি যা বলবে তা-ই হবে—

তখন আর দাঁড়াবার সময় ছিল না তপেশ গাঙ্গুলীর। আজ অফিস না-গেলেই নয়। আজ মাইনের দিন। বললেন—ঠিক আছে, আমি তাই বলি গিয়ে—

বলে তিনি রান্নাঘরের দিকে গিয়ে যোগমায়াকে বললেন —বৌদি, তুমি তাহলে বাড়িতেই ব্রত করিও এখন থেকে। আজ মাইনের দিন আমি অফিসে চলি। যদি বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাড়ি থেকে টাকা দিতে সেই ছোকরা আসে তো তুমি সই দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিও। টাকা কিন্তু গুনে নিও। যেন একশো পাঁচিশ টাকা ঠিক হয়। আর তোমার ব্রতর জন্যে বাজাব থেকে কিছু কিনে আনতে হবে?

যোগমায়া যখন বললে যে কিছু দরকার নেই, তখন তপেশ গাঙ্গুলী রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় পা দিতেই প্রত্যেক দিনের মতন তাঁর মনে হলো কী করতে যে তিনি সংসার করেছিলেন কে জানে! দাদা জোর করে তাঁর বিয়ে দিয়েই যত সর্বনাশ করে গেছে। এমন জানলে কোন্ শালা বিয়ে করতো!

সামনের দিক থেকে একটা বাস আসতেই তিনি তাতে উঠে পড়লেন। চলন্ত বাসের পা-দানিতে কোনও রকমে আধখানা পা রেখে ঝুলতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো এই রকম ঝুলন্ত অবস্থায় বাস থেকে পড়ে গিয়ে যেদিন তিনি চাকার তলায় চেপ্টে মারা যাবেন, সেইদিনই তিনি শান্তি পাবেন। তার আগে নয়। কোথাও এতটুকু শান্তি দেবাব কেউ নেই তাঁর। যেমন হয়েছে শালার বউ, তেমনি হয়েছে শালার গভর্মেন্টি। সব শালাই সমান।

বাসটা তখন সেই ঝুলন্ত তপেশ গাঙ্গুলীকে নিয়ে সামনের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে।
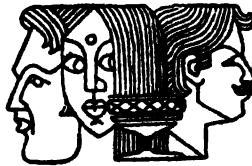
বিশাখা জানতো সেই ছেলেটা সেদিন তাদের বাড়িতে আসবেই। সে কাউকে না জানিয়ে খিডকির দরজা খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সন্দীপও বাস থেকে নেমে সাত নম্বব বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছিল। আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে তার। আগের দিন রাতটা কেটেছে গিরিধারীর ঘুপচি ঘরে। সেখানে না ছিল হাওয়া

আর না ছিল হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শোবার জায়গা। তা-ও তো বলতে গেলে প্রায় সমস্ত রাতটাই সে কাটিয়েছে নাইট-ক্লাবে।

নাইট-ক্লাব কথাটা আগে কখনও শোনেনি সন্দীপ। ওটা ছিল তার কাছে তখন নতুন জিনিস। পৃথিবীতে কোথাও যে অমন জিনিস থাকতে পারে, তা তার কল্পনাতেও ছিল না কখনও। সন্দীপ বেড়াপোতার চ্যাটার্জিবাবুদেব বাড়ির লাইব্রেরীতে অনেক বই পড়েছে, তা থেকে কত কী সে শিখেছে, কত কী সে জানতে পেরেছে। কিন্তু নাইট-ক্লাব! পৃথিবীর আর কোথাও নাইট-ক্লাব আছে কিনা তা সন্দীপ বলতে পারে না। কিন্তু কলকাতাব মত শহরে যে তা আছে, তা নিজের চোখে না দেখলে কি সে বিশ্বাস করতো?

সব শুনে মল্লিকমশাই-এর মুখখানা গম্ভীব হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে কিছু বলেন নি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে বলেছিলেন—ওখানে গিয়ে তুমি ভালো করোনি—

কিন্তু সন্দীপ কি নাইট-ক্লাবে ইচ্ছে করে গিয়েছিল? গোপাল জোর করে তাকে নিয়ে না গেলে কি সে যেত?

মল্লিকমশাই বলেছিলেন— ও-সব জায়গায় ভদ্রলোকেবা যায় না—

—কিন্তু গোপাল যে গিয়েছিল?

মল্লিকমশাই বলেছিলেন—গোপালকে আমি চিনি না, জানি না সে ভদ্রলোক কিনা।

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু তার যে অনেক টাকা—

মল্লিকমশাই আবার বলেছিলেন —অনেক টাকা থাকলেই কেউ ভদ্রলোক হয় এ কথা তোমাকে কে বলেছে? সে কী করে?

সন্দীপ বলেছিল—তা জানি না। তবে দেখছিলাম অনেক রাস্তার সব মোড়ে মোড়ে পুলিশদেব সে টাকা দিচ্ছিল—

—পুলিশদের কেন টাকা দিচ্ছিল? ঘুষ?

সন্দীপ বলেছিল—তা জানি না।

মল্লিকমশাই বলেছিলেন—তা যখন জানো না তখন তার হয়ে সাফাই গাইতে এসো না। সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে কিছু অন্যায় করে। নইলে পুলিশদেব সে অমন করে টাকা দিতে যাবে কেন? অত রাত্তিরে পুলিশদের টাকা দেওয়ার পেছনে তার উদ্দেশ্য কী? তারা গোপালের কে?

সন্দীপ এ প্রশ্নেব কোন জবাব দিতে পারেনি। মল্লিকমশাই বলেছিলেন—যা হোক এইটে জেনে রেখো যে ওই-সব নাইট-ক্লাবে কোনও ভদ্রলোক যায় না—

সন্দীপ বলেছিল—কিন্তু ওখানে না গেলে তো জানতেই পারতুম না যে আমাদের এই বাড়িব ছোটবাবু ওখানে যান। ছোটবাবুও তো...

সন্দীপের কথায় বাধা দিয়ে মল্লিকমশাই বলেছিলেন—তা ছোটবাবুই কি তোমার আদর্শ? তুমি হলে গরীব বিধবার ছেলে আর ছোটবাবু হলেন কোটিপতি মানুষ। ছোটবাবুর সঙ্গে কি তোমার তুলনা? ছোটবাবু যা করবেন তুমিও কি তাই-ই করবে? ছোটাবাবুব টাকা আছে, তিনি যেমন ইচ্ছে টাকা খরচ করবেন, যখন যা ইচ্ছে হবে করবেন। কিন্তু ভুলে যেও না আমরা গরীব, আমরা গরীবদের মত থাকবো, তুমি এ-বাড়িতে এসেছ এখানে থাকতে পাচ্ছো, খেতে পাচ্ছো, এদের নুন খাচ্ছো তুমি, এদের গুণগান করতেই হবে তোমাকে। তা যদি না করো তো সেটা নেমক হারামী হবে জেনে রেখো—

এর পরে সন্দীপ আর কোনও কথা বলেনি। আর মল্লিকমশাই-এর হাতেও তখন অনেক কাজ ছিল। কিন্তু সন্দীপেরও কি অনেক কথা বলবার ছিল না? ছিল বইকি। অনেক কথাই বলবার ছিল। বলবার ছিল এই যে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে বড়লোক আব গরীবদের কি আলাদা আলাদা বিচার হবে? অর্থাৎ বড়লোকদের মনুষ্যত্ব আর গরীবদের মনুষ্যত্ব কি আলাদা রকমের? তা যদি হয় তো তাদের দু'দলের রক্তেব রংও আলাদা রকমের, শুধু রক্তই নয়, গায়ের রংও আলাদা হওয়া উচিত।

কিন্তু তাহলে চ্যাটার্জিবাবুরাও তো বড়লোক, তাদের গায়ের রং কালো কেন? সৌম্যবাবু বড়লোক বলে যদি তার নাইট-ক্লাবে যাওয়ার অধিকার থাকে তাহলে সন্দীপেরও নাইট-ক্লাবে যাবার অধিকার কেন থাকবে না? নাইট-ক্লাবে যাওয়া যদি অপরাধ হয় তাহলে ছোটবাবু সন্দীপ দু'জনের পক্ষেই সেখানে যাওয়া অপরাধ। আমার শরীর কালো বলে আগুনে পুড়তে বেশি সময় লাগবে, আর ছোটবাবু ফরসা বলে কি তার শরীর আগুনে পুড়তে লাগবে কম সময়?

বিডন স্ট্রীট থেকে বাসে আসতে-আসতে সন্দীপ এই-সব কথাই ভাবছিল। ভাবছিল যে যাদের বাড়িতে সে টাকা দিতে যাচ্ছে সেই বাড়ির বিশাখার সঙ্গে কিনা বিয়ে হবে এদের বাড়ির সৌম্যবাবুর, যাকে সে আগের দিন রাত্তিরেই মদ খেয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করতে দেখেছে। আশ্চর্য! এ বিয়ে কি সুখের হবে? এ বিয়েতে কি বিশাখা সুখী হবে?

কিন্তু আবার তার মনে হলো এ-সব কথা সে ভাবছে কেন? তার এ-সব কথা ভাববার দরকার কী? সত্যিই তো, মল্লিকমশাই তো বলেই দিয়েছেন ছোটবাবু যা ইচ্ছে করুন, যেখানে ইচ্ছে যান, যার সঙ্গে ইচ্ছে বিয়ে হোক, তা নিয়ে তোমার ভাববার দরকার কী? তুমি গরীব বিধবার ছেলে, এই বাড়িতে তুমি থাকতে পাচ্ছো, এই-ই তো যথেষ্ট, তুমি লেখাপড়া করবে, চাকরি করে মা'কে খাওয়াবে, তুমি তাই নিয়ে ভাবো, অন্য কিছু কথা ভাবা তোমার পাপ।

বাসটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। সন্দীপ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাসটা হঠাৎ থেমে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বাসের যত যাত্রী সবাই চমকে উঠেছে! কী হলো? হলো কী? হুড়হুড় করে সবাই বাস থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো।

ততক্ষণে হাজার-হাজার লোক জমে গেছে, রাস্তায়, তারা বাসটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। সবাই চিৎকার করছে—মারো, মারো শালাকে—

—শালাকে টেনে নিচেয় নামিয়ে আনুন—

সন্দীপের জামার বুক-পকেটের ভেতর দিকে একশো পাঁচিশটা টাকা আছে। মল্লিকমশাই যথারীতি সাবধানে আসতে বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন—এ কলকাতা শহর, এখানে কাউকে বিশ্বাস করো না। বাঙালীরা খুব বদমাইশ জাত। তুমি এখেনে গ্রাম থেকে নতুন এসেছ জানতে পারলেই তারা তোমার পকেট কাটবে। যেখানে ভিড় দেখবে সেদিকে মোটে যাবে না—

কিন্তু তখনকার মত কথাটা বোধহয় ভুলে গিয়েছিল সন্দীপ। নইলে অন্য সকলের মত সেও বাস থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো কেন? আর নেমেই যদি পড়লো তাহলে মানুষের ভিড়ের মধ্যে গেল কেন? কেন ভিড় কাটিয়ে সে একেবারে ভেতরের দিকে উঁকি মারতে গেল?

—শালাকে নিচেয় নামিয়ে আন্—শালা বাস চালাতে জানে না।

—শালা কন্‌ডাকটারটা কোথায়? ওই তো শালা পালাচ্ছে—ধর-ধর—

কয়েকজন মিলে বাসের কন্‌ডাকটারকে ধরে ঘুঁষি মারতে শুরু করলে। কেউ কন্‌ডাকটারের চুল টেনে ধরেছে, কেউ ধরেছে গলা টিপে, আবার কেউ শার্ট ধরে টানছে। আর একজন তারই মধ্যে তার কাঁধ থেকে টাকা-পয়সার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে গিয়েই টাকা-পয়সা পিচের রাস্তায় ঝন্-ঝন্ শব্দ করে ছিট্‌কে পড়লো।

কিন্তু কেন যে সবাই মারছে তাদের তা বোঝা গেল একটু পরে। সে-দিকটায় প্রথমে নজরে পড়েনি সন্দীপের, পাশেই আর একটা জটলা হয়েছে আর একটু দূরেই সন্দীপ সেই দিকে সরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে। দেখতে গিয়েই তার সমস্ত শরীরটা যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। দেখলে একটা লোক বাসের চাকার তলায় চেপ্টে গিয়ে একেবারে সারা জায়গাটা রক্তে রক্তে ভেসে গেছে। আর শরীরটা তার কাদার মত ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গায়।

—কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?

সকলেরই মুখে ওই একই কৌতূহল। একই কৌতূহল যেন আকাশে-বাতাসে অন্তরীক্ষে ইথারে ভেসে-ভেসে সকলকে পীড়িত করছে, কেবল বলছে—কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?

আর আশ্চর্য, এতক্ষণ সেদিকে নজর পড়েনি সন্দীপের। সেই দিকটায় রয়েছে আসল জিনিসটা। এত যে মারামারি, এত যে উদ্বেগ, এত যে কৌতূহল, এত যে প্রশ্ন, এত যে কোলাহল, সব-কিছুর কেন্দ্রেই ছিল সেটা।

সেখানেও উঁকি মেরে দেখলে সন্দীপ। একটা ফুলে-ফুলে ঢাকা দামী খাটের ওপর শোয়ানো একটা মৃতদেহ। শ্মশানে যাওয়াব পথে শবদেহবাহীরা একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য বোধহয় খাটটা সেই পিচের রাস্তায় সূর্যের আলোর তলায় বসিয়ে রেখেছে—

—না মশাই, না। এই মড়াটাকে শ্মশানে নিযে যাওয়ার সময়েই তো ব্যাটা বাসের তলায় চাপা পড়ে মরলো—

—কেন?

আর একজন লোক দয়া কবে জিনিসটা ব্যাখ্যা করে দিলে।

পয়সার লোভ কার না আছে মশাই? সকলেরই তো পয়সার লোভ। দোষটা ওমনি পয়সার হয়ে গেল? পযসার জন্যেই তো দুনিয়াটা চলেছে—

তবু কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সন্দীপ একজন শববাহীদের দলের লোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মশাই?

লোকটা সন্দীপের দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

সন্দীপ বললে—আমি এই বাসটায় চড়ে খিদিরপুরে যাচ্ছিলুম। বাসটা থামতেই আমরা সবাই নেমে পড়লুম—

পাশেই একজন দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হলো মৃতদেহ তারই কোনও নিকট আত্মীয়ের। বেশ শান্ত গলায় বললে—আমাদের সামনে একজন ছেলে রাস্তায় খই ছড়াতে-ছড়াতে যাচ্ছিল, আর সঙ্গে -সঙ্গে পাঁচ পয়সা দশ পয়সার খুচরোও ছড়ানো হচ্ছিল, রাস্তার ছেলেরা তাই কুড়োবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, এমন সময় আপনাদের দোতলা বাসটা এসে...

কথা শেষ হলো না। তখন ওদিকে পুলিশের গাড়িতে চড়ে একদল পুলিশ এসে হাজির হয়েছে—

—এই ভাগো, ভাগো ইঁহাসে—ভাগ্‌ যাও—

পুলিশের দল জনতার দিকে তেড়ে এল লাঠি নিয়ে। অন্য লোকদের সঙ্গে সন্দীপ সরে গেল। সব জায়গাটা তখন ফাঁকা। সন্দীপ দূর থেকে ভিখিরির চাপা পড়া বিকৃত চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার আর চেহারা বলে কিছু নেই। শুধু কয়েক টুকরো মাংস, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আর রক্ত। আশ্চর্য, ছেলেটা এক মিনিট আগেও জানতো না ওই পয়সা কুড়োন তার শেষ পয়সা কুড়োন হয়ে যাবে। আর ওই শবদেহটার পেছনে তাকেও শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে!

সেই দিকে চেয়ে অন্য কার কী মনে এল কে জানে, কিন্তু সন্দীপের ছেলেবেলায় নিবারণ কাকার সেই বিল্বমঙ্গলের অভিনয়ের দৃশ্যগুলো মনে পড়ে গেল—

এই নরদেহ,
জলে ভেসে যায়
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর-শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম সম পবন উড়ায়
এই নাবী, এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে..

সেদিন সেই ছোটবেলায় সন্দীপ কথাগুলোর মানে কী বুঝেছিল, কতটুকু বুঝেছিল তা আর মনে নেই। কিন্তু রাস্তায় দামী খাটের ওপর শুইয়ে রাখা ওই মৃতদেহটা আর বাসের তলায় চাপা পড়া ওই ছেলেটার মাংসপিণ্ডটা দেখে তার মনে হলো কথাগুলোর মানে যেন এখন এতদিনে সে ভালো করে বুঝতে পেরেছে। বুঝে নিয়েছে যে, যে শরীরটা নিয়ে মানুষের এত অহংকার, এত দম্ভ, এই অহমিকা, তার এই-ই শেষ এই-ই পরিণতি। আগের দিন নাইট-ক্লাবে গিয়ে যা সে

দেখেছিল, সেই মানুষগুলোর নারী-মাংস নিয়ে যে লোফালুফি প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদেরও এই একই পরিণতি। ওই যে খিদিরপুরের বিশাখা, তারও যেমন একদিন এই পরিণতি হবে, বিডন স্ট্রীটের ওই সৌম্যবাবু, ওরও একদিন সেই পরিণতি হবে; এই শ্মশানে এসেই সকলকে একই বিছানায় শুয়ে একদিন নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। ওই যে যোগমায়াদেবী, উনি তো বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাড়ির টাকা দেখেই তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কই, একবারও তো খবর নিতে চান নি যে ঠাকমা-মণির নাতির কেমন স্বভাব চরিত্র! খবর নিতে চাননি যে ঠাক্‌মা-মণির নাতি কেমন দেখতে। খবর নিতে চাননি যে ঠাক্‌মা-মণির নাতির কেমন স্বাস্থ্য! শুধু টাকা দেখেই তিনি ধন্য মনে করেছিলেন নিজেকে, শুধু টাকা দেখেই তিনি বিশাখার জীবন ধন্য হবে বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, সব-কিছুর শেষ তো এই! যে-বিল্বমঙ্গল কতকাল আগে 'এই নরদেহে'র পরিণতি ভেবে বিচলিত হয়েছিলেন, এরা তো সে-কথা কেউ ভাবে না। এই সামান্য এই তুচ্ছ নরদেহটার তৃপ্তির কথা ভেবেই তো সবাই দিন-রাত হুড়োহুড়ি করে চলেছে। এই সামান্য, এই তুচ্ছ নরদেহটার তৃপ্তির কথা ভেবেই বিশাখাদের বাড়িতে দুই জা' হিংসের আগুনে জ্বলছে।

তাহলে?

হঠাৎ একটা জায়গাতে এসে বাসটা আর চললো না। আর হঠাৎই সন্দীপের খেয়াল হলো বাসের মধ্যে সে একলাই শুধু বসে আছে, আর কেউ নেই। অথচ কখন যে সে বাস বদলে অন্য বাসে উঠেছিল, কিছুই মনে নেই। রাস্তার মধ্যিখানে সেই গাড়ি চাপা পড়া মাংসপিণ্ডটা আর দামী খাটের ওপর ফুলে-ফুলে ঢাকা মৃতদেহটা দেখে তার মনে যে-ভাবান্তর হয়েছিল, তার ঘোর যেন এখন কাটলো। সে বুঝতে পারলে বাসটা কখন নিঃশব্দে খিদিরপুরে পৌঁছে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়লো। তপেশ গাঙ্গুলীবাবু হয়ত, তার আসার পথ চেয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। পাশের একটা দোকানের ঘড়িটা দেখেই সন্দীপ চমকে উঠলো। এখন যে দুপুর সাড়ে এগারোটা কী আশ্চর্য! এতক্ষণে তো তপেশ গাঙ্গুলী অফিসে চলে গেছেন। সে তো টেরই পায়নি কখন কোথা দিয়ে এতখানি সময় কেটে গেল।

—বাবাঃ! এতক্ষণে এলে তুমি?

সন্দীপ একেবারে চমকে উঠেছে। দেখলে বিশাখা। বিশাখা তপেশবাবুর বাড়ির খিড়কি-দরজার সামনে একলা দাঁড়িয়ে আছে।

—কী? কী হয়েছিল তোমার? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? তোমার জন্যে আমার কাকা অনেকক্ষণ বসে বসে শেষকালে আপিসে চলে গেল। আমরাও ভেবেছি তুমি আজ বুঝি আর টাকা দিতে এলে না।

সন্দীপ বললে—তোমার কাকা নেই? তাহলে আজ টাকাটা কার হাতে দেব?

বিশাখা বললে—তা কার হাতে টাকা দেবে আমি তার কী জানি?

—তুমি জানবে না তো আর কে জানবে? এ টাকা তো তোমারই জন্যে।

—ছাই, ছাই, আমার জন্যে না ছাই! ও টাকা তো কাকীমার জন্যে! আমি তো সেবার তা বলেই দিয়েছি—

সন্দীপ বললে—তা টাকাটা যার জন্যেই হোক, আমার ওপর যা হুকুম হয়েছে আমি তাই-ই করবো। সে-টাকা নিয়ে তোমার কাকীমা গয়নাই গড়াক আর যা-ই করুক আমার তা দেখবার দরকার নেই, আমি চাকর মানুষ, আমি টাকা দিয়ে তোমার মা'র হাতের সই নিয়েই খালাস।

বিশাখা চারদিকটা ভালো করে দেখে নিলে। বললে—তুমি এত জোরে কথা বলছো কেন, সবাই শুনতে পাবে যে—

—শুনলে আর আমার কী হবে? আমি তো আর কোনও অন্যায় কাজ করছি না—

—শুনতে পেলে তোমার তো কিছু হবে না, হবে আমারই—

—কেন, তোমার কী হবে?

বিশাখা বললে—শুনতে পেলে কাকীমা মা'র সঙ্গে আবার ঝগড়া করবে। মা'কে কথা শোনাবে।

—কেন, তোমার মা কী দোষ করলো।

বিশাখা বললে—মা'রই সব দোষ।

—কেন?

বিশাখা বললে—তা তুমি বোঝ না? আমি কেন মা'র মেয়ে হলুম, এইটে তো মা'র আসল দোষ।

সন্দীপ বললে— সে কী? তুমি তোমার মায়ের মেয়ে হয়েছ তাতে তোমার মায়ের দোষ কী?

বিশাখা বললে—তুমি ছেলেমানুষ, তাই তুমি বুঝবে না, আগে বড় হও তখন বুঝবে—

সন্দীপ বললে—তুমিও তো ছেলেমানুষ, তাহলে তুমি তা বুঝলে কেমন করে?

বিশাখা বললে—বয়েস কম হলে কী হবে, বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে অনেক বড়—

বেশ আশ্চর্য ব্যাপার তো। বলে কী মেয়েটা। মেয়েটা যে কেবল বুদ্ধিতে পাকা তাই-ই নয়, বদমায়েশিতেও পাকা।

সন্দীপ হেসে ফেললে এবার। বিশাখা বললে—তুমি হাসছো যে বড়?

সন্দীপ বললে—হাসছি তোমার কথা শুনে। এত কম বয়েসে তোমার এত বুদ্ধি হলো কী করে?

বিশাখা বললে—তোমার তো মা নেই, তোমার মা থাকলে তোমার বুদ্ধিও আমার মত হতো।

—কে বললে আমার মা নেই?

—মা আছে?

—হ্যাঁ, আমার দেশে মা আছে।

বিশাখা বললে—তোমার মা'কে কি তোমার কাকীমা খাটিয়ে মারে? তোমার কাকীমা কি তোমার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে? তোমার মা'র কি আমার মত একটা মেয়ে আছে? তোমার মা'র তো তবু তুমি আছো, কিন্তু আমি ছাড়া আমার মা'র আর কে আছে বলো তো?

কথাগুলো বলতে বলতে বিশাখার চেহারা যেন কেমন করুণ হয়ে উঠলো।

বিশাখা আবার বলতে লাগলো—তোমার বিয়ে হলে তো তুমি বউ নিয়ে নিজের ঘরেই থাকবে, আর আমি? আমার বিয়ে হলে তা আমি তখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো! আমার বরের কাছে থাকবো। আমার মা? আমি বরের কাছে চলে গেলে আমার মা কাকে নিয়ে থাকবে? কে মা'কে দেখবে? আমার মা'র কত কষ্ট, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। জানো, মা যখন একলা থাকে তখন কেবল কাঁদে—

এ-কথারও কোনও জবাব এল না সন্দীপের মুখে। সে হাঁ করে এই মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু! ভাবতে লাগলো এরই সঙ্গে কিনা বিয়ে হবে সেই নাইট-ক্লাবে-দেখা বিডন স্ট্রীটের সৌম্য মুখার্জির সঙ্গে!

এবার হঠাৎ বিশাখা বলে উঠলো—তুমি আমার কথা শুনে রাগ করলে না তো?

সন্দীপ শুধু বললে—না—

—তবে চুপ করে আছো যে? তোমাকে বোকা বলেছি বলে তুমি যেন রাগ করো না। মা আমার জন্যে কত ভাবে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। দিনরাত মা আমার কথা ভাবে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—বা রে, ভাববে না? বাপ-মরা মেয়ের জন্যে মা যদি না ভাবে তো কে ভাববে? বাবা থাকলে বাবাই ভাবতো, কিন্তু আমার তো বাবা নেই—

সন্দীপ বললে—আমারও বাবা নেই—

—কিন্তু তুমি তো ব্যাটাছেলে। তোমার বাবা না-থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি যে মেয়েমানুষ। মা বলে, ছেলে ঘর পূর্ণ করে, আর মেয়ে ঘর শূন্য করে—

একটুখানি থেমে বিশাখা সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় বুঝতে চাইল কথাগুলো বুঝতে পারছে কিনা। তারপর বললে—যাক গে, তুমি মেয়ে হলে এ-সব কথা বুঝতে—আমি সদর দরজা খুলে দিই গে, তুমি মা'কে টাকা দিয়ে যাও।

কথাটা বলে বিশাখা ভেতরের দিকে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু সন্দীপ ডাকলে—শোন, শোন, বিশাখা শুনে যাও—আর একটা কথা শুনে যাও—

বিশাখা মুখ ঘুরিয়ে বললে—অত চেঁচাচ্ছ কেন? সবাই শুনতে পাবে যে—

সন্দীপ বললে—শুনলে দোষ কী?

আরে তুমি একটা ন্যাকা কিছু বোঝ না। কী বলছিলে বলো?

সন্দীপ বললে—বলছিলুম যে-জন্যে আমি টাকা দিতে আসি, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তার কী-রকম চেহারা তুমি জানো? তাকে তুমি কখনো দেখেছ?

বিশাখা হেসে ফেললে এবার। বললে—ও মা, কী বোকা তুমি, বিয়ের আগে বরকে দেখতে আছে নাকি? একেবারে তো শুভদৃষ্টিব সময় প্রথম দেখতে হয়—

—তা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

বিশাখা বললে—মা বলেছে আমার বর খুব ভালো হবে।

—কেন?

বিশাখা বললে—আমি যে ব্রত করি।

—ব্রত? ব্রত মানে?

—ওমা, তুমি ব্রতও জানো না? তুমি কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ভূত! আমাকে দিয়ে মা তো রোজ ব্রত করায়। দশ পুতুল ব্রত। এই ব্রত আমি ছোটবেলা থেকে করছি। মা বলেছে এই ব্রত করি বলেই তো আমার অত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

—কী রকম করে ব্রত করো?

বিশাখা সব বুঝিয়ে বললে। পিটুলি দিয়ে মা দশটা পুতুল এঁকে দেয়, তাতে দুর্বোঘাস দিয়ে আমি মন্ত্র বলি—

—কী মন্ত্র বলো?

বিশাখা বললে—আমি বলি—

এবার মরে মানুষ হবো, রামের মত পতি পাবো
এবার মরে মানুষ হবো, সীতাব মত সতী হবো
এবার মরে মানুষ হবো, লক্ষ্মণের মত দেবর পাবো
এবার মরে মানুষ হবো, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাবো
এবার মরে মানুষ হবো, কুন্তীর মতো পুত্রবতী হবো
এবার মরে মানুষ হবো, দ্রৌপদীব মত রাঁধুনী হবো
এবার মরে মানুষ হবো, দুর্গার মত সোহাগী হবো
এবার মরে মানুষ হবো, পৃথিবীর মতো ভার সবো..

সন্দীপ বললে—তারপর? থামলে কেন? তারপর আর নেই?

বিশাখা বললে—সবটা বলবো না—

—কেন?

এ ব্রত তো সকালবেলা করতে নেই, বিকেলে করতে হয়। এখনও তো বিকেল হয়নি। এবার থেকে বিকেলেই করবো। এতদিন কেউ দেখতে পাবে বলে মা'র সঙ্গে ভোরবেলা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে করতুম। এখন থেকে বাড়িতেই করবো—

সন্দীপ খুব মজা পাচ্ছিল বিশাখার কথা শুনে। বললে—কেন, গঙ্গার ঘাট কী দোষ করলো?

বিশাখা বললে—গঙ্গার ঘাটে ঠিক ভালো করে ব্রত করা হয় না। ব্রত করতে তো পিটুলি গোলা লাগে। ঘাটে পিটুলি কোথায় পাবে মা?

—এ ব্রত করলে কী হয বলছিলে? ভালো বর হয়?

—হ্যাঁ।

বলে বিশাখা আবার হাসলো। বললে—ব্রত করে আমার খুব ভালো বর হয়েছে কিনা তাই বিজলীও এখন থেকে আমাব মত রোজ ব্রত করবে। এই নিযে কাকীমা খুব ঝগড়া করেছে আমার মা'র সঙ্গে—

—কেন? ঝগড়া কবেছে কেন?

বিশাখা বললে কেন ঝগড়া করবে না? কাকীমা বলেছে বিজলী কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তার জন্যেও একটা বর চাই। আমার ভালো বর হয়েছে বলে কাকীমার খুব হিংসে হয়েছে—

—কাকীমার কার উপর হিংসে হয়েছে?

—মা'র ওপর, আবার কাব ওপব? তাই জন্যে আমার মা খুব কেঁদেছে আজকে।

সন্দীপ এবার আসল কথা পাড়লে। বললে—তুমি কি ফল-টল খাও? ফল, দুধ, ঘি, মাছ, মাংস এ-সব তুমি খাও?

—ওমা, আমি ও-সব খাবো কেন? কে আমাকে ও-সব খেতে দেবে?

সন্দীপ বললে—কেন খাবে না? ওই-সব খাবার জন্যে তো আমাদের ঠাক্‌মা-মণি মাসে তোমার মা'কে এত এত টাকা পাঠায়। আমি বাড়ি ফিরে গেলেই তো ঠাক্‌মা-মণি আমাকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করবে। তখন আমি তার কী জবাব দেব?

বিশাখা বললে—আমি তো শুধু ভাত, তরকারি, রুটি খাই—

—আর মাছ মাংস?

বিশাখা বললে—না, ও-সব আমি খাই না।

—মাছ, মাংস, ফল, দুধ, দই, ঘি কিছুই খাও না?

—না!

সন্দীপ বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু খুব সাবধানে। কেবল ভয় হচ্ছিল যদি কেউ তাদের দেখে ফেলে! কিন্তু এখানে বিশাখাকে একলা পেয়ে যদি এ-সব কথা জিজ্ঞেস না করে তো আর কখন করবে? আর কখন এ-সব কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ হবে?

জিজ্ঞেস করলে—তোমার বোন এখন কোথায়?

বিশাখা বললে—কে? বিজলী? কাকীমা বিজলীকে চান করিয়ে দিচ্ছে—

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—আর তুমি? তুমি আজকে চান করবে না?

—বা রে, আমি তো সেই ভোরবেলা মা'ব সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে চান করে এসেছি, এখন আবার দুবাব চান করবো নাকি?

—আর তোমার মা?

—মা তো এখন রান্না করছে। মা তো সমস্ত দিনই কাজ করে। কখনও রান্না করে, কখনও বাসন মাজে, কখনও ঘরদোর ঝাঁট দেয়, কখনও সাবান কাচা করে, বাড়ির সব কাজ মা একলাই করে। মা'র মোটে সময় নেই। এ ছাড়া মা'কে দোকান থেকে রেশন আনতে হয়, কেরোসিন আনতে হয়, কয়লা আনতে হয়—

সন্দীপ বললে—তাহলে আমি যখন বাড়িতে ফিরে যাবো সেখানে ঠাক্‌মা-মণিকে কী বলবো? ফল, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, মাখন কিছুই তুমি খাও না, এ-সব কথা বলবো তো?

—বলবে বিজলী সব খায়, আর আমি শুধু রুটি, ভাত আব তরকারি খাই—

—আর বিজলী কী খায়?

—আমার জন্যে রাত্তিরে রুটি হয় আর বিজলী আর কাকীমার জন্যে হয় পরোটা—

বেশ কথা হচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে কার গলা শোনা গেল—ওরে ও মুখপুড়ী, কোথায় গেলি?

আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা উধাও।

সন্দীপ আর কী করবে, তাই অনেকক্ষণ সেখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগলো কী করে এ-সব কথা ঠাক্‌মা-মণিকে গিয়ে সে বলবে! আসলে কথাগুলো বলা উচিত কিনা, তাও সে ঠিক করতে পারলে না। এ-সব কথা শোনবার পর যদি এ-বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে যায়? যদি বন্ধ হয়ে যায় এ-সম্বন্ধ? তাহলে ক্ষতি হবে কার? ঠাক্‌মা-মণির না তপেশ গাঙ্গুলীর? তপেশ গাঙ্গুলীবাবু মাসে-মাসে এতগুলো টাকা পয়সা থেকে বঞ্চিত হবেন। আর ঠাক্‌মা-মণি কী করবেন? নাতির জন্যে অন্য পাত্রী ঠিক করবেন? নাতির বিয়ে অন্য জায়গায় দেবেন? কিন্তু এত ভালো জন্মকুণ্ডলী আর কোন্ মেয়ের আছে? তাহলে তো তাঁকে আবার অন্য ব্যবস্থা করতে হয়! এত-দিনকার এত আয়োজনের সব সমাধান এখন নির্ভর করেছে শুধু সন্দীপের একটি মাত্র কথার ওপর। তাহলে সে কি বাড়িতে গিয়ে ঠাক্‌মা-মণির কাছে মিথ্যে কথা বলবে?

মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সমস্যাগুলো সমস্ত ভাবনাগুলো যেন একসঙ্গে একযোগে এসে সন্দীপকে আক্রমণ করলো। বিশাখা ভেতরে গিয়ে মা'কে কিছু বলেছিল কিনা কে জানে, কারণ সে দরজার কড়া নাড়তে না নাড়তেই সেটা হঠাৎ খুলে গেল। সেখান দিয়ে দেখা গেল একজন মহিলার মুখ। সে-মুখে একটা কৌতূহলী প্রশ্ন ঃ

—তুমি কি বাবা বিড়ন স্ট্রীটের মুখুজ্জেবাড়ি থেকে আসছো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—আপনি একটু তপেশবাবুকে বলুন আমি তাঁকে দেবার জন্যে এ-মাসের টাকা এনেছি—

মহিলা বললেন—তিনি তো বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে আপিসে চলে গেছেন। আজ তাঁর আপিসে মাসমাইনের দিন কিনা, তাই।

—তাহলে আপনি কে?

—আমার নাম হলো বাবা যোগমায়াদেবী। আমি বিশাখার মা হই—

সন্দীপ বললে—আগে তো বরাবর আপনার নামেই টাকা এসেছে। টাকা যিনি-ই নিন, সই তো দিয়েছিলেন আপনিই—এবারও আপনার নামেই টাকা এনেছি। আপনি টাকাটা নেবেন?

—তাহলে বাবা ভেতরে এসে একটু বোস। আমি আমার জা'কে ডেকে দিই—

সন্দীপ আগেকার মত সেদিনও সেই ঘরটায় তক্তপোশের ওপর বসে পড়লো। সেই তক্তপোশ। জোড়া ডাই করে রাখা ময়লা বিছানার ওপর। চারদিকে চেয়ে সন্দীপ দেখলে ঘরটার সেই একই দুরবস্থা। প্রায় দুপুর হতে চলেছে, তবু তখনও ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি। সংসারের সমস্ত খুচরো কাজ সেরে বিশাখার মা'ই বোধহয় সে-কাজটা করবে। হঠাৎ আর একজন মহিলা সেই ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার, কানে সোনার দুল, সিঁথিতে সিঁদুর।

সন্দীপ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আপনিই কি বিশাখার কাকীমা?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ বাবা, তুমি টাকা এনেছ বুঝি? দাও—

সন্দীপ টাকাগুলো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আর এইখানে মাসিমাকে এটা সই দিতে বলবেন—

সন্দীপ এই-ই প্রথম বিশাখার কাকীমাকে দেখলে। বুঝলো যে এই মহিলাই ঝগড়া করে মাসিমার সঙ্গে। বিশাখার নিজের পাওয়া এই-সব টাকা দিয়েই মহিলার গায়ের ওই সোনার গহনাগাঁটি তৈরি হয়েছে। ঠাক্‌মা-মণির কাছ থেকে যত টাকা মাসে-মাসে এসেছে তা দিয়ে এই মহিলা নিজের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ মিটিয়েছে। তার মধ্যে একটা টাকাও বিশাখার প্রয়োজনের জন্যে খরচ করা হয়নি।

হঠাৎ বিজলী আর বিশাখা দু'জনেই ঘরে ঢুকলো। বিজলী বললে—তুমি আজ এত দেরি করলে কেন? আমার বাবা খুব রাগ করে তোমার ওপর।

সন্দীপ বললে—কেন?

বিজলী বললে—সেই যে বুড়োটা আগে আসতো সে কত সকাল সকাল টাকা নিয়ে আসতো—

সন্দীপ বললে—আজকে রাস্তায় আমি যে বাসটায় আসছিলুম সেটা একটা মানুষ চাপা দিয়েছিল বলে অন্য বাস ধরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল—

তারপর মেয়েটা বললে—তুমি দেরি করে এলে বলে আজ আমাদের মা স খাওয়া হলো না—

সন্দীপের দেরি করে আসার সঙ্গে এ বাড়ির মাংস খাওয়ার যে কী সম্পর্ক, তা বুঝতে সন্দীপের কোনও অসুবিধে হলো না।

বিজলী বললে—বাবাও মাংস না খেয়ে আপিসে চলে গেল—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের মাংস খেতে খুব ভালো লাগে বুঝি?

—বারে, মাংস খেতে ভালো লাগবে না? মাংস খেতে তো সকলেরই ভালো লাগে। তোমার কি মাংস খেতে ভালো লাগে না?

সন্দীপ বললে—না—

বিজলী জিজ্ঞেস করলে—ডিম?

সন্দীপ বললে—না—

বিজলীর পাশে বিশাখা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বিজলী তাকে বললে—দেখছিস মাংস, ডিম কিছুই এ লোকটার খেতে ভালো লাগে না—এ লোকটাও ঠিক তোরই মতন—

সন্দীপ বিশাখার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার মাংস, ডিম এ-সব খেতে ভালো লাগে না?

বিশাখা কিছু বলবার আগে বিজলীই তার জবাব দিলে। বললে—ওরও ও-সব খেতে ভালো লাগে না—বিশাখাও তোমার মত ও-সব কিছু খায় না—

—সে কী, তুমি ও সব খাও না?—

কিন্তু বিশাখার উত্তর শোনবার আগেই তার কাকীমা ঘরে এসে হাজির। বললে—এই, তোরা এখানে গোলমাল করছিস কেন? যা, পালা এখান থেকে—

বলে টাকার রসিদটা সন্দীপের হাতে দিতেই সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর যে-রাস্তা দিয়ে সন্দীপ বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল সেই রাস্তা দিয়েই বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। বাইরে তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। তার মনে হলো বিশাখার সঙ্গে আর একটু কথাবার্তা বলতে পারলে যেন ভালো হতো। যেন ঠিক পুরো ইতিহাসটা শোনা হলো না। কিন্তু সব কথা জানতে তো আরো অনেক সময় লাগবে। অন্ততঃ আর এক মাসের আগে তো আর তার সঙ্গে বিশাখার দেখা হচ্ছে না। তাহলে? অতদিন তাহলে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে?

—এই, শোন—

সন্দীপ সরে গলিটা ছেড়ে বাইরে রাস্তাটার দিকে একটু পা বাড়িয়েছে, ঠিক তখনই পেছন থেকে বিশাখার গলা শোনা গেল—এই, শোন—

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে বিশাখা খিড়কির দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্দীপ আস্তে আস্তে সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলে সেই আগেকার সে-বিশাখা যেন আর নয়। এ যেন অন্য এক বিশাখা। মুখটা যেন গম্ভীর-গম্ভীর, চোখ দুটো যেন জলে টস টস্ করছে। কোথায় গেল বিশাখার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই দুষ্টু দুষ্টু ভঙ্গী।

—কী হলো? ডাকছিলে কেন?

বিশাখা বললে—আরো কাছে এসো, চুপি চুপি, একটা কথা বলবো—

—বলো।

বিশাখা তেমনি গলা নিচু করে বললে—দেখ, তোমাকে আমি যা বলেছি, সে-সব মিথ্যে কথা—আমি সব খাই। কাকীমা আমাকে সব খেতে দেয়। আমি মাছ খাই, মাংস খাই, ডিম খাই,

দুধ ঘি-মাখন খাই, আপেল-আঙুর-বেদানা খাই। আর তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি যে টাকা পাঠিয়ে দেয় তা দিয়ে কাকীমার সোনার গয়না, কানের ঝুমকো, হাতের চুড়ি, গলার হার, কিছ্ছু হয় না। সে-টাকায় আমার পরবার শাড়ী-ফ্রক, আর পায়ের জুতো, আমার খাওয়া-পরা সব-কিছু হয়। তোমার ঠাক্‌মা-মণিকে বোল আমার কাকীমা আমাকে খুব ভালোবাসে, আমার মা'কেও খুব ভালোবাসে...

সন্দীপের মনে হলো সে যেন দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখছে। বললে—কিন্তু একটু আগেই যে তুমি বললে বিজলীর জন্যে পরোটা হয় আর তোমার জন্যে রুটি হয়। তুমি যে বললে মাংস-ডিম কিছ্ছু তোমার খেতে ভালো লাগে না—

—ও-সব মিথ্যে কথা। আমি সব মিথ্যে কথা বলেছি তোমাকে—

বলে বিশাখা দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্দীপের কানে তখনও বিশাখার শেষ কথাগুলো গুঞ্জন করতে লাগলো—আমি সব খাই, কাকীমা আমাকে সব খেতে দেয়, আমি মাছ খাই, মাংস খাই, ডিম খাই, ফল খাই, দুধ-ঘি-মাখন খাই, আপেল-আঙুর-বেদানা খাই। তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি যে-টাকা পাঠিযে দেয় তা দিয়ে কাকীমার সোনার গয়না, কানের ঝুমকো, হাতের চুড়ি, গলার হার কিছ্ছু হয় না। সে-টাকায় আমার পরবার শাড়ী-ফ্রক, আমার পায়ের জুতো, আমার খাওয়া-পরা সব কিছু হয়। তোমার ঠাক্‌মা-মণিকে বলো আমার কাকীমা আমাকে খুব ভালোবাসে মা'কেও খুব ভালোবাসে...
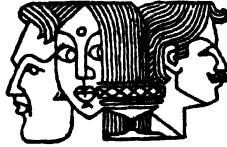
সেদিন যখন বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরলো, তখন সত্যিই বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। দুপুর প্রায় উতরে গেছে বলা যায়, গ্রীষ্মকালের দুপুর। কলকাতার পিচের রাস্তা সূর্যের তাপে জায়গায়-জায়গায় গলে গেছে। পায়ের জুতো গরম পিচের ওপর পড়তে অনেকবার জুতো আটকে যাচ্ছিল।

বাড়ির সামনে আসতেই সন্দীপ দেখলে একটা নতুন বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ড্রাইভারের গায়ে খাঁকি ইউনিফর্ম, মাথায় সাদা পাগড়ি। মুখের ওপর লম্বা-চওড়া গোঁফ। এ কার গাড়ি! এমন গাড়ি আর এমন ড্রাইভার এ বাড়িতে তো আগে কখনও দেখেনি সে। কে এলো?

অন্যদিনের মতো গিরিধারী ভেতরে ছিল না, একেবারে বাইরে রীতিমত এ্যাটেনশনের মত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে! কী হলো? হঠাৎ এত প্রভুভক্ত হয়ে গেল কেন সে? কার গাড়ি?

তবু সন্দীপকে দেখে গিরিধারী হাত তুলে যথারীতি সেলাম করলে।

সন্দীপও হাত তুলে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলে—এটা কার গাড়ি? বাড়িতে কে এসেছে?

গিরিধারী বললে—বড়া সাহাব বাবুজী, আমার বড়া মালিক—

—বড়া মালিক মানে? বড়া মালিক আবার কে তোমার?

—আপনি জানেন না? বড়া মালিক হাওড়া থেকে এসেছে, ঠাক্‌মা-মণির ছোট লেড়কা—

ঠাক্‌মা-মণির ছোট লেড়কা! মানে ঠাক্‌মা-মণির ছোট ছেলে! তাহলে কি দেবীপদ মুখার্জির ছোট ছেলে মুক্তিপদ মুখার্জি? অর্থাৎ স্যাক্সবী মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর? সৌম্য মুখার্জির কাকা তাহলে! তাদের বেলুড়ের কারখানার মালিক। এ বাড়ির এই সমস্ত ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যের মালিক। এরই অন্ন খাচ্ছে সন্দীপ। তার মানে এ বাড়ির এই মল্লিককাকা থেকে আরম্ভ করে এই কামিনী-ফুল্লরা-কালিদাসী-সুধা-বিন্দু, এই বাড়ির ঠাকুর-চাকর, কন্দর্প, বাবুঘাটের দশরথ সকলেরই অন্নদাতা।

অন্নদাতাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হলো সন্দীপের। শুধু তাঁর নামই শুনেছে সে। আর শুধু নামই শোনেনি, তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে। ঠাক্‌মা-মণির বড় ছেলে শক্তিপদর পরেই এই ছেলে জন্মেছিল। তখন দেবীপদ মুখার্জির সৌভাগ্য-সূর্য উদিত। পূর্ণ উদিতই বলা যায়। সমাজে কর্মস্থলে চারদিকে তাঁর সম্মান. প্রচাব-প্রসার-সম্বর্ধনা-লাটসাহেবের খাস কামরাতেও তাঁর যখন-তখন এবেলা-ওবেলা নিমন্ত্রণ। কৃপাপ্রার্থীরা তাঁর কৃপাদৃষ্টির প্রত্যাশায় লোলুপ হয়ে আশেপাশে ঘোরে। তার সঙ্গে আছে তাঁর ফ্যাক্টরির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। লন্ডন, ফ্রান্স, জার্মানীতেও তাঁর শাখা অফিস। সেই যুগেও তাঁকে ঘন-ঘন সে-দেশে যেতে হতো। দু'তিন বার ঠাক্‌মা-মণিও তাঁর সঙ্গে সে-দেশে গেছেন। সেই বংশে পর-পর দু'টি ছেলে হওয়ার মত ঘটনা শুধু যে শুভসূচক তাই-ই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার মত।

মানুষের সৌভাগ্য যখন আসে, তখন বোধহয় এই রকম বন্যার জলস্রোতের মতই আসে। একেবারে দু কূল ছাপিয়েই আসে। তখন আর তাকে কোনও মতেই ঠেকানো যায় না। অনেকটা যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপচে পড়ার মতই অবস্থা হয়।

শক্তিপদর জন্মের সময়ে কম ঘটা হয়নি। পাড়ায়-পাড়ায় লোকের বাড়িতে বাড়িতে সে-ঘটার স্মৃতি তখনও মুছে যায়নি, লাটসাহেবকে পর্যন্ত সেদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়েছিল সেই পার্টিতে। বিলেতেও ম্যাকডোনাল্ড সাহেবদের পরিবারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারই সে নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি।

কিন্তু পরের বার? মুক্তিপদ জন্মাবার পর?

সে-বারের ঘটা প্রথম বারের ঘটাকেও ছাড়িয়ে গেল। একদিন-দুদিন নয়, পর পর সাত দিন ধরে চলেছিল সে-উৎসবের ধাক্কা। কলকাতার সব পাড়ার লোকই জানতে পেরেছিল যে বিড়ন স্ট্রীটের মুখার্জি বংশে দ্বিতীয় পুত্র-সন্তান হয়েছে। তখন কলকাতার জানা মানে সারা ইন্ডিয়ার জানা। মল্লিককাকা তখন নতুন এসেছেন এ বাড়িতে। বলেছিলেন—জানো, তখন তো স্বদেশী যুগ, একদিকে সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে অন্য দল স্বদেশী করছে। সব লোক ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে, তোমরা সে-সব যুগ দেখোনি—

সন্দীপ দেখেনি বটে, কিন্তু শুনেছে। তখন যে-যুদ্ধ হয়েছিল তাতে নাকি বোমা পড়েছিল এই কলকাতায়। সে বোমা নাকি জাপানীরা ফেলেছিল। কলকাতায় অনেক লোক নাকি সেই সময়ে কলকাতা থেকে যে-যেখানে পেরেছিল পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল দেশে। সবই শোনা কথা। তারপর হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি। সে সমস্তই ইংরেজদের তৈরী করানো। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিলে ইংরেজদেরই লাভ। তা হলে তখন আর ইংরেজদের এ-দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে না, এই ছিল তাদের মতলব।

সেই যুগে প্রায় যখন সবাই ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে তোড়জোড় করছে, সুভাষ বোস যখন কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে জাপানের রেডিও থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন, তখনও এই মুখার্জি বংশের লোকেরা ছিল ইংরেজদের পক্ষে। তখনও এ বাড়ির ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে ইংরেজ বড়লাট, লাটসাহেবদের ছবি ঝুলছে, ইংরেজী কায়দায় কোট-প্যান্ট পরছে এ বাড়ির পুরুষেরা। তখনও এ বাড়ির লোকেরা মনেপ্রাণে ইংরেজদেরই ভজনা করে চলেছে—

সেই বাড়ির মেজ ছেলে আগেও যেমন ইংরেজদের অনুকরণে আদব-কায়দায় চালচলন চালাতো, এখনও তেমনি একই কায়দায় সে-সব চালিয়ে যাচ্ছে। দেবীপদ মুখার্জি যেমন কথায়-কথায় বিলেত যেতেন, এখন এই যুগে মুক্তিপদ মুখার্জিও কথায়-কথায় বিলেত, আমেরিকা, জার্মানী, আফ্রিকা, ইজিপ্ট্ যাচ্ছে।

সন্দীপ বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে মল্লিকমশাই-এর ঘরে গিয়ে দেখলে দরজায় তালা ঝুলছে। কোথায় গেলেন তিনি?

হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকলে—আপনি কোথায় ছিলেন বাবু?

সন্দীপ মুখ ফিরিয়ে দেখলে ঠাকুর।

—আমি আপনার দেরী দেখে ভাত ঢাকা দিয়ে রাখলাম—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সরকারমশাই কোথায় গেলেন?

ঠাকুর বললে—তিনিও খাননি, আজ মেজবাবু এসেছেন, তিনি ওপরে, তাঁর কাছে তাঁর ডাক পড়েছে—

যাক, তাহলে বাড়ি ফিরতে তার দেরি হয়েছে বলে তাকে আর জবাবদিহি করতে হবে না। সত্যিই ভালো হয়েছে। আসলে এটা যখন তার চাকরি তখন প্রত্যেক কাজের জন্য তার কাছে মালিকের জবাবদিহি চাইবার অধিকার আছে বইকি। সেখানে সন্দীপ গিয়ে ঠিকমত টাকাটা ঠিক লোকের হাতে দিয়েছে কিনা, তপেশবাবু কিছু বলেছেন কিনা, বউমা দুধ, ঘি, ফল, দই, মাছ, মাংস খাচ্ছে কিনা, আর যদি খেয়ে থাকে তো তাতে বউমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে কিনা—এইসব নানা কথার জবাব তাঁকে এখনি দিতে হতো। আর এখন যদি এর জন্যে ডাক নাও পড়ে তো কাল হোক পরশু হোক-এ-সব কথার জবাব দিতেই হবে। তখন?

তখন কী বলবে সন্দীপ? তখন সে কী জবাব দেবে?

ঠাক্‌মা-মণি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন—বউমার সঙ্গে কিছু কথা হয়েছে?

তার জবাবে কী বলবে সে? সে "হ্যাঁ" বলবে, না না বলবে? যদি "হ্যাঁ" বলে তো ঠাক্‌মা-মণি হয়ত আবার জিজ্ঞেস করবেন—কী কথা হয়েছে?

এর উত্তরেই বা সে কী বলবে? বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। বলতে হয় যে বউমা দুবার দু'রকম কথা বলেছে। একবার বলেছে যে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে বাড়ির সকলে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ-ঘি-দই-ফল খায়, অন্যরা খায় আর সে কিছুই খায় না। বিজলী পরোটা খেলে বিশাখার ভাগ্যে পড়ে রুটি। বিজলীর পাতে মাংস-মাছ পড়লে বিশাখা খায় নিরামিশতরকারি।

কোনটা বললে ঠাক্‌মা-মণি খুশি হবেন? মিথ্যে কথা বললে, না সত্যি কথা বললে? যদি সন্দীপ বলে দেয় যে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই টাকাগুলো নিয়ে নিজেরা ভালো-ভালো জিনিস খান আর নিজের স্ত্রীর সোনার গহনা গড়ান, তাহলে কী হবে? তাহলে কি এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে? যদি এ বিয়ে ভেঙ্গে যায় তাহলে বিনা মেহনতে মাসে মাসে এই একশো পঁচিশ টাকাব আয় তো তাঁর কমে যাবে! তখন দোষ পড়বে কার ঘাড়ে? তখন তিনি হয়ত ছুটে চলে আসবেন মল্লিক-মশাইয়ের কাছে, আর যখন শুনবেন এই সন্দীপই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তখন প্রশ্ন উঠবে সন্দীপ এ-সব খবর জানতে পারলো কী করে? সন্দীপকে এ-সব কথা কে বলেছে? তখন সন্দেহ হবে বিশাখার ওপর। তখন বিশাখার ওপরই যত অত্যাচার শুরু হবে। তখন বিশাখার মা যোগমায়া দেবীর ওপরে আরো অত্যাচার শুরু হবে!

ঠাকুর বললে—খাবার দিয়ে দিয়েছি, আপনি খেতে আসুন বাবু—

রান্নাবাড়ির এক কোণে খেতে খেতে সন্দীপ অনেক ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা ঠাকুর, তোমার মেজবাবু হঠাৎ এতদিন পরে এ বাড়িতে এলেন কেন?

ঠাকুর বললে—মেজবাবু তো প্রায়ই আসেন। ঠাক্‌মা-মণিও তো কারবারের একজন মালিক, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে এ-বাড়িতে প্রায় আসতেই হয়—

—তোমার বাড়ি কোন্ দেশে ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—কটক জিলা—

—কতদিন থেকে এ-বাড়িতে কাজ করছো তুমি?

—বাবু, মেজবাবু যখন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন তার আগের বছর থেকে এ-বাড়িতে আছি। ঠাক্‌মা-মণি যখন জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন—

সত্যি, ঠাকুরটি খুব ভালো লোক। অনেক যত্ন করে সন্দীপকে খাওয়াতো। অনেক সৌভাগ্য থাকলে এমন লোক পাওয়া যায়। ঠাকমা-মণির অনেক সৌভাগ্য তাই দশরথ, কন্দর্প আর এই ঠাকুরের মত এমন সৎ লোক পেয়েছেন। আর শুধু ওরাই নয়, মল্লিকমশাই কি কম সৎ মানুষ! নইলে ঠাকমা-মণি কি সাধে মল্লিকমশাই'র হাতে হাজার-হাজার টাকার হিসেব ছেড়ে দিতে পেরেছেন?

—আর দু'টি ভাত নেবেন বাবু?

সন্দীপ বললে—না, তা তোমাদের খাওয়া হয়েছে?

—না বাবু, সরকারমশাইই খাননি, আপনি খাননি, আমি আগেই খেয়ে নেব?

সন্দীপ বললে—জানো ঠাকুর, তোমরা সবাই ভালো লোক, তুমি ভালো লোক, গিরিধারী ভালো লোক, দশরথ ভালো লোক, কন্দর্প ভালো লোক, সরকারমশাইও ভালো লোক, তোমার ঠাকমা-মণিও ভালো লোক

ঠাকুর বললে—আপনিও ভালো লোক বাবু, আপনি নিজে ভালো লোক বলে সবাইকে ভালো দেখেন—

সন্দীপ বললে—না ঠাকুর, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি আবার একটা মানুষ! আমরা কত গরীব, তা তুমি জানো না ঠাকুর! বললে তুমি বিশ্বাস করবে না ঠাকুর, আমার মা পরের বাড়িতে তোমার মত রান্না করে আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছে—

বলতে বলতে সন্দীপের গলাটা বোধহয় একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, তাই ঠাকুর বললে—বাবু, সব মহাপ্রভু জগন্নাথের দয়া। তাঁর দয়ায় আপনি আরো বড় হবেন বাবু, অনেক বড় হবেন...

তারপর একটু থেমেই আবার বললে—কিন্তু আমার ঠাক্‌মা-মণির অনেক দুঃখু বাবু অনেক দুঃখু

—কেন ঠাক্‌মা-মণির অনেক দুঃখু কেন? কীসের দুঃখ ঠাক্‌মা-মণির?

ঠাকুর বললে—সে অনেক কথা বাবু, সে অনেক কথা—

সন্দীপ বললে—কী কথা ঠাকুর? কী কথা? বলো না আমাকে—

ঠাকুর কিছু জবাব দিলে না।

সন্দীপ তবু ছাড়ল না। জিজ্ঞেস করল—ঠাক্‌মা-মণির দুঃখের কথা তুমি কী করে জানলে ঠাকুর? তুমি তো সারাদিন রান্নাবাড়িতে থাকো, তোমার তো জানার কথা নয়।—

ঠাকুর বললে— ঠাক্‌মা-মণির খাস-ঝি বিন্দু, ও যে আমার আপন বোন হয়—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—বিন্দু তোমার আপন বোন?

ঠাকুর বললে—হ্যাঁ আমার দিদি, আমার বিধবা দিদি—আমি এ-বাড়িতে আসবার পর আমি দিদিকে এখানে এনে দিয়েছি। দিদির কাছে আমি শুনেছি ঠাক্‌মা মণির মনে অনেক দুঃখু বাবু, ঠাক্‌মা মণির অনেক দুঃখু টাকা থাকলেই মানুষের সুখ হয় না। ঠাকমা-মণির কপালে তাই অনেক দুঃখু

স্যাক্সবী মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর প্রাণপুরুষ আগে যিনিই থাকুন, যিনিই এ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে থাকুন না কেন, এখন তার মালিক বলে লোকে যাঁকে জানে তিনি হলেন এই ঠাক্‌মা-মণির মেজ ছেলে এম পি মুখার্জি মানে মুক্তিপদ মুখার্জি। স্বর্গীয় দেবীপদ মুখার্জির

কাছে যত সহজে স্বয়ং মা লক্ষ্মী ধরা দিয়েছিলেন, মুক্তিপদের কাছে তিনি অত সহজে ধরা দেননি। কারণ ব্রিটিশ আমলে ব্যবসা করা যত সহজ ছিল, দেশী আমলে তত সহজ আব রইল না। আইনের কড়াকড়িই শুধু নয়, ট্যাক্সের ব্যাপারেও দেশী গভর্মেন্ট আগেকার চেয়ে আরো অনেক কড়াকড়ির আইন বাড়িয়ে দিলে। এমন আইন করে দিলে যাতে দেশে বড়লোক আর কেউ না থাকতে পারে। বড়লোকদের নিচেয় নামিয়ে গরীবদের সমপর্যায়ে আনতে হবে। গরীবদের উঁচুতে উঠিয়ে দেবার ক্ষমতা যখন আমাদের নেই, তখন দেশে গণতন্ত্র আনতে গেলে বড়লোকদেরই টেনে নিচেয় নামাও। তাদের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপাও। তাদের পেছনে ইউনিয়নের গোলমাল শুরু করে দাও। শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাও, শ্রমিকদের দিয়ে তাদের ঘেরাও করাও। ঘেরাও করার ফলে, তাদের কারবারে লক্-আউট হোক, ক্লোজার হোক। লক্ষ-লক্ষ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাক। তাদের পয়সার আমদানি কম হলেই তারা সবাই শ্রমিকদের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। তাহলেই প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে। ইংরেজরা ছিল পুঁজিপতি, আব আমরা হলুম প্রজাতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী। আমরা ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট। আমরা কাউকে বড়লোক হতে দেব না।

সেই আওতার মধ্যে এসে পড়লো স্যাক্সবী মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেড। সেই আইনের কড়াকড়ির ঢেউ এসে লাগলো সেই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম. পি মুখার্জির ওপর। তখন বড় ছেলে এস. পি. মুখার্জি আর তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। বেঁচে আছে কেবল তাঁর এক নাবালক শিশু সৌম্য মুখার্জি। সে যতদিন পর্যন্ত নাবালক থাকবে ততদিন অবশ্য কোম্পানীর ডাইরেক্টর হতে পারবে না, কিন্তু তার অছি থাকবেন কেবল তার বিধবা ঠাক্‌মা শ্রীমতী কনকলতা মুখার্জি। তাদের হয়ে ফ্যাক্টরি আর অফিসের কাজকর্ম চালাবেন সৌম্য মুখার্জির কাকা এম. পি. মুখার্জি।

এতদিন কোম্পানীর যত কিছু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সব কাঁধের ওপর নিয়ে বইতে হয়েছে একলা সেই মুক্তিপদকেই। যখন ফ্যাক্টরিতে লেবার-ট্রাবল হয়েছে, যখন শ্রমিক-অশান্তি হয়েছে, যখন স্ট্রাইক হয়েছে, যখন ঘেরাও হয়েছে, অফিসের কাজে ইন্ডিয়ার বাইরে যখন যেতে হয়েছে, তখন মুক্তিপদ মুখার্জি একলাই সব দিক দেখেছে। যখন চেম্বার-অফ্-কমার্সের কনফারেন্স হয়েছে, তখন অনেকবার তাঁকে প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছে। ঘরের আর বাইরের সব দিক দেখবার দায়-দায়িত্ব মুক্তিপদ মুখার্জিকেই মাথার ওপর নিয়ে একলা চলতে হয়েছে।

কিন্তু এবার অন্য রকম। এবার সৌম্যপদ মুখার্জি সাবালক হয়েছে। এবার কাকার কাজে তাকে সাহায্য করতে হবে। এবার সৌম্যপদ মুখার্জিকে ফুল্-টাইম ডাইরেক্টর হতে হবে।

ঠাক্‌মা-মণি সব শুনলেন। বললেন—তুমি কি এই জন্যেই এসেছ?

মুক্তিপদ বললে—মা, তুমি বুঝতে পারছো না, আমার কত ঝামেলা, মোটেই সময় পাইনি—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা একবার টেলিফোন করবারও কি সময় হয় না তোমার? একবার খবর নিতেও কি ইচ্ছে হয় না যে বুড়ি মা বেঁচে আছে কি না? এতই কাজ তোমার!

মুক্তিপদ বললে—আরে, তোমার কেবল সেই একই কথা! আমি কি ছিলুম এখানে যে একবার খরব নেব? তোমার টাকা তো আমি ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলুম অফিসে, ও তো স্ট্যান্‌ডিং-অর্ডার দেওযা আছে আমার সেক্রেটারিকে—

—রাখ্ তোর স্ট্যান্‌ডিং-অর্ডার, তুই কি তোর পকেট থেকে আমাকে টাকা দিচ্ছিস? ও তো আমারই টাকা আমাকেই দিচ্ছিস তুই। অত বাজে কথা বলছিস তুই কাকে?

মুক্তিপদ একটু নরম হলো যেন। বললে—ওমনি তুমি রাগ করছো...

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা রাগ করবো না? তুই কাকে ও-সব কথা শোনাচ্ছিস শুনি? আমি কি কিছু জানি না?

—ওই দেখ, আমি বলছি...

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তুই ও-সব কথা অফিসের অফিসারদের বোঝাস্, আমাকে বোঝাতে আসতে হবে না—

মুক্তিপদ বললে—জার্মানীতে যাবাব আগে তো আমি এসেছিলুম—

—সে তো আজ তিন মাস হয়ে গেল—

—তাবপব তো ওখান থেকে স্টেটস এ যেতে হয়েছিল সেখান থেকে লন্ডন, প্যাবিস হয়ে আবাব মিডল ইস্টে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে

ঠাকমা মণি বললেন—থাক থাক অত কাজেব ফিবিস্তি দিতে হবে না তোকে। আমিও ওবকম কত ঘুবেছি, কিন্তু তোব মত বাডিব কথা ভুলে থাকিনি। আমাব টেলিগ্রাফেও খবব নিতে পাবতিস একটা। তোদেব ছোটবেলায লন্ডন প্যাবিস থেকে খবব নিইনি? এখন কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে তুই একেবাবে লাটসাহেব হয়ে পডেছিস। জানিস কাব টাকায তুই খেতে পবতে পাবছিস? এখন তুই আমাকে খাওযাচ্ছিস, না আমি তোকে খাওযাচ্ছি?

এ-কথাব জবাব দেবাব আগেই ঠাকমা-মণি বাধা দিলেন।

বললেন—জীবনে কখনও কাবো তাঁবে থাকিনি, এখনও থাকবো না। যদ্দিন বেঁচে থাকবো, তদ্দিন কাবো দান দক্ষিণে নিতে চাই না। মনে কবিসনি আমি তোদেব দযাব ওপব নির্ভব কবে থাকবো কিংবা আব কাবোব ওপব আমাব পেট চলবে—

—মা, তুমি দযাব কথা তুলছো কেন?

—থাম তুই! আব কথা বলিস না- তোবা সবাই কী ভেবেছিস বল দিকিনি? ভেবেছিস কর্তা নেই বলে আমি না-খেয়ে মবে যাবো?

মুক্তিপদ বলতে গেল—মা, তুমি

—থাম্, কথা বলতে লজ্জা কবে না তোব? আমি অনেক ব্যাটাছেলে দেখেছি কিন্তু তোব মত বউ-এব ভেড়ুযা কখনও দেখিনি

মুক্তিপদ আবাব বলতে গেল —এ বকম কবলে আমি কিন্তু চলে যাবো মা চলি তাহলে

—ভাবছিস তুই চলে গেলে আমি উপোস কববো?

—উপোস কববাব কথা উঠছে কেন মা

ঠাকমা মণি বললেন —তাহলে চলে যাব বলে ভয দেখাচ্ছিস কেন? আমি তোব মা, যখন তুই জন্মেছিলি তখন তোব ওজন ছিল মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। ডাক্তাব বলেছিল এ ছেলে বাঁচবে না। আমিও জেদী মেয়ে, আমি তখন বলেছিলুম একে আমি বাচাবোই। তোব এক বছব বযেস পর্যন্ত আমি দিনে-বাতে কখনও ঘুমোই নি। কত নার্স কত ডাক্তাব, কত ওষুধ সব কিছুব ব্যবস্থা ছিল। নার্সিং-হোমেব সব্বাই আমাব কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাবা সবাই বলেছে তাদেব জীবনে তাবা এমন মা দেখেনি

একটু থেমে আবাব ঠাক্‌মা-মণি বলতে লাগলেন—তা এখন ভাবছি সব ভুল কবেছি। ভাবি সেদিন তোব গলা টিপে মেবে ফেললেই ভালো হতো, তাহলে আমি আব এই এত কষ্ট পেতুম না—

মুক্তিপদ এতক্ষণ দাঁডিযে দাঁডিযে কথা বলছিল, এবাব দুই হাতে মাথাটা চেপে ধবে একটা সোফার ওপবে বসে পডলো।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কী হলো আবাব তোব? আমাব কডা কথাগুলো শুনতে ভালো লাগলো না বুঝি? তোব মাথা ধবে উঠলো?

মুক্তিপদ এ-কথাব কোন জবাব দিলে না। যেমন দুই হাতে নিজেব মাথাটা চেপে বসে ছিল তেমনিই বসে বইল। মুক্তিপদেব জীবনেব এক-এক মিনিট সমযেব দাম কোটি-কোটি টাকা। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন তাব মনে হলো কোটি কোটি টাকা জলে যায যাক, তাব বদলে আবো কযেক কোটি টাকা সে ঠাক্‌মা-মণিব কাছ থেকে উপার্জন কবে নিযে যাবে।

—কী হলো, মাথা ধবা ছাডলো না? মাথায একটু অমৃতাঞ্জন ঘযে দেব?

—না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কেন, বউমাব নামে লাগিযেছি বলে মাথা ধবলো?

তখনও মুক্তিপদ কিছু বললে না দেখে ঠাকমা মণি বিন্দুকে ডাকলেন। বললেন—ওলো বিন্দু, আমার অমৃতাঞ্জনের শিশিটা একাবার আমাকে দিয়ে যা তো—

বিন্দু অমৃতাঞ্জনের শিশিটা ঠাকমা মণিকে দিতেই ঠাকমা-মণি সেটা থেকে কিছুটা মলম বার করে ছেলের কপালে ঘষতে লাগলেন। যখন মুক্তি ছোট ছিল তখনও ঠিক এমনি করে তার কপালে এইটে ঘষে দিতেন। তখন এই ছেলেই আরাম পেয়ে তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো। এতদিন পরে এত বয়সেও সেই মুক্তি যেন আবার আগেকার মত ছোট ছেলেটি হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।

মুক্তিপদ সোফাটার পেছনে মাথা হেলিয়ে রেখেই চোখ দুটো বুঁজে বললে—মা মল্লিক মশাইকে একটু ডেকে পাঠাও তো—

—কেন? আবার তাকে ডেকে কী করবি?

—একটু হিসেব বুঝে নেব--

বিন্দুর ওপর ভার পড়লো সরকারমশাইকে ডাকবার। বিন্দু খবর দিলে সুধাকে। সুধা খবর দিলে কালিদাসীকে। কালিদাসী খবর দিলে ফুল্লরাকে। ফুল্লরা খবর দিলে একতলার খাজাঞ্চিখানায়।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—সৌম্য কোথায়?

—কেন? তাকে ডেকে কী হবে? সে বোধহয় খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে রয়েছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—সৌম্য আজকাল কী করে?

—কী করে, মানে?

মুক্তিপদ বললে—মানে একজামিন তো হয়ে গেছে, এখন কী করছে ও?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন— খায়-দায় আর ঘুমোয়। রাত ন'টার সময় সদর গেট বন্ধ হয়ে যায়, সে তার আগে বাড়ি এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তা, হঠাৎ তার সম্বন্ধে তুই এত জিজ্ঞেস করছিস কেন? সে বেঁচে আছে কি মরলো, সে সম্বন্ধে এতদিন তো কই কিছু খোঁজ নিস্‌নি—

মুক্তিপদ বললে—এবার তো সে মেজর হয়েছে, এবার তো ওর অফিসে বেরোন উচিত তাকে একবার ডাকতে পাঠাও না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ডাকবো?

—একবার ডাকো তো-দেখি সে কী বলে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাকা হলো। এতদিন বাদে কাকা এসেছেন, এসে তাকে ডাকছেন শুনে সৌম্য তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়লো। সারা রাত সে যে জেগে কাটায় তা ঠাকমা-মণি জানেন না। সৌম্য সোজা এসে ঠাক্‌মা-মণির ঘরে ঢুকলো।

মুক্তিপদ সৌম্যর দিকে চেয়ে বললেন—এ কী, তোমার এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? এত দেরী পর্যন্ত তুমি ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

লজ্জায় সৌম্য একটু জড়োসড়ো হবার চেষ্টা করলে। বললে—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম একটু।

মুক্তিপদ বললেন—তোমার কোন কাজ নেই বলেই এত ঘুমোও। তোমার ঠাক্‌মা-মণি তো বলছিলেন তুমি নাকি রাত ন'টার পরই ঘুমিয়ে পড়ো। এত ঘুম তোমার কোত্থেকে আসে? তোমার তো ডাক্তার দেখান উচিত। নিশ্চয় কোন অসুখটসুখ আছে তোমার—

সৌম্য মাথা নিচু করে বললে—না, আমার কোনও অসুখ নেই—

—কোনও অসুখ নেই তো এতক্ষণ ঘুমোও কী করে? আমি তো রাত বারোটার আগে কোনও দিন শুতে যেতে পারি না। আর এদিকে ভোর চারটের পর আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। আমার এই বয়েসেও আমি দশজন লোকের কাজ একলা করি। এখন আমারও তো বয়েস হচ্ছে, এখন থেকে কাজকর্ম বুঝে নাও—

সৌম্য কথাগুলো শুনলো কিন্তু কিছু বললে না।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলো—এই তো আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এলাম। চার মাস ধরে আমি এতটুকু বিশ্রাম পাইনি, বাড়ির কারোর খবর রাখবারও সময় পাইনি এ ক'মাস। লন্ডনে শুধু

আমাদের অফিসে কাজ করেছি এক জায়গায় বসে, সেই দু'দিনই বলতে গেলে রাত্তিরে একটু ঘুমিয়েছি। কিন্তু তুমি এ-সব কাজগুলো করতে পারলে আমি বেলুড়ের ফ্যাক্টরিটা ভালো করে দেখতে পারি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে- তুমি কাল আমাদের হেড অফিসে যাবে?

সৌম্যর কী আর বলবার থাকতে পারে। বললে—যাবো—

—তা হলে কাল তুমি আমাদের হেড্-অফিসে ঠিক সাড়ে ন'টার সময় যাবে। তারপরে আমি তোমায় বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাবো সেখান থেকে। এখন থেকে সব কাজটাজ বুঝে নাও। আমার যদি অসুখ-বিসুখ হয় কোনও দিন, তো তুমিই তখন দেখতে পারবে। তুমি এখন মেজর হয়েছ, তুমিও এখন থেকে আমাদের একজন ফুল-ফ্লেজেড্ ডাইরেক্টর--

সৌম্য কাকার সব কথাগুলো শুনেছিল, কাকা আবার বললে—তা হলে তুমি যাও এখন সবে ঘুম থেকে উঠেছো, আর বেশীক্ষণ তোমায় আটকাবো না, ওই কথাই রইল তাহলে—যাও।

সৌম্য উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেই যেন বাঁচলো।

বিন্দু ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকে বললে--বাইরে সরকারমশাই এসে দাঁড়িয়ে আছেন—আসতে বলবো কি?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—হ্যাঁ পাঠিয়ে দে—

মল্লিকমশাই এতক্ষণ ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সকাল থেকে তিনি সন্দীপের অপেক্ষা করছিলেন। খুব সকাল সকালই একশো পঁচিশটা টাকা সন্দীপের হাতে দিয়ে তপেশ গাঙ্গুলীর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। অফিসে যাবার আগেই যাতে তিনি টাকা পেয়ে যান সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সকাল দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো তবু দেখা নেই সন্দীপের। কলকাতায় নতুন এসেছে সে, তাই ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। বাস থেকে নামা-ওঠার সময়ে ধাক্কাধাকিতে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

এমনি যখন ভাবছেন, হঠাৎ ঠাকুর এসে খবরটা দিয়ে গেল। বললে—সরকারমশাই, মেজবাবু এসেছেন—

মেজবাবু! মেজবাবুর আসবার খবর শুনেই মল্লিকমশাই বুঝতে পারলেন আজ তাঁর দুপুরের খাওয়া শিকেয় উঠলো।

ঠাকুর বললে—আপনি কি এখনই খেয়ে নেবেন?

মল্লিকমশাই তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে চড়িয়ে দিলেন। বললেন—না রে বাবা, খাওয়া এখন মাথায় উঠেছে আমার, কখন মেজবাবুর ডাক পড়ে তার কি ঠিক আছে? মেজবাবু চলে যাওয়ার পরই খাবো। আর তা ছাড়া আমাদের সন্দীপও তো এখনও আসেনি, সে গাড়ি চাপা পড়ালো না কোথায় গেল, তা তো বুঝতে পারছি না। সে এলেই না হয় একসঙ্গেই খাবো—

অনেকক্ষণ থেকে তিনি হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে তৈরী হয়ে ছিলেন। যখন তেতলা থেকে ডাক এলো তখন সঙ্গে সঙ্গে তেতলায় চলে গেলেন। গিয়ে শুনলেন খোকাবাবু ভেতরে ঢুকেছেন। একজন ঘরে থাকতে অন্য-একজনের সে ঘরে যাওয়া শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। তাই ঘরের বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর খোকাবাবু যেই বেরিয়ে গেলেন বিন্দু এসে ডাকলে—আসুন সরকারমশাই আসুন--

মল্লিকমশাইকে দেখেই মেজবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর? সব ভালো?

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে সবই ভালো—

মেজবাবু সরাসরি কাজের কথাই শুরু করে দিল। বললেন একটা কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। দু'মাস আগে অফিস থেকে আপনাকে যে ঠাক্‌মা-মণির নামে ক্যাশ এক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল তা আপনি খাতায় তোলেননি তো? আমি তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম--

মল্লিকমশাই সঙ্গে সঙ্গে হিসেবের খাতার পাতাটা বার করতে করতে বললেন—সে টাকাটা আমি বাড়িতে এসেই ঠাক্‌মা-মণির হাতে তুলে দিয়েছি, দিইনি?

ঠাকমা-মণি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—হ্যাঁ, আমি সে টাকা গুনে নিয়েছি—

মল্লিকমশাই ততক্ষণে হিসেবের খাতার বিশেষ একটা পাতা বার করে সামনে মেজবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এই দেখুন, এইখানে আমি টাকাটা জমার পাতায় জমা করে নিয়েছি—

—না, ওটা কেটে দিন—

বলে নিজের পোর্টফোলিও থেকে ডট পেন বার করে সমস্ত লেখাটা ঘষে ঘষে কেটে বাদ দিয়ে দিলে। যখন দেখলে ওপর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তখনই যেন নিশ্চিন্ত হলো। তারপর বললো—এবার টোটালটাও কেটে দেবেন নতুন করে আবার টোটাল দিয়ে দেবেন—খাতা কখন কার নজরে পড়ে বলা যায় না—ইনকামট্যাক্সের লোক দেখে ফেললে—

তারপর মল্লিকমশাইকে বললে—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন এবার থেকে কোন ফিগারটা পোস্টিং করতে হবে আর কোন্‌টা পোস্টিং করতে হবে না, সেটা আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন—

মল্লিকমশাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন।

ঠাক্‌মা-মণির দিকে চেয়ে মুক্তিপদ বললে—যে-দিকটা আমি দেখবো না সেই দিকটাতেই গোলমাল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই তো তোমাকে বলছি সৌম্য এখন থেকে ফ্যাক্টরিতে বেরুতে আরম্ভ করুক—

ঠাক্‌মা-মণি চুপ করে রইলেন।

মেজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা, চলি—আবার আর একদিন আসবো—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—এত বাজে কথা বলিস কেন?

—বাজে কথা?

—বাজে কথা না তো কী? আমি কি তোর কোনও কথা কোনও দিন বিশ্বাস করেছি যে এবার তোর কথায় আমি বিশ্বাস করবো?

মুক্তিপদ বললে—দেখছি আমার ওপর তোমার রাগ এখনও গেল না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—রাগ যাবে আমি ম'লে।

তারপর আবার একটু থেমে বললেন—তবে একটা কথা তোকে বলে রাখি মুক্তি, আমার মরার খবর পেলে একবার দেখতে আসিস—আসতে ভুলিস নে—

—বা রে, ওকথা বলছ কেন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কেন বলবো না? তুই যে রাক্ষুসীর হাতে পড়েছিস সে কি তোকে ছাড়বে মনে করেছিস? উঃ, কর্তা যে কী মেয়ের সঙ্গেই তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন! ও মেয়ে একদিন আমার হাড় ভাজা করে দিয়েছিল, এখন দেখবি তোরও হাড় মাস ভাজা ভাজা করে দিয়ে তবে তোর ঘাড় থেকে নামবে—

এ-সব পুরনো কথা মুক্তিপদর কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল তাই বললে—আমি এবার চলি মা—

বলে সত্যিই চলতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু যেন কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আবার সোফাটায় বসে পড়লো। বললে—হ্যাঁ, একটা জরুরী কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। অথচ সেই কথাটা বলতেই আসা। তোমার সৌম্যর বিয়ে দেবে?

ঠাক্‌মা-মণি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—বিয়ে! হঠাৎ?

মুক্তিপদ বললে—না, বলছি সৌম্য তো এখন বড় হয়েছে, এই বয়েসেই বিয়ে হওয়াটা তো ভালো। একটা ভালো পাত্রী আছে, তুমি যদি বলো তো তোমাকে পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থা করি।

—তুই সৌম্যর বিয়ের ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছিস যে হঠাৎ? মতলবটা কী?

—মতলব আবার কী! দাদা নেই, সুতরাং আমাকেই তো সমস্ত দিক দেখতে হবে। আর তোমারও তো একটা সঙ্গী দরকার। বাড়িতে একটা বউ এলে তোমাকেও তো সব সময় সেবা করতে পারবে—

ঠাকমা মণি হাসলেন হাসিটা ব্যাঙ্গের বললেন —সেবা? খুব হযেছে খুব হযেছে—তোব বউ আমাব যে সেবা কবেছে তা [illegible] আমি সামলে উঠতে পাবিনি এখন নাতবউ এসে নতুন কবে আমাব সেবা কবে [illegible] কপালে বাকি ছিল। অত সেবা আমাব সইবে না বে অত সেবা আমাব [illegible] কপালে [illegible]—তুই ববং যেখানে যাচ্ছিস সেখানে যা—

মুক্তিপদ বললে—না মা আমি আজ এই কথাটা বলতেই তোমাব কাছে এসেছিলুম—

[illegible] বলতো? সৌম্যব বিযেব ব্যাপাবে তোব এত আগ্রহ কেন?

মুক্তিপদ বললে —একটা নতুন পার্টি মিডল ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকাব কাজেব কনট্র্যাক্ট পেযেছে আমাদেবই হাত দিয়ে, তাবা চাটার্জি মেযেও খুব কোযালিফাযেড এম এ পাশ কবেছে এবাব-

ঠাকমা মণি অবাক হযে বললেন—তা পাচশো কোটি টাকাব কনট্র্যাক্ট-এব সঙ্গে বিযেব কী সম্পর্ক বে

—না পাত্রীব বাবাব ব্যাপাবটাও তো তোমাব জানা দবকাব। তাঁদেব কি বকম আর্থিক অবস্থা, তাও তো আমাদেব জানতে হবে—আব তা ছাডা—

—তা ছাডা?

—তা ছাডা এই বিযেটা হলে তাবা আমাদেব ফার্মকে কনট্র্যাক্টেব থার্টি পার্সেন্ট অর্ডাব দেবে বলেছে। পাঁচশো কোটি টাকাব থার্টি পার্সেন্ট কত কোটি টাকা হবে সেটা তুমি একবাব ভেবে দেখ—

ঠাকমা মণি কিছু বলাব আগেই মুক্তিপদ বলতে লাগলো—আবো একটা কথা। সেটা হচ্ছে লেবাব আজকাল লেবাব ট্রাবলই হচ্ছে আমাদেব বেঙ্গলেব সবচেযে বড হেডেক্। চ্যাটার্জিদেব বড ছেলেটা আবাব ট্রেড ইউনিযন লীডাব। ওবা হাতে থাকলে আমাদেবও কত সুবিধে ভেবে দেখ। এক ঢিলে দুই পাখী মাবা যাবে। আমাদেব ফার্ম সেদিক থেকে সিকিওব হযে গেল—

ঠাকমা মণি ছেলেব মুখেব দিকে খানিকক্ষণ ধবে অবাক হযে চেযে বইলেন।

মুক্তিপদ বললে—কী হলো? কী ভাবছো?

ঠাকমা মণি বললেন আমি ভাবছি তোব এ কি অবনতি হলো বে? কর্তা বেঁচে থাকলে যে তোব গালে থাপ্পড মেবে বাডি থেকে তোকে দূব কবে তাডিযে দিতেন—

মুক্তিপদ বললে—বাবাব আমল আব আমাদেব আমল এক নয মা। তুমি ঠিক বুঝছো না—

– খুব বুঝছি, তুই থাম, আব বেশি কথা বললে আমিও তোকে থাপ্পড মেবে বাডি থেকে দূব কবে দেব তা বলছি। ভাইপোব বিযে হবে তাতেও টাকা? তুই আমাকে টাকাব লোভ দেখাচ্ছিস, এত বড তোবা আস্পর্ধা?

—মা, তুমি বাডিব ভেতব থাকো তাই কিছু জানতে পাবো না। আমাকে এই নিযে পৃথিবীময ঘুবে বেডাতে হচ্ছে। দিনবাত কোটিপতিদেব সঙ্গে কর্নফাবেন্স কবতে হচ্ছে, মিনিস্টাবদেব পার্টি দিতে হচ্ছে। আমাব যে কী জ্বালা তা তুমি বুঝতে পাববে না—

ঠাকমা মণি বললেন—তুই মা'ব কাছে মামাবাডিব গল্প বলিস না। আমি তোব মা, এটা মনে বাখিস—

মুক্তিপদ বললে—যাকগে, তুমি যখন শুনতে চাও,না তখন আমি আব বলতে চাই না। তবু বলি আজকাল আমাব ঘুম হয না। ঘুমেব বডি খেলে তবে ঘুম আসে। তাই পাগলেব মত হযে তোমাব কাছে চলে এসেছি—তুমিও যখন তাডিযে দিচ্ছ তখন আব কী কববো—

ঠাকমা মণি বললেন—টাকাব কথা একটু কম ভাব তাহলেই ঘুম আসবে—

মুক্তিপদ বললে—এ সব এখন আব হবে না। এখন বড্ড দেবি হযে গেছে—

– তাহলে আমাব মত ভোববেলা গঙ্গায গিযে চান কব—

মুক্তিপদ বললে —না মা এখন একটা মাত্র উপায আছে আমাব হাতে—

—কী

—তুমি সৌম্যর বিয়েটা দাও সেই মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে, তাহলে দেখবে তখন আর আমাকে ঘুমের পিল্ খেতে হবে না। টাকাও হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে লেবার-ট্রাবলও দূর হয়ে যাবে—

ঠাক্মা মণি বললেন—না, তা কিছুতেই হবে না, আমাব দ্বারা তা কিছুতেই হবে না। কর্তা তোদের বিয়ে দিয়ে যে পাপ করে গেছেন, আমি আর সে ভুল কববো না।

—তা হলে? তোমার সৌম্যর বিয়ে দেবে না?

ঠাক্মা-মণি বললেন—আমি গরীব লোকের বাড়ী থেকে সৌম্যর বউ নিয়ে আসবো—

—সে কী?

—হ্যাঁ, তোর বউ যেমন আমার কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সৌম্যর বউকে আমি তা করতে দেব না। এমন ঘর থেকে নাতবউ আনবো যে বরাবর আমার তাঁবে থাকবে, যে আমার কাছ থেকে সৌম্যকে ছিনিয়ে নিয়ে আলাদা সংসার করবে না—

মুক্তিপদ বললে—কিন্তু গরীব ঘব থেকে বউ আনলে যদি বউমার গরীব বাপ-মা ভাই-বোন তারা সবাই তোমার ঘাড়ে চেপে বসে?

ঠাক্মা-মণি বললেন—তা-ও ভালো, তবু তোর বউ-এর মত তারা তো আমার বুকে দাঁড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরবে না—

মুক্তিপদ এবারে চুপ করে গেল—

শুধু বললে—তাহলে তুমি আমার পার্টির সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দেবে না?

ঠাক্মা-মণি বললেন—না!

—এই তোমার শেষ কথা?

ঠাক্মা-মণি বললেন—হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

তারপর একটু থেমে ঠাক্মা-মণি ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আমি সৌম্যর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি—

মুক্তিপদ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সৌম্যর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছ? কোথায়? কবে বিয়ে হচ্ছে?

ঠাক্মা-মণি বললেন—আমি মেয়ে দেখে একেবারে পছন্দ করে ফেলেছি।

—পাত্রীর বাবা কী করে?

ঠাক্মা-মণি বললেন—পাত্রীব বাপ নেই, বিধবা মা আছে—

—তাদেব সংসার চলে কী করে?

ঠাক্মা-মণি বললেন—তারা মা মেয়ে দেওরের গলগ্রহ হয়ে আছে। দেওর রেলে কেরানীর চাকরি করে—

মুক্তিপদব মুখে চোখে বিবক্তি-ঘৃণা-তাচ্ছিল্যেব বলিরেখা ফুটে উঠলো। বললে—সে কী আমাদের বংশের নাম ডোবাবে তুমি? আমার অফিসের অফিসাররা কী বলবে? তাদের আমি কী করে মুখ দেখাবো? তার চেয়ে আমাকে বললে আমাদের কোম্পানীরও কত অফিসারের মেয়ে ছিল, তাদেব সঙ্গে আমি সৌম্যর বিয়ের সম্বন্ধ করতে পারতুম, তাদের কারোর মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিলে তারা ধন্য হয়ে যেত। সে-বিয়েতে তুমি অনেক যৌতুক পেতে। কিছু ব্ল্যাক টাকা পেয়ে যেতে—

ঠাক্মা-মণি চীৎকার করে উঠলেন। আসলে সেটা যেন চীৎকার নয়, মুক্তিপদর মনে হলো ঠাক্মা-মণি চীৎকার করলেন না, যেন বিকট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন—থাম তুই, থাম—

মুক্তিপদ মুখার্জি, স্যাক্সবী-মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, যেন থতমত খেয়ে গেল, যেন সে আর্তনাদ শুনে ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

ঠাক্মা-মণি আবার চড়া গলায় বলে উঠলেন—থাম তুই, থাম—

তারপব বললেন—লেখাপড়া শিখিয়ে ভেবেছিলুম তুই মানুষ হয়েছিস, এখন দেখছি তুই একটা গাধা হয়েছিস, একটা আস্ত গাধা—যা, আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা, আমার মুখের সামনে থেকে দূর হ—আমি তোর মুখও দেখতে চাই না। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে—

মুক্তিপদ আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না। স্যাক্সবী-মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এম পি মুখার্জি সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে একেবারে একতলায় নিজের গাড়ির মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করবার তাগিদে বলে উঠলো—অফিস—

ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই আমেরিকার তৈরি গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন অনেক দূরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে বাঁচলো। গিরিধারী যে সাহেবকে একটা লম্বা স্যালুট দিলে তা যেন তার সাহেব দেখতেই পেলে না। অপমানে লজ্জায় ঘৃণায় তার সাহেব যে একেবারে মর্মাহত বিধ্বস্ত তা বিহারের ছাপরা কি আরা জেলার তুচ্ছ একটা গ্রামের গিরিধারী সিং বুঝতেও পারলে না।
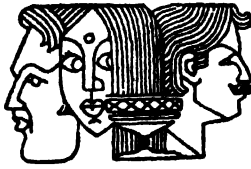
মল্লিকমশাই হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে আসতেই ঠাকুর এসে দাঁড়ালো। বললে—আপনি এসে গেছেন? চলুন খেয়ে নেবেন চলুন—

মল্লিকমশাই বললেন—কিন্তু সন্দীপবাবু এখনও এল না কেন? এত দেরি তো হবার কথা নয়। এত দেরি কেন হচ্ছে তার?

ঠাকুর বললে—সন্দীপবাবু তো এসে গেছেন, এখন তিনি খাচ্ছেন—

—তাই নাকি? কই?

বলে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাবাড়ির দিকে গেলেন। সন্দীপ তখনও খাচ্ছে। মল্লিকমশাই নিজের জায়গায় বসে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কখন এলে? আমি তোমার জন্যে বসে-বসে অনেকক্ষণই অপেক্ষা করলুম, শেষে মেজবাবু অনেকদিন পরে এ-বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁর ডাকে আমি ওপরে গিয়েছিলুম, এই এখন আসছি, তা তোমার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হলো কেন?

সন্দীপ বললে—যে বাসটাতে আমি যাচ্ছিলুম সে বাসটা মানুষকে চাপা দিয়েছিল বলে সবাই আমাদের নামিয়ে দিলে—

—কী সব্বোনাশ! তারপরে?

—তারপরে অন্য বাসে উঠতে আরো একঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।

মল্লিকমশাই খেতে খেতে বললেন—তা শেষ পর্যন্ত মনসাতলা লেনের বাড়িতে যেতে পেরেছিলে তো?

সন্দীপের খাওয়া তখন হয়ে গিয়েছিল। বললে—হ্যাঁ—

—তপেশ গাঙ্গুলীমশাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সন্দীপ বললে—না—

—সে কী? দেখা হয়নি? তাহলে টাকাটা ফেরত নিয়ে এসেছ?

—না। দিয়েছি। তপেশ গাঙ্গুলীমশাই-এর আজকে মাইনের তারিখ, তাই তিনি অফিসে চলে গিয়েছিলেন। টাকাটা বিশাখার মা'র কাছে দিয়ে এসেছি—

—রসিদ এনেছ?

—হ্যাঁ। আমার জামার পকেটে আছে—

—আচ্ছা যাও, তুমি আঁচিয়ে নাও গে আমি খেয়ে উঠে ঘরে যাচ্ছি।

সন্দীপ কলঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে চলে গেল। দুর্ভাবনা হলো তার। মল্লিককাকা যদি সমস্ত কথা জিজ্ঞেস করেন তো তার কী জবাব দেবে সে? বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। মনসাতলা লেনের সাত নম্বর বাড়ির খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বিশাখা যে-সব কথা তাকে বলেছিল তাও তো বলতে হয়। বিশাখাকে যে মাছ-মাংস কিছুই খেতে দেওয়া হয় না, ফল, দুধ, দই, ঘি ও খেতে দেওয়া হয় না, সে-সব কথাও তো বলেছিল বিশাখা। অথচ বিজলীকে সবই খেতে দেওয়া হয়। যেদিন বাড়িতে সকলের জন্যে রুটি হয় সেদিন বিজলীর জন্যে পরোটা হয় আর তারই পাশে বসে বিশাখা খায় শুকনো রুটি। দুজনের জন্যে দু'রকম ব্যবস্থা। অথচ ঠাক্‌মা-মণি যে টাকা দেন তা তো একলা বিশাখার জন্যেই। বিজলী বা অন্য কারোর জন্যে নয়। বিশাখা একদিন এ-বাড়ির বউ হয়ে আসবে, বিশাখা একদিন এ-বাড়ির গৃহিণী হবে, তাই বিশাখার স্বাস্থ্য, বিশাখার লেখাপড়া, বিশাখার চাল চলন সব-কিছুর আয়োজনের জন্যে যেন টাকার অভাব না হয়, এইটেই ছিল ঠাক্‌মা-মণির এত টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। যদি তা না হয় তাহলে টাকা দেওয়ার লাভ কী?

খাওয়া-দাওয়া সেরে মল্লিকমশাই ঘরে এলেন। মেজবাবু বাড়িতে এসেছিলেন বলে খাওয়া-দাওয়া সারতে আজ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এসেই বললেন—এবার বলো তারা কী বললে? বউমার সঙ্গে দেখা হলো?

—সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—কিছু কথা হলো?

সন্দীপ বুঝতে পারলে না কী বললে ভালো হবে। সত্যি কথাও তো অনেক সময়ে অপ্রিয় লাগে অনেক মানুষের। অপ্রিয় সত্যি বলা কি ভালো? তাতে যদি মল্লিককাকা রেগে যান? তাতে যদি ঠাক্‌মা-মণি অসন্তুষ্ট হন? তখন কি তার এই চাকরি থাকবে? চাকরি চলে গেলে তার লেখাপড়া কী করে চলবে? কোথা থেকে সে টাকা পাবে? আর চাকরি চলে গেলে সে এ-বাড়িতে কি থাকতে পাবে? তখন তো তাকে বাড়ি ভাড়া করতে হবে। বাড়ি ভাড়া করতে গেলে তো টাকাও লাগবে অনেক। সে-টাকা তার কোথা থেকে আসবে? গোপালের ঠিকানাটা যদি সে জানতো তাহলে তার কাছে গিয়েই জিজ্ঞেস করে আসতো এত টাকা তার কোথা থেকে আসে। লেখাপড়া না শিখেও যদি কলকাতায় টাকা উপায় করা যায় তো অত ছেলে তাদের কলেজে পড়ছে কেন?

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো, চুপ করে রয়েছ যে? কী ভাবছো?

সন্দীপ বললে—না, কিছু ভাবছি না—

—তাহলে কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? ঠাক্‌মা-মণি আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন তুমি এলে যেন জিজ্ঞেস করি বউমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কিনা, বউমার সঙ্গে তোমার কিছু কথা হয়েছে কিনা, বউমা মাছ-মাংস, দুধ, ফল, দই, ছানা খাচ্ছে কিনা। বলে দিয়েছেন ঠাক্‌মা-মণির কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে। তিনি সব কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন—

সন্দীপের খুব ভয় হতে লাগলো। ঠিক এই-সব প্রশ্নই যদি ঠাক্‌মা-মণি করেন? তখন সন্দীপ কী জবাব দেবে তার?

হঠাৎ ফুল্লরা ঘরে এল। বললে—সরকারমশাই, ঠাক্‌মা-মণি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—

মল্লিকমশাই বললেন—ওই শোন, ঠাক্‌মা-মণি ডেকে পাঠিয়েছেন—চলো-চলো, বেশি দেরি কোর না—তোমার জন্যেই উনি বসে আছেন। সারা দিনটা ওঁনার খুব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কেটেছে। মেজবাবুর সঙ্গে ঠাক্‌মা-মণির খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে সকালে। মেজাজটাও তাই খুব খারাপ হয়ে আছে তাঁর। তাঁর সব কথার ঠিকঠাক জবাব দেবে। বুঝলে? যেন বেফাঁস কিছু বোল না—

তারপর জামাটা আবার গায় দিয়ে দিলেন। ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বললেন—চলো—

বলে সামনের বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন। সন্দীপও পেছন পেছন চলতে লাগলো। তার মনে হলো সে যেন [illegible] সির আসামী। ফাঁসির আসামী যেমন [illegible] হাড়ি কাঠের দিকে এগিয়ে যায় সন্দীপও তেমনি সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

সন্দীপের এখনও মনে হয় [illegible] [illegible] না করলে কি এমন [illegible] কেবল মানুষের বাইরেটা দেখেই [illegible] [illegible] মানুষ? অন্দর মহলের মানুষের সঙ্গে সে [illegible]

সেদিনের পর কত দিন কত মাস কত বছর [illegible] প্রশংসা, কত নিন্দে কত [illegible] আবার আক্রমণও করেছে। কিন্তু তাতে কি [illegible] যখন তার টাকা ছিল না তখন সে যেমন ছিল তার টাকা [illegible], তখন কি সে অন্য গোত্রের হয়ে গিয়েছে? [illegible]

সংসার-যাত্রার দৈনন্দিনতায় পৃথিবীতে [illegible] সন্দীপ। সে-দুটির একটি হলো মানুষ আর একটি হলো অমানুষ। মানুষের [illegible] যে মানবেতর জীবের মত ব্যবহার করে তাকেই তো আমরা বলি অমানুষ। [illegible] থেকে পড়ে না তারা গজায়। তারা মানুষের সমাজ থেকে জন্ম নেয় [illegible] মানুষের মত। সেই-সব মানুষ ফরসা জামা কাপড় [illegible] ভালোক বলেই চিহ্নিত করে।

সারা জীবন সন্দীপ মানুষ-অমানুষের সঙ্গে [illegible] কখনও অমানুষকে মানুষ বলে ধারণা করার মত অকাট্য ভুল করেনি।

ওই যেমন গোপাল। গোপাল [illegible] গাড়ি চড়ছে, ভেবেছে, টাকা দিয়ে সে দুনিয়ার পাপ পুণ্য মান সম্মান সব কিছু নিজের আয়ত্তে আনবে। তা যদি হতো এই বিডন স্ট্রীটের বারো বাই-এ নম্বরের মালিক আর সান্যাল মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানির ডাইরেক্টর সৌম্য মুখার্জির এ দুদশা হলো কেন? সেই গোপাল, অশিক্ষিত বেড়াপোতার পিতৃমাতৃহীন গোপালও যা আর এই কোটিপতি শিক্ষিত সদ্বংশের সুসন্তান সৌম্য মুখার্জি—দু'জনে একই গোত্রের, একই পর্যায়ের, একই সম্প্রদায়ের। সন্দীপের কাছে এদের দু'জনের অস্তিত্ব একই স্তরের একই শ্রেণীর।

নইলে ওই গোপাল আর এই সৌম্য মুখার্জির পরিণতি একই রকম হলো কেন?

এই কেন'র উত্তরও সন্দীপের জানা, কিন্তু সে এখন নয় পরে। তার এ কাহিনী ধৈর্য ধরে গোড়া থেকে শুনতে হবে। একেবারে শুরু থেকে।

সেই গোড়া থেকেই, সেই শুরু থেকেই বলি এবার?

সেদিন ঠাকমা মণির খুবই মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন গেছে। যেমন ভোরবেলা বাবুঘাটে স্নান করতে যান তেমনি গেছেন সেদিনও তারপর বাড়িতে এসে জপতপ-আহ্নিক করেছেন। তারপর যা নিত্য জলযোগ করেন তা-ই করেছেন। সামান্য একটু ফল, ছানা আর দুধ। তারপর সারা বাড়ির কাজকর্মের তদ্বির তদারক করা। সেই সময়ে তাঁকে শুনতে হয়েছে ঝি'দের অভাব অভিযোগ সুবিধে অসুবিধের কথা। শুনে সব কিছুই যথাযথ বিহিত করেছেন। তারপর ঠিক সময়ে সরকারমশাই এসেছেন হিসেবের খাতাপত্র নিয়ে জমা-খরচের খতিয়ান শোনাতে। তা-ও চুকেছে একসময়ে। এ-সব নিত্যনৈমিত্তিক কাজের তালিকার মধ্যে পড়ে। তারপরে রান্নাবাড়ি থেকে তার দুপুরের নিরামিষ খাবার নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে ঠাকুর। তার খাওয়াটা ঠিক খাওয়া নয় নিয়ম রক্ষে করা। কিন্তু সেদিন সেই নিয়ম রক্ষের মধ্যেই এসে পড়েছেন মুক্তিপদ।

তারপর মুক্তিপদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একবার ডেকেছেন সৌম্যকে, একবার ডেকেছেন সরকারমশাইকে। তারপর উঠেছে সৌম্যর বিয়ের প্রসঙ্গ। কখনও মুক্তিপদকে আদর করেছেন,

মায়ের মতন স্বাভাবিক স্নেহের অধিকারে কপালে অমৃতাঞ্জন ঘষে দিয়েছেন, কখনও আবার বাড়ির কর্ত্রীর মত তিরস্কার করেছেন, মুক্তিপদকে কড়া-কড়া কথা শুনিয়েছেন। শেষকালে বাড়ি থেকে ছেলেকে অপমান করে তাড়িয়েও দিয়েছেন।

এ সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঠাক্‌মা মণির জীবনে কিছু নতুন নয়। ঠাকমা-মণির কড়া শাসনে সমস্ত সংসারটা বরাববই উঠেছে আর বসেছে। কিন্তু তিনি বিধবা হওয়ার পব থেকেই সেই শাসনের তাপমান যন্ত্রের পাবাটা ক্রমে-ক্রমে আরো উঁচু দিকে গিয়ে শেষ বিন্দুতে ঠেকবার মৃদু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাই সমস্ত বাড়িটা তাঁর দাপটে আরো শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনেকবাব।

কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি সৌম্যর কথা ভোলেননি। তাঁর মনে পড়ে গেছে যে সেটা মাসের পয়লা তারিখ। মনসাতলা লেনের বাড়িতে গিয়ে মাসকাবারি টাকা দিয়ে আসতে হবে। সে-টাকাটা কি দেওয়া হয়েছে?

বিন্দু এসেই খবরটা দিলে। সরকাবমশাই এখন ঘরের মধ্যে বসে আছেন সঙ্গে সেই ছেলেটা।

ঠাক্‌মা-মণি ঢুকেই বললেন—কী হলো, টাকা দিয়ে আসা হয়েছে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, দিয়ে এসেছি—

—তুমি দিয়ে এসেছ? বউমার কাকা কী বললে?

—কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁরও তো আজ অফিসের মাইনের তারিখ তাই তিনি বাড়িতে ছিলেন না। আমি পৌঁছোবার আগেই তিনি অফিস চলে গিয়েছিলেন।

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার যেতে দেবি হয়েছিল বুঝি?

—হ্যাঁ—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কেন, দেরি হলো কেন?

মল্লিকমশাই সন্দীপেব হয়ে বললেন—ও যে বাসে চড়ে যাচ্ছিল সেই বাসটা একটা লোক চাপা দিয়েছিল, তাই বাস বদলাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল—

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে টাকাটা কাকে গিয়ে দিলে তুমি?

সন্দীপ বললে—বউমার মা'কে—

—বউমা'র মা কিছু বললে? খুশী হলো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, চেহারা দেখে মনে হলো বউমা'র মা খুশী হয়েছেন—

—তারপর? বউমাকে দেখলে?

সন্দীপ কী জবাব দেখে বুঝতে পারলে না। কী বললে তার নিজের চাকরি থাকবে অথচ বিশাখার কোন ক্ষতি হবে না, সেটা সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

হঠাৎ বলে ফেললে—না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—সে কী? তুমি এত দূর থেকে গেলে আর বউমাকে না দেখেই ফিরে এলে? তোমাকে তো আমি বলেই দিয়েছিলুম যে তুমি জিজ্ঞেস করবে আমি মাসে-মাসে যে টাকাগুলো পাঠাই, তা দিয়ে ফল, দুধ, মাছ, মাংস, ঘি, ছানা-টানা খাচ্ছে কি না—

সন্দীপ চুপ করে রইল। কী সে বলবে? কী জবাব সে দেবে?

ঠাক্‌মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে আমি এ-সব জিজ্ঞেস করতে বলিনি?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—তা হলে সে-কথা জিজ্ঞেস করলে না কেন?

সন্দীপ এবার চুপ করে রইল।

—কী হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?

সন্দীপ বললে—আমি জিজ্ঞেস করিনি—

ঠাক্‌মা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—আরে, এ তো আচ্ছা ছেলে দেখছি? বলছি কেন জিজ্ঞেস করলে না?

সন্দীপ বললে—জিজ্ঞেস করবার সময় পাইনি—

—সময় পাওনি মানে? একটা কথা জিজ্ঞেস করতে কত সময় লাগে? সন্দীপ তখন ঠাক্মা-মণির জেরার চাপে ভেতরে-ভেতরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। বললে—টাকা নিয়েই বউমা'র মা ভেতরে চলে গেলেন, তাই আমি আর অন্য কথা জিজ্ঞেস করবার সময় পেলাম না—

ঠাক্মা-মণি বললেন—তা তাকে তুমি ডাকলে না কেন? কেন বললে না যে তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে—বললে না কেন, ঠাক্মা-মণি জিজ্ঞেস করতে বলেছেন? বলতে তোমার লজ্জা না ভয়, কী হলো?

সন্দীপ একটু ভেবে বললে—লজ্জা হলো।

ঠাক্মা-মণি বললেন—সরকারমশাই, আপনার দেশের এই ছেলেটি তো বড় লাজুক দেখছি, এর দ্বারা তো আমার কোনও কাজই হবে না—

মল্লিকমশাই সন্দীপের কথায় নিজেই যেন লজ্জায় পড়ে গেলেন। সন্দীপকে বললেন—তোমার লজ্জা হলো কেন? কীসের লজ্জা? লজ্জাটা কীসের? এ তো খুব সাধারণ কথা! এ কথা বলতে তো লজ্জা করবার কোন কারণ নেই—তোমার লজ্জা হলো কেন, বলো?

সন্দীপ কোনও উত্তর দিতে পারলে না। মল্লিকমশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কথা বলো, চুপ করে রইলে কেন? বলো কেন লজ্জা হলো?

সে-দিনের কথা ভাবলে এখনও সন্দীপের লজ্জা হয়। সত্যিই তখন সে অত লাজুক ছিল কেন? কেন সে সত্যি কথাটা বলতে এত দ্বিধা করেছিল? সে কি বিশাখার আসল কথাগুলো বলতে ভয় পেয়েছিল? যদি ভয়ই পেয়েছিল তো কীসের ভয়? বিশাখার ক্ষতি হবার ভয়? বিশাখার কিছু ক্ষতি হলে তার কী ক্ষতি? বিশাখার সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক? আর যদি লজ্জাই হয় তো কীসের লজ্জা? বিশাখা তো তাকে তাদের বাড়ির সমস্ত কথা মন খুলে বলেই দিয়েছিল। সে-সব কথা বাইরের লোকের কাছে বলাও তো উচিত নয়। তাহলে বিশাখা তার কাছে কেন তাদের পারিবারিক সাংসারিক হাঁড়ির খবর সমস্ত এক নিঃশ্বাসে অকপটে বলে গেল?

সে-সব কথা বলতে বিশাখা তো এতটুকু লজ্জা পেলে না। সে কি তাহলে ভেবেছিল যে সন্দীপ বিশাখার সমস্ত বলা কথাগুলো ঠাক্মা-মণির কাছে হুবহু বলুক! সমস্ত জিনিসটাই সন্দীপের কাছে যেন কেমন রহস্যময় মনে হয়েছিল। সন্দীপের এই ভয় হয়েছিল যে কাকীমার অত্যাচারের কথাগুলো যদি সন্দীপ ঠাক্মা-মণিকে বলে দেয় তাহলে হয়ত এই বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাবে! সন্দীপ যেন চেয়েছিল ঠাক্মা-মণির নাতির সঙ্গে বিশাখার বিয়েটা হোক।

ঠাক্মা-মণির গলার শব্দে সন্দীপের যেন হুঁশ ফিরে এল। ঠাক্মা-মণি মল্লিকমশাইকে বলতে লাগলেন—আপনি এক কাজ করুন মল্লিকমশাই, এই ছেলেটাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না—একবার আপনি নিজে যান বউমার বাড়ি।

তারপর নিজের কথা শুধরে নিয়ে আবার বললেন—না না, একে সঙ্গে করেই নিয়ে যান। এরও তো শেখা দরকার কার সঙ্গে কী রকম করে কথা বলতে হয়। আপনি বউমা আর বউমার মাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন গিয়ে। আমি নিজেই তাদের জিজ্ঞেস করে দেখবো আমার পাঠানো টাকাগুলো বউমার পেছনে খরচ হচ্ছে, না ভূতের পেছনে খরচ হচ্ছে—

মল্লিকমশাই প্রস্তাব শুনে একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—বউমা আর বউমা'র মা দুজনকেই নিয়ে আসবো তো?

ঠাক্মা-মণি বললেন—হ্যাঁ—

—আজই যাবো?

ঠাক্মা-মণি আবার একটু ভেবে নিয়ে বললেন—না, কাল আবার আমার সৌম্য অফিসে যাবে। এখুনি মেজবাবু এসে সৌম্যকে কাল থেকে অফিসে যেতে বলে গেলেন আমি সেই নিয়ে সকালবেলা ব্যস্ত থাকবো। আর পরশু তো শনিবার। শনিবারটা দিন ভালো নয়। আপনি সোমবার যান। ড্রাইভারকে আগে বলে রাখবেন। সে আপনাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে, আবার ওদের মা

তার [illegible]। আর এখানেই ওরা খাবে। আর তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর সে [illegible] আসবে--

[illegible] বললেন [illegible] আপনি যা বললেন তাই-ই করবো—বলে [illegible] বেরিয়ে এলেন। পেছনে পেছনে সন্দীপও আবার নিচেয় নেমে এল।

[illegible] ঠিক ন'টার সময়ে স্যাক্সবি-মুখার্জি কোম্পানির গাড়ি বারো বাই [illegible] স্ট্রীটে বাড়ির সামনে এসে দাড়ালো। ড্রাইভারের ইউনিফর্মের ওপর লাল সিল্কের [illegible] এমব্রয়ডারিতে [illegible] দুটো অক্ষর এস আর এম্। মানে স্যাক্সবি মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানি।

ঠাকমা মণি আগে [illegible] বলে রেখেছিলেন কিন্তু সকালবেলা গঙ্গা থেকে স্নান [illegible] করে যখন নাতির ঘরে গেলেন তখন দেখলেন ভেতর থেকে [illegible]। সেই রাত ন'টার সময়ে খেয়েদেয়ে শুয়েছে আর এখন [illegible] ঘুমোতে পারে!

[illegible] মণি [illegible] লাগলেন। বললেন—ওরে সৌম্য, ওঠরে ওঠ—

[illegible] সৌম্য দরজা খললো

ঠাকমা মণি বললেন [illegible] ঘুমোবি? তোকে আজ অফিসে যেতে হবে, মনে [illegible] সেই কাল [illegible] সময়ে ঘুমোতে গেছিস, আর এখন উঠলি? ক'টা বেজেছে জানিস?

সৌম্য কী ভাবলো কে জানে, কিন্তু ঠাকমা-মণির মুখের ওপর কিছু বললে না।

ঠাকমা মণি বিন্দুকে বললেন—বিন্দু, সুধাকে বল্ রান্নাবাড়িতে খবর দিতে খোকাবাবু আজ সকাল সকাল খাবে। সে খেয়ে দেয়ে আজ ন'টার সময় অফিসে যাবে—

নাতি কখন খাবে, কখন অফিসে যাবে, সবই দেখতে হবে ঠাকমা-মণিকে। আজ যদি বড় বউমা থাকতো, আজ যদি বড় খোকা থাকতো, তাহলে আর এই বুড়ো বয়েসে ঠাকমা-মণিকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না। কপালের দুর্ভোগ তাই এ-বয়েসেও তাঁকে এই সব কাজ এখনও করতে হচ্ছে। আর-জন্মে তিনি বোধহয় অনেক পাপ করেছিলেন, তাই এখন তার এই শাস্তি!

শুধু ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেই কাজ শেষ হয় না। তারপর থেকে কেবল জিজ্ঞেস করেন খোকা চান করেছে কিনা, খোকা খেতে গেল কিনা, কিংবা খাওয়া শেষ হলো কিনা। আর শুধু খেয়ে উঠলেই হবে না, অফিসে বেরোল কিনা তাও বিন্দুকে জেনে নিতে হবে। জেনে বলতে হবে ঠাকমা মণিকে।

সুধা মনে মনে গজ-গজ করে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু সে সব জানে। সে জানে কত রাত্রে ঠাকমা মণির নাতি খোকাবাবু বাড়ি ফেরে। তখন সে কী-রকম করে টলতে টলতে বাড়িতে ঢোকে, গিরিধারী তাকে কেমন করে দু'হাতে ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। সবই সুধার জানা। কিন্তু মুখে কিছু বলার হুকুম নেই তার। তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে শুধুই বিন্দুকে বলে—ওলো সবই জানি, সবই শুনি কিন্তু সেই যে কথায় বলে—চোখে দেখে কানা হও, কানে শুনে কালা হও, আমারও হয়েছে তাই

বিন্দু বলে—তোর অত কথায় কাজ কি রে মাগী? কাজ করবি মাইনে নিবি, আর চুপ করে থাকবি। দেখছি আদা শুকনো হলেও ঝাল যায় না—তোর হয়েছে তাই—

কিন্তু ঠাক্‌মা-মণির হুকুম তামিল করতে করতেই সব লোক এমন হয়রান হয়ে যায় যে কারো ঝগড়া করবার ফুরসত্ থাকে না। হাতে যদি কিছু না থাকে তো ঘরগুলো আরও একবার মোছ, জানলা দরজার ধুলোগুলো আরও একবার ঝাড়ো। ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে না হলেই ঠাক্‌মা-মণি রেগে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। এমন চিৎকার গালাগালি শুরু করবেন যাতে সমস্ত বাড়িটা গম্‌গম্ করে উঠবে।

স্যাক্সবি মুখার্জি কোম্পানির অফিসে সেই দিনই সৌম্যর প্রথম পদার্পণ। শুধু অফিসেই নয়, সমস্ত ফ্যাক্টরির লোকই জেনে গেল যে আজ থেকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভাইপো সৌম্যপদ মুখার্জি নতুন ডাইরেক্টর হয়ে এসেছেন, নিজের কাজ বুঝে নিয়েছেন! এর পর থেকে তিনি সকলের কাজ দেখাশোনা করবেন। তার মানে এবার থেকে তিনি এলে ও তাঁকে দেখলে সসম্ভ্রমে সেলাম করতে হবে। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম মেজাজ দেখলি ছোট সায়েবের?

অন্যজন উত্তর দিলে—ভাই ওলাউঠোর নাড়ী, মৌলবীর দাড়ি আর জঙ্গলের গাই, এ তিনকে বিশ্বাস নেই—.

—তার মানে?

—তার মানে নিমপাতা ঘি দিয়ে ভাজলেও কি মিষ্টি হয়?

অফিস ফ্যাক্টরিতে আর ক্যান্‌টিনে ক্যান্‌টিনে এই একই আলোচনা। নতুন সাহেবই আসুক আর পুরোন সাহেবই থাকুক আমাদের কপাল সেই গুয়ের এপিঠ-ওপিঠ—

তবে আশার কথা এই যে এ-সব কথা কখনও কোম্পানির মালিকদের কান পর্যন্ত পৌঁছোয় না। কারণ সামনে এসে তো সবাই অন্য কথা বলে। একজন বলে—স্যার, আমি হচ্ছি এখানকার ডেস্‌প্যাচ সেকশনের বড়বাবু। যদি কোনও ফাইল খুঁজে না পান তো আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি আজ তিরিশ বছর এখানে কাজ করছি—

সৌম্য সকাল থেকেই এই রকম কথা অনেক লোকের মুখ থেকে শুনলে। কেউ ডেস্‌প্যাচ সেকশনের বড়বাবু, কেউ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট সেকশনের চিফ-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, কিংবা কেউ আবার লিগ্যাল ডিভিসনের এ্যাডভাইজার, আবার কেউ ফাইন্যানস্ ডিভিসনের চিফ্-এক্যাউন্‌টেন্ট। এমনি আরো অনেক। সকলেরই ওই একই কথা সবাই নতুন ডাইরেক্টরকে কাজে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। সবাই এসে নিজের নিজের ফাইল নিয়ে এক এক করে দেখালে। সবাই-ই বলতে চাইলে যে সে একলাই এই অফিসটা চালাচ্ছে। সবাই-ই চলে যাবার সময় তাকে সশ্রদ্ধ উইশ্ করে বিদায় নিলে।

এর পরে বেলুড়ের ফ্যাক্টরি। সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। ভেতরে এত আওয়াজ যে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। সৌম্য এ কথাটাও বুঝলে যে তাদের যে ঐশ্বর্য তার মূলে তার ঠাকুর্দা দেবীপদ মুখার্জিরই সমস্ত কৃতিত্ব। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে কোম্পানিকে এই অবস্থায় উন্নীত করে দিয়েছেন।

মুক্তিপদ তাকে নিয়ে যেখানেই গেলেন সেখানকার সমস্ত কর্মীরা লম্বা করে স্যালিউট্ জানালে। যেন সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। তারপর তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে বসলেন।

বললেন—সব দেখলে তো? দেখে তোমার কী মনে হলো?

সৌম্য বললে—ট্রিমেন্ডাস্—

—ওই বাইরে থেকে দেখে তাই-ই মনে হয় বটে। কিন্তু তুমি ব্যালেন্স-শীট দেখলেই ভেতরের আসল অবস্থাটা বুঝতে পারবে। ওটা একদিনে বোঝা যাবে না। অনেক দিন ধরে পড়তে পড়তে তবে কিছু জ্ঞান হবে। আজ তুমি যাদের দেখলে তারা এক-একটা শয়তান। এইটুকু জেনে রাখবে। তারা কেউ তোমার ওয়েল-উইশার নয়। আজকাল লেবার-ট্রাবল যা চলেছে তাতে জানি না আর কতদিন এই ভাবে চালাতে পারা যাবে। কারণ এখানকার গভর্মেন্টই আমাদের এগেন্‌স্টে—।

তাদের মতে আমরা হলুম ক্যাপিট্যালিস্টস। তাদের মতে আমরা নাকি ওর্য়াকারদের এক্সপ্লয়েট করছি—

এমনি সব আরো অনেক কথা! এটা তার প্রথম দিন, তাই সৌম্য কিছু বুঝলো আর কিছুটা বা বুঝলো না।

কাকা বললেন—এখন তোমার কম বয়েস তাই অতটা বুঝতে পারছো না। কিন্তু আমার কাছ থেকে জেনে নাও যে এই সমস্ত দায়িত্ব একলা কাঁধে নেওয়ার পর থেকে আমি রাত্তিরে ভালো করে ঘুমোতে পারি না। আই অ্যাম নাউ এ্যান ইন্‌সোম্‌নিয়্যাক। তুমি কল্পনা করতে পারো? আমাকে এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়! সেই জন্যেই আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি আমার একটা হেল্‌পিংহ্যান্ড্ হবে বলে—

আরো অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন মুক্তিপদ মুখার্জি। সে সব কথা পরে আর মনে ছিল না সৌম্য মুখার্জির। কিন্তু যতদিন কোম্পানিতে গিয়েছে ততদিন অনেক ক্ষণ লেগেছে সেই সব কথা বুঝতে। সমস্ত দিন ধরে সব কিছু দেখে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে এই কোম্পানি চালু রাখতে গেলে কাকার সঙ্গে তাকেও অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে। তার বিচক্ষণতা, পরিশ্রম আর বৈষয়িক বুদ্ধির ওপরেই নিজের আর পরিবারের সকলের শান্তি আর নিরাপত্তা নির্ভর করবে।

মুক্তিপদ বললেন—এই বিচক্ষণতা, পরিশ্রম আর বুদ্ধি ছাড়া আরো একটা জিনিস দরকার—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলেন—সেটা কী?

মুক্তিপদ সৌম্যকে বললেন—সেটা হচ্ছে লোক চিনতে পারা।

—লোক চিনতে পারা মানে?

—তা জানো না? পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে লোক চেনা। সবাই কি লোক চিনতে পারে?

সৌম্য কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলে না।

মুক্তিপদ বললেন—একদিনে তুমি সব বুঝবে না। আসলে আমরা তো সবাই ভদ্রলোক। কারণ সবাই আমরা কোটপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তা বলে সবাই কি আমরা ভদ্রলোক? এদের মধ্যে কত লোক ফোর-টুয়েন্টি, কত লোক বিশ্বাসঘাতক, কত লোক ধান্দাবাজ, তার হিসেব রাখা খুব কঠিন কাজ। আমি জীবনে অনেক লোক দেখেছি যারা রামকৃষ্ণ-মিশনে লাখ-লাখ টাকা চ্যারিটি করে। আসলে খোঁজ নিয়ে দেখেছি অনেকেই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ান। আবার এমন লোক দেখেছি যারা জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেনি কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা নাইট-ক্লাবে গিয়ে রাত কাটায়। আবার এমন লোকও দেখেছি যারা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সামনে আধঘণ্টা ধরে জপ্ করে তবে দিনের কাজ শুরু করে, কিন্তু অফিসে দু'হাতে ঘুষ নেয়...

বিকেলে চা খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল।

সৌম্য মন দিয়ে কাকার কথাগুলো শুনছিল। এই তার অফিসে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—'অনেস্টি' বলে একটা ইংরেজি কথা আছে নিশ্চয়ই জানো তুমি। কিন্তু আমরা হচ্ছি বিজ্‌নেস ম্যান। আমাদের 'অনেস্টি'র সঙ্গে সাধারণ লোকের 'অনেস্টি'র অনেক তফাৎ। আমাদের 'অনেস্টি'র সঙ্গে ডিক্সনারির 'অনেস্টি'র কোন মিল নেই। তুমি যদি ডিক্সনারির 'অনেস্টি'র মানে মুখস্থ করে ব্যবসা চালাতে যাও তাহলে কিন্তু তোমার ব্যবসা ফেল মারবে—

সৌম্য সব শুনে গেল। কিছু মন্তব্য করলে না—

মুক্তিপদ বলতে লাগলেন—এর কারণটা কী? কারণটা হচ্ছে ডিক্সনারির সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনও মিল নেই। জীবন আমাদের অনেক বদলে গেছে কিন্তু ডিক্সনারি বদলায়নি। তাই জীবনের সঙ্গে জীবনের এত ফারাক। ধরো, তোমার বিজনেসের স্বার্থে একটা বিরাট পার্টিকে

তোমাকে এনটারটেইন করতে হবে, তোমাকে খাওয়াতে হবে। তার কাছ থেকে তুমি দেড় কোটি টাকার কাজ আদায় করে নেবে। সেখানে যদি সেই পার্টি তোমায় হুইস্কি অফার করে, তুমি কি তাকে বলবে তুমি হুইস্কি খাও না? তা বললে কিন্তু তোমার কার্যসিদ্ধি হবে না। ইচ্ছে না থাকলেও তোমাকে মুখ চোখ নাক টিপে হুইস্কি গিলতে হবে। এরই নাম হচ্ছে 'বিজনেস্ অনেস্টি'—

তারপর মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন আর একটা কথা। ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দেওয়া দুটোই তো বেআইনী। বেআইনী নয়?

—হ্যাঁ—

—কিন্তু তোমার বিজনেসের স্বার্থে তোমায় ঘুষ তো দিতেই হবে। ঘুষ না দিলে এখনকার পৃথিবীতে তুমি অচল। জানো তো, এই সেদিন জাপানের প্রাইমমিনিস্টার তানাকা'র চার বছরের রিগারাস ইম্প্রিজ্নমেন্ট হয়ে গেল, তার সঙ্গে দু'কোটি ডলার ফাইন—জানো?

সৌম্য বললে—না।

—সে কী? তুমি খবরের কাগজটাও পড়ো না? সকাল ন'টা পর্যন্ত পড়ে পড়ে তুমি ঘুমোবে তাহলে আর এ-সব জানবে কী করে? খবরের কাগজটা পড়বে। ওটাও একটা এডুকেশন। তানাকা'র আগে কি আর কোনও জাপানের প্রাইমমিনিস্টার ঘুষ নেয়নি? নিয়েছে, কিন্তু ধরা পড়েনি, এইটেই যা তফাৎ। ঘুষ এমন ভাবে নিতে হবে আর এমন ভাবে দিতে হবে যাতে ধরা না পড়ো। এখন সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা অফিসিয়াল ঘুষ নেয়। ঘুষ না নিলে কোনও কাজ হাসিল হবে না—এইটে জেনে রাখো—

হঠাৎ মুক্তিপদর কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলেন—এ-সব কথা তোমার শুনতে ভালো লাগছে তো? ঠিক করে বলো—

সৌম্যর এ-সব শুনতে ভালো লাগছিল না। তবু বললে—হ্যাঁ, ভালো লাগছে—

মুক্তিপদ বললেন—না থাক, আজকে এ-সব কথা থাক, পরে তুমি কাজ করতে করতে নিজেই সব বুঝতে পারবে—কিন্তু আর একটা কথা বলি, একটা কাজের কথা—

সৌম্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো।

মুক্তিপদ বললেন—তোমার বিয়ের কথা। দেখ, বিয়েটাও আজকাল একটা বিজনেস্। তুমি হয়ত কথাটা বিশ্বাস না করতেও পারো। কিন্তু ফ্যাক্ট্ ইজ্ ফ্যাক্ট্। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তোমাকে তো একদিন বিয়ে করতেই হবে, তা কী রকম বিয়ে তুমি করতে চাও? বিজনেসওয়াইজ-ম্যারেজ না ইমোশন্যাল ম্যারেজ? তোমায় খুলেই বলি তাহলে—আমাদের একটা পার্টি আছে যারা মিড্ল ইস্টে একটা প্রায় পাঁচশো কোটি ডলারের মত অর্ডার সিকিওর করেছে। তাঁর একটা ভালো সুশ্রী মেয়ে আছে। আমি চাই তোমার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোক, যাতে আমাদের ফার্ম অন্ততঃ সেই অর্ডারের একটা পোরশান পেয়ে যাবে। তার মানে দেড়শো কোটি ডলারের মত প্রফিট্ হবেই আমাদের। যদি এই সামান্য বিয়েটা করলেই আমাদের দেড়শো কোটি টাকার মত প্রফিট্ হয়, সে-প্রফিটের ভাগ তো তুমিও পাবে। হোয়াট ডু ইউ থিংক? এ—সম্বন্ধে তুমি কী মনে করো? প্ল্যানটা কেমন? তুমি কি এটা অ্যাপ্রুভ করো?

বলে সৌম্যর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মুক্তিপদ। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর বললেন—অল্‌রাইট্, এখনই তোমাকে এর রিপ্লাই দিতে হবে না। তুমি একটু ভাবো। তুমি তো এখন থেকে রোজই অফিসে আসছো। তার মধ্যে ভালো করে ভেবে একটা উত্তর দিও তাড়াহুড়ো নেই তেমন—

ততক্ষণে আফ্টারনুন টি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিপদ উঠে দাঁড়ালেন এবার, তাঁর অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে এরই মধ্যে। টাকার শেকল দিয়ে তাঁর জীবনের সব ঘণ্টাগুলো বাঁধা। রাতটাও টাকার কথা ভাবতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু আজকাল না ঘুমোলে তাঁর কষ্ট হয়। সকালবেলা মাথাটা ঝিম-ঝিম করে, তাই ইচ্ছে না থাকলেও শোবার আগে তাঁকে ড্রাগ খেতে হয়। জেগে থাকতে পারলে মুক্তিপদ আরো কয়েক কোটি ডলার উপার্জন করতে

পাবতেন। কিন্তু ডাক্তাবেব নিষেধ আছে। ডাক্তাব বলেছে টাকাব চেযে জীবন বড। কিন্তু সত্যিই কি তাই?
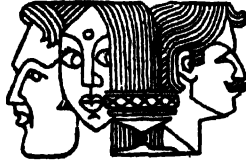
অথচ সবাই তো টাকাব পেছনেই দৌডাচ্ছে। শুধু একলা গোপালেব কী দোষ। ওই স্যাক্সবি মুখার্জি এ্যান্ড কোং ইন্ডিয়া লিমিটেডেব ম্যানেজিং ডাইবেক্টব মুক্তিপদ মুখার্জিব সঙ্গে বেডাপোতাব গোপালেব কি কিছু তফাৎ আছে? হয টাকাব আব নয তো ক্ষমতা। আব টাকা মানেই তো ক্ষমতা। যে-লোকটা কলকাতা শহবেব বুকে নাইট-ক্লাব চালায সেও তো টাকাব জন্যেই তা চালাচ্ছে। টাকা উপায কববাব জন্যে মুক্তিপদ মুখার্জি যা কবছে, নাইট ক্লাবেব মালিকও মেযেমানুষ আব মদ নিযে সেই একই কাজ কবছে। বদনাম শুধু নাইট ক্লাবেব মালিকদেব। আব বদনাম শুধু তপেশ গাঙ্গুলীবাবুদেব মত মানুষদেব।

সাত নম্বব মনসাতলা লেনেব বাডিতে সেই দিন থেকেই শুরু হযেছিল ব্রত-উদযাপন। আগে গঙ্গাব বাবুঘাটে গিযে একলা বিশাখাই ব্রত কবতো, তাব পব থেকে আব অত কষ্ট কবতে হয না যোগমাযাকে। এখন তাব ওপবে ভাব পডেছে বাডিতেই ব্রত কবানোব। ব্রত একসঙ্গে বিজলী আব বিশাখা কবে। ব্রত কবতেও কিছু খবচ আছে। যত সামান্য খবচই হোক সেটা তো খবচই বটে। অন্য কোনও খবচেব ব্যাপাব হলে ছোট-জা'ব শবীব খাবাপ হতো, গা ম্যাজম্যাজ কবতো, মাথা ঝিম-ঝিম কবতো, কত বকম বাযনাক্কা হতো। কিন্তু এতে তাব স্বার্থ আছে। বিশাখাব মত বিজলীব জন্যেও যদি একটা শাঁসালো পাত্র পাওযা যায তাহলে সব খবচই তখন সব সার্থক হযে উঠবে।

যোগমাযা শেখায আব বিজলী, বিশাখা দু'জনেই মা'ব কথামত আবৃত্তি কবে যায—

সীতাব মত সতী হবো
বামেব মত স্বামী পাবো
দশবথেব মত শ্বশুব পাবো
কৌশল্যাব মতো শাশুডী পাবে।
লক্ষ্মণেব মত দেওব পাবো
দুর্গাব মত সোহাগী হবো
অন্নপূর্ণাব মত বাঁধুনী হবো
কুন্তীব মত মা হবো
গঙ্গাব মত শীতল হবো
লক্ষ্মীব মত আদবিণী হবো
শচীব মত ইন্দ্রাণী হবো।
ভক্তি-ভবে পূজি আমি দেবেব চবণ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবো দেব-দেবীগণ।

সকাল থেকে স্নান কবে চাল বাটাব পিটুলিতে ভগবতীব পা, হবিব পা, মহাদেবেব পা এঁকে তাদেব পা পূজো কবে দু'জনে। যোগমাযা বলে—এই ব্রত কবাব পব খাবে। খালি পেটে উপোস কবে এই ব্রত কবতে হয—তা জানো তো?

বিজলী নতুন ব্রত কবছে। জিজ্ঞেস কবে—এ ব্রত কবলে কী হয বডমা?

যোগমায়া কিছু বলবার আগেই বিশাখা গড় গড় করে মুখস্থ বলে যায়—এটা করলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়, বাপের বংশ উজ্জ্বল হয়, ভালো বরে ভালো ঘরে বিয়ে হয়...

ক'দিন ধরে এমনিই চলছিল, হঠাৎ সেদিন সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই বিজলী ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—কে?

কে আর, নিশ্চয় বাবা। তপেশ গাঙ্গুলী বাজারে গেছেন, তিনিই হয়ত বাজার থেকে ফিরছেন। দরজা খুলে দিতেই কিন্তু বিজলী অবাক। দেখে সেদিনের সেই বুড়োটা আর তার পেছনে সেই সুন্দর ছেলেটা। সে দৌড়ে ভেতরে গিয়ে বললে—বড়মা, বিশাখার শ্বশুরবাড়ি থেকে সেই তারা এসেছে, সেই বুড়োটা আর সেই সুন্দর ছেলেটা—

রাণীর কানে কথাটা গেছে। কানে যেতেই বললে—কে এসেছে রে?

বিজলী আবার সেই একই কথাটা বললে—বিশাখার শ্বশুরবাড়ি থেকে বুড়োটা আর সেই সুন্দর ছেলেটা—

রাণীর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—তোর বড়মা'কে ডেকে দে। বল্ বাবা বাড়ি নেই, বাজারে গেছে—বড়মাকে দেখা করতে বল্ গে—

যোগমায়া ঘরের কাছে এসে বললে—আমি কী করে যাই দিদি—

রাণী বললে—তোমার কুটুম-বাড়ির লোক এসেছে, তা তুমি যাবে না তো কি আমি যাবো? আমার দায় পড়েছে যেতে—

যোগমায়া বললে—ঠিক আছে, আমিই যাই—

বলে ময়লা কাপড়টা বদলাবার জন্যে ভেতরে গেল। আর ঠিক সেই সময়েই তপেশ গাঙ্গুলী মশাই বাজারের থলি নিয়ে ঢুকছেন।

দু'জনকে দেখে তপেশ গাঙ্গুলী মশাইয়ের মুখে এক গাল হাসি।

—আরে, আপনারা এসে গেছেন? কী ভাগ্যি আমার। বসুন-বসুন, ভেতরে এসে বসুন। আমি বাজারে গিয়েছিলুম। ওরে, কোথায় রে সব? ও বউদি, চা করো, চা করো। মুখুজ্জে-বাড়ির সব লোকেরা এসে গেছেন—

বলে ভেতরে বাজারের থলেটা ফেলেই বাইরে চলে এসেছেন। বললেন—তা কী খবর বলুন? আপনাদের ঠাক্‌মা-মণি ভালো আছেন তো?

মল্লিক-মশাই বললেন হ্যাঁ, ভগবানের আশীর্বাদে তিনি ভালো আছেন, আজকে একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এলাম। ঠাক্‌মা-মণি একবার বিশাখা আর তার মা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাদের বাড়িতে—

—আপনাদের বাড়িতে? ডেকে পাঠিয়েছেন?

—কেন, হঠাৎ?

মল্লিক-মশাই বললেন—তা কী করে বলবো বলুন? আমরা তো হুকুমের চাকর। ঠাক্‌মা-মণি বললেন অনেক দিন থেকে বউমাকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর। সেই গুরুদেব আসার সময় যা একটু দেখেছিলেন। তাই একবার বউমাকে দেখবার ইচ্ছে হয়েছে তাঁর—

—তা বিশাখাকে না-হয় নিয়ে যান বউদিকে আবার কেন নিয়ে যাওয়া?

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠাক্‌মা-মণি বলে দিয়েছেন, বিশাখা ছোট্ট মেয়ে, তাই তার সঙ্গে তার মা'কেও নিয়ে যেতে বলেছেন। আজকে দুপুর বেলা ওঁরা দুজনেই খাবেন।

তপেশবাবু বললেন—কিন্তু তা'হলে এ-বাড়ির রান্না-বান্নার কাজ রয়েছে যে, সে সব কাজ কে করবে?

মল্লিক-মশাই হঠাৎ এক-কথায় এর উত্তর দিতে পারলেন না শুধু বললেন—দেখুন, আমার ওপর যা হুকুম হয়েছে তাই-ই আপনাকে বললুম। ওঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাই গাড়িও এনেছি সঙ্গে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ঠিক আছে, আমি ভেতরে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসি—

বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু ভেতরে রাণীর কাছে গিয়ে দেখলেন তার মুখ গম্ভীর, প্রস্তাবটা তার কাছে তুলতেই রাণী বললে—তা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি কে? যাকে নিয়ে যেতে ওরা এসেছে, তাকে গিয়ে বলো গে—

ওদিকে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে তপেশবাবু বললেন—কই বউদি, তুমি শুনেছ? তোমাকে আর বিশাখাকে নিয়ে যাবার জন্যে ওদের লোক এসেছে, শুনেছ তুমি? ওখানে বিশাখার আর তোমার নেমন্তন্ন, ওখানেই তোমরা খাবে। তোমাদের জন্যে গাড়ি এসেছে—

যোগমায়া শুনতে [illegible] শুনতে পেলে না, [illegible] বললেন. বউদি, আমি [illegible] তুমি শুনতে [illegible]।

যোগমায়া বললে— আমি যাবো না [illegible] কাজ আমি [illegible] সব কে সামলাবে?

বিশাখাও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে বলে উঠলো—মা, আমি যাবো, ওরা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে—

যোগমায়া বললে— থাম্ তুই মুখপুড়ী, থাম্—

তারপর দেওরকে উদ্দেশ্য করে বললে—তুমি বলে দাও ওদেব ঠাকুরপো, আমার যাওযা হবে না, আমার মেয়েও যাবে না

রাণী আর থাকতে পারল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঝড়ের বেগে। বললে—তুমি যাবে না কেন বড়দি? তোমার হবু কুটুমের বাড়ি না গিয়ে তুমি আমাদের মুখে চুন কালি লাগাবে, এই বুঝি তোমার মতলোব? আমাদের ওপর যদি তোমার এতই হিংসে তাহলে এই তোমার সামনেই আমি গাল পেতে দিচ্ছি লাগাও, লাগাও না। তোমার যত ইচ্ছে চুন কালি লাগাও এই গালে, আমি কিছ্ছুটি বলবো না, লাগাও

বলে নিজের মুখটা রান্নাঘবের দিকে বাডিয়ে দিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরাবী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিনিসটা তপেশ গাঙ্গুলীরও বোধ করি একটু দৃষ্টিকটু লাগলো, তাই বললে—আঃ, কী যে করো তুমি—

রাণী স্বামীর দিকে চেয়ে ফণা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে—থামো. তুমি কেমন ধারা পুরুষমানুষ তা আমার বেব দেখা আছে। কাছা দিয়ে কাপড পরলেই পুরুষ মানুষ হয় না। বিযেব নামে টুঁ-টুঁ কুলোপানা চক্কর

তপেশ গাঙ্গুলীর অন্য যে রকমের বদনামই থাক তার চরম শত্রুও এমন বদনাম দেবে না যে তিনি বড় বদরাগী মানুষ। কিন্তু তিনিও স্ত্রীর কথার উত্তরে বললেন—ঠিক আছে, আমি তাহলে ওদের ওই কথাই বলি গিয়ে যে ওরা যেতে পাবে না—

কিন্তু স্ত্রী তাতেও বাধা দিলে। বললে—যাও যাও, তুমি তাই বলো গে, আমাকে অপমান করে যদি তোমার মান-সম্মান বাড়ে তো তাই করো গে, আমি আর কিছু বলবো না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তা হলে কী করবো তা তো বলবে?

রাণী বললে—তুমি ওদের কী বলবে তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? তাহলে তুমি বেটাছেলে হয়েছিলে কী জন্যে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—এ তো আচ্ছা জ্বালা হলো দেখছি! আমি কি বলবো তাও তুমি বলে দেবে না, আবার আমার মর্জিমত কাজও তুমি করতে দেবে না।

—তা তুমি কি কচি খোকা যে আমি তোমাকে কথা বলতে শিখিয়ে দেব? তুমি জানো না কী কথা বললে গেরস্তর মান থাকে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমিই বলে দাও না কী বললে গেরস্তর মান থাকে!

রাণী বললে—তাহলে তুমিই বাড়ীর ভেতরে বসে ঘর সংসার সামলাও আর আমি কোট-প্যান্ট পরে আপিসে যাই—

তপেশ গাঙ্গুলী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই যোগমায়া বললে—না ঠাকুরপো, তুমি ওদের বলে দাও আমরা এখন যেতে পারবো না—

বিশাখা বলে উঠলো—না মা, আমি যাবো—

যোগমায়া মেয়ের মাথায় সজোরে এক ঘুঁষি মেরে বললে—মর মুখপুড়ী মর তুই—

বিশাখা মার হাতে আঘাত খেয়েই রোয়াক থেকে নিচের উঠোনের ওপর ছিটকে পড়ে গিয়ে চিৎকার কবে কেঁদে উঠলো। যোগমায়া তখনও তাকে সমানে গালাগালি দিচ্ছে—কাঁদ, আরো জোরে কাঁদ, কেঁদে কেঁদে পাড়ার লোক জড়ো কব। পাড়ার লোক এসে দেখুক আমার পেটে কী শয়তান জন্মেছে—

রাণী এক নিমেষে উঠোনে নেমে বিশাখাকে দুই হাতে ধরে ফেলেছে। কিন্তু ততক্ষণে বিশাখার কপাল ফেটে টস-টস করে রক্ত ঝরে পড়ছে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কী সব্বোনাশ, এখ্‌খুনি একটু টিনচার-আইডিন লাগিয়ে দাও ওখানে—শীগ্‌গির করো—

রাণী বিশাখাকে ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে স্বামীকে বললে—দেখলে তো, তোমার নিজের চোখেই তো দেখলে, রাক্ষুসী মায়ের কাণ্ডটা,—আমার কথা তো তোমার বিশ্বাস হয় না—

তারপর বিশাখাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললে—কাঁদিস নে তুই, থাম্, তোরও যেমন কপাল, অমন রাক্ষুসী মায়ের কাছে কেন যাস তুই? আমার সঙ্গে আয়—

তারপর ঘরের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বললে—ওগো, এদিকে একটু এসো তো, আমার বাক্স থেকে একটু তুলো বার করে দাও তো—

যোগমায়া তখনও সেই রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। টিন্‌চার আইডিনের জ্বালায় বিশাখা তখন আরো জোরে চেঁচাচ্ছে। সে যত চেঁচাচ্ছে যোগমায়া যেন যন্ত্রণায় তত আরো কাঠ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ রাণী এসে যোগমায়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো যে বড়? কী ভাবছো? দেওরের মুখে চুন-কালি লাগাতে না পারলে বুঝি তোমার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না? যাও, শীগ্‌গির মুখ হাত পা ধুয়ে নিয়ে পরনের ময়লা থানটা বদলে নাওগে, আর মেয়েটাকেও মাথার চুল-টুল আঁচড়ে একটা ফরসা জামা পরিয়ে দাও।

রাণী আবার বললে—কি হলো? কানে কথা যাচ্ছে না বুঝি? মেয়ের মাথায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েও তোমার হুঁশ হচ্ছে না? তুমি কি মা, না রাক্ষুসী? মেয়েকে যদি মেরে ফেলতেই তোমার এত সাধ তো আমার চোখের সামনে আমার প্রাণ থাকতে আমি তা করতে দেবো না—এই তোমায় আমি বলে রাখলুম—মেয়েকে খুন করতে হয় তো অন্য কোথাও গিয়ে তা করো—এ-বাড়িতে কিছুতেই নয়—

যোগমায়া তখনও সেই কথা, বললে—ওদেব বাড়িতে আমি যাবো না—

রাণী বললে—আচ্ছা দিদি, বলতে পারো আর কত কষ্ট দেবে তুমি আমাকে? নিজের বাড়ির মধ্যে তুমি যা করো তা করো, কিন্তু কুটুম-বাড়ির চোখের সামনে আমাদের বে-ইজ্জৎ না করলে কি তোমার চলছে না? আমার তো মাত্তোর দুটো হাত, এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তলোয়ার, আমি কোন্ হাতে লড়বো? আমি কি তোমার পায়ে ধরবো বলতে চাও? চাও তো বলো আমি তাই-ই ধরি—

বলে ঝপ্ করে রাণী নিচু হয়ে যোগমায়ার পা জোড়া ছুঁতে যাচ্ছিল—কিন্তু যোগমায়া তার আগেই রাণীর হাত দুটো ধরে ফেলেছে। বললে—ছিঃ করো কী?

বেশ, তাহলে বলো যাবে?

যোগমায়া বললে—কিন্তু ঠাকুরপোর আফিসের ভাত—সংসারের কত কাজকর্ম—

রাণী বললে—দিদি আমি তো মরিনি এখনও! মরলে তুমি কি একটা খবর পাবে না বলতে চাও?

যোগমায়া বললে—ও-কথা মুখে বলতে নেই দিদি, ছিঃ—
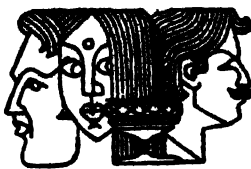
সন্দীপের সব কথা মনে আছে। কিছুই ভুলতে পারে না সে। কে তাকে ভালোবেসেছে, কে তাকে ভর্ৎসনা করেছে, কে তাকে ঠকিয়েছে, কে তাকে সহানুভূতি দেখিয়েছে, কে তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, কে তাকে অবহেলা করেছে, সব মনে আছে তার। এত মনে রাখা কি ভালো? কিন্তু কেন তার মনে থাকে? কেন সে ভুলতে পারে না?

সেদিন ঠাক্‌মা-মণি বিশাখার মাকে যা যা কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, যোগমায়া দেবী যা যা উত্তর দিয়েছিলেন তাও সন্দীপের মনে আছে। মৃত্যুকে কেউ মনে রাখে না, মেঘকেও কেউ মনে রাখে না, জীবনকেই মনে রাখে, সূর্যকেই মনে রাখে। মৃত্যুকে মনে রাখে না বলেই জীবন আজো এগিয়ে চলেছে। এত মিথ্যে, এত ঘৃণা, এত ভর্ৎসনা, এত যন্ত্রণা, অবহেলা সত্ত্বেও তো সন্দীপ যার শুরু দেখতে পেয়েছিল তার শেষ দেখতে পারছে। মানুষের যে এই দেহ, তার মানে এই নরদেহ, যে দেহটা নিয়ে এত মান, এত অভিমান, এত অহঙ্কার, এত বিবাদ, এত কলহ, এত সমস্যা, সে সব কিছুতো একদিন আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবু কি মান অভিমান অহঙ্কার বিবাদ কলহ সমস্যা থেমে গেছে?

কিন্তু সেই তখন তো সন্দীপ এত জানতো না, এত বুঝতো না তাই তখন যা কিছু সে দেখেছে তাতেই সে অবাক হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময় নিয়েই সে তখন জীবন পরিক্রমা করেছে। জীবন পরিক্রমা কবতে একদিন বেড়াপোতা থেকে নদী হয়ে বেরিয়ে আজ এত দিন এত বছর পেরিয়ে সে সমুদ্র হয়ে উঠেছে।

ঠাক্‌মা-মণি জীবনে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে করে ভেবেছিলেন তিনি সব যন্ত্রণার অতীত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি হয়ত জানতেন না যে সুখের শেষ একদিন থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু যন্ত্রণার কখনও শেষ নেই। জীবনের শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে মানুষের বোধকে পেছুতাড়া করে চলে।

ঠাক্‌মা-মণি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলেন—কপালে তোমার কী হয়েছে বউমা?

যোগমায়া কিছু বলার আগেই বিশাখা বলে উঠেছিল—আমার মা মেরেছে—

—সে কী? কেন মা তুমি ওকে মেরেছিলে কেন?

যোগমায়া বললে—বড্ড দুষ্টুমি করে যে ও—বড্ড দুষ্টু—

বিশাখার দিকে চেয়ে ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি দুষ্টুমি করেছিলে?

বিশাখা বলে উঠলো—না আমি দুষ্টুমি করিনি—

যোগমায়া ধমক দিলেন মেয়েকে—তুমি দুষ্টুমি করে আবার এখন বলছো দুষ্টুমি করোনি? তুমি দুষ্টুমি না করলে আমি কি মিছিমিছি মেরেছি তোমাকে?

বিশাখা প্রতিবাদ করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বললে—বারে, আমি কখন দুষ্টুমি করলুম? তুমিই তো কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে।

—কাকীমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করছিলুম তো তাতে তোমার কী?

ঠাক্‌মা-মণি যোগমায়ার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার জায়ের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয় বুঝি?

যোগমায়া কিছু বলার আগেই বিশাখা বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমার মা'র সঙ্গে কাকীমার রোজ ঝগড়া হয়।

যোগমায়া মেয়েকে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠাক্‌মা-মণি তার আগেই তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—ও কচি মেয়ে, ওকে কেন বকছো মা তুমি? ও রকম ঝগড়া সব বাড়িতেই হয়। ননদ-জায়ে, জায়ে-জায়ে ঝগড়া কোন্ বাড়িতে হয় না তাই বলো তো? আমার বাড়িতেও তো ঝগড়াঝাটি হতো—

যোগমায়া কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তুমি বুঝি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছো মা?

যোগমায়া বললে—আপনারা কত বড়লোক...

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—গবীব বড়লোক নেই মা, ঝগড়ার ব্যাপারে গরীব বড়লোক বলতে কিছু নেই। বড়লোকদের বাড়িতেই তো বেশি ঝগড়াঝাঁটি। আমার মেজবউমার সঙ্গেও আমার অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। শেষে বাড়ি করে আলাদা হয়ে যাবার পর এখন বেঁচেছি। আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে। তাদের সঙ্গে এখন আমার আর কোনও সম্পর্কই নেই—এই তো আমার অবস্থা—

খানিক থেমে আবার ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা যাক গে বাজে কথা। তোমরা খেয়ে নাও—

খাবার বোধহয় অনেক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মল্লিক-মশাই তাদের পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঠাক্‌মা-মণিও তাদের সামনে গিয়ে বসলেন। বহুদিন পরে বিশাখা এমন খাবার চোখে দেখলে।

খেতে বসেই বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—মা, দেখেছ এরা লুচি দিয়েছে—

যোগমায়া বললে—কথা বোল না, চুপ করে খাও—

বিশাখা বললে—আমি কিন্তু অনেক লুচি খাবো—

যোগমায়া ধমক্ দিয়ে উঠলো, বললে—বলছি, কথা বলতে নেই।

কথাটা কানে গেল ঠাক্‌মা-মণির। বললেন—তুমি যত লুচি নেবে তত লুচি দেবে লজ্জা করে খেও না। আরো লুচি নেবে তুমি?

বিশাখা বললে—আমি লুচি খেতে খুব ভালোবাসি—

—তা বেশ তো, ঠাকুর, আমার বউমাকে আরো চারখানা লুচি দিয়ে যাও তো—

ঠাক্‌মা-মণির কথা অনুযায়ী আরো লুচি এল। যোগমায়া গলা নিচু করে মেয়েকে বললে—ছিঃ, তুমি অত হ্যাংলা কেন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তুমি ওকে অত বকছো কেন মা? ও তো এ-বাড়িরই লোকের মত, পেট ভরে খাক্ না—

বিশাখা বলে উঠলো—আমাদের বাড়িতে রোজ লুচি হয়, আমাকে একদিনও খেতে দেয় না। আমাকে মা কেবল রুটি দেয়—

—কেন তোমাকে রুটি দেয় কেন?

বিশাখা বললে—লুচি খেতে চাইলে মা খালি বলে—ও তোমার খেতে নেই, যত লুচি হয় সব বিজলী খায়—লুচিও দেয় না, মাংসও দেয় না, রাবড়িও দেয না, সন্দেশ রসগোল্লা কিছ্ছু দেয় না। ঘি দিয়ে মেখে ভাত খেতে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু মা আমার ভাতে ঘি দেয না—

কথাগুলো শুনে ঠাক্‌মা-মণির মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। যোগমায়ার দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কেন মা? তুমি আমার বউমাকে মাছ-মাংস-ঘি-দুধ-রাবড়ি কেন খেতে দাও না?

বিশাখা বললে—আমি কতবার খেতে চেয়েছি, মা একবারও খেতে দেয় না—

—কেন মা? তুমি আমার বউমাকে ও-সব খেতে দাও না? আমি তো মাসে-মাসে টাকা পাঠাই বউমা'র জন্যেই, কেন দাও না খেতে?

বিশাখা বলে উঠলো—ওসব টাকা দিয়ে কাকীমা গয়না গড়ায়!

—গয়না গড়ায়? তোমার কাকীমা? সে কী?

যোগমায়ার মাথা তখন আরো নিচু হয়ে গিয়েছে। সে যেন তখন মাটির তলায় তলিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলেই বেঁচে যেত, এমনি করুণ তার মুখের ভাব!

ঠাক্‌মা-মণি মল্লিক-মশাই-এর দিকে চাইলেন। বললেন—সরকারমশাই, আমি এ-সব কী শুনছি এদের মুখে! আপনি এতদিন ধরে ও-বাড়িতে যাচ্ছেন, এ-সব কথা তো আমার কানে একবারও তোলেন নি! আমার টাকা কি এতই সস্তা? আমার টাকা দিয়ে যে ওরা ভূত-ভোজন করাচ্ছে তা তো কই কেউ আমাকে বলে নি! প্রত্যেক বার আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলুম—বউমাকে কেমন দেখলেন জিজ্ঞেস করে এসে আমাকে বলবেন, তা তো আপনি আমাকে জানান নি! আপনি তো প্রতিবারই আমাকে এসে বলেছেন—হ্যাঁ, বউমা ভালো আছে। তা এই কি ভালো থাকার নমুনা? এখন এ-সব কী শুনছি? এসব কথা বউমা আমাকে বলছে কেন? বউমা না-বললে তো কিছুই আমার কানে আসতো না—

তারপর একটু থেমে সন্দীপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আর তুমি?

সন্দীপ এতক্ষণ এই ভয়ই করছিল। সে এবার থর-থর করে কাঁপতে লাগলো।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আর তুমি? তুমিও তো এই নিয়ে দু-দুবার গেলে, তুমিও তো কিছু বলো নি আমাকে! তাহলে তোমাদের কেন পাঠানো বউমাদের বাড়িতে? তোমরা কি তাহলে ওদের ওখানে হাওয়া খেতে যাও নাকি? এই খবরগুলো যদি না আনতে পারো তাহলে মণি-অর্ডারে টাকা পাঠালেই পারতুম! তোমাদের যাতায়াতের ভাড়াও তো আমাকেই গুনতে হয়! কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? বলো, কী বলবার আছে তোমার। বলো—

বিশাখা মাঝখান থেকে বলে উঠলো—আমি ওকে বলেছি—

ঠাক্‌মা-মণি বলে উঠলেন—কী বলেছ? কাকে বলেছ?

বিশাখা সন্দীপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই ওকে।

—ওকে মানে? ওই সন্দীপকে?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

ঠাক্‌মা-মণি সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলেন—কী? তোমাকে বলেছে বউমা?

আগে থেকেই সন্দীপ থর-থর করে কাঁপছিল। এবার সে আরো ভয় পেয়ে গেল। কী জবাব দেবে সে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেললে—হ্যাঁ—

ঠাক্‌মা-মণি এবার রেগে গেলেন। বললেন—সে কী? তোমাকে বউমা সব বলেছিল আর তুমি আমাকে বলো নি! এ কী-রকম ছেলে তুমি?

তারপর মল্লিক-মশাই-এর দিকে চেয়ে বললেন—এ আপনি কী রকম লোক দিয়েছেন! আপনি তো বলেছিলেন ও আপনাদের দেশের ছেলে, খুব সৎ, অভাবী! আর এই তার কাজের নমুনা—

মল্লিক-মশাই এ-কথার কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না, কিন্তু তাকে বিশাখাই বাঁচিয়ে দিলে। বিশাখা বলে উঠলো—না, আমি তা বলিনি। আমি প্রথমে বলেছিলুম আমি ঘি-দুধ-মাংস-মাছ কিছু খাই না, কিন্তু পরে বলেছিলুম—মা আমাকে ঘি-দুধ-মাছ-মাংস সব খেতে দেয়। ওই টাকা নিয়ে আমার কাকীমা গয়না গড়ায় না...

—সে কী?

ঠাক্‌মা-মণি যেন দোটানায় পড়ে গেলেন। বললেন—যাক্ গে, আমার অত কথায় দরকার নেই। ও-সব গরীব-গুবোর বাড়ির লোক, টাকা পেলে বাজে খরচা তো হবেই। তার চেয়ে এক কাজ করুণ মল্লিক-মশাই—

মল্লিক-মশাই এমনিতেই কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন—কী কাজ করবো বলুন—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আমাদের তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে না?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ। সেই মামলা করে ভাড়াটেদের উঠিয়ে দেবার পর ওটা আর ভাড়া দেওয়া হয়নি। একজন দরোয়ান আছে, সে শুধু পাহারা দেয় ওখানে—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ওটাতে আর ভাড়াটে বসাতে হবে না। মেজবাবুকে আপনি বলে দেবেন, আর মুক্তি এলে আমিও তাকে বলে দেব'খন—এর পব থেকে বউমা আর বউমার মা দু'জন ওখানেই থাকবে। যাতে আরাম কবে থাকতে পারে ওবা, তার ব্যবস্থা কবে দিন—

মল্লিক-মশাই বললেন—তাহলে ফ্ল্যাটটায তো একবাব কলি ফেবাতে হবে—

—তা তো ফেরাতে হবেই—যা টাকা লাগে তা ক্যাশ থেকে নিন—

মল্লিক-মশাই বললেন—কিন্তু শুধু তো কলি ফেরালেই চলবে না। জানলা-দবজাগুলোতে বংও লাগাতে হবে—

—তা লাগান।

মল্লিক-মশাই বললেন—তা ছাড়া ও'বা শোবে কোথায়? তাব জন্যে দু'খানা খাটও দরকার। আব আলমারি ড্রেসিং টেবিল, চেযাব, টেবিল থেকে আবম্ভ কবে সংসাবেব সমস্ত কিছুই লাগবে—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—যা লাগবে তা তো কবতেই হবে। ওবা তো আব দেওবেব সংসাব থেকে কোনও জিনিসপত্র আনতে পাববে না, তা তাবা আনতে দেবেও না। আপনি সমস্ত বাড়িটা সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেলে তাবপবে ওদেব নিযে এসে ওখানে তুলবেন। বেশি দেরি করবেন না। একমাসের আগেই যেন ওরা সাত নম্বর মনসাতলা লেনেব বাড়ি ছেড়ে ওই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এসে উঠতে পাবে।

মল্লিক-মশাই বললেন—যে আজ্ঞে—

ঠাক্‌মা-মণি আবার বললেন—আব একটা কথা, শুধু তো বাড়ি সাজালেই চলবে না, ঝাঁট-বাট দেওয়া রান্না কবাব জন্যে তো চাকর-ঝি চাই। সে-সব ব্যবস্থাও করবেন সঙ্গে-সঙ্গে। যেন খুব বিশ্বাসী লোক হয়, চুবি-চামাবি না করে, দেখবেন। দেখছি এতদিন মাসে-মাসে মোটা টাকা একেবাবে নিছক জলে চলে গেছে—কপালে লোকসান থাকলে কে খণ্ডাবে. .

ততক্ষণে বিশাখাদেব খাওযা-দাওযা হযে গেছে।

ঠাক্‌মা-মণি মল্লিক-মশাইকে বললেন—যা-যা বললুম সব কথা মনে বাখবেন। যেন ভুলবেন না—এবাব এদের গাড়ি কবে বাড়িতে পৌঁছিযে দিন গিযে—যান—

যোগমায়াব তখনও যেন মনেব ঘোব কাটেনি। যোগমাযা কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—এসো মা এসো, এতক্ষণ আমাব সবকাবকে যা বললুম সব শুনলে তো? এবার থেকে বউমাকে ভালো-ভালো জিনিস খাওয়াবে। মাছ-মাংস-দুধ দই-ঘি। আর যেন রুটি খাইও না বউমাকে। বউমাকে লুচি করে দেবে—যাও মা, এবাব যাও—

যোগমায়ার মুখে তখন কথা আটকে গেছে। তাব চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়তে শুরু করেছে। বিশাখাকে নিয়ে মল্লিক-মশাই-এব পেছন-পেছন সিঁড়ি দিযে নিচের দিকে নামতে লাগলো...
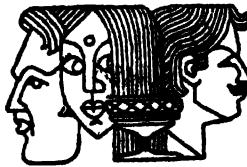
সন্দীপ তখন ছোট। ছোট হলেও খুব ছোট নয, সে তখন ভালো-মন্দ, গুণ-দোষ, গরীব-বড়লোক, পুণ্য-পাপ সব কিছু বুঝতে শিখেছে। ইস্কুলের অন্য ছেলেরা যখন ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকতো, সে তখন হয় একলা একলা কাশীবাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের লাইব্রেরীতে গিয়ে যে-কোনও একটা বই নিয়ে তাতেই মত্ত হয়ে থাকতো। তারপর মা যখন ওদের বাড়ির কাজকর্ম সেরে

ভাত-তরকারী নিয়ে বাড়ি আসতো তখন সন্দীপও তার সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে চলে আসতো। তখন দু' জনেই একসঙ্গে সেই ভাত-তরকারী খেত।

মা জিজ্ঞেস করতো—কী রে, বাবুদের বাড়িতে অত সব কী পড়িস? ইস্কুলের পড়ার বই?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ—

শুনে মা খুব খুশী হতো। ছেলে লেখাপড়া শিখে চাটুজ্জেবাবুদের মত বড়লোক হবে, ওদের মত ছেলের বাড়ি হবে, ওদের মত গাদা গাদা টাকা রোজগার করবে, ওদের কাশীবাবুর মত উকিল হবে, এর চেয়ে বেশী সুখ আর কী চাই মা'র। শুধু মা'র একটা কামনা এই যে যেন বেঁচে থেকে সেই সুখ, সেই ঐশ্বর্য দেখে যেতে পারে।

মা ছেলের উত্তর শুনে বলতো—হ্যাঁ বাবা, তাই করো, লেখাপড়া করে চাটুজ্জেবাবুদের মত বড়লোক হও।

সন্দীপ সে কথার কোন জবাব দিত না। আসলে সে যে ইস্কুলের বই না পড়ে অন্য আলাদা বই পড়তো তা মা জানতো না।

—আর দেখ বাবা, তুমি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশবে না।

—কোন্ ছেলেটার কথা বলছো?

—ওই যে, ওই ছোঁড়াটা, হাজরা বুড়োর বখাটে ছোঁড়াটা, গোপাল না কী যেন নাম। ওর সঙ্গে তোমার কীসের এত ভাব? ও কি তোমায় রাজা করবে?

মা তো জানতো না যে পৃথিবীতে শুধু মন্দ নেই ভালোও আছে। ভালো-মন্দ গরীব-বড়লোক আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর এত বিচিত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মানুষ ঐক্য খুঁজে পায় সেই মানুষই তো মহৎ মানুষ। এখানে গোপালও থাকবে, কাশীবাবুও থাকবে, সৌম্যবাবুও থাকবে, মল্লিক-মশাইও থাকবে, তপেশ গাঙ্গুলীও থাকবে। সকলের মধ্যে এক কণাও যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবে সেই এক কণা মনুষ্যত্বের দাম দিতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে, তবেই তুমি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার পাবে।

কাশীবাবু একদিন একখানা বই এগিয়ে দিলেন। বললেন—এই বইটা পড়েছ?

সন্দীপ চেয়ে দেখলে একটা চটি বই। মলাটের ওপর বইটার নাম লেখা রয়েছে—'ঈশোপনিষদ'।

ভেতরে সংস্কৃত শ্লোক, তার নীচে সংস্কৃত শ্লোকের বাঙলা অনুবাদ। দেখলে একটা জায়গায় লেখা আছে—'নচিকেতা যমকে বলিয়াছিলেন— হে যমরাজ, আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তুসমূহ কাল পর্যন্ত থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত। অধিকন্তু এ সমস্তের ভোগ মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজ নষ্ট করে। জীবনও ক্ষণস্থায়ী। অতএব অশ্ব, রথ, নৃত্যগীতাদি যাহা দিতে চাহিতেছেন তাহা আপনারই থাকুক।'

তখন কথাগুলোর মানে বোঝেনি সন্দীপ। কিন্তু এখন এই বয়সে এসে তার মনে হচ্ছে ওই কথাগুলোর মত সত্যি কথা আর বোধহয় কোথাও লেখা হয়নি, কখনও লেখা হবেও না। এখানে না এলে এই বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে না থাকলে কি সে কথাগুলোর মানে এমন প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারতো?

আশ্চর্য যে সেদিনই ঠাক্মা-মণির হুকুমমত তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। জন্ম থেকে যে-বাড়িতে বিশাখা বড় হয়েছে, সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেন থেকে শেকড় তুলে নতুন বাড়িতে নিয়ে আসা কি সহজ কথা? আর শুধু তো শেকড় নয়, সেই শেকড় থেকে প্রাণরসও তো জড়িয়ে ছিল ওই পরিবেশের সঙ্গে। যে মাটির ওপর এতদিন মা মেয়ে মানুষ হয়েছিল সেই মাটিও তো এর পর থেকে পায়ের তলা থেকে সরে যাবে।

কিন্তু তার চাইতে আরো বড় বড় কথা আছে। সেগুলোর কথাও ভাবা দরকার। প্রতি মাসে বিশাখার খাওয়া-পরা, শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যেটা আসে সেটা তখন থেকে অন্যের ভোগে আর আসবে না। তখন পুরো টাকাটাই হাতে পেয়ে যাবে যোগমায়া।

জিনিসটা ভাবতে ভালোই। কিন্তু যখন প্রথম কথাটা উঠবে, তখন?

ঝড় আসবার আগে কি কেউ কল্পনা করতে পারে ঝড়ের ঝাপটায় কার কতটা সর্বনাশ হবে?

সন্দীপের এখনও মনে আছে সে সব দিনের কথাগুলো। নতুন জায়গা তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে কিছুই ছিল না। না ছিল একটা খাট আর না ছিল একটা বিছানা। সবই তো বাজার থেকে নতুন কিনতে হবে। তাই কেনাও হয়েছিল।

বাড়িটা কর্তা কিনে রেখে গিয়েছিলেন। পুরনো বাড়ি বটে, কিন্তু হলে কী হবে, খুবই মজবুত। তখনকাব দিনে বাজার দর হিসেবে সস্তাই পড়েছিল! তিনতলা বাড়ি। শুধু একতলায় কিছু ভাড়াটে থাকতো। তাও বাড়িব একতলার ঘরে নয়, চারদিকের খালি জমিতে। একটা চীনেম্যানেদের চুল-ছাঁটাই-এর দোকানও ছিল। তারা কতকাল আগে থেকে ওখানে ছিল তাও কারোর হিসেব ছিল না। বাড়িটা কেনবার পর একটা শুভ তারিখ দেখে গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত সেরে রেখেছিলেন ঠাক্‌মা-মণি। কর্তার ইচ্ছে ছিল ওখানে কোনও ব্যবসা-ট্যবসা করবেন। ব্যবসার পক্ষে জায়গাটা ভালো। ওপরের ঘরে থাকবে ম্যানেজারের কোয়ার্টার, আর দোতলায় থাকবে অফিস।

কিন্তু সে সব শেষ পর্যন্ত আর কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। কারণ তার পরেই তিনি দেহ রেখেছিলেন। আর তারপর থেকেই ওটা তালা চাবি বন্ধ পড়েছিল। একটার পর একটা দুর্বিপাকে পড়ে ঠাক্‌মা-মণির ও বাড়ির কথা মনে ছিল না।

অপ্রিয় কাজটার ভার পড়েছিল সন্দীপেরই ওপর।

কাঁদতে কাঁদতে যোগমায়া মনসাতলা লেন থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিলো তখনও সে জানতো না যে সে স্বর্গে যাচ্ছে না নরকে যাচ্ছে। শুধু যোগমায়া একলাই নয়, কেউই জানতে পারে না সেকথা। অথচ সব মানুষই তো বাড়ি বদলায়। রোজ রোজ বাড়ি না বদলালেও, জীবনে কোনও না কোনও সময়ে সব মানুষই বাড়ি বদলায়। মেয়েরাই তো বেশি বাড়ি বদল করে। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি। চিরকালের চেনা একটা বাড়িকে কেমন অনায়াসে পেছনে ফেলে রেখে শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়। আর তার পরে সেই স্বামীর বাড়িটাই একদিন কেমন চিরকালের চেনা বাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তখন বেশ সাজানো হয়েছে বাড়িটাকে। তখন আর বোঝবার উপায় নেই যে এতদিন সেটা একটা ভূতের বাড়ি ছিল।

যোগমায়ার খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বললে—বাঃ খুব ভালো বাড়িটা তো!

সত্যিই মেরামতের পর বাড়িটা দেখতে ভালো হয়েছিল। সেকালের বড় বড় ঘর। পুরনো সাহেবি আমলেব বাড়ি। কাঠের কড়ি-বরগা। সিঁড়িটাও কাঠের তৈরি, কাঠের রেলিং। নতুন রং করা হযেছিল। বিশাখা চারদিকে ঘুরে ঘুবে দেখছিল। এত বড় বাড়ি সে-ও এমন কখনও দেখেনি, তাব মা-ও দেখেনি কখনও। গরীব ঘরে জন্মেছিল বলে মনে কোনও দুঃখ ছিল কিনা কে জানে? উত্তর দিকের বাবান্দার রেলিং ধরে চারদিকের কলকাতার চেহারাটা দেখে বললে—উঃ, কলকাতা কত বড় দেখ মা—

মা-ও দেখছিল সব একদৃষ্টে।

বললে—আমার কপালে এত সুখও ছিল বাবা!

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—এই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে আমার আর মরে যেতেও কোনও দুঃখ নেই বাবা! এ সবই হলো আমার মেয়ের ভাগ্যে! বিশাখার বাবা যদি পরলোক থেকে দেখতে পান তো তাঁরও খুব আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়ই।

সন্দীপ বলেছিল—ঠাক্‌মা-মণিকে গিয়ে বলবো যে এ-বাড়ি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে—

হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা, তুমি তাঁকে বোল গিয়ে যে তিনি আমাদের যে কী উপকার করলেন তা আমি পোড়ামুখে বলতে পারবো না—

শুধু কি তাই, এত বড় বড় ঘর যে পৃথিবীতে কোনও বাড়িতে থাকতে পারে তা বোধহয় কল্পনা করতেও পারেনি বিশাখার মা। তার যেন বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছিল। যোগমায়া কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, না এই সব কিছুই তার কল্পনা!

সন্দীপ নিজেও অবাক হয়ে যাচ্ছিল বাড়িব এই সব সাজ-সরঞ্জাম দেখে। নাতবৌয়ের সুখ-সুবিধের জন্যে এত টাকা খরচ? আর তা ছাড়া এত বড় বাড়িটা এতদিন খালি পড়েই বা ছিল কেন? এমন কত হাজার-হাজার লোক কলকাতায় আছে যাবা নিজেদের একটা আশ্রয়ের অভাবে ফুটপাথে খোলা আকাশের তলায় ঘুমিয়ে রাত কাটায়, আর এই বিডন স্ট্রীটের বাড়ির মুখুজ্জেদের এত টাকা যে এই বাড়িটা এত বছর ধরে খালি রেখে দিয়েছে? এখানে কম করেও অন্তত একশো-দেড়শো লোক আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে!

বিশাখার মা জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা বাবা, এ-বাড়িতে আমাদের কত দিন থাকতে দেবেন তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি?

সন্দীপ বলেছিল—আপনাদের যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকুন না—

যোগমায়া বলেছিল—তা এ-বাড়িটা ভাড়া দিলে তো অনেক টাকা আমদানি হয়!

সন্দীপ বলেছিল—তা তো হয়ই। কিন্তু মুখুজ্জে-বাবুদের তো টাকার অভাব নেই। ওদের অনেক টাকা—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করেছিল—ওদের কত টাকা আছে বাবা?

সন্দীপ বলেছিল—তা আমি কী করে জানবো মাসিমা, আমি তো নিজেই গরীব লোকের ছেলে। আমিও তো আপনাদের মতই গরীব।

—সংসারে কে আছে তোমার?

সন্দীপ বলেছিল—আমার শুধু এক বিধবা মা আছে দেশে আর কেউ নেই আমার—

—আর কেউ নেই?

—না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করেছিল—বাবা?

—না, বাবাও নেই। বাবাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি, বাবা কবে মারা গিয়েছেন তাও আমি জানি নে—

যোগমায়ার বড় কষ্ট হলো সন্দীপের কথা শুনে। যোগমায়ার মনে হলো ছেলেটি যেন তাদেরই স্বগোত্রের। ছেলেটিও যেন তার নিজের বিশাখাব মত। বিশাখারও যেমন বাবা নেই, এই সন্দীপেরও ঠিক তেমনি। তারও বিশাখার মতন হতভাগ্য।

—তোমার মা তাহলে কোথায় থাকেন?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতাতে, আমার দেশে—

—সেখানে কী করে তাঁর চলে?

সন্দীপ বললে—মা আমাদের বেড়াপোতার জমিদার চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ি রান্না-বান্না করে, আব তারাই খেতে দেয়। আমি যতদিন বেড়াপোতাতে ছিলাম আমার দুবেলার খাবারও ওই চাটুজ্জেবাবুদের বাড়ি থেকেই মা নিয়ে আসতো!

—আর এখন? এখনও তোমার মা সেখানে চাকরি করেন?

—হ্যাঁ।

—তুমি মা'কে চিঠি-পত্তর দাও?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, প্রতি মাসেই দিই। আমার চিঠি না পেলে মা বড় ভাবে।

যোগমায়া বললে—তাতো ভাববেনই। মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না। তুমি তো তবু ছেলে। বড় হয়ে মা'র কাছেই উঠবে, মা'র কাছেই থাকবে। বিয়ে-থা হলে ছেলে-বউ নিয়ে তোমার মা সংসার করতে পারবেন, তখন আর তোমার মা'কে পরের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতে হবে না। পরের বাড়িতে 'পরভাতি' হওয়ার যে কী কষ্ট তা তো আমার চেয়ে আর কেউ এত ভালো করে জানে না।

সন্দীপ বললে—কিন্তু এখন থেকে তো আর আপনার সে-দুঃখ থাকবে না। এখন তো আপনার নিজের জামাই-এর কাছে থাকবেন। জামাই তো আর পর না—

যোগমায়া বললে—ও-কথা বোল না বাবা। কথায় আছে জন্-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা—

সন্দীপ বললে—কিন্তু এ তো আপনাদের সে-রকম জামাই নয় মাসিমা। এ-রকম বড়লোক জামাই সংসারে আর কাব হয বলুন? এরা এত বড়লোক, আমি তো এতদিন ধরে দেখছি, কত লোক যে এদের বাড়িতে খাচ্ছে তার হিসেবও নেই কারো কাছে। বাড়ির সরকারমশাই ছাড়া আর কেউ তা জানে না। আর তারপর আপনার জামাই-এর যে কারখানা আছে বেলুড়ে সেখানে হাজার-হাজার লোক যে খেটে খাচ্ছে তাও তো সবই আপনার জামাই-এর দৌলতেই। আপনার মেয়েও তো সেই কারবারেরই মালিক হবে—

যোগমায়া বললে—ওকথা বোল না বাবা তুমি!

—কেন, ও-কথা বলবো না কেন? আমি কি কিছু মিথ্যে কথা বলেছি? আপনিই বলুন—

যোগমায়া খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—তুমি ও-কথা বোল না বাবা, সত্যিই আমার বড় ভয় করে—

—কেন, আপনার ভয় করে কেন মাসিমা? আপনার মেয়ে তো সুন্দরী! আপনার মেয়ে সুন্দরী বলেই তো এত বড় বড়লোকের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হতে চলেছে—

যোগমায়া বললে—তুমি ছেলেমানুষ কিনা তাই ওই কথা বললে বাবা। আমি ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি—'অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই', সেই কথা ভেবেই আমার বড় ভয় করে—আর কিছুর জন্যে নয়—

কথাটা শুনে সন্দীপের মনে পড়ে গেল সেই সেদিনকার নাইট-ক্লাবের ঘটনাটা। অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই। কিন্তু অনেকে তো আবার বিয়ের পরেও শুধরে যায়। বিয়ের পর থেকে তো অনেক স্বামী বদলেও যায়। গরীব ঘর থেকে মেয়েদের তো বড়লোকেরা সেই জন্যেই নিজেদের ঘরে বউ করে আনে। মল্লিক-কাকা তো সেই কথাই তাকে বলেছে।

সন্দীপ বললে—আপনি চিন্তা করবেন না মাসিমা!

যোগমায়া বললে—চিন্তা কি সাধ করে করি বাবা, জীবনে অনেক দেখেছি, অনেক ঠকেছি, অনেক ভুগেছি। তোমার মা'র মত আমার যদি একটি ছেলে থাকতো তাহলে কি আমি চিন্তা করতুম? জানো তো—মেয়ে ঘর শূন্য করে আর ছেলে ঘর পূর্ণ করে—

—আবার আপনি ওই সব কথা ভাবছেন!

যোগমায়া বললে—আমি ভাববো না তো কে ভাববে বাবা? বিশাখার কি বাবা আছে, কিংবা একটা ভাই আছে? আমাদের যে ত্রিভুবনে আর কেউ নেই—

সন্দীপ বললে—আর কেউ না থাকুক, মাথার ওপর তো ভগবান আছেন।

যোগমায়া বললে—যারা আপন বলতে বাড়িতে ছিল, তারা তো কখনও আমাদের ভালো দেখতে পারতো না। তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি কেন যে আমার মত গরীব বিধবার মেয়েকে পছন্দ করলেন কে জানে! ভগবানের লীলা কে বুঝতে পারে বাবা—

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তা তো বটেই, এই যে আমি, আমি কোথায় ছিলাম আর ভগবানের কোন ইচ্ছেয় আমি এই কলকাতায় চলে এলাম, এ-কথা ভাবতে গেলেই আমি অবাক হয়ে যাই মাসিমা!

যোগমায়া বললে—তুমি তো বেটাছেলে, তোমার কী ভাবনা বাবা! আর আমি? আমার কথা ভাবো তো একবার! আঠেরো বছর বয়েসে ওই বিশাখাকে নিয়ে বিধবা হলুম, আর তারপর থেকে ওই দেওরের সংসারে হাঁড়ি-কড়া নাড়ছিলুম আর জা-এর লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছিলুম, হঠাৎ ভগবান আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলেন। এটা ভালো হলো কি মন্দ হলো তাও বুঝতে পারছি না—

—ভালোই হবে মাসিমা, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন! নইলে আপনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে একদিন এখানে এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে উঠবেন!

যোগমায়া বললে—কিন্তু আমার মেয়ে? ওই মেয়েই তো আমার গলার কাঁটা!

সন্দীপ বললে—কিন্তু সেই মেয়েরও তো বিয়ের পাত্র ঠিক হয়ে গিয়েছে! আর কী ভাবনা আপনার?

যোগমায়া বললে—আমাদের দেশে একটা কথা আছে বাবা, তুমি হয়ত জানো—না।

—কী কথা বলুন?

যোগমায়া বললে—কথাটা হচ্ছে 'মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি—'. কথাটা ভাবলেই আমার মাথাটা টন্-টন্ করে ওঠে—

মাসিমার কথাটা সেদিন সন্দীপ বুঝতে পারেনি ঠিক। কিন্তু পরে বুঝেছে ও-রকম সত্যি কথা আর পরে কখনও বোঝেনি সন্দীপ! সত্যিই তো, বিশাখা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তো মাসিমার আর ভাবনার কী ছিল?

এতদিন পরে আজ মনে হচ্ছে মাসিমার কথাটা কতটা মর্মান্তিক সত্যি! এই উপন্যাসের যে কাহিনীটা বলতে বসেছি তা তো বলতে গেলে ওই বিশাখার জীবনেরই মর্মান্তিক সত্যি কাহিনী! শুধু বিশাখার জীবনেরই কাহিনী, তা তো নয়। তার সঙ্গে সন্দীপের জীবনেরও তো মর্মান্তিক সত্যি কাহিনী! কিন্তু একদিন কোন কুক্ষণে বিশাখা সন্দীপের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল? আর কেনই বা সন্দীপ তার সমস্ত স্বার্থ বিশাখার ভালোর জন্যে জলাঞ্জলি দিতে গিয়েছিল? কে এই 'কেন'র জবাব দেবে? সেই জবাব দেওয়ার জন্যে সে কোন্ দেবতার কাছে তার প্রার্থনা জানাবে?
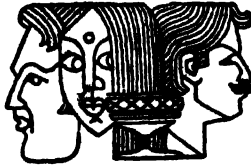
আজ আর সন্দীপের কেউ নেই। সব মানুষের মধ্যে 'আমি' বলে যে কাঙালটা সংসারের সব জিনিসকে নিজের বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, সেই 'আমি'টা এখন বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু পৃথিবীটা তো রয়েছে, সংসারটা তো রয়েছে। সংসারটা দীর্ঘকাল থাকে, শুধু অহংটা চলে যায়। তাকে কেউ নেয় না। এই এতদিন জেলখানার মধ্যে কাটিয়ে আজ বোধহয় সে অহংমুক্ত হতে পেরেছে। নইলে এত নিস্পৃহ সে হতে পারছে কী করে? নিস্পৃহ দৃষ্টিতেই এই সন্দীপ সেদিনকার সেই সন্দীপকে আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সেই দিন থেকে সন্দীপকে আর সাত নম্বর মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলী মশাই-এর বাড়িতে যেতে হয়নি। তার জন্যে তার পরিশ্রম যেমন কমেছিল, মানসিক অশান্তিও তেমনি কমেছিল। বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে সোজা ধর্মতলার মোড়ে এসে নামলেই চলতো। কিংবা পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে নামলেই কাজ চলে যেত। বাকিটা হাঁটা রাস্তা। তাও বেশি দূর নয় মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। তারপর ডান দিক ঘুরলেই সেই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িটা। উত্তরমুখো দোতলা তিনতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গিয়ে ডাকতো—মাসিমা—

শুধু মাসিমা কি বিশাখা নয়, একটা ঝি'ও রাখা হয়েছিল দিন-রাত্তিরের কাজ করবার জন্যে। সেই শৈল-ঝিই অনেক সময় দরজা খুলে দিত। অনেক সময় তার নাম ধরেই ডাকতো সন্দীপ—শৈল, ও শৈল—

স্বামী বেঁচে থাকতেও যোগমায়াকে বরাবর ঝি-এর কাজ করতে হয়েছে, আর তারপর স্বামী মারা যাওয়ার পরও ঝি-এর কাজ থেকে কখনও মুক্তি পায়নি যোগমায়া। সেই মানুষের কপালে যে এত সুখ হবে তা যেন কল্পনা করা যায় না।

প্রথমে মাসিমা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আমার আবার ঝি রাখা কেন বাবা? ভারি তো দুটো মানুষের সংসার, এ কাজ আমি একলাই করতে পারবো—

সন্দীপ বলেছিল—না মাসিমা, ঠাক্‌মা-মণি বলে দিয়েছে রান্না-বান্না, বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া কত কাজ আছে। তার ওপর কাপড়-কাচা, কাজ কি কম? আপনাকে কোনও কাজই করতে হবে না। ঠাক্‌মা-মণি আমাকে বলতে বলে দিয়েছে—

মাসিমা বলেছিল—তাহলে আমি সারা দিন বসে-বসে কী করবো? কাজ না করে আমার যে সারা গতরে বাত ধরে যাবে—

সন্দীপ বলেছিল—সারা জীবনই তো খেটেছেন, এখন এই বয়েসে না-হয় একটু আরামই করলেন—

মাসিমা বলেছিল—না বাবা, এত সুখ ভালো নয়, সকলের কপালে কি সব সুখ সয়? আমি গরীব লোক, গরীবের মত চাল-চলনই আমার ভালো—

তা সেই থেকে শৈলই সব করতো। বাজার করা থেকে শুরু করে রান্না, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার মত মোটা-মোটা সব কাজই করতো সে। তার মাসকারবারি মাইনে আসতো বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জে-বাড়ি থেকে। সন্দীপ টাকাগুলো এনে দিত শৈলকে। শৈল সেটা নিয়ে রসিদের ওপর টিপ ছাপ দিয়ে দিত। সেই রসিদটা মল্লিক-মশাইয়ের সরকারি খরচের খাতায় আবার ঠিক সময়ে জমা পড়তো। আর যোগমায়ার হাতে দিয়ে যেত সংসার খরচের পুরো টাকা। সংসার থাকলেই মোটা খরচ, তা সে দু'-জনের সংসারই হোক, আর দশজনের সংসারই হোক। সে খরচও বড কম নয়। দুধ আছে, চাল-ডাল-তরকারী-মশলাপাতি-কেরোসিন থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিস কিনতে হয়। ছোট সংসার বলে তার আয়োজন যে ছোট্ট হবে তার কোনও মানে নাই। কোনও মাসে তিনশো টাকা আবার কোনও মাসে চারশো।

আর তার ওপর আছে আর একটা মোটা খরচ। সেটা হচ্ছে গাড়ি। ঠাক্‌মা-মণির হুকুম দেওয়া আছে বউমা গাড়ি করে ইস্কুলে যাবে আর গাড়ি করে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে। তাই নিয়ম করে ড্রাইভার সদরে এসে হাজির হয়। বউমা হেঁটে-হেঁটে ইস্কুলে যায়, এটা ঠাক্‌মা-মণির পছন্দ নয়। যে একদিন বড় ঘরের বউ হতে চলেছে তার পক্ষে কোথাও পায়ে হেঁটে চলা-ফেরা করা ভালো নয়। তাতে মুখুজ্জে বাড়ির ইজ্জৎ চলে যাবে।

আর এই যে এই নতুন সংসারের দেখা-শোনা করার কাজ, এর সব ভার রইলো সন্দীপের ওপর। বলতে গেলে এ-সংসারের দায়-দায়িত্ব সব কিছুরই সে কর্তা। টাকা যা লাগে তা সরকার-মশাই এর কাছ থেকে নাও, কিন্তু এ-বাড়ির ভালো-মন্দর সব জবাবদিহি করতে হবে সন্দীপকে।

আগেকার কাজ ছিল সোজা। মাসের মধ্যে মাত্র একটা দিন মনসাতলা লেন-এ গিয়ে মাসকাবারি টাকা তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে তুলে দিয়ে আসে। কিন্তু এ কাজ নিত্য-নৈমিত্তিক। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেমে উঠে তৈরি হয়ে নিয়েই এ বাড়িতে চলে আসতে হয়। এসেই মাসিমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়—কেমন আছে মাসিমা। কিংবা ঘুম হয়েছে কিনা। কিংবা টাকা কড়ির কিছু দরকার আছে কিনা। সন্দীপ অবশ্য রোজই কিছু-কিছু বাড়তি টাকা পকেটে করে আনতো। মাসিমার দরকার না থাক, বিশাখার কিছু দরকার থাকতে পারে। ইস্কুলে যদি তার ক্ষিধে পায় তো কিছু কিনে খেতে পারে। হয় আইসক্রীম, নয়তো কেক পেস্ট্রি। সন্দীপ বিশাখাকে খারাপ জিনিস কিনে খেতে বারণ করে দিয়েছে। আশে-পাশে বাজে জিনিস খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তখন বিশাখাকে বকুনি খেতে হবে না, ঠাক্‌মা-মণির কাছ থেকে বকুনি খাবে সন্দীপ।

আর শুধু কি তাই? এর ওপর আছে ডাক্তার।

মাসকাবারি মাইনে করা ডাক্তার আছে। তিনি এসে বউমার শরীর পরীক্ষা করে যাবেন। সেদিন বিশাখার জিভ্ পরীক্ষা করবেন, পেট পরীক্ষা করবেন। ওজন নেবেন। পরীক্ষা করে দেখবেন ওজন বাড়ছে না কমছে। যদি ওজন কমে যায় তো একটা ওষুধ প্রেসক্রিপসন কববেন। সে-ওষুধটার দাম পাঁচ টাকাই হোক আর পঞ্চাশ টাকাই হোক তা কিনে খাওয়াতে হবে। মোট কথা বউমার স্বাস্থ্য ভালো করতেই হবে, যেমন-তেমন কবে হোক। আব যদি ডাক্তার বলে যে চেঞ্জে গেলে উপকার হবে, তা তাই-ই কবতে হবে। হাতেব কাছে পুবী আছে, কিংবা কাশী, কিংবা মধুপুর. দেওঘব তো আছেই। আর কাশী? সেখানে তো গুরুদেবই আছেন। তিনিও যা, ভগবানও তাই। ওঁর কাছে গেলে এক কথায় সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কোনও অসুবিধে হবে না। বলো তো এখনি সবকাবমশাই গুরুদেবকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছে—

সেদিনও সন্দীপ রাসেল স্ট্রীটেব বাড়িব তেতলায় উঠে ডাকলে—মাসিমা, ও মাসিমা—

ভেতরে যেন কারা জোরে-জোরে কথা বলছিল। সন্দীপ বুঝতে পারল না ভেতরে কারা এমন করে কথা বলছে। পুরুষের গলা। অথচ এ-বাড়িতে তো কোনও পুরুষ মানুষ নেই!

শৈলই দরজা খুলে দিলে। দরজাটা খুলতেই সন্দীপ দেখলে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই ভেতরে বসে আছেন।

সন্দীপকে দেখেই বললেন—কী ভায়া, কেমন আছো?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি কেমন আছেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আরে, আমাদের কথা ছেড়ে দাও। এতকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি তো, তাই একটু বউদিকে দেখতে এলুম—তোমাব ঠাক্মা-মণি কেমন আছেন?

সন্দীপ বললে—তা আজকে আপনাব অফিস নেই?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আরে আমাদের আপিসের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের আপিসে না গেলেও চলে! তুমি তো কলেজে পড়ো? আজকে তোমার কলেজ নেই?

—আমাব তো রাত্তিরে কলেজ! সকালবেলা এখানে আমাকে একবাব করে রোজ আসতে হয়, এ-বাড়ির সব ব্যাপাব দেখাশোনা করতে হয়। ঠাক্মা-মণি বলে দিয়েছেন রোজ একবার এখানকার খবর দিতে—

—ভালো—ভালো, খুব ভালো। দেখো, সবই কপাল ভাযা, সবই কপাল! নইলে সারা জীবন আমি মাথার ঘাম ফেলে চাকরি করে যা করতে পারলুম না, এদের আজ তাই-ই হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই-এর চোখ দুটো কেমন যেন ছল্‌ছল্ করে উঠলো। যেন বউদির এই সৌভাগ্য দেখে তাঁর মনে খুব কষ্ট হয়েছে।

তারপর বললেন—তা সে যা হোক্ গে, শুনলুম তোমার ঠাক্মা-মণি আমার বউদির জন্যে নাকি অনেক কিছু করেছেন—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন—

—এদের এই ঝি'টাকে কত টাকা মাইনে দাও তোমরা?

সন্দীপ বললে—তিরিশ টাকা। তার সঙ্গে খাওয়া-পরা-থাকা, সে সবও আছে।

—তি-রি-শ টা-কা? অত?

সন্দীপ বললে—তার কমে তো আর আজকাল কোনও ঝি-চাকর পাওয়া যায় না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সবই কপাল ভায়া, সবই কপাল। আমি রেলের অফিসে চাকরি করেও আজ পর্যন্ত বাড়ির জন্যে একটা ঝি বা চাকর রাখতে পারলুম না—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, সত্যি আপনার খুবই কষ্ট!

তপেশ গাঙ্গুলীমশাই সন্দীপের কথায় যেন সান্ত্বনা পেলেন একটু। যেন একটু উৎসাহিত হলেন। বললেন—দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলবো আর কে-ই বা তা বুঝবে! এই বৌদি আমার সব জানে!

যোগমায়া বললে—তুমি অত ভেবো না ঠাকুরপো। অত ভেবো না। এখানে এসে আমারই কি খুব ভালো লাগছে? আমিও সব বুঝতে পারছি। এখানে এসেও সব সময় তোমাদের কথাই মনে পড়ে!

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সে কি আমি জানি না বউদি? এখানে আসবার দিন তুমি কত কেঁদেছিলে, সে সবই আমার মনে আছে। আমি তো তাই তোমার জাকে বলি যে বউদি ছিল আমাদের বাড়ির লক্ষ্মী। সেই বাড়ির লক্ষ্মীই যদি বাইরে চলে যায় তো সে-বাড়িতে কি শান্তি থাকে? তুমিই বলো!

যোগমায়া বললে—তোমার শরীর [illegible] ভালো নেই মনে হচ্ছে।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কী করে শরীর ভালো থাকে বলো? আজকাল [illegible] আমার খাওয়াই হয় না—

—কেন? খাওয়া হয় না কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কী করে খাওয়া হবে? তুমি যতদিন আমার বাড়িতে ছিলে ততদিন কত আরামে ছিলুম। তুমি ঠিক সময়ে আমাকে ভাত রান্না করে দিতে। একদিনও আমার আপিসে যেতে দেরি হয়নি—

যোগমায়ার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছায়া ভেসে উঠলো। বললে—এখন কি দেরি হয়?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—দেরি হবে না? বলতে গেলে রোজই তো দেরি হয়। তোমার জা যে সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেরি করে। বাজার করে যখন বাড়ি ফিরে আসি তখনও দেখি তোমার জা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে! মেয়ে মানুষের এত ঘুম যে কোত্থেকে আসে তা কে জানে বাবা! তখন আমি নিজে উনুনে কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালাই। ওদিকে যখন উনুনে কয়লা গন্‌-গন্‌ জ্বলছে তখন দেখি তোমার জা দয়া করে উনুনে চায়ের জল চাপিয়েছে। সেই চা খেয়ে যখন ঘুমের ঘোর কাটবে তখন উনি কল-ঘরে ঢুকবেন। তা তুমিই বলো বউদি, আগে চা, না আগে আমরা আফিসের ভাত? কোনটা আগে তুমিই বলো?

যোগমায়া বললে—আহা, তাহলে তো তোমার বড় কষ্ট!

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আমার কষ্টের কথা আর কতটুকুই বা বলেছি তোমাকে? আরো কত কষ্টের কথা বলবো? সব বললে সাত কাণ্ড রামায়ণ হয়ে যাবে! তাই জন্যেই তো বলছিলাম যে তুমি ছিলে আমাদের বাড়ির লক্ষ্মী, তুমি যেদিন থেকে এ-বাড়িতে চলে এসেছ সেই দিন থেকেই আমাদের সংসার লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। মানুষ কতদিন আর না খেয়ে থাকতে পারে বলো?

যোগমায়ার মুখ থেকে যেন একটা হাহাকার বেরিয়ে এল। বললে—ওমা, তুমি কতদিন না খেয়ে আপিসে যাবে ঠাকুরপো?

—আর কতদিন! আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবো না। বাঁচতে আর আমার ইচ্ছেও নেই। আমার শুধু একটাই ভাবনা—আমি মরে গেলে ওই বিজলীটাকে কে দেখবে? ওর জন্যেই আমার যত ভাবনা—

যোগমায়া বললে—তা এখন—এখন কি তুমি না খেয়েই এসেছ?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—খাওয়া? খেতে আমায় কে দেবে? বাড়িতে রান্না হলে তবে তো খাবো! আমার বাড়িতে তোমার-মত লোক কে আছে যে আমার খাওয়ার কথা ভাববে? আমি খেলুম, কি খেলুম না তা দেখবার মত লোক তো নেই আমার বাড়িতে।

যোগমায়া বলে উঠলো—তাহলে তুমি আজ এখানেই দু'টি খেয়ে যাও—

বলে শৈলকে ডাকলে যোগমায়া। বাইরের দোকান থেকে চারটে রসগোল্লা আনতে বলে দিলে। বললে—এখন হাসিমুখে একটু মিষ্টি খেয়ে নাও, তারপরে আমাদের সঙ্গে তোমাকেও এখানে দু'টি ভাত খেতে হবে—

—না না, তুমি আবার আমার জন্যে এত কষ্ট করতে যাবে কেন?

যোগমায়া বললে—আমার আবার এতে কষ্ট কীসের? ওই দেখছ সন্দীপকে। ও বড্ড ভালো ছেলে। ও-ই রোজ আমাদের দেখাশোনা করে যায়। ও আছে বলেই আমাদের এখানে কোন কষ্ট নেই—

তপেশ গাঙ্গুলী এবার আবার সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—তুমি খুব ভালো কাজ কবছ ভায়া। তোমার অনেক পুণ্যফল হচ্ছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, এই প্রার্থনাই করি ভগবানের কাছে—

সন্দীপ বললে—আমাকে আপনি এত কথা বলছেন কেন? আমি তো কেউ না, যা ঠাক্‌মা-মণি আমাকে করতে হুকুম করেছেন, আমি তা-ই-ই করছি। তার বেশী কিছু নয়!

—তা এটা তো তোমাদের ঠাক্‌মা-মণির নিজেদের বাড়ি! এ বাড়ির ভাড়া তো দিতে হয় না—

সন্দীপ বললে—না—

তপেশ গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে এই এঁদের জন্যে তোমাদের ঠাক্‌মা-মণির কত খরচ হয় মাসে মাসে?

সন্দীপ বললে—হিসেব তো আমি রাখি না, সব হিসেব রাখেন আমাদের সরকারমশাই—

—তবু আন্দাজ কত? দুশো না তিনশো?

সন্দীপ বললে—না, তার চেয়েও বেশি! কোন-কোন মাসে পাঁচশো-ছ'শোও হয়ে যায়।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—সে কী? পাঁচ-ছ'শো? আমি তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেও মাসে অত টাকা হাতে পাই না—কপাল ভায়া, কপাল—

সন্দীপ বললে—এর পরে তো খরচ আরো বাড়বে—

—কেন? খরচ বাড়বে কেন?

সন্দীপ বললে—ঠাক্‌মা-মণি বলেছেন এর পরে একজন মাস্টার রাখতে হবে বিশাখাকে পড়াবার জন্যে। সে মাস্টার শুধু বাংলা অঙ্ক আর অন্য বিষয় পড়াবে, আর তার ওপর একজন মেমসাহেব রাখা হবে বিশাখাকে ইংরেজী পড়াবার জন্য। ইংরেজী শেখাবার মেমসাহেব সপ্তাহে দু'দিন আসবে। সে একলাই মাইনে নেবে মাসে তিনশো টাকা—

ততক্ষণে শৈল চারটে রসগোল্লা এনে প্লেটে রেখে দিয়ে গেল। আর এককাপ চা। রসগোল্লা চারটে দেখে তপেশ গাঙ্গুলী চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে উঠলো। টপ করে একটা রসগোল্লা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বললে—বাঃ, বাঃ তোমাদের এ-পাড়ার রসগোল্লা খুব মিষ্টি তো।

রসগোল্লা যে কখনও নোন্‌তা কি তেতো হয় না, মিষ্টিই হয়, তা যেন সেই দিন তপেশ গাঙ্গুলী জীবনে প্রথম জানলেন। বললেন—তোমাদের এ পাড়ার দেখছি সবই ভালো। কতদিন যে রসগোল্লা খাইনি তা মনেও নেই—

যোগমায়া তপেশ গাঙ্গুলীর মুখে এ পাড়ার রসগোল্লার প্রশংসা শুনে বললে—আর রসগোল্লা নেবে ঠাকুরপো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আঃ, আবার রসগোল্লা আনালে?

বলেই আবার রসগোল্লাটা মুখে পুরে দিলেন। রসগোল্লাটা খেতে খেতেই বললেন—ভালো রসগোল্লা বলেছি বলে কি এতগুলো রসগোল্লা খেতে হবে?

তপেশ গাঙ্গুলী যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন—আরো দেবে?

এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে যোগমায়া আরো চারটে রসগোল্লা শৈলকে দিয়ে আনিয়ে দিলেন।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আঃ, আবার কেন রসগোল্লা? বলে আর একটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিলেন।

তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে বললেন—তাহলে তো বিশাখার জন্যে তোমার ঠাক্‌মা-মণির অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে—

সন্দীপ বললে—বিশাখাকে তো নিজের নাত-বউ করবেন, তাই তাকে ভালো করে লেখা-পড়াটা শিখিয়ে নিতে চান আর কি—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওদের অনেক টাকা, আর নাতিও একটা, সেই নাতির বউ করতে হলে টাকা খরচ তো হবেই—

—আচ্ছা, ওদের কত টাকা ভায়া—এত টাকা মানুষের কী করে হয়? কই, আমাদের তো টাকা হয় না—অথচ আমরা তো টাকার জন্যে হা-পিত্যেস করে মরি—। সত্যি বলো তো ওদের কত টাকা?

সন্দীপ বললে—তা আমি কি করে বলবো?

—তবু আন্দাজ কত টাকা?

সন্দীপ বললে—আমি গরিব লোক, আমি তা কী করে বলবো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—দেখ ভগবানের আক্কেলখানা, আমরা টাকার অভাবের জন্যে বাড়িতে একটা ঝি-চাকর রাখতে পারি না, টাকার অভাবে মেয়েকে ভালো খাওয়াতে-পরাতে কি লেখাপড়া শেখাতে পারি না আর ভগবান কিনা সব টাকা ওদের বাড়িতে ঢেলে দেন। এ কী-রকম ভগবান বলো তো, কী-রকম একচোখো বিচার?

তখন আর বেশী সময় ছিল না সন্দীপের। সে বললে—আচ্ছা আসি মাসিমা—কাল আবার আসবো—

বলে সদর দরজা খুলে বাইরে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার মনে হলো এতক্ষণ সময়টা যেন বড় খারাপ কাটলো। ওই তপেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কেবল বাজে কথাই বলে এল সে। টাকা দিয়েই যারা মানুষকে বিচার করে, তাদের ওপর সন্দীপের বরাবরের রাগ। তাহলে গোপালের সঙ্গে তপেশ গাঙ্গুলীর কীসের তফাৎ! তফাৎ শুধু এইটুকুই যে গোপালের অনেক টাকা আছে আর তপেশ গাঙ্গুলীর কোনও টাকা নেই। কিন্তু স্বভাব? মনোবৃত্তি?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্দীপ রাসেল স্ট্রীটে পা দিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে চীৎকার—কানে এল—ও ভায়া—ও ভায়া—শুনছো—?

সন্দীপ পেছন ফিরে অবাক হয়ে গেল। দেখলে তপেশ গাঙ্গুলী তাকে ডাকতে ডাকতেই দৌড়ে কাছে আসছেন।

তপেশ গাঙ্গুলী কাছে এসে হাঁফাতে লাগলেন। বললেন—একটা কথা আছে ভাই তোমার সঙ্গে—

—আমার সঙ্গে? কী কথা?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—খুব গোপনীয় কথা। তুমি যেন কাউকে বোল না—

সন্দীপ বললে—কী কথা তাই বলুন আগে—

—না, আগে তুমি কথা দাও কাউকে বলবে না—

—আচ্ছা, কথা দিলুম কাউকে বলবো না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—খুব গোপনীয় কথা, তাই এত করে তোমাকে আমি বলছি। তুমি তো ভায়া আমার অবস্থা ভালো করেই জানো। আমি ভাই মাইনে পাই সব কিছু কেটেকুটে নিয়ে মাত্র সাড়ে তিনশো, তাই দিয়েই আমার সংসার চালাতে হয়। এই যুগে ওই কটা টাকায় সংসার চালানো যায়? তুমিই বলো। জিনিস-পত্তোরের দাম যে-হারে বাড়ছে তাই দিয়ে কি আজকাল সংসার চালানো যায় বলো?

সন্দীপ কিছু উত্তর দিলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—এতদিন তো তোমার ঠাক্‌মা-মণির দেওয়া টাকাগুলো দিয়ে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছিলুম, কিন্তু আর তো চলছে না ভায়া। এখন তো আর চলছে না ভাই।

সন্দীপ বললে—আমাকে কী করতে হবে, বলুন? আমি কী করতে পারি তার জন্যে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি? তুমি সব করতে পারো। তুমি আমাকে মারলে মারতে পারো, বাঁচালে বাঁচাতে পারো।

—কী করে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ওই বিশাখার জন্যে তোমার ঠাক্‌মা-মণি তো মাষ্টার রাখবেন বলছিলে, তো আমাকেই মাস্টার রাখবার কথা তুমি তোমার ঠাকমা-মণিকে তো বলতে পারো—

—আপনি বিশাখাকে পড়াবেন? কী পড়াবেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—যা বলবে তুমি আমি তা-ই পড়াবো। তুমি তো জানো ভায়া আমি বি-এ পাশ করেছি। আমি পড়াতে পারবো না?

—আপনি ইংরেজী পড়াতে পারবেন?

—কী যে বলো তুমি? আমি তো ইংরেজীতেই অনার্স। রেলে চাকরি করি বলে কি একটা বাচ্চা মেয়েকে ইংরেজীটাও শেখাতে পারবো না?

সন্দীপ বললে—কিন্তু ঠাক্‌মা-মণির ইচ্ছে একজন মেম-সাহেবের কাছে তাঁর বউমা ইংরেজী শিখুক। পরে তো বরের সঙ্গে বিশাখাকে বিলেতে-টিলেতেও যেতে হতে পারে—

বিশাখা বিলেতে যাবে নাকি?

সন্দীপ বললে—তা যাবে না? মুখুজ্জেবাবুদের তো বিলেতেও অফিস আছে। মেম-সাহেবের কাছে ইংরেজী শিখলে তখন আর বিশাখার কোনও অসুবিধে হবে না—

কথাগুলো শুনে তপেশ গাঙ্গুলীর নাক দিয়ে হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললেন—তাহলে বাংলা? ইস্কুলে আমি বাংলায় বরাবর ফার্স্ট হতুম। বাংলাটা আমি শেখাতে পারি।

সন্দীপ বললে—ইংরাজী ইস্কুলে পড়ে বিশাখা, তাই বাংলা পড়াবার দরকার হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—আচ্ছা, তা না হয়, না হোক, অঙ্কটা তো সব ইস্কুলেই আছে। আমি অঙ্কটাও ভালো পারি। আমি অঙ্কটা বিশাখাকে ভালো শেখাতে পারি—

সন্দীপ এর জবাবে কী বলবে বুঝতে পারলে না। একটু ভেবে বললে—আচ্ছা, আমি পরে ভেবে বলবো—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—পরে টরে নয় ভাই। তুমি আমার ছোট ভাই-এর মত, তোমাকে আমার এ-উপকারটা করতেই হবে। নইলে আমি মরে যাবো ভাই, নির্ঘাত মরে যাবো—

সন্দীপ বললে—দেখুন, আমাকে বলা বৃথা। আমি তো মুখুজ্জে বাড়ির একজন চাকর বই তো কেউ নই। আমার কথার কী দাম!

এবার তপেশ গাঙ্গুলী এক কাণ্ড করে বসলেন। একেবারে খপ্ করে সন্দীপের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ফেললেন। তারপর কান্নায় দু'চোখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো! বললেন—তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই, নইলে আমি সপরিবারে মারা পড়বো। আর নইলে আমার মেয়ের জন্যেও ঠিক এই রকম একটা পাত্র জুটিয়ে দাও—

মহা মুশকিলে পড়লো সন্দীপ। বললে—আমি তো বলছি আপনাকে—

তপেশ গাঙ্গুলী হঠাৎ জামার বুক-পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে সন্দীপের হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে।

সন্দীপ হতবাক হয়ে গেছে একেবারে। বললে—এ কী করছেন? এ কী করছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ও কিছু না ভাই। ও কিছু না। তুমিও গরীব লোক, আমিও গরীব লোক, তোমাকে পাঁচটা টাকা আমি মিষ্টি খেতে দিচ্ছি, আর কিছু নয়—

সন্দীপ এবার রেগে গেল। বললে—আপনি, আপনি আমাকে ঘুষ দিচ্ছেন? আমাকে আপনি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—না না, তুমি একে ঘুষ মনে করছো কেন? তুমিও তো ভায়া আমার মত ছাপোষা মানুষ! তুমি রেগে যেও না ভাই, তুমি রেগে যেও না—শোন, শোন—

কিন্তু সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ায় নি। আর কোনদিকে না চেয়ে সন্দীপ তপেশ গাঙ্গুলীকে সেই রাসেল স্ট্রীটের ওপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। আর একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি। শেষকালে তপেশ গাঙ্গুলী কিনা দু'টো টাকার লোভে তাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন? সন্দীপ কি অত ছোট, অত নীচ, অত অপদার্থ? সন্দীপ কি—

কিন্তু সে সব কথা পরে হবে!
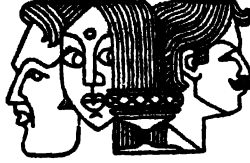
মনে আছে তখন বিশাখা নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। সকাল বেলা বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের গাড়ির পোর্টিকোর তলায় দাঁড়াতো, আর সেই খবর পেয়েই বিশাখা সেই গাড়িতে চড়ে ইস্কুলে যেত। আবার যতক্ষণ না ইস্কুলের ছুটি হতো ততক্ষণ গাড়ি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতো। ইস্কুলের ছুটি হওয়ার পর বিশাখাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর তবে ড্রাইভারের ছুটি।

সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ির জীবন-যাপনের সঙ্গে এই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির জীবন-যাপনের নিয়ম-কানুন একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। এ বাড়িতে যোগামায়ার আর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই জা'-এর চা তৈরি করার ব্যস্ততাও যেমন নেই, দেওরের আপিসের ভাত-ডাল তরকারি রান্নার তাগিদও নেই তেমনি। সবই করে শৈল। এ-বাড়ির ঘর ঝাঁট-দেওয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে বাজার করা রান্না করা সমস্ত। আর শৈল মানুষটাও বড় ভালো। মাইনে যা পায় তা ঠাক্‌মা-মণিই দেন ঠিক সময়ে। কিন্তু কাজ করতে তার এতটুকু মুখভার নেই, এতটুকু বেজার হওয়া নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা চুরি-চামারির ধার দিয়েও মাড়ায় না সে।

যোগমায়া বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। বলে—এত সুখ আমার কপালে সইলে হয় বাবা—

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বলে—আপনি অত ভাববেন না মাসিমা। আমার মা'কেও আমি তাই বলেছি, আমার মাকেও আমি ভাবতে বারণ করেছি। আমার মা ও আমাব কথা বড্ড ভাবে—

বিশাখা গাড়ি করে ইস্কুলে চলে যাবার পর থেকেই যোগমায়ার ভাবনা শুরু হয়। যদি রাস্তায় গাড়িতে-গাড়িতে ধাক্কা লাগে। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে। যদি মেয়ের কিছু বিপদ হয়!

ইস্কুল থেকে যতক্ষণ না বিশাখা বাড়ি ফেরে ততক্ষণ মাসিমার আর অস্বস্তি কমে না। যখন বিশাখা শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে তখন যোগমায়া মেয়ের দিকে চেয়ে বলে—তুই এলি, আমি বাঁচলুম মা—

বিশাখা বলে—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা, শিগ্‌গির খেতে দাও।

খাবার তৈরিই থাকে। তবু যোগমায়া বলে —আগে মুখ-হাত-পা ধো, তবে তো খাবি।

কিন্তু বিশাখা মুখ-হাত-পা না ধুয়েই খেতে চায়। শেষকালে যোগমায়াকে নিজে বেসিনের কাছে গিয়ে বিশাখার মুখ-হাত-পা ভালো করে ধুইয়ে দিতে হয়। বলে—শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে যেন এই রকম দুষ্টুমি কোর না। নইলে সবাই তোমার নিন্দে কববে—বলবে বউমা'র মা মেয়েকে কিছুই শেখায়নি।

বিশাখা বলে—সে যখন বিয়ে হবে তখন দেখা যাবে—

যোগমায়া বলে—ওই বড় দোষ তোমার। বড্ড তক্কো করো তুমি! তক্কো করা তোমার একটা বদ স্বভাব! শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যখন তক্কো করবে তখন তোমার ঠাক্‌মা-মণি তো আমাকে দুষবে!

বিশাখা বলে—ঠাক্‌মা-মণি তো বুড়ী, ও কি আর চিরকাল বেঁচে থাকবে ..?

যোগমায়া বলে—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। মনে রেখো ঠাক্‌মা-মণি তোমার গুরুজন—গুরুজনের নিন্দে করতে নেই—

বিশাখা তখনকার মত চুপ করে যায়, কিন্তু ততক্ষণে বিশাখার ইংরেজী শেখাবার মেমসাহেব এসে যায়। তখন বিশাখার শুরু হয়ে যায় লেখাপড়া। মেমসাহেব ভালো বাংলা বলতে পারেন না। ভাঙা হিন্দী আর ভাঙা বাঙলা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়।

বিশাখা জিজ্ঞেস করেছিল— আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

মেমসাহেবের নাম মিস মেরী, মিস্ মেরী বলেছিলেন—আমি তোমাব আন্টি। আমাকে তুমি আন্টি বলে ডেকো—

সেই থেকেই এই বাড়িতে সবার কাছেই আন্টি মেমসাহেব হয়ে গেল। যোগমায়াও তাকে আন্টি বলেই ডাকতো। আন্টি বাড়িতে এলেই তার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে হতো। শুধু চা নয়, তার সঙ্গে থাকতো আরও অনেক কিছু খাবাব।

কোথায় সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়ি আর কোথায় এই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটেব বাড়ি। এ কি যোগমায়া কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল? দুঃখেব দিনে কে কল্পনা করতে পারে অদৃশ্য ভবিষ্যতের ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে কে-ই বা কল্পনা করতে পারে শ্রাবণের শ্যাম সমারোহের? কিংবা তার উল্টোটাও অনেক সময়ে ঘটে। রামায়ণের রাম কি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিল যে একদিন তাকেই আবাব অযোধ্যা ত্যাগ করে বনবাসে যেতে হবে! কিন্তু রাম যদি বনবাসে না যেত তাহলে কি রাবণ বধ হতো? আর রাবণ-বধ না হলে তো আমরা রামায়ণ পড়তে পেতাম না। তাই মনে হয়, রামায়ণ পড়বার সৌভাগ্য হবে বলেই হয়ত রামকে অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। তাই যোগমায়া তার মেয়ে বিশাখাকে নিয়ে এই সাত নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে না এলে 'এই নরদেহ' উপন্যাসও হয়ত লেখা হতো না।

একদিন আন্টি মেমসাহেব রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়েছে আর ঠিক সেই সময়েই সন্দীপ সেই বাড়িতে ঢুকছে। মাঝামাঝি রাস্তায় দেখা।

আন্টি মেমসাহেব সন্দীপকে দেখেই বললে—গুড্ মর্নিং বাবু—

সন্দীপও বললে—গুড্ মর্নিং—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনার ছাত্রী কেমন পড়ছে?

মেমসাহেব বললে—ভেরি গুড, খুব ভালো—

তারপর বললে—আচ্ছা বাবু, একটা কথা, ইজ ইট এ ফ্যাক্ট যে বিশাখার নাকি বিয়ে হয়ে যাবে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, ইট্ ইজ্ এ ফ্যাক্ট!

আন্টি মেমসাহেব বললে—কেন? হোয়াই? এত কম বয়সে কি বিয়ে হওয়া ভালো? তা কাব সঙ্গে বিয়ে হবে?

সন্দীপ বললে—সে একজন মাল্‌টি মিলিওনিয়ারের সঙ্গে—একজন কোটিপতি সে!

আন্টি মেমসাহেবের মুখটা শুকিয়ে গেল খবরটা শুনে! বললে—তাহলে তো আমার চাকরিটাও চলে যাবে বাবু—

মাসে-মাসে দু'শো টাকা মাইনে। এ কি সোজা কথা! তার দুঃখ হবার মত কথাই বটে!

সন্দীপ সান্ত্বনা দিয়ে বললে—সে বিয়ের এখন অনেক দেরি আছে। আগে বিশাখার বিয়ের বয়েস হোক! এখন সে-কথা ভাবছেন কেন?

আন্টি মেমসাহেব কথাটা শুনে যেন একটু আশ্বস্ত হলো মনে মনে!

হঠাৎ একাটা গাড়ির ভেতর থেকে একজনের গলার আওয়াজ এল—হ্যালো মেরী—

আন্টি মেমসাহেব সেই গাড়িটার দিকে চেয়ে বললে—হ্যালো—

তারপর আন্টি মেমসাহেব সেই গাড়িটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গাড়ি থেকে নেমে এল গোপাল!

গোপালকে দেখে সন্দীপও অবাক হয়ে গেছে। আগের দিন গোপালকে দেখেছিল রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে আর আজ খোলা আকাশের তলায় দিনের বেলা।

—কীরে সন্দীপ, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি গোপাল রে, গোপাল হাজরা—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—তুই হঠাৎ?

গোপাল বললে—হঠাৎ কেন? আমি তো সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াই রোজ। এই মেয়ীর সঙ্গে তোর আলাপ হলো কী করে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ও-তো বিশাখাকে ইংরাজী শেখায়—

—বিশাখা? বিশাখা কে?

আন্টি মেমসাহেব সব বুঝিয়ে দিলে। তারপর বললে—এই যে, এই তিন নম্বর বাড়িটায় আমার স্টুডেন্ট থাকে—

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—তোর সঙ্গে এ-বাড়ির সম্পর্ক কী?

সন্দীপ বললে—আমি বিডন স্ট্রীটে যে বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে এই বাড়ির মেয়ের যে বিয়ে হবে।

—সেই সৌম্যের সঙ্গে? সৌম্য মুখার্জি?

—হ্যাঁ।

আন্টি মেমসাহেব বললে—সে একজন মালটি-মিলিওনিয়ার—

গোপাল বললে—মাল্‌টি-মিলিওনিয়ার হতে পারে, কিন্তু সে তো একটা ডিবচ্‌, একটা লম্পট। রোজ রাত্তিরে চৌরঙ্গী পাড়ার নাইট্‌-ক্লাবে মাল খায়, মেমসাহেবদের নিয়ে ফূর্তি করে। তুই তো সেদিন নিজের চোখেই সব দেখেছিস। তা করে বিয়ে হবে?

সন্দীপ বললে—সে হবে অনেক দিন পরে। এখন তাদের টাকাতেই মেয়েটাকে এখানে রেখে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে, আদব কায়দা রপ্ত করানো হচ্ছে, গান-বাজনা শেখানো হচ্ছে। খুব গরীবের মেয়ে কিনা—

আন্টি মেমসাহেব বললে—আমি তাকে ইংরেজী শেখাই। বিয়ে হওয়ার পর আর কি সে আমার কাছে ইংরেজী শিখবে? আমার দুশো টাকা মাইনের চাকরিটাও চলে যাবে। তখন কী হবে?

গোপাল অভয় দিয়ে বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না, তোমার ভয় কী? আমি তো আছি—

ততক্ষণে আন্টি মেমসাহেব আর গোপাল গাড়িতে উঠে বসেছে। গোপাল গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুই এখন কি করছিস?

সন্দীপ বললে—বি-এ একজামিন দিয়ে এখন বসে আছি—

এবার কী করবি?

সন্দীপ বললে—কী করবো, যদি পাস করি তো—ল' পড়বো আর নয়তো একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবো— দেখা যাক কী হয়—

ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। গোপাল সেই চলন্ত গাড়ি থেকেই বললে—মিছিমিছি তোর চাকরি করা, চাকরিতে কি টাকা আছে? তাতে তোর জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে রে—

তারপর গাড়িটা গোপাল আর আন্টি মেমসাহেবকে নিয়ে সোজা পার্ক স্ট্রীটের দিকে ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে সোঁ করে বেরিয়ে গেল। সন্দীপ দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো গাড়িটার দিকে একদৃষ্টে—

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেও যেন তার বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। শুধু গোপালের জন্য নয়, আন্টি মেমসাহেবের জন্যে তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। এদের দুজনের সম্পর্কের কথা ভেবেও তার বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। গোপাল আন্টি মেমসাহেবের সঙ্গে মেশবার সূত্রটা কোথা থেকে পেলে? রহস্যটা কোথায়?

আর টাকার?

তা সত্যিই কি সবাই প্রাণপণে টাকার সন্ধানেই ছুটছে? জীবনে টাকাটা কি এতই অপরিহার্য? বিশাখার লেখাপড়া শেখাটা যেন প্রধান নয়। তার বিয়ে হয়ে গেলে আন্টি মেমসাহেবের দু'শো টাকা মাইনের চাকরিটা চলে যাবে, সেইটেই যেন সব কিছু।

বেড়াপোতাতে যখন সন্দীপ থাকতো তখনও জিনিসটা এমন প্রকট হয়ে তার চোখে পড়েনি। সেই যুগে যখন হাজরা বুড়োর মৃতদেহটা দেখতে লোকের ভিড় হয়েছিল তখন সকলেরই চোখে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। প্রশ্নটা হচ্ছে—হাজরা বুড়োকে কে মেরে ফেলল?

কেউ বললে—নিশ্চয়ই কোনও চোর হাজরা বুড়োর ঘরে ঢুকেছিল—

অন্য সবাই হেসে উঠেছিল সে কথায়। হাজরা বুড়োর আছে কী. যে চোর তার ঝুপড়িতে ঢুকবে?

তাহলে হয়ত সাপে কামড়েছে।

তা অবশ্য সম্ভব' আশে-পাশে জঙ্গল যেখানে আছে সেখানে সাপ থাকা অসম্ভব নয়। হয়ত ঝুপড়ির ফাঁক দিয়ে সাপ ঢুকে হাজার বুড়োকে কামড়েছে।

তা যদি না হয় তো মৃত্যুর আর কী কারণ থাকতে পাবে?

মনে আছে, সেদিন সবাই সেই দুর্ঘটনা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছিল। কারোর কোন যুক্তি কেউ শোনেনি। ব্যাপারটা সকলের কাছে রহস্য হয়েই রয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চাটুজ্যে বাবুদের বাড়িতে কাশীনাথবাবুই সব শুনে বলেছিলেন—আমি জানি কে হাজরা বুড়োকে মেরেছে—কে তাকে খুন করেছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল কে?

কাশীবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, সে কথা তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না—

কথাগুলো রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল সন্দীপের কাছে, সে কাশীবাবুর দিকে চেয়ে আরো উদগ্রীব হয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলে—বলুন না, কে? কে হাজরা বুড়োকে খুন করেছে?

কাশীবাবু বললেন—যারা মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছিল, তারাই হাজরা বুড়োকে খুন করেছে।

সন্দীপ তবু বুঝতে পারে নি। বলেছিল—কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে তো খুন করেছিল নাথুরাম গড়সে—তার তো ফাঁসী হয়ে গিয়েছে। সে এখানে হাজরা বুড়োকে মারতে আসবে কী করে?

কাশীবাবু বলেছিলেন—তুমি এই লাইব্রেরীর একটা বই পড়লে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কী বই?

কাশীবাবু বইটার নাম বলেছিলেন—'দি ট্রায়াল এ্যান্ড ডেথ্ অফ্ সোক্রেটিস্'—এই বইটা পড়লেই বুঝতে পাববে যে আমাদের এই পৃথিবী ভালো মানুষদের সহ্য করতে পারে না। The World does not tolerate absolute truth...

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—হাজরা বুড়ো তো সৎ লোক ছিল না—

কাশীবাবু বলেছিলেন—কিন্তু হাজরা বুড়ো তো বদ্‌মাইশ লোকও ছিল না। এই পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে এই যে, হয় তুমি সোক্রেটিসের মত এ্যাবসোলিউট্ গুড্ ম্যান হও, আর না হয় তো মহারাজ নন্দকুমারের মত এ্যাবসোলিউট্ ব্যাড্ ম্যান হও। আমাদের মত যারা মাঝখানের মানুষ, তাদের নিয়ে ইতিহাসের কোনও মাথাব্যথা নেই—

সন্দীপ তখন অনেক অল্পবয়েসী ছেলে ছিল। এ-সব কথার মানে বোঝেনি সে তখন। কিন্তু কলকাতায় আসার পর থেকেই দেখতে পেলে পয়সা উপার্জন করার নানান ফন্দি-ফিকির, কেউ রাস্তার ওপর মোড়ের মাথায় ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে "বিশ্বশান্তি যজ্ঞ" করবার আবেদন জানিয়ে পয়সা উপায় করতে চেষ্টা করে, আবার কেউ অশৌচের পোশাক পরে গৃহস্থের বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে মাতৃ-দায়ের অজুহাতে টাকা-পয়সা ভিক্ষে করে। টাকা-পয়সা উপায় করবার ফিকির আবিষ্কারের নমুনা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বারোর এ বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ির সামনেই একদিন এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সন্দীপ তখন সকালবেলা তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যাবার জন্য বেরিয়েছে, এমন সময় একজন দুঃস্থ লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল?

—বাবু, একটু দয়া করবেন?

সন্দীপ চমকে উঠে দেখলে লোকটার দিকে। বয়েস বেশি নয়। মুখে খোঁচা খোঁচা কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি, মাথার তৈলহীন চুল এলোমেলো। দেখলেই বোঝা যায় অশৌচের দায় সামলাতে লোকটা বিব্রত।

—আমার বাবা মারা গেছে, যদি কিছু সাহায্য করতেন—

স্বভাবতই সন্দীপের একটু দয়া হয়েছিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখেছিল সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই, সন্দীপ তার নিজের বাবাকে দেখতে পায়নি। বললে—দাঁড়ান একটু, আমি আপনাকে ঘর থেকে টাকা এনে দিচ্ছি—

বলে ভেতরে আসতেই মল্লিক-কাকা দেখতে পেয়েছেন। বললেন—কী গো, আবার ফিরে এলে কেন?

সন্দীপ বললে—এক ভদ্রলোক ভিক্ষে চাইছে।

—ভিক্ষে? কিসের ভিক্ষে?

সন্দীপ বলে—ভদ্রলোকেব বাবা মারা গেছে—আমার কাছে টাকা নেই, দু'টো টাকা দিতে পাবেন? পবে ও-মাসে আপনাকে দিয়ে দেব—

মল্লিক-কাকা বললেন—কই, দেখি কী-বকম ভদ্দরলোক—

বলে হাতের কাগজ-পত্র রেখে উঠে বাইরের রাস্তায় এলেন। লোকটা তখনও দাঁড়িয়েছিল ভিক্ষের আশায়। মল্লিক মশাইকে দেখেই লোকটা পালিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি তাকে ধরে ফেলেছেন।

বললেন—তোমার বাবা মারা গেছে? বছরে ক'বার তোমার বাবা মারা যায় শুনি? বলো-বলো শীগগির—

লোকটা কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো—আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমি আর করবো না, আমাকে ছেড়ে দিন...

কিন্তু মল্লিক-মশাই তাকে ছাড়লেন না। ডাকতে লাগলেন—গিরিধারী, গিরিধারী—

গিরিধারী তখন তার ঘরের ভেতরে খাচ্ছিল। খেতে খেতে সেই অবস্থাতেই দৌড়ে এসেছে। এসে ধরে ফেলেছে লোকটাকে।

মল্লিকমশাই বললেন—তুমি কী করছিলে ঘরের ভেতরে? দেখতে পাওনা কে বাড়ির সামনে আসছে যাচ্ছে?

গিরিধারী বললে—আমি খাচ্ছিলুম হুজুর—

—খাওয়াটাই তোমার বড় হলো? আমি যদি এখখুনি ঠাক্‌মা-মণিকে বলে দিই তখন কি তোমার নোকরি থাকবে?

গিরিধারী লজ্জায় পড়লো। ভয়ও হলো, বললে—আমার গলতি হয়ে গেছে সরকারবাবু, আমি মাফি মাংছি...

তারপর লোকটা কী অপরাধ করেছে তা না জেনেই গলা টিপে ধরলে।

কিন্তু মল্লিকমশাই বাধা দিয়ে বললে—ছাড়-ছাড় গিরিধারী, গলা ছাড়...

গিরিধারী লোকটার গলা ছাড়তেই সে হুমড়ি খেড়ে পড়লো মল্লিক-মশাই-এর পায়ের ওপর। বলতে লাগলো—আমায় মারবেন না বাবু, মারবেন না আমাকে, আমি আর করবো না—

—জানিস, তোকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারি—

তারপর বললেন—দাঁড়া, আমি আসছি—

বলে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলেন, টাকাটা লোকটার হাতে ফেলে দিয়ে বললেন—নে, রাখ, এবার ভাগ। আর যদি কখনও তোকে এখেনে দেখতে পাই তো পুলিশের হাতে তুলে দেব—যা, ভাগ—

লোকটা মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মল্লিকমশাই আর সেখানে দাঁড়ালেন না, গিরিধারীও মুক্তি পেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পডলো, সন্দীপও আস্তে-আস্তে মল্লিকমশাই-এর ঘরে এসে ঢুকলো।

মল্লিকমশাই বললেন—কী হলো, তুমি রাসেল স্ট্রীটে গেলে না?

সন্দীপ বললে—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি লোকটাকে টাকা দিলেন কেন?

—টাকা? টাকা কেন দিলুম?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, লোকটা তো জোচ্চোর। আপনি জেনেশুনে ওকে পুলিশে না দিয়ে একটা টাকা দিলেন?

মল্লিককাকা বললেন—দিলুম, কারণ ও গরীব, তাই.

—কিন্তু ও তো জোচ্চোর!

মল্লিককাকা বললেন—ও গরীব বলেই তো জোচ্চোর হয়েছে। ও যদি গরীব না হতো তাহলে তো আর জোচ্চোর হতো না—

সন্দীপ তবু মল্লিককাকার যুক্তিটা বুঝতে পারলে না—

মল্লিককাকা কথাটা বুঝিয়ে দিলেন, বললেন-- গরীব হওয়াটা অভিশাপ হতে পারে কিন্তু সেটা তো অপরাধ নয়। ওকে গরীব করেছে কে? বলো, বলো কে ওকে গরীব করেছে?

সন্দীপ কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

মল্লিককাকা নিজেই নিজের প্রশ্নটার জবাব দিলেন। বললেন—আমরা।

—তার মানে?

মল্লিককাকা বললেন—তার মানে তুমি এখন বুঝবে না। অনেকে বুড়ো বয়সেও কথাটা বোঝে না, তুমি তাড়াতাড়ি যাও—

সন্দীপ তবু দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে।

মল্লিককাকা বললেন—কী হলো? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে? রাসেল স্ট্রীটে যাবে না?

সন্দীপ তবু নড়লো না সেখান থেকে।

মল্লিক-কাকা জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? তুমি কিছু বলবে আমাকে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—কী কথা, বলো?

সন্দীপ নিজেকে একটু ভালো করে সামলে নিয়ে বললে-—ক'দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে..

—কী ঘটনা? ভালো করে খুলে বলো না? বলতে অত ভয় পাচ্ছো কেন?

—না, ভয় পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি কথাটা বলা ভালো হবে কিনা—

মল্লিককাকা বিরক্ত হলেন সন্দীপের দ্বিধা দেখে। বললেন—তাহলে বোল না—

সন্দীপ বললে—না, আপনাকে বলাই ভালো। কিছুদিন আগে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলীবাবু এসেছিলেন, আমার সঙ্গে ওখানেই দেখা হয়ে গেল।

—তারপর?

সন্দীপ বললে—উনি আমাকে টাকা দিতে চাইছিলেন—

—টাকা? কীসের জন্যে টাকা?

সন্দীপ বললে যাতে আমি আমাদের খোকাবাবুর সঙ্গে বিশাখার বিয়ের বদলে ওঁর মেয়ে বিজলীর সঙ্গে দেবার কথা ঠাকুমা মণিকে বলি--

—তার মানে ঘুষ?

সন্দীপ যা ভয় করছিল তা-ই হলো। মল্লিককাকা কথাটা শুনে খুব রেগে গেলেন।

বললেন—এত বড় আস্পর্দ্ধা ও ভদ্রলোকের? তোমাকে কিনা ঘুষ দিতে চায়? মনে করেছে তোমাকে ঘুষ দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে? তা তুমি কী বললে?

সন্দীপ বললে --আমি রাজি হইনি- -আমি ওঁর টাকা ওঁর হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে চলে এলুম—

—এ কতদিন আগেকার কথা?

সন্দীপ বললে- এই পনেরো কুড়ি দিন আগেকার ঘটনা -

—তা এতদিন বলোনি কেন?

সন্দীপ বললে—আমার ভয় করছিল—

—ভয়? কীসের ভয়? সত্যি কথা বলতে তোমার কীসের ভয়? বলো কীসের ভয়?

সন্দীপ বললে—ভয় নয়, মানে মনে হয়েছে, যদি বললে আমার চাকরি চলে যায়—

—চাকরি চলে যাবার ভয়টাই তোমার কাছে বড় হলো? যার অধীনে তুমি চাকরি করছো, যিনি তোমার অন্নদাতা, তার ভালোটা আগে দেখবে, না তোমার চাকরিটা যাবার ভয়টা আগে দেখবে? কোনটা বড় হলো তোমার কাছে?

সন্দীপ চুপ করে রইলো।

তারপর মল্লিককাকা বললেন—যাও, এখন যাও, তোমার দেরি হয়ে যাবে। ওখান থেকে ফিরে এলে কী করা উচিত তা ঠিক করা যাবে। যাও।

সন্দীপ চলে গিয়ে যেন নিষ্কৃতি পেলে। আবার তাড়াতাড়ি রাস্তায় গিয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে গেল।
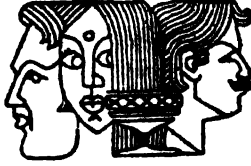
ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কোম্পানি বেচে দেবার সময়ে দেবীপদ মুখার্জীকে বলে দিয়েছিলেন—দেখ মুখার্জী, আমারা চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে কোর না তোমরা শান্তিতে থাকতে পারবে।

দেবীপদ মুখার্জী জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

—কারণটা হলো এই, যুদ্ধের পর তোমাদের ঘরে ঘরে আবার অন্য এক রকম যুদ্ধ বাধবে, সে যুদ্ধ হবে গৃহযুদ্ধ। সেই গৃহযুদ্ধ মানে সেই সিভিল-ওয়ার-এর সময়ে আমাদের কথা তোমাদের মনে পড়বে।

—কেন?

—কেন বলবো? তার কারণ হচ্ছে তোমাদের দেশ মালটি-কালচারের দেশ। একদিন আমরাই এই দেশকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে এক দেশ করেছিলাম। কিন্তু আমরা চলে যাবার পর আবার তোমরা মালটি-কালচারের দেশে পরিণত হবে, তখন হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের আবার ঝগড়া শুরু হবে। আরব দেশ থেকে পেট্রোডলার আসবে মুসলমানদের হাতে আর আমেরিকা থেকে ডলার আসবে ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের হাতে। আর রাশিয়াও তখন চুপ করে বসে থাকবে না। সে রুবল্ পাঠাবে এখানকার সি-পি-আই-এর লীডারদের হাতে। তখন পৃথিবীর ব্যালেন্স অব পাওয়ার নষ্ট হয়ে গিয়ে অন্য এক দুরবস্থার সৃষ্টি করবে। তখন ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে ডলার-রুবল আর পেট্রোডলার হাতিয়ে নেওয়ার জন্যে। সো বি কেয়ারফুল; তখন তোমাদের এই বিজনেস্ চালানো মুশকিল হয়ে যাবে। এই তোমাকে আমি বলে গেলাম মুখার্জি।

ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যাবার পর দেবীপদ মুখার্জী তেমন কিছু বিপদের আঁচ পাননি। যেটুকু আঁচ পেয়েছিলেন তার সবটাই আস্তে আস্তে সত্য হতে লাগলো, ইন্ডিয়ার অত দিনকার বন্ধু চায়নার সঙ্গে ইন্ডিয়ার গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। তারপর ইন্ডিয়ার প্রথম প্রাইম মিনিস্টার জহরলাল নেহরুও মারা গেলেন।

একবার লন্ডনে গিয়ে দেখা হলো মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড-এর সঙ্গে।

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? আমি যা বলেছিলাম তা ঠিক ঠিক হলো তো?

দেবীপদ মুখার্জী বললেন—হ্যাঁ—

ম্যাকডোনাল্ড বললেন—আমরা আসলে সেই কায়দাই করেছিলাম ইন্ডিয়া ছাড়বার আগে। ওই কাশ্মীরই তোমাদের ইন্ডিয়ার গলায় কাঁটা হয়ে থাকবে চিরকাল। ওই কাশ্মীর ইস্যুটাই হবে ভবিষ্যতের যুদ্ধের প্রধান কারণ! দেখবে, তোমাদের আমরা শান্তি দেব না কোনও দিন!

আর শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল।

এরপর দেবীপদ মুখার্জী মারা গিয়েছিলেন, শক্তিপদ মাথায় তুলে নিয়েছিলেন কোম্পানির ভার। তা তিনিও বেশিদিন বাঁচলেন না। তাঁর জায়গায় এলেন মুক্তিপদ। মুক্তিপদ মুখার্জী।

তা বলে ইতিহাস থেমে থাকেনি! ১৯৬৫ সালে যুদ্ধ হলো একটা। ওই ইংলন্ড আর আমেরিকা থেকেই আর্মস্ কিনতে হলো ইন্ডিয়াকে। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়াই বন্ধুর মত ইন্ডিয়ার দিকে তার মুক্তহস্ত বাড়িয়ে দিলে।

বাইরে যখন এই যুদ্ধ আর অস্ত্র আদান-প্রদানের লেনদেন চলছে, তখন দেশের মানুষ জিনিসপত্রের দর-দামের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জীবনযাত্রায় আর এক যুদ্ধের বলি হয়ে চলেছে। চারদিকে হরতাল, লক-আউট আর ক্লোজারের ঠেলায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

তখন রাতারাতি কোথা থেকে সব পার্টি গজিয়ে উঠলো। তারা সবাই মানুষের ভালো করবার ব্রত নিয়ে নেতা হয়ে উঠলো। আগে যা ছিল একটা পার্টি তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তিন-চারটে পার্টিতে পরিণত হলো। আগে যেখানে ছিল একজন লীডার এর পর ভাগাভাগি হয়ে হাজারটা লীডার। সকলের মুখেই একটা কথা, একটা শ্লোগান—মালিকের জুলুম মানবো না মানছি না, মালিকের হুকুম শুনবো না শুনছি না। কোথা থেকে সব দেশের আর দলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর দল গজিয়ে উঠলো। রাতারাতি তারা নিজেদেরকে নেতার আসনে বসিয়ে মজুরদের কল্যাণকামী হিসেবে আত্মপ্রচার শুরু করে দিল। পেছন থেকে কে তাদের টাকা জোগাচ্ছে, কাদের টাকায় নেতাদের গাড়ি বাড়ি হচ্ছে, সে-প্রশ্ন একবারও কেউ করলে না। শুধু নেতাদের পেছনে পেছনে মিছিল করে শ্লোগান দিয়েই তারা পরমার্থ লাভ করতে লাগলো।

আর তখন মুক্তিপদ কী করছেন?

সান্যাবি মুখার্জি কোম্পানির মালিক মুক্তিপদ মুখার্জী একবার একটা পার্টির লীডারকে টাকা দিচ্ছেন, আর একবার টাকা দিচ্ছেন অন্য পার্টির আর এক লীডারকে। সবাই আমার আপন, কেউ আমার পর নয়, আমি সকলের দলে। তার মানে আমি কারোর দলে নয়।

এই অবস্থার মধ্যে পড়ে যখন আর ফার্ম সামলাতে পারলেন না, তখন মনে পড়ে গেল সৌম্যর কথা। অফিসের আর যত কর্তা সবাই কর্মচারী। নামে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাওয়া লোকও কর্মচারী। অথচ কাউকে বিশ্বাস নেই, সবাই চায় আরো টাকা। দেখতে দেখতে আমেরিকার ডলার, ইংলন্ডের পাউন্ড, ফ্রান্সের ফ্রাঁ, ইটালির লিরা, জাপানের ইয়েন সব দামে ভারি হতে লাগলো আর ইন্ডিয়ার টাকার দাম হু-হু করে নামতে নামতে একেবারে ষোল আনা ষাট পয়সায় এসে ঠেকলো।

মুক্তিপদর তখন হুঁশ হলো। কল্ পেয়ে একদিন ডাক্তার এলো বাড়িতে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে—কী হলো আপনার?

মুক্তিপদ প্রেসারটা দেখাবার জন্যে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

প্রেসার মেপে ডাক্তার বললে—কী হলো, সিস্টোলিকটা এত বাড়ল কেন?

মুক্তিপদ মুখার্জি বললেন—কদিন থেকে ভালো ঘুম হচ্ছে না—

—কেন ঘুম হচ্ছে না? অফিসের কাজের ঝামেলা চলছিল বুঝি?

মুক্তপদ মুখার্জী বললেন—কাজ থাকলেই ঝামেলা থাকবে। ঝামেলাও থাকবে অথচ ঘুম আসবে, এই রকম একটা ওষুধ দিন আমায় ডাক্তার—

ডাক্তার বললে—একটু Callous হবার চেষ্টা করুন—

—Callous হবো কী করে?

ডাক্তার বললে—Callous যদি না হতে পারেন তাহলে দিন-কতক কোথাও ঘুরে আসুন। অবশ্য এটা psychological pressure যাকে আমরা বলি functional pressure. এর একমাত্র ওষুধ হলো সব কিছু ভুলে যেতে চেষ্টা করা—

মুক্তিপদ মুখার্জী বললেন—ভুলতে চেষ্টা করব কী করে? এই হাজার হাজার লোক আমাদের কনসার্নে, তাদের কথাও তো আমাকে ভাবতে হয়—

—তা হলে একটা করে 'ক্যামপোজ' খান্—

মুক্তিপদ মুখার্জী বললেন—আমার ভাইপোটা যদি মেজর হতো তাহলে তার ওপরে কিছু কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে—

—তা হলে তা-ই করুন, মিস্টার মুখার্জী আপনার বয়েস হচ্ছে, এখন থেকে আস্তে আস্তে সব কিছুর দায়িত্ব ছাড়তে শুরু করা উচিত—

তা, এই-ই হলো সূত্রপাত। অফিসের কাজে কনটিনেন্টে চলে গেলেন। সব জায়গাতেই বিজনেসের কথা। কেবল টাকা-আনা-পাই আর পাউন্ড-শিলিং পেন্স। সারাজীবন শুধু এই-ই করে এসেছেন। ইন্ডিয়ার বাইরে গিয়েও তাই-ই করলেন। তারপর একদিন রাত্রে আর ঘুমই এল না। মাথাটা খুব ধরে রইলো কদিন ধরে, ভাবলেন ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবেন! কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি। তারপর গেলেন জার্মানী। সেখান থেকে স্টেট্স্। মাথা ধরাটা ছাড়লো না। ডাক্তারকে দেখালেন। এক গাদা ওষুধ খেতে দিলে ডাক্তার। কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলবে! -

তাই ইন্ডিয়াতে এসেই চলে এলেন বিড়ন-স্ট্রীটের বাড়িতে। মা'র কাছে। কিন্তু মা-ও যেন কেমন হয়ে গেছেন। যেন পর-পর ভাব, খানিকক্ষণ বসেই আবার বেলুড়ের বাড়িতে। কিছুছু ভালো লাগলো না।

নন্দিতা কাছে এল। বললে—কী হলো? আজ এখুনি ফিরে এলে যে?

মুক্তিপদ বললেন—আজকে বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েছিলুম—

—সে কী? হঠাৎ?

—হঠাৎই গেলাম মার কাছে।

নন্দিতা বললে—বুড়ী আমার নামে খুব লাগালো তো?

—হ্যাঁ সেই একই পুবনো কথা!

নন্দিতা বললে—আমার নামে গালাগালি শুনতে তোমারও খুব ভালো লাগলো বুঝি?

—না, আমার খুব মাথা ধবে গেল।

নন্দিতা বললে—বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে। রাইটলি সার্ভড—আমি তোমাকে বলেছি বুড়ীর কাছে যেও না, তবু তুমি গেলে। আমার গালাগালি শুনতে তোমার ভালো লাগে, তাই ওখানে গিয়েছিলে—

—না, না, তা নয়।

—তা নয় তো গেলে কেন? ওখানে গেলেই তো তোমার বরাবর মাথা ধরে—এতো আজ নতুন নয়। অনেক শাশুডী দেখেছি বাবা কিন্তু তোমাব মা'র মতন অমন শাশুড়ী আর কেউ কখনো কোথাও দেখেনি। বুড়ি আর কতদিন বাঁচবে বলো তো! আর কতদিন জ্বালাবে আমাদের?

মুক্তিপদ বললেন—জানো, একটা নতুন কথা শুনে এলাম মা'র কাছ থেকে। সৌম্যর নাকি বিয়ে দিচ্ছে মা—

—সৌম্যর বিয়ে! কবে? কোথায়? আমাকে জ্বালাতে পারেনি বলে আবার কাকে বাড়িতে এনে জ্বালাবে?

মুক্তিপদ বললেন—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

—কী রকম?

—মা বললে আগেকার কোনও বউকে পছন্দ হয়নি বলে এবার নিজে পছন্দ করে বউ আনছে—

নন্দিতা বললে—আবার কার কপাল পুড়বে কে জানে, আহা...

না, এবার একেবারে গরীব ঘর থেকে বউ আনছে। শুনলাম মেয়ের বাপ নেই, মা বিধবা। কাকার সংসারে গলগ্রহ। কাকা রেলের কেরানী—

নন্দিতা কিছু বলবার আগেই মুক্তিপদ বললেন—আমি বললুম আমার একটা পার্টি আছে, সে মিডল ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার অর্ডার সিকিওর করেছে, তার মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিলে আমরা প্রায় থার্টি পার্সেন্ট অর্ডার পেতে পারি, তা মা শুনে রেগে উঠে বললে—তুই আমায় টাকার লোভ দেখাচ্ছিস? বোঝ কথা। আমি তো আমাদের ফার্মের ভালোর জন্যেই বলেছি, তা ছাড়া মেয়ের দাদা আবার একজন লেবার ইউনিয়নের লীডার। আজকালকার যুগে একসঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আর অন্যদিকে লেবার-ইউনিয়নের কো-অপারেশন, এটা কি কম কথা। কিন্তু মা তো বুঝতে চাইলে না, আমি কী বলবো বলো তো? আমি কত ব্ল্যাক টাকা পেয়ে যেতুম, তাতে মারও কত সুবিধে হতো। সেকথা বলতেই মা আমার ওপর ক্ষেপে গেল। বুড়ো হলে বোধহয় মানুষ ওই রকমই হয়, তখন আর নিজের ভালোটা কেউ বুঝতে পারে না—

নন্দিতা বললে—তোমার মা তো বরাবরই ওই রকম। এখন না হয় মা বুড়ী হয়েছে, কিন্তু আমি আগেও তো দেখেছি, চিরকালই তো এক-বগ্গা মানুষ। অনেক পাপ করলে তবে মানুষের অমন শাশুড়ী হয়। শাশুড়ী নয় তো যেন খাণ্ডরনী। আমাকে কী বুড়ী কম জ্বালিয়েছে। অমন শাশুড়ীর ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার—

মুক্তিপদ বললেন—যাকগে কাল থেকে আমি সৌম্যকে অফিসে আসতে বলেছি—

—অফিসে আসতে বলেছ? কেন?

—কেন আবার? এখন তো ও মেজর হয়েছে। ও-ও তো একজন ডাইরেক্টার। ও অফিসে এলে আমি একটু রিলিফ পাই।

—তাহলে তো নাতির কাছ থেকে বুড়ী অফিসের হাঁড়ির সব খবর পেয়ে যাবে।

মুক্তিপদ বললে—তা পেলে পাবে। আমি আর তার কী করবো।

নন্দিতা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাছের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মুক্তিপদ টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি—

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—এখনি আবার বেরোবে নাকি?

—হ্যাঁ, নাগরাজন ডেকেছিল—

নন্দিতা বললে—আবার কী কাজ?

মুক্তিপদ বললেন—ওই ইনকাম-ট্যাক্সের একটা চিঠি এসেছে জরুরী, সেই জন্যে

নন্দিতা বললে—ওই ইনকাম ট্যাক্সই তোমায় খেয়ে ফেলবে—

মুক্তিপদ বললেন—কী করবো বলো? ওদের এত টাকা খাওয়াচ্ছি তবু ওদের পেট কিছুতেই ভরছে না। সেই জন্যেই তো সৌম্যকে অফিসে নিয়ে আসছি—আমি আর পারছি না—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি নিচেয় এসে গাড়িতে উঠলেন। মুক্তিপদর জীবন মানেই যেন গাড়ি। মুক্তিপদর সমস্ত জীবনটা যেন গাড়ির মতই গড়িয়ে চলেছে। কবে যে তাঁর মাটির ওপর পা পড়েছে তা তাঁর মনেই পড়ে না। যদি মুক্তিপদ কোনও দিন মারা পড়ে তাহলে বোধহয় ওই হাওয়াই জাহাজে, আর নয় তো নিজের মোটর গাড়ির ভেতরেই সে মরে পড়ে থাকবে। জীবনটা মোটা টাকার ইনসিওর করা আছে, আর প্লেনে চড়ে উড়ে যেতে যেতে যদি দম আটকে বা এ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তা'হলে রিস্ক কভার করা আছে মোটা টাকায়। সেটা বছর বছর রিনিউ করা হয়। তবু সব সময় একটা ভাবনা থাকে। যদি জিজ্ঞেস করা যায়—কীসের ভাবনায়? তার উত্তরে মুক্তিপদ কিছুই বলতে পারবেন না। টাকার ভাবনা? কিন্তু তা তো নয়।

একবার প্লেনে উড়তে উড়তে সামনের র‍্যাক থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে এসে সময় কাটাবার জন্যে বসেছিল। তখন লাঞ্চ হয়ে গিয়েছে। সবাই নিজের নিজের সিটের পেছনে হেলান দিয়ে একটু আরাম করছে। হঠাৎ একটা পাতার ওপর চোখ পড়তেই দৃষ্টিটা সেখানেই আটকে গেল।

একটি কবিতা লেখা রয়েছে একটা ছবির তলায়। ছবিটার ভেতরে একজন বুড়ো মানুষ চুপ-চাপ ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। ঘড়িতে তখন রাত দু'টো কিন্তু ঘুম আসছে না লোকটার।

মুক্তিপদ একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ব্যাঙ্কে লোকটার অনেক টাকা, ঘরের ভেতরে হরেক রকমের দামী ফার্নিচার। বিলাস-ঐশ্বর্যের কোন অভাব নেই, তবু ঘুম আসছে না।

কিন্তু কেন ঘুম আসছে না, তার কারণ ছবিতে কোথাও লেখা নেই - শুধু নিচের বড়-বড় অক্ষরে টানা হাতের লেখায় এই কথাগুলো রয়েছে—

By money one can buy bed but not sleep
By money one can buy books but not brains
By money one can buy food but not appetite
By money one can buy finery but not a beauty
By money one can buy house but not a home
By money one can buy medicine but not health
By money one can buy luxuries but not culture
By money one can buy amusement but not happiness
By money one can buy religion but not salvation.

এইখানেই কবিতাটা শেষ হয়েছে।

মুক্তিপদ সেই উড়ন্ত প্লেনের মধ্যে বসেই কথাগুলো ভাবতে লাগলেন অনেকবার করে। সত্যিই তো, টাকা দিয়ে দামী বিছানা কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঘুম? ঘুম কি টাকা দিয়ে কেউ কিনতে পারে? টাকা দিয়ে ওষুধ কিনতে পারে সবাই, কিন্তু স্বাস্থ্য কি কেউ টাকা দিয়ে কিনতে পারে? ধর্মও টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায় কিন্তু মুক্তি? মুক্তি কোন্ বাজারে কিনতে যাবো?

পড়তে পড়তে মুক্তিপদর মনে হয়েছিল যে তাঁর শুধু টাকাই হয়েছে, তাঁর শুধু বয়েসই বেড়েছে, জ্ঞান তাঁর কিছুই হয়নি, কিন্তু এ-বয়েসে এ-জ্ঞান হয়ে তাঁর লাভ কী হলো? আরো আগে এ কবিতাটা পড়লে হয়ত তাঁর উপকারই হতো, কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

গাড়িতে যেতে যেতে মুক্তিপদর বহুদিন আগেকার পড়া এই কবিতাটা মনে পড়লো। গাড়ি নিয়ে যখন ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে পৌঁছুলো তখন যাকে সামনে দেখেন তারা সবাই সেলাম করতে থাকে মাথা নিচু করে।

এই সেলামটাই তাঁর জীবনে কাল হয়েছে। আগে সেই সেলামগুলো তাঁর খুব ভালো লাগতো। এই সেদিনও সেলাম পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন। কিন্তু আজ বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে মা'র সঙ্গে কথা বলার পর ওই অনেকদিন আগে পড়া কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়তেই সব কিছু বিরস ঠেকলো, যে-টাকায় কোনও দামী জিনিস কিনতে পাওয়া যায় না, কেন তাহলে তিনি সেই তুচ্ছ টাকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন?

নাগরাজন কাগজপত্র নিয়ে তৈরিই ছিল। মুক্তিপদ ঘরে ঢুকতেই সে দাঁড়িয়ে উঠলো। মুক্তিপদ বসতে তবে সে বসলো।

মুক্তিপদ চিঠিটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন—কানুনগো দেখেছে?

—হ্যাঁ। তিনি দেখে বলেছেন যে এ টাকাটা আমাদের পে করতে হবে—

কানুনগো মানে বিজনেশ কানুনগো। স্যান্সবি মুখার্জী এ্যান্ড কোং-এর ট্যাক্স-এ্যাডভাইজার। ইন্ডিয়ার একজন নামকরা ট্যাক্সেশ এক্সপার্ট।

মুক্তিপদ বললেন—একবার টেলিফোনে ডাকো তো কানুনগোকে—

কানুনগোকে ডাকা হলো। মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, তুমি নাকি বলেছ যে এই বারো লাখ তিরিশ হাজার টাকাটা আমাদের পে করতে হবে?

ওধার থেকে কানুনগো বললে— হ্যাঁ স্যার, পেমেন্ট করতে হবে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কেন? এক্সপেন্‌ডিচার দেখানো যায় না?

—তাহলে ব্যাক-ডেট দিয়ে সতেরো লাখ টাকার ভাউচার সাবমিট করতে হবে। ওই এ্যামাউন্টের ভাউচার সাবমিট করলে আমরা পুরো বিলিফ পেয়ে যাবো।

মুক্তিপদ রেগে গেলেন। বললেন—তা সেই কথাটা নাগরাজনকে বলবে তো! আমি বাইরে গিয়েছিলুম বলে কি তোমাদের দিয়ে কিছুই হবে না? এ-ব্যাপারটাও কি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে দেখতে হবে? তাহলে তোমাদের রাখা হয়েছে কেন?

কানুনগো চুপ! এ-কথার কোনও জবাব নেই তার মুখে!

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, ব্যাক-ডেটেড ভাউচার সাবমিট করা হচ্ছে—এ নিয়ে যেন আর ফারদার কোনও চিঠি না আসে, দেখো—

বলে রিসিভারটা রেখে দিলেন মুক্তিপদ। আর তারপর কয়েকটা জায়গায় টেলিফোন করতে লাগলেন। সতেরো লাখ টাকার ভাউচার যোগাড়ের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল দু'ঘণ্টার মধ্যে। সিমেন্ট, স্টোন চিপস, বালি, লোহার রড, এমনি কয়েক টন মাল কেনার এবং পেমেন্ট করার পাকা রসিদ। আর তার সঙ্গে আছে মোটা টাকার লেবার-চার্জ। সে-চার্জের কোনও ভাউচার দেখাবার দরকার নেই ইনকামট্যাক্স অফিসকে। দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা ম্যাজিক দেখানো হয়ে গেল খাতা-কলমে। যে-বিল্ডিং কখনও ভাঙ্গা হয়নি, কাগজে-কলমে দেখানো হয়ে গেল যে সেই বিল্ডিংই পুরনো হয়ে যাওয়ার জন্যে পুরো ভেঙ্গে ফেলে আবার সেই জমির ওপর নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়েছে সতেরো লাখ তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে।

এও ট্যাক্সেসান-এক্সপার্টের এক আজব ভেলকি।

মুক্তিপদ সেদিন অফিসের আর কোনও জরুরী কাজে মাথা বসাতে পরালেন না। সিমেন্ট, স্টোন-চিপস, বালি আর আয়রন-রডের ডীলাররা নিজেরা এসে পুরনো তারিখ দিয়ে ভাউচার লিখে দিয়ে গেল, সঙ্গে রেভেন্যু-স্ট্যাম্পের ওপর তাদের সইও করে দিলে। আর তারপর যে টাকাটা তারা বাঁ হাতে পকেটে পুরে নিলে, তার কোনও হিসেব কারোর লেজার বইতে লেখা রইলো না। এমনি করেই বারো লাখ টাকার ট্যাক্স-ডিম্যান্ড নোটিশ সতেরো লাখ ত্রিশ হাজার টাকার খরচের ভুয়ো দলিল দেখিয়ে পুরোপুরি নাকচ হয়ে গেল।

সারাদিন কারো লাঞ্চ করা হলো না।

বাড়ি থেকে নন্দিতা একবার টেলিফোন করেছিল তাগাদা দিয়ে। বলেছিল—কী হলো? তুমি লাঞ্চে আসবে না?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—না—

—সে কী? তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে?

মুক্তিপদ তবু বলেছিলেন—আমার এখন মরার সময় নেই, আমাদের এখানে কারো লাঞ্চ হয়নি আজকে, সময় পেলে হোটেলে লাঞ্চ সেরে নেব সবাই মিলে। তুমি খেয়ে নিও, আমার জন্যে বসে থেকো না—

ঘড়িতে তখন রাত আটটা তখনই মুক্তিপদ সারাদিনের মধ্যে প্রথম একটা সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে বুক খালি করে লম্বা একটা ধোঁওয়া ছাড়লেন। মুক্তিপদর মনে হলো, তাঁর যেন এক ফুঁয়ে দশ বছর বয়েস কমে গেল। আঃ, কী আরাম! অথচ এ ব্যাপারটায় গাফিলতি করলে কোম্পানির বারো লাখ টাকার বরবাদ হয়ে যেত!

নাগরাজন-এরও সারাদিন খুব ঝামেলা গেছে, সেও সারাদিন স্যারের সঙ্গে কাজ করেছে। কানুনগো কয়েক ঘণ্টা থেকে এক ক্লায়েন্টের কাজে চলে গিয়েছিল। সে কারো হোল-টাইম এমপ্লয়ী নয়। তার কাজ পার্টিকে ট্যাক্সেসন বিষয়ে এ্যাডভাইস দেওযা। দরকার হলে ওপর ওয়ালাদেরও সে হাত করতে পারে। তাতে তার ফিস দিলে সে ট্যাক্সদাতাদের হাতে আকাশের চাঁদও পাইয়ে দিতে পারে।

—একটু ড্রিঙ্ক করবে নাগরাজন?

নাগরাজন কী করবে কী বলবে হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলে না। স্যারকে এ-রকম অবস্থায় সে আগে আর কখনও দেখেনি। বললে—স্যার, আপনি বলেছেন, আমি ড্রিঙ্ক করতে পারি। কিন্তু আপনার যে লেট হয়ে যাবে বাড়ি যেতে স্যার—

মুক্তিপদ বললেন—তা হোক, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না, তোমার যদি বাড়ি যেতে লেট হয়ে যায় তাহলে অবশ্য...

নাগরাজন বললে—না-না, আমি আপনার কথা ভেবে বলছি—

নাগরাজন ভালো করে স্যারের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বছর থেকে সে মিস্টার মুখার্জীকে দেখে আসছে। কিন্তু কোনও দিন মানুষটাকে ভালো করে চিনতে পারেনি। এক একবার মনে হয়েছে মানুষটা খুব স্বার্থপর, আবার কখনো মনে হয়েছে উদার।

মুক্তিপদ বললেন—জানো নাগরাজন, এবার ওয়াশিংটনে গিয়ে খুব অসুখ হয়েছিল আমার, তাই এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম। সেই ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে কী বললে জানো? আমার নাকি কোনও অসুখই নেই। যা-কিছু আমার অসুখ, সবই নাকি আমার মনের...

নাগরাজন বললে—ঠিকই তো, সবই আপনার মনের—

—তুমিও বলছো আমার অসুখটা মনের?

—হ্যাঁ স্যার, আপনার কোনও অসুখই নেই।

মুক্তিপদ বললেন—আমার কী মনে হয় জানো নাগরাজন? আমার মনে হয় চিরকাল তো আমি বাঁচবো না, চিরকাল কেউই বাঁচে না। একদিন না একদিন সবাইকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হয়, তাহলে? তাহলে আমি চলে গেলেও কেউ তো আমাকে মনে রাখবে না। আমাকে তো সবাই ভুলে যাবে—

নাগরাজন এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। আর তার উত্তর দেবার আছেই বা কী যে উত্তর দেবে?

মুক্তিপদ বললেন—ডাক্তার শেষকালে আমাকে কী বললে জানো নাগরাজন?

—কী স্যার?

—বলল আমাকে টাকার চিন্তা বন্ধ করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কখনও টাকার চিন্তা করতে পারবো না। কিন্তু টাকার কথা না ভাবলে আমি সারাদিন কী নিয়ে ভাববো? টাকার কথা যদি না ভাববো তো আমার এই কোম্পানীতে যারা কাজ করছে তাদের কী করে পেট চলবে? কোম্পানীর টাকা আমদানি হলে তবেই তো আমি তাদের মাইনে দিতে পারবো। এই দেখ না, এতদিন পরে আজ বিডন স্ট্রীটে মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার মা'ও আমাকে টাকার কথা ভাবতে বারণ করলে। অথচ দেখ আজ সকালবেলাই তোমরা একটা ইনকাম ট্যাক্সের ডিম্যান্ড-নোটিশ পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠালে আর এমন ভাবিয়ে তুললে যে আজকে আমারও খাওয়া হলো না আর তোমারও খাওয়া হলো না—

নাগরাজন এ-কথারও কোনও উত্তর দিলে না। শুধু সামনে বসে চুপ করে শুনতে লাগলো।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—এই তো এখন বাড়ি যাবো, সেখানে গিয়েও আমাকে কেবল ওই টাকার কথাই শুনতে হবে। বাড়িতে তো লোকে শান্তিতেই কাটাতে চায়। টাকা ছাড়া তো অন্য কথা শুনতেও ভালো লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর মুখেও সেই একই কথা। কেবল টাকা-টাকা আর টাকা। অথচ, দেখ, আমার তো টাকার অভাব নেই। নিজের ফ্যামিলির জন্যে কোনওদিন আমি টাকার কোন অভাব রাখিনি। যে যা চেয়েছে তাই-ই আমি তাকে দিয়েছি। কিন্তু আমি? আমি লোকটার কথা বাইরের তোমরাও যেমন কেউ ভাবো না, তেমনি বাড়ির কেউই ভাবে না—

হঠাৎ আবার টেলিফোন এল।

নাগরাজন রিসিভারটা তুললে—কে?

অপারেটার বললে—মিস্টার মুখার্জীর বাড়ির থেকে রিং এসেছে—

মুক্তিপদ রিসিভারটা নিয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখনি আসছি—

টেলিফোন রিসিভারটা রেখে দিয়ে মুক্তিপদ বললেন — দেখলে তো নাগরাজন? দেখলে তো? এই আমার লাইফ। এবার বাড়ি যেতেই হবে—

বলে স্যার উঠলেন, বললেন—জানো নাগরাজন, এই ক্যালকাটায় প্রথম ইমপোর্টেড গাড়ি আসে আমাদেরই বাড়িতে, প্রথম ইনভার্টার আসে আমাদেরই বাড়িতে, পৃথিবীতে যা কিছু লাকসারিজ বাজারে নতুন এসেছে তা সবই কলকাতায় প্রথম আসে আমাদেরই বাড়িতে। আমাদের এত টাকা। কিন্তু আমার বাবা দেবীপদ মুখার্জী যখন মারা গেছেন তখন তাঁর বয়েস ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর, আমার দাদা যখন মারা গেছেন তাঁর বয়স ছিল, পঁচিশ বছর, আর আমি? আমার বয়েস এখন সাঁইত্রিশ, আমি আর ক'দিন বাঁচবো? টাকাই আমাদের সকলকে মেরেছে, এবার টাকা হয়ত আমাকেও মারবে—

ড্রাইভার নিশ্চয় তৈরিই ছিল।

মুক্তিপদ গাড়িতে উঠে বললেন—নাগরাজন, এতক্ষণ আমি তোমাকে কি বলেছি মনে নেই। তবে ফরগেট্ ইট্ অল্, সব ভুলে যাও—

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুক্তিপদর মনে পড়ে গেল আসল কথাটা। বললেন—হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি নাগরাজন, কাল থেকে আমার দাদার ছেলে এস মুখার্জী আমাদের অফিসে ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে জয়েন করছে। আমার পাশের ঘরটা খালি করে রাখবে। সব এ্যারেঞ্জমেন্ট যেন ঠিক থাকে। একটা টেলিফোনের লাইনের এক্সটেন্‌শনের ব্যবস্থাও যেন সকালেই হয়ে যায়। আর একটা নেম-প্লেট, তাতে লেখা থাকবে যে এস মুখার্জী, 'ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর', ও-কে?

নাগরাজন বললে—ও-কে স্যার—

কথা শেষ হওয়ার আগেই গাড়িটার ইঞ্জিন আর্তনাদ করে উঠলো আর তারপরেই মিস্টার মুখার্জী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
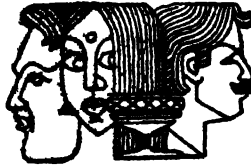
তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে বড় দেরীতে ভোর হয়। মনসাতলা লেনের বাড়িতে হতো সকাল সকাল। রাত্রে ভালো করে ঘুম হোক আর না হোক, অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠতে হতো যোগমায়াকে। তখন বিশাখাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হতো বাবুঘাটের গঙ্গায়। সেখানে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্নান করে বাড়ি ফিরতে হতো। আগে ছিল মেয়েকে দিয়ে ব্রত করানো। পরে সেটা যদিও বিজলী বিশাখা দুজনকেই বাড়িতে করানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু দুধ আনা, রান্না করা, দেওরের জন্যে ঠিক সময়ে ভাত দেওয়া, সারাদিন তার কাজের অন্ত ছিল না।

কিন্তু এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে? বাইরের কাজকর্ম সবই করে শৈল। মেয়ের জন্যে যারা পড়াতে আসে তাদের মাইনে যদিও আসে বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে কিন্তু তাদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে হয় যোগমায়াকেই। আর পড়ায় কি একজন?

আন্টি মেমসাহেব আসে ভোরবেলায়। সে বিশাখাকে শেখায় ইংরিজি। তারপরে যখন আন্টি মেমসাহেব চলে যায় তখন বিশাখাকে তৈরী হয়ে নিতে হয় স্কুলে যাবার জন্যে। স্কুলেও নিয়ে

যাবার জন্যে তখন বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে এসে একতলার পোর্টিকোর তলায় অপেক্ষা করে ড্রাইভার। আর তারপর বিকেল তিনটের সময় আসে অঙ্ক শেখাবার দিদিমণি। বিকেল চারটের সময় সে চলে গেলে আসে নাচের মাস্টার। সেও একজন মহিলা। সঙ্গে আসে তবলা বা ঢোলক বাজাবার একটা ছেলে।

বিশাখা যাতে ঠিকমত লেখাপড়া শেখে, ঠিকমত নাচ শিখতে পারে, তার জন্যে ঠাক্‌মা-মণির চেষ্টার বা টাকা খরচ করবার কোনও কার্পণ্য নেই।

মাঝে মাঝে বিশাখা ক্লান্ত হয়ে পড়তো। তখন তার ঘুম পেত। সে যোগমায়ার কোলের ভেতর মুখ লুকিয়ে চোখ বুজিয়ে ঘুমোতে চাইত।

যোগমায়া বলতো—কীরে ঘুমোচ্ছিস নাকি?

বিশাখা বলতো—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মা—

যোগমায়া বলতো—না, এখন ঘুমিও না, এখনি তোমার অঙ্কের দিদিমণি আসবে—

বিশাখা বলতো—দিদিমণি এলে তুমি বলে দিয়ো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি—

যোগমায়া বলতো—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই, জানো না তোমার জন্যে ঠাক্‌মা-মণি কত টাকা খরচা করছেন। ভালো করে লেখাপড়া করলে তবে তো তোমার বর তোমাকে ভালোবাসবে। কত ভালো বর হচ্ছে তোমার বলো তো? অমন বর কারো কপালে আগে হয়েছে?

বিশাখা কিছু জবাব দিত না কথার, তেমনি মায়ের কোলের ভেতরে মুখ গুজেই হয়ত অদৃশ্য বরের চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করতো—

বলতো—মা, একদিন চলো না মনসাতলা লেনের বাড়িতে—

—কেন, সেখানে গিয়ে কি হবে তোর? কি করবি তুই সেখানে গিয়ে?

বিশাখা বলতো—বিজলীর সঙ্গে খেলা করবো বেশ—

যোগমায়া বলতো—এখন কি তোমাব খেলা করবার বয়েস? তুমি তো এখন বড় হয়েছ? বারে, খেলা করবার বয়েস না তো কী কববার বযেস?

এখন তুমি বড় হয়েছ, দুদিন বাদে তো তোমার বিয়ে হবে। এখন শুধু মন দিয়ে লেখাপড়া করো, নইলে বিযের পর বব এসে যখন দেখবে তুমি লিখতে জানো না, পড়তে জানো না, নাচতে জানো না, তখন যে তোমার নিন্দে করবে—

বিশাখা বলতো—নিন্দে করলে তো আমার বয়ে গেল। আমিও বরের সঙ্গে কথা বলবো না, কেবল ঝগড়া করবো—

—ছি, ও-কথা বলতে নেই, বরের সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে?

বিশাখা বলতো—কেন, আমার নিন্দে করলে আমি ঝগড়া করবো না?

কথা বলার মাঝখানে অঙ্কের দিদিমণি এসে হাজির হয়। ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়নি। সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে আসে, তার জন্যে মাইনে বরাদ্দ দুশো টাকা মাসে। অঙ্কের দিদিমণি হলেও অন্য বিষয়ও পড়িয়ে যায়।

প্রথম দিকে এ বাড়িতে এসে ভদ্রমহিলাটি সব শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘটনা কারো জীবনে যে ঘটতে পারে তা তার কল্পনারও বাইরে ছিল। বলেছিল—এরকম ঘটনা তো মানুষের জীবনে কখনও ঘটতে শুনিনি। এ তো অনেকটা উপন্যাসের মতই শোনাচ্ছে মাসিমা। আপনি আপনার হবু জামাইকে চোখে দেখেছেন?

যোগমায়া বলেছিল—না মা, দেখবো কী করে? সে তো তখন ছোট ছিল। আমার মেয়েও যেমন তখন ছোট, জামাইও তখন তেমনি ছোট ছিল—

—আর এখন?

—এখন তো মেয়ে বড় হয়েছে। জামাইও নিশ্চয়ই বড হয়েছে। শুনছি, এখন নাকি জামাই অফিসে যেতে আরম্ভ করেছে।

দিদিমণির নাম জয়ন্তী। জয়ন্তী বিশাখার মতই একদিন গরীবের ঘরে জন্মেছিল। তারপর নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, নিজের চেষ্টায় এম-এ পাশ করেছে। কিন্তু বাপ-মা কেউ নেই। অনেকগুলো ছোট ভাই বোন নিয়ে সংসার। সারাদিন রাত হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যা টাকা-পয়সা উপায় করে তা সমস্ত তাদের মানুষ করতেই খরচ হয়ে যায়। একটা স্কুলের চাকরি আছে। সেটা নাম মাত্র। সেখানে কাজ কম ছুটি বেশি, কিন্তু মোটা মাইনে। বছরে প্রায় ছ'মাসের মত ছুটি। তবু বিয়ের কথা ভাববারও সময় হয়নি তার। এত বাড়িতে সকালে বিকেলে ছাত্রী পড়াতে যায় কিন্তু কোথাও এমন নিয়ম করে এত টাকা মাইনেও পায় না, আর অমন জলখাবারও কেউ খেতে দেয় না। শুধু জয়ন্তীই নয়, আন্টি মেমসাহেবও খুশী, নাচ শেখানোর দিদিমণিও খুব খুশী।

সারাদিন খাটা খাটুনির পর রাত্রে বিশাখা একেবারে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন যোগমায়া নিজের হাতে মেয়েকে খাওয়াতে বসে। তখন বিশাখা সেই আগেকার বিশাখা হয়ে ওঠে। তখন আর কিছুতেই খেতে রাজি হয় না সে।

বলে—আমার ঘুম পেয়েছে, আর খাবো না—

তখন যোগমায়া তাকে কোলে নিয়ে ভোলাতে বসে। অনেক কষ্টে তার ঘুম ভাঙ্গায়। বলে—ছি, খেতে হয়। না খেলে রোগা হয়ে যাবে যে। তখন বর নিন্দে করবে—

বিশাখা বলে—আমি বিয়ে করবো না—

যোগমায়া বলে—ও কথা বলতে নেই। মেয়েমানুষের বিয়ে না হওয়া কি ভালো। বিয়ে হলে তোমার বর কত ভালো ভালো শাড়ি দেবে, কত ভালো ভালো গয়না দেবে, কত টাকা দেবে—

বিশাখা বলে—দিদিমণি তো বিয়ে করেনি, দিদিমণি যে কত ভালো ভালো শাড়ি পরে, তার বেলায়? তার তো বর নেই।

যোগমায়া মেয়েকে বকে। বলে—তাহলে দিদিমণির মত সারাজীবন তুমিও আইবুড়ো হয়ে থাকো, তাহলে তোমাকেও চিরকাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিদিমণির মত ছেলে মেয়েদের পড়িয়ে টাকা রোজগার করতে হবে—

তারপর একটু থেমে আবার বলে—আর এই যে এত বড় বাড়ি, এই যে এত মাছ মাংস দই রাবড়ি খেতে পাচ্ছো, এ কার দৌলতে শুনি? কে এর টাকা যোগাচ্ছে?

বিশাখা জানতো না, বলতো—কে?

যোগমায়া বলতো—কেন, জানো না কে যোগাচ্ছে? তোমার বর।

—আমার বর?

—হ্যাঁ রে মুখপুড়ী হ্যাঁ। তোর বরই সব যোগাচ্ছে—

বিশাখা জিজ্ঞেস করতো – কেন যোগাচ্ছে এত?

– কেন যোগাচ্ছে তা বিয়ে হলেই তুই বুঝবি। বিয়ে হলে তখন বুঝতে পারবি আমি কেন তোর জন্যে এত ভাবতুম। তখন দেখবি তুই আমাকে একেবারে ভুলে যাবি, বরকে ছেড়ে আমার কাছে একবার আসতেও চাইবি না। আর শুধু কি তাই, বরের সঙ্গে তুই তখন কত দেশ-বিদেশে ঘুরবি, উড়োজাহাজে চড়ে কত দূর-দূর জায়গায় যাবি, তখন আমার কথা তোর মনেও থাকবে না, তখন আমাকে তুই একেবারেই ভুলেই যাবি—দেখিস—

কথা শুনতে শুনতে কখন বিশাখা নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়তো তা সে নিজেও টের পেত না। কিন্তু যোগমায়ার তখনও ঘুম আসতো না। অনেকক্ষণ জেগে জেগে বিশাখার কথাই ভাবতো। বিশাখার বাবার কথাও ভাবতো। বিশাখার বাবা মারা যাবার আগে যে কথাগুলো তাকে বলেছিল সেই কথাগুলোও মনে পড়তো। তারপর এক সময়ে কখন নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়তো।

সকাল বেলা সন্দীপ আসতো এ বাড়ির খোঁজ খবর নেবার জন্যে। এ বাড়ির যাবতীয় দরকার-অদরকারের সঙ্গে এ বাড়ির ভালো মন্দের খবর দেওয়াও তার কাজের মধ্যে পড়তো। আর সে খবর দৈনিক গিয়ে দিতে হতো ঠাকমা-মণিকে।

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করতেন—এখন বৌমার শরীর কেমন দেখলে?

সন্দীপ বলতো—ভালো—

—আর মাছ মাংস ডিম দুধ ঠিক-ঠিক নিয়ম করে খাচ্ছে তো?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—এ সপ্তাহে ওজন নেওয়া হয়েছিল? ওজন একটু বেড়েছে?

সন্দীপ বলতো— হ্যাঁ আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি বললেন—এ সপ্তাহে এক কেজি বেড়েছে।

—আর মাস্টারনীরা কেমন পড়াচ্ছে?

সন্দীপ বলতো—এবার ক্লাসে তো ফোর্থ হয়েছে—

—কেন, ফার্স্ট হতে পারেনি কেন? তাহলে মাস্টারনীদেরই দোষ। গাদা গাদা টাকা নিচ্ছে মাসে মাসে, সে-সব কি ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে? তুমিই বা তাহলে আছো কী করতে? তুমি তো মাস্টারনীদের বলতে পারো। তুমি আমার নাম করে তাদের বলে দিও, যদি পরের বার বউমা ফার্স্ট না হতে পারে তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেব। বিদেয় করে অন্য মাস্টারনী রাখবো। তখন মজা টের পাবে। টাকা কি আমার সস্তা পেয়েছে সবাই?

সপ্তাহে একবার করে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে সন্দীপ আসতো বিশাখাকে পরীক্ষা করবার জন্যে। ক্ষিদে হচ্ছে কিনা হজম হচ্ছে কি না, খিদে বেড়েছে না কমেছে, এই সব পরীক্ষা করে দেখাই ছিল ডাক্তারবাবুর কাজ। তিনি সব কিছু দেখে পরীক্ষার রিপোর্ট দিলে তা ঠাক্‌মা-মণিকে গিয়ে বলতে হতো।

ডাক্তারবাবু আসতো সপ্তাহে একদিন, কিন্তু সন্দীপকে রোজই একবার করে এই রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে আসতে হতো।

আন্টি মেমসাহেব একদিন সন্দীপকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি গোপালকে চিনলে কী করে?

সন্দীপ বলেছিল—ও যে আমাদের গ্রামের ছেলে। আমরা ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি।

তারপর সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি গোপালকে চিনলে কী করে?

আন্টি মেমসাহেব বলেছিল—ও, হি ইজ গ্রেট—

গোপাল যে কীসে গ্রেট তা খুলে বলেনি মেমসাহেব। আন্টি মেমসাহেব চলে যাবার পর যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তুমি আন্টি মেমসাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কী কথা বলছিলে বাবা?

সন্দীপ বললে—আমার এক বন্ধুর কথা ওকে জিজ্ঞাসা করছিলুম—

যোগমায়া বললে—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বাবা?

সন্দীপ বললে—করুন না জিজ্ঞেস।

যোগমায়া বললে—জানি না, কথাটা বলা ভালো হবে কিনা—

সন্দীপ বললে—আপনি বলুন না, আমি কিছু মনে করবো না—

অনেক দিন থেকেই যোগমায়া জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু সেদিন আর কথাটা চেপে রাখতে পারলে না।

বললে—কথাটা হচ্ছে, এই যে তুমি তো বাবা আমাদের ভালো-মন্দ সবই দেখছো। আমাদের কোনও অভাবই রাখেননি তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি। বুঝতে পারছি আমাদের জন্য তাঁর হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে। এখন ভাবলে অবাক হতে হয় কত কষ্ট করে খিদিরপুরের দেওরের বাড়িতে কাটিয়েছি। তা এ তো সবই তোমার ঠাক্‌মা-মণির দয়াতেই সম্ভব হয়েছে—তাই বলছিলুম—

—বলুন না কী বলবেন? আমার কাছে বলতে আপনি কোনও লজ্জা করবেন না মাসিমা, আমাকে আপনি নিজের ছেলের মত মনে করবেন—

যোগমায়া বললে দেখ বাবা, বিশাখা তো এখন অনেক বড় হয়েছে। কবে যে তার বিয়ে হবে তা তোমার ঠাক্‌মা-মণিই জানেন—শুধু আমার একটা অনুরোধ—

—বলুন না কী অনুরোধ আপনার?

যোগমায়া বললে—আমার জামাইকে দেখতে বড় সাধ হয়।

সন্দীপ বললে—দেখতে সাধ হওয়াইতো স্বাভাবিক—

যোগমায়া বললে—তোমার ঠাক্‌মা-মণি জানতে পারলে যদি আবার রেগে যান তা হলে অবিশ্যি দরকার নেই—

সন্দীপ বললে—আপনি বিশাখার মা, আপনার জামাইকে দেখতে তো ইচ্ছে হবেই—

যোগমায়া বললে—তোমার ঠাক্‌মা-মণি যদি আপত্তি করেন তাহলে আর দবকাব নেই বাবা—

সন্দীপ বললে—সৌম্যবাবুকে একবার এ বাড়িতে নিয়ে আসবো?

—তুমি আনতে পারবে বাবা?

সন্দীপ একটু ভেবে বললে—চেষ্টা করে দেখব আমি—

—কিন্তু তোমার ঠাক্‌মা-মণি জানতে পারলে হয়ত তিনি রাগ করবেন। তখন রেগে গিয়ে হয়ত আমাদের এ-বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দেবেন...তুমি বরং

সন্দীপ বললে—সৌম্যবাবু তো এখন রোজই অফিস যাচ্ছেন...

—রোজ অফিসে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

যোগমায়া বললে—তাহলে এক কাজ করো না বাবা, জামাই যখন আপিসে যাবে কিংবা যখন আপিস থেকে ফিরবে তখন তুমি এই বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে বলে দিও না, আমি তাহলে বাড়ির সামনের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবো, আর তখনই এক পলক চোখের দেখা দেখে নেব—

সন্দীপ বললে—তাও মন্দ কথা নয়। কিন্তু আগে থেকে কিছু কথা দিতে পারছি না মাসিমা, বুঝতেই তো পারছেন, আমি তো ও-বাড়িতে চাকরি করি, এমন কিছু করা যাবে না যাতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়—

যোগমায়া বললে—তোমাকে নিজের ছেলের মত মনে করি বলেই কথাটা বলতে পারলুম বাবা, অন্য কেউ হলে কি আমার বলতে এত সাহস হতো? সাহস হতো না, সবাই জিজ্ঞেস করে কিনা, আমি জামাইকে দেখেছি কিনা, এই সব—

—কে জিজ্ঞেস করে?

—ওই যেমন বিশাখাকে অঙ্ক পড়াতে আসে জয়ন্তী দিদিমণি, তার নিজের এখনও বিয়েই হয়নি। সেও জিজ্ঞেস করছিল আমি জামাইকে দেখেছি কিনা। তাই আমার বড় সাধ হয় বাবা তাকে দেখতে—

সন্দীপ বললে—যদি আপনার জামাইকে এইখানে এনে তুলি? এই বাড়িতে?

যোগমায়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত মুখ করে বললে—তুমি জামাইকে এই বাড়িতে এনে তুলবে! বলছো কী বাবা তুমি? তুমি পারবে?

সন্দীপ যেন মনে মনে কী ভাবতে লাগলো। তারপর চলে যাবার আগে বললে—আচ্ছা আমি ভাবি একটু মাসিমা, আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর আমি আপনাকে বলে রাখবো, আগে থেকেই, আমি বলে রাখবো—

যোগমায়া আবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললে—দেখো বাবা, যেন কেউ জানতে না পারে—

সন্দীপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে—না না, কেউ জানতে পারবে না, আপনার কোনও ভয় নেই, আমি আগে থেকে আপনাকে সব জানিয়ে যাবো—

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে এসেও সন্দীপের মন থেকে কথাটা দূর হলো না। সৌম্যবাবুকে কী করে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে যাবে? সৌম্যবাবু যদি তার কথা না রাখে! সৌম্যবাবুর সঙ্গে তার তো মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক। মনিব কি চাকরের কথা শুনবে?

বাড়িতে আসতেই মল্লিককাকা বললেন—তোমার মা তোমাকে চিঠি লিখেছে, এই নাও—

মা'ব চিঠি। মা'র কাছ থেকে চিঠি এসেছে শুনেই সন্দীপ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

সামান্য একটা পোস্ট-কার্ডের চিঠি।

মা লিখেছে—"খোকা, তোমার পাশ করার খবর পেয়ে খুব আনন্দিত হইয়াছি। আমি খবরটা পাইয়াই মা শীতলার মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়া আসিয়াছি। তোমার শরীর কেমন জানাবে। আমি বাবুদের বাড়ি কাজ করিতে গেলে সকলেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। তুমি পাশ করিয়াছ শুনিযা বাবুদের বাড়ির সকলেই আনন্দ করিয়াছে। এবার তুমি কী করিবে জানাইয়া পত্র দিও। নিজের শরীরেব দিকে নজর রাখিবে। তোমার মল্লিককাকাকে আমার প্রণাম জানাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি অনেক বড় হও। তোমার উন্নতি হউক। তোমার উন্নতি হইলে আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে। ইতি—আশীর্বাদিকা—মা।"

মা'র জবানীতে চিঠি লেখা বটে, কিন্তু সন্দীপ জানতো ও চিঠি চ্যাটার্জী বাবুদের বউ-এর লেখা। মা নিজে লেখাপড়া জানে না, তাই সন্দীপের চিঠি গেলেই মা সেটা নিয়ে বাবুদের বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে নেয়।

মল্লিককাকা বললেন—মা'কে একটা চিঠি লিখে দাও এবার। লিখে দিও এখানে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। আজকেই লিখে দিও।

মনে আছে, সেই ছোটবেলায় মা'র চিঠি পেলে যে তার কী আনন্দ হতো, তা বলে বোঝানো যেত না। সত্যিই, বোধহয় ছোটবেলাটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়। বড় হয়ে সন্দীপ কত টাকা উপায় করেছে, কত সম্মান পেয়েছে, কিন্তু ছোটবেলায় মার কাছ থেকে সামান্য একটা চিঠি পাওয়ার মধ্যে দিয়ে যে কত সুখ পেয়েছে সন্দীপ, তা আর পরে কখনও সে পায়নি।

সেদিন মাকে চিঠি লিখে সেটা বড় পোস্টাফিসের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে সন্দীপ যখন বাড়ি এল তখন সিংহবাহিনীর মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে সাড়ম্বরে রোজকার মত আরতি হচ্ছে। ঠাক্‌মা-মণি নিজে তেতলা থেকে নেমে এসে আরতি দেখলেন। আরতির শেষে প্রণাম করলেন। পাশে বসে বিন্দুও প্রণাম করলেন। তারপর সবাই প্রসাদ পেলে।

মল্লিককাকার ঘরেও প্রসাদ নিয়ে এল ঠাকুর।

মল্লিককাকা জিজ্ঞেস করলেন—চিঠি লিখলে মা'কে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ।

মল্লিককাকা বললেন—তোমার মা তো জীবনে কাউকে ঠকাননি, কাউকে কষ্টও দেননি। তোমার মা'র ভালোই হবে—দেখে নিও—

কথাটা কি ঠিক? সন্দীপ নিজেকেও অনেকবার প্রশ্নটা করেছে। সত্যিই কি যারা জীবনে কোনও দিন কাউকে ঠকায়নি, কাউকে কষ্টও দেয়নি, তাদের ভালোই হয়?

কিন্তু গোপাল? গোপাল তো উল্টো কথা বলতো।

গোপাল বলতো—কাউকে না ঠকিয়ে ইতিহাসে কেউ বড়লোক হতে পারেনি।

সন্দীপ তখন গোপালের কথায় অবাক হয়ে যেত। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের কথা ভাবতো। তখন তো এই বিড়ন স্ট্রীটের মুখার্জীবাবুদের সে দেখেনি! বেড়াপোতায় বড়লোক বলতে তখন চ্যাটার্জীবাবুদেরই সে চিনতো। কিন্তু চ্যাটার্জীবাবুদের বড়লোক হওয়ার ইতিহাস সে জানতো না, জানবার ইচ্ছেও তার হতো না।

মাকে একবার সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—মা, চ্যাটার্জীবাবুরা অত বড়লোক কী করে হলো মা?

মা ছেলের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওরা বড়লোক কেন তা আমি কী করে জানবো?

সন্দীপ মা'র সে উত্তর শুনে খুশী হতো না। আবার জিজ্ঞেস করতো—তাহলে আমরা কেন গরীব লোক মা? তোমাকে কেন ওদের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে হয়?

মা ছেলের এ প্রশ্ন শুনে আরো অবাক হয়ে যেত। শেষকালে বিরক্ত হয়ে বলতো—আমি গেল জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম, তাই এ-জন্মে এত গরীব হয়েছি।

সন্দীপ মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করতো—পাপ কী? পাপ কাকে বলে? মিথ্যে কথা বলা পাপ? চুরি করা মহাপাপ? স্কুলের পড়ার বইতে তো তাই লেখা আছে।

গোপাল বলতো—ইস্কুলের বইতে সব মিথ্যে কথা থাকে। চুরি না করলে কি দেশের রাজারা বড়লোক হতে পারতো? পরকে ঠকিয়েই জমিদাররা বড়লোক হয়েছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—তা হলে বইতে মিছে কথা লেখা থাকে কেন?

গোপাল বলতো—বইগুলো তো গভর্মেন্টই লেখায়। গভর্মেন্ট যেমন কথা বইতে লিখতে বলে, লোকেরা টাকা পেয়ে সেই কথাই লেখে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করতো—গভর্মেন্ট মানে কারা রে?

—এই রে, তুই তাও জানিস না? আগে যেমন রাজা থাকতো, এখন তেমনি গভর্মেন্ট' এই যে দেখছিস পুলিশ, চৌকিদার, দারোগা—এরাই আমাদের গভর্মেন্ট এরাই সরকার। ওরা যা করতে বলবে তাই-ই আমাদের করতে হবে।

তারপর একটু থেমে গোপাল গলাটা আরো নিচু করে বলতো—এই যে এক বছর আগে বেড়াপোতায় ডাকাতি হয়ে গেল, মনে আছে?

সন্দীপের মনে ছিল। বললে—হ্যাঁ, মনে আছে কেশববাবুদের গুদাম থেকে চল্লিশ হাজার টাকা লুটে নিয়েছিল ডাকাতারা—

গোপাল বললে—কারা ও ডাকাতি করলো বল তো?

—কারা আবার, ডাকাতরা।

—দূর, তুই কিস্যু জানিস না।

—তাহলে কারা?

গোপাল বললে—গভর্মেন্টই চুরি করালে।

সন্দীপ বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

গোপাল বললে—তার মানে বুঝলি না? গভর্মেন্ট মানে তো একজন নয়, গভর্মেন্ট মানে কয়েকজন লোক। তারা যখন দেশের রাজা হতে চায় তখন তারা দল বাঁধে। তারা দল বেঁধে সবাইকে বলে—তোমরা আমাদের ভোট দাও। কিন্তু টাকা না থাকলে টাকা না উপায় করলে দেশের জন্যে খাটবে কী করে? তাদেরও তো খাওয়া পরার জন্যে টাকা চাই। খালি পেটে তো আর দেশ সেবা চলে না। তখন তারা ডাকাতি করে।

সন্দীপ তখন খুব বোকা ছিল। গোপালের কথা কিছুই বুঝতে পারলো না।

বললে—কোথায় ডাকাতি করে?

—সব জায়গায়। আগে স্বদেশী যুগে যেমন লোকেরা ইংরেজদের খাজনা লুঠ করতো, এখন এই যুগে তেমনি তারা দিশী লোকদের গুদাম লুঠ করে। সেই লুঠ করা টাকা দিয়ে মন্ত্রী হয়ে তারা আমাদের মত গরীব লোকদের পকেট কেটে নিজেদের পকেট ভর্তি করে —

মন্ত্রী? মন্ত্রীরা আমাদের পকেট কাটে?

গোপাল বললে—হ্যাঁরে, বোকা-চন্দর। মন্ত্রীরাই তো এ যুগের রাজা রে। সেই মন্ত্রী হতে গেলে তো অনেক টাকা খরচ করতে হয়। অনেক গুণ্ডা পুষতে হয়। শেষে যখন তারা মন্ত্রী হয় তখন তারা সেই গুণ্ডাদের চাকরি দেয়, চাকরি দিয়ে সেই গুণ্ডাদের পুষতে বাধ্য হয়।

আজ এতদিন পরে মল্লিককাকার কথা শুনে আবার তার সেই সব দিনকার গোপালের কথাগুলি মনে পড়লো —

খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্দীপ সেদিনও নিজের জায়গায় শুয়েছিল। সেই ছোট বেলাকার গোপালের সঙ্গে যে এতকাল পরে কলকাতায় এসে আবার দেখা হবে তা কি সেদিন সে কল্পনা করতে পেরেছিল। আর এত টাকাই বা কোথা থেকে পেলে যে গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছে? তবে কি সে মন্ত্রী হয়েছে? তবে কি সে গুণ্ডা হয়েছে? কেন সে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশদের মুঠো- মুঠো টাকা দিয়ে বেড়ায়। কেন সে নাইট ক্লাবে মদ খেতে যায়? সৌম্যবাবুর মত বড়লোকদের সঙ্গে কী করে আলাপ হয়? আর যে শ্রীপতি মিশ্র তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে মন্ত্রী হয়েছে, তার সঙ্গেই বা সে মেশে কী করে? আর ওই যে অ্যান্টি মেমসাহেব, যে বিশাখাকে ইংরিজী পড়ায় তাকেই বা গোপাল চিনলে কী করে? গোপাল তো ইংরিজীর ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত পড়েনি, তবু ইংরেজী জানা মেমসাহেবের সঙ্গে ভাব করে কী করে?

হঠাৎ কানে এল সেই পুরনো শব্দটা। সৌম্যবাবু কি তাহলে এখনও রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে যায়?

সন্দীপ অন্ধকারের মধ্যে মল্লিককাকার দিকে চেয়ে দেখল। তিনি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, জোরে জোরে নাক ডাকছে তাঁর। সে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। সৌম্যবাবু তো এখন স্যাক্সবি মুখার্জী কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। সকালবেলাস্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে রোজ অফিসে যায়। সারাদিন অফিসেই কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। তা সত্ত্বেও আবার রাত্রে বাইরে যাবে? তাহলে কখন ঘুমোবে? না ঘুমিয়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে?

মাসিমার কথাটাও মনে পড়লো। মাসিমা একবার তাঁর জামাইকে দেখতে চেয়েছেন। দেখতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

আর বিশাখা?

বিশাখারও নিশ্চয়ই ইচ্ছে হতো তার বরকে দেখতে। বিশাখাও তো আর সেই আগেকার বিশাখা নেই। সেও বুঝতে শিখেছে। সেও জেনে গেছে যে তাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি, তাদের সংসার-খরচ, তার বাড়ির দিদিমণিদের মাইনে, ইস্কুলে যাবার গাড়ি আর ইস্কুলের পড়বার মাইনে সমস্তই আসে ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে। তারাই তাদের সব কিছুর খরচ যোগায়। অথচ যে-মানুষটার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, তাকে সে-ও যেমন দেখেনি, তার মাও তেমনি তাকে দেখেনি।

যোগমায়া একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ বাবা যার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা তাকে তো দেখেছ?

সন্দীপ বলেছিল—তা তো দেখেইছি।

সন্দীপ কী জবাব দেবে, ঠিক করতে পারেনি। শুধু বলেছিল—ওদের অনেক টাকা। এতটাকা যে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না—

—গায়ের রং?

—গায়ের রং ফর্সা।

—আমার বিশাখার গায়ের রং-এর চাইতেও ফর্সা? না কি বিশাখার গায়ের রং-এর চাইতে নিরেস?

এবারও এর জবাবে সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারেনি। খানিক ভেবে বলেছিল—বিশাখার চাইতেও আমাদের ছোটবাবু ফর্সা—

কথাটা শুনে বিশাখা বোধহয় খুশীই হয়েছিল, খুশীও যেমন হয়েছিল তেমনি অবাকও হয়েছিল। বলেছিল—আমার চাইতেও ফর্সা? তাহলে সাহেব বাচ্চা নাকি?

কথাটা শুনে মাসিমা বিশাখাকে বকে দিয়েছিল। বলেছিল—চুপ কর পোড়ারমুখী, যা মুখে বলতে নেই তা-ই বললি? ছিঃ—

সন্দীপ বলেছিল—ওকে বকবেন না মাসিমা ওর বয়েস কম, কী বলতে কী বলে ফেলেছে—

—তুমি থামো তো!

মাসিমা সন্দীপকে থামিয়েছিল। বলেছিল—তুমি থামো তো বাবা, ওর বয়স কম? তুমি বলছো কী? ওই বয়েসে যে আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কাকে কী বলতে হয় তাও এখনও শিখলো না, বিয়ের পর ওর কী গতি হবে বলো তো! তখন তো আমাকে বদনাম দেবে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। বলবে মা মাগী মেয়েকে সহবৎটাও শেখায়নি, তখন? তখন কী হবে?

বিশাখা বেশ মজা পেয়েছিল বলেছিল—আমি খারাপটা কী বলেছি, সাহেব বাচ্চা বলে আমি কী অপরাধ করেছি?

—দেখলে তো বাবা, দেখলে তো! মেয়ে আবার বলেছে—কী অপরাধ করেছি! ওরে পোড়ারমুখী, তুই কি আমাকে সারাটা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে তবে আমাকে মুক্তি দিবি? তুই নিজেদের ভালোটাও এখনও বুঝতে শিখলি নে? আর কবে নিজের ভালো বুঝতে শিখবি? বয়েসের তো গাছপাথর নেই, কবে তোর ঘটে বুদ্ধি হবে শুনি? আমি মলে?

এ-রকম ঝগড়া প্রায়ই হতো। আর সন্দীপকেই এসব কথা শুনতে হতো কান পেতে।

বলতো—আপনি অত বকবেন না মাসিমা। ও ছোট মেয়ে, ও কী-ই বা বোঝে?

বলে অনেক সময়ে চলে আসতো।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকে হঠাৎ বিশাখার গলা শোনা যেত, এই শোনো।

সন্দীপ ওপর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কী হলো আমাকে কিছু বলবে?

বিশাখা ইঙ্গিত করতো ওপরে উঠে এসো—

সন্দীপ নিঃশব্দে আবার উপরে উঠতো। বিশাখাও সিঁড়ি দিয়ে দু'তিন ধাপ নিচেয় নেমে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করতো—আমার বর কি তোমার চেয়েও ভালো দেখতে?

সন্দীপের চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে উঠতো বিশাখার কথাগুলো শুনে। তার কথার কী জবাব দেবে বুঝতে পারতো না। শুধু অবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো বিশাখার মুখের দিকে।

আর এক মুহূর্তের মধ্যে বিশাখা একটা কাণ্ড করে বসতো। হঠাৎ সন্দীপের গালে একটা আলতো চড় মেরে বলতো একটা আস্ত বোকা —

বলেই দুড়-দুড় করে ওপরে উঠে গিয়ে সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত। আর সন্দীপ সেই সিঁড়ির মাঝখানেই দাঁড়িয়ে থাকতো হাবার মত।

মল্লিককাকার নাকটা তখনও ডাকছিল। সন্দীপ সেই অন্ধকারের মধ্যেই জেগে জেগে সেই পুরনো দিনের কথাগুলোই আপন মনে ভাবছিল। কেন বিশাখা তাকে 'আস্ত বোকা' বলেছে? সত্যিই কি সন্দীপ বোকা? সন্দীপ গরীব হতে পারে, কিন্তু সে কী এমন কাজ করলে যাতে তাকে বিশাখা বোকা বললে?

সেদিনও অনেক রাত্রে সেই লোহার গেট খোলার পুরনো, ঘড়-ঘড় শব্দটা হলো।

তবে কি সৌম্যবাবুও এখনও রাত্রে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে? এখন তো সৌম্যবাবু স্যাক্সবি মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। এখন তো সারা দিন সৌম্যবাবু অফিসে গিয়ে কাজকর্ম করে। তাহলে রাত্রে আবার বেরোয় কী করে?

সন্দীপ বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠলো। তারপর টিপি-টিপি পায়ে ঘরের দরজায় খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। চারিদিকে সেই একই দৃশ্য। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই নিঃশব্দ খাঁ-খাঁ পরিবেশ। সেই নিরিবিলি আবহাওয়া। সন্দীপ আস্তে আস্তে দেখলে গিরিধারী গাড়িটা ঠেলে বাইরের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। আর গাড়িটা রাস্তায় পড়তেই সৌম্যবাবু তার ওপর চড়ে বসলো আর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই সেটা গড়-গড় করে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে গিরিধারী আবার লোহার গেটটা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও সন্দীপকে গিরিধারী বললে—কেয়া বাবুজী, আপনি ঘুমোননি?

সন্দীপ বললে—কী, ছোটবাবু এখনও আগেকার মত রাত্তিরে বাইরে থাকে?

গিরিধারী বললে—হ্যাঁ, বাবুজী, আপ কিসীকো বাতাইয়ে মাত। মেরা নৌক্‌রী ছুট্‌ যায়গী...মগর...
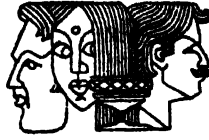
স্যাক্সবী মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড শুধু ইণ্ডিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী তার জাল ছড়ানো। আগেকার ইংরেজরা এসে এখান থেকে শুধু এখানকার কাঁচা মালই নিয়ে যায়নি, এখানকার কাঁচা মাল থেকে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করেও তা দেশে বিদেশে পাঠিয়েছে। যারা গরীব, তাদের কাছে সেই যন্ত্রপাতি বিক্রি করে টাকাকড়িও নিজের জন্মভূমিতে পাঠিয়েছে। তাতে তাদের জন্মভূমিই যে শুধু বড়লোক হয়েছে তাই ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্মভূমির মানুষদের জীবনযাত্রার মানও বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে যারা শুধু শুকনো রুটি খেয়েছে তারা তখন তার সঙ্গে মাখনও খেতে পাচ্ছে। সেই টাকাকড়ি দিয়ে তখন তাদের দেশে কাপড়ের কল তৈরি হয়েছে, সেই কলে তৈরি কাপড়-চোপড় যে জাহাজে চাপিয়ে বিদেশের বাজারে বিক্রি করবে, সেই জাহাজও তখন কলের জাহাজে রূপান্তরিত হয়েছে।

অর্থাৎ টাকা-পয়সা বেশি হলে যা হয়, তখন তাদের তাই-ই হয়েছে। অর্থাৎ টাকা বেশি হলেই বেশি' টাকা খরচ করার প্রবৃত্তি বাড়ে। তখন বড়লোকদের ইচ্ছে হয় বাড়িতে বসে বসে পরিশ্রম না করে সেই টাকা ভোগ করতে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবদের আত্মীয় পরিজনদের তখন আর কাজ করতে ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় কেবল বসে বসে আরাম করি। টাকাটার সবটাই যেত ইণ্ডিয়া থেকে। কিন্তু ততদিনে ইণ্ডিয়া আর সেই আগেকার ইণ্ডিয়া নেই। যুদ্ধটা যখন বাধলো তখন তাদের নিজের ঘরেও আগুন লেগেছে। ইণ্ডিয়াতে তখন এমন কয়েকটা মানুষ জন্মেছেন যাঁরা ইংরেজদের দেশ থেকেই ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছেন আর ইংরেজদের জীবনের আদব কায়দা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখে এইটে বুঝতে পেরেছেন যে এই আদব-কায়দা আরাম-বিরামের রহস্যটা কোথায়। জানতে পেরেছেন যে এই আরাম-আয়েসের পেছনে আছে ইণ্ডিয়ার ওপর তাদের অন্যায় আবদার।

এই শোষণের রহস্যটা তখন কে-কে জানতে পেরেছেন?

জেনেছেন ইংল্যাণ্ডে লেখাপড়া করতে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আর সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখরা। তাঁরাই দেশে ফিরে এসে সব রহস্য ফাঁস করে দিলেন আর সেই খবরটা ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইণ্ডিয়ার মানুষ নিজেদের দেশের দারিদ্র্য-দশার কারণগুলো সম্পূর্ণ বুঝে ফেলল।

এবার তারা সবাই বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ালো। তারপর যুদ্ধটা শেষ হবার পর যখন ইংরেজরা দেখলে যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ইণ্ডিয়ান সৈন্য তাদের হয়ে লড়াই করছিল তাদের সবাই দল বদল করে ইংরেজদের অবিচারের খবর পেয়ে গেছে তখন ইংরেজ সরকার ইণ্ডিয়ায় পাঠালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে।

ভাগ হয়ে গেল ভারতবর্ষ আর ভাগ হয়ে গেল ইংরেজদের কারবার। তারপর ম্যাকডোনাল্ড স্যাক্সবি ছেড়ে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কোম্পানি বেচে দিয়ে নিজের দেশে চলে গিয়ে বাঁচলো।

আর দেবীপদ? দেবীপদ মুখার্জী?

তিনি ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের চেয়ারে উঠে বসলেন।

কিন্তু ততদিনে সাহেবদের রক্ত সাহেবদের আদব-কায়দা মুখার্জী পরিবারের মেদ-মজ্জায় পাকা আসন গেড়ে বসেছে।

দেবীপদ মুখার্জীর পর এসে গেছেন শক্তিপদ মুখার্জী ও মুক্তিপদ মুখার্জী তারপর এবার এসে গেল সৌম্যপদ মুখার্জী। দেবীপদ মুখার্জীর একমাত্র নাতি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো আয়েস, ঢুকলো মদ, ঢুকলো মেয়েমানুষের নেশা।

তিন পুরুষের মধ্যেই একটা বাঙালী কোম্পানির নাভিশ্বাস টানবার উপক্রম হতে শুরু করলো।

সেদিন যথাসময়েই সৌম্য অফিসে যাচ্ছিল। একটা ক্রসিং-এর মুখে এসে ট্রাফিকের লাল সিগন্যাল জ্বলতেই গাড়িতেই ব্রেক কষতে হলো। আশে-পাশে পেছনে থেমে গেল আরো অনেকগুলো গাড়ি।

—হ্যালো, মিস্টার মুখার্জী—

সৌম্য সেই দিকে চেয়ে দেখলো অন্য একটা গাড়িতে মিস্টার হাজরা।

মিস্টার হাজরা জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

সৌম্য বললে—অফিসে।

মিস্টার হাজরা অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—অফিসে? অফিসে মানে? কোন অফিসে?

—আমাদের নিজেদের অফিসে। স্যান্ক্সবি মুখার্জী কোম্পানির অফিসে।

মিস্টার হাজরা যেন ঠিক বুঝতে পারলে না। মিস্টার মুখার্জী বড়লোকের ছেলে হলেও তাদের সঙ্গে নাইট ক্লাবে আড্ডা দেয়। সে আবার অফিসে ঢুকলো কবে?

সৌম্য বললে—আমি তো আমার ফার্মের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—আমার সঙ্গে একদিন দেখা করবেন—

—কোথায়? কোথায় দেখা করবো?

সৌম্য বললে—আমাদের ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসে।

আর বেশিক্ষণ কথা হলো না। হঠাৎ ট্রাফিক সিগন্যালের লাল রঙটা সবুজ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব গাড়িগুলো পড়ি-মরি করে পাঁই পাঁই শব্দে দৌড়তে শুরু করতেই আর কেউ কাউকে দেখতে পেলে না। দু'জনের ক্লাবের পরিচয় সেইদিন থেকে ঘরোয়া পরিচয়ের গণ্ডীর ভেতরে এসে গেল।

সেই দিনই বিকেল বেলা গোপাল সৌম্যর অফিসে এসে হাজির! স্যান্ক্সবি মুখার্জী কোম্পানির গেটের ভেতরে ঢুকেই লিফ্‌ট্। দেয়ালের গায়ে একটা নির্দেশিকা লেখা আছে কোন তলায় কোন কোম্পানির অফিস।

লিফ্‌টে উঠে তিনতলায় নামতেই রিসেপশন। সেখানে একটা সুন্দরী মেয়ে বসেছিল।

গোপাল তাকেই জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার মুখার্জী আছেন?

—কোন মুখার্জী? সিনিয়ার না জুনিয়ার?

—জুনিয়ার!

একটা স্লিপ্ এগিয়ে দিল মেয়েটা। তাতে গোপাল নাম-গোত্র ভর্তি করে দিল, তারপর মিস্টার মুখার্জীর কাছে তার আসার উদ্দেশ্যটাও লিখে দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো গোপালের। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

সৌম্য নতুন অফিসে ঢুকেছে। আস্তে আস্তে কাজকর্ম বুঝে নিচ্ছে। বুঝতে না পারলেও তাকে বুঝতে হবে। মিস্টার নাগরাজন সবই শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হিসেব-নিকেশের কাজ অত সোজা নয়, আর তা বুঝে নেওয়া একদিনের কাজও নয়।

ঠিক এই সময়ে মিস্টার হাজরা গিয়ে হাজির।

—গুড আফটারনুন।

শুধু যে মিস্টার হাজরাই অবাক হয়েছে তাই নয়, মিস্টার মুখার্জীও অবাক হয়ে গেছে। সেই দিনই সকালে রাস্তায় দেখা হয়েছে। আর বিকেল বেলাই মিস্টার হাজরা এসে হাজির।

গোপাল বললে—কালকে রাত্তিরেও তো আপনার সঙ্গে ক্লাবে দেখা হয়েছে, তখনও তো কিছু বলেননি আপনি—

সৌম্য বললে—তখন কি আর বলবার মত মেজাজ ছিল?

—তা বটে।

বলে গোপাল একটা সিগারেট ধরালে। বললে—খুব খুশি হলুম আপনাকে এখানে দেখে—তারপরে এখন তো আপনি এ্যাডাল্ট, এখন তো আপনি মেজর, আপনার এখন প্রোগ্রাম কী?

—প্রোগাম আর কী? আগেও যেমন ছিলুম, এখনও তাই-ই থাকবো। এ তো আমার পেট্রাবন্যাল অফিস, এখন থেকে আমি একজন এর মালিক।

গোপাল বলল—তাহলে তো এই অকেশানটা আজ ক্লাবে সেলিব্রেট করতে হয়—

—তা তো করতে হবেই।

গোপাল বললে—তাহলে উইশ্ ইউ গুড্ লাক। আমি তো শুনেছিলুম আপনার বউ তৈরি?

—কে বললে?

—একজন ভালো লোকের মুখ থেকেই শুনেছি—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—কে? কার কাছে শুনেছেন?

গোপাল বললে—সে আমাদেরই গাঁয়ের একটা ছেলে।

সে কী করে জানলে?

গোপাল বললে—সে আপনাদের বাড়িতেই থাকে?

—আমাদের বাড়িতেই থাকে? কে সে? নাম কী?

গোপাল বললে—তাকে আপনি চিনবেন না। সে একজন পুওর বয়। ভেরি পুওর বয়।

সৌম্য বললে—সে কী, আমাদের বাড়িতে থাকে অথচ আমি চিনি না?

—তার নাম সন্দীপ। আপনি কী করে চিনবেন? আপনাদের বাড়িতে যত লোক থাকে, তাদের সকলকে কি আপনি চেনেন?

তা অবশ্য সত্যি। শুধু বাড়িতে নয়, তাদের অফিস, তাদের ফ্যাক্টরি কত জায়গাতে, তাদের কত লোক চাকরি করছে, সব কি সৌম্য জানে? না জানা সম্ভব? বললে—সে কী বলেছে?

গোপাল বললে—আরে ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা। সে আপনাদের বাড়ির চাকরের মত থাকে।

—বলুন না, সে কী বলেছে?

গোপাল বললে—তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটে আপনাদের একটা বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে সেই মেয়েটি আছে, যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে—

সৌম্য কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনি ঠিক শুনেছেন?

—ঠিক শুনবো না তো বলছি কেন?

বলেই বললে—যাকগে এ সব বাজে কথা, আমি এখন আসি। আপনি আজকে ক্লাবে যাচ্ছেন তো? আমি আপনার জন্যে ওয়েট করবো—

বলে উঠলো।

সৌম্য বললে—আপনি উঠলেন কেন?

গোপাল বললে—না, আমাকে এখন উঠতে হবে। আমাকে একবার মিস্টার মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—কে মিস্টার মিশ্র?

গোপাল বললে—মিস্টার মিশ্রকে চেনেন না? শ্রীপতি মিশ্র, আমাদের মিনিস্টার।

—আপনার বন্ধু নাকি?

গোপাল বললে—হ্যাঁ, একটা সার্টিফিকেট দরকার। সেই জন্যেই তাঁর কাছে যাচ্ছি।

—কিসের সার্টিফিকেট?

গোপাল বললে—আর বলেন কেন? একজন ঘরহারা মুসলমান বাংলাদেশ থেকে ইণ্ডিয়ায় এসেছে, তার একটা রেশন কার্ড দরকার, আমাকে খুব ধরেছে—

সৌম্য বললে—রেশন কার্ড নিয়ে সে কী করবে?

গোপাল বললে—রেশন কার্ড না হলে তো তাকে কেউ চাকরি দেবে না। রেশন কার্ড দেখিয়ে ভোটার হতে পারবে—এখন এখানে রেশন কার্ডই তো সব—

কথা শেষ হওয়ার আগেই সিনিয়ার মুখার্জী ঘরে ঢুকলেন। সৌম্যর কাকা। এসেই সামনের চেয়ারে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে তোমার অফিসে?

সৌম্য বললে—ভালো।

মুক্তিপদ বললেন—না, ভালো লাগার তো কথা নয়, তবু তোমার ভালো লাগলো কেন? তুমি সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছ, এরই মধ্যে এ-কাজ ভালো লাগা তো ভালো কথা নয়!

কাকার কথাটার মানে সৌম্য বুঝতে পারলে না, অথচ সত্যিই তার কাজটা ভালো লাগেনি। আগের দিন সমস্ত রাত সে জেগে কাটিয়েছে। ভোরের দিকে মাত্র একটু সে ঘুমিয়েছিল। চিফ্ এ্যাকাউনটেন্ট মিস্টার নাগরাজন তাকে ডেবিট-ক্রেডিট বোঝাতে এসেছিল। কিন্তু সে কিছুই বোঝেনি। কোটি কোটি টাকাব ব্যালেন্স-শীট তার কাছে নিরর্থক মনে হয়েছে। হাজার-হার্জার লোক তাদের ফ্যাক্টরিতে চাকবি করে তাদেব সংসার প্রতিপালন করছে, এইটেই চরম কথা। প্রফিট্ যা হচ্ছে তা কোম্পানির ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ডে জমা হচ্ছে। কিছু দেওয়া হচ্ছে শেয়ারহোল্ডারদের। এ সব জেনে তার কী লাভ হবে?

মুক্তিপদ বললেন—এর পর একদিন তোমাকে যেতে হবে আমাদের বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে। আজকে প্রথম দিন, এর বেশি আর তোমাকে কাজ করতে হবে না—

বলে উঠলেন। চলে যাবার আগে বলে গেলেন—ইউ ক্যান টেক রেস্ট নাউ। এখন তুমি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারো।

বলে চিফ্-অ্যাকাউনটেন্টের ঘরে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—নাগরাজন, কী রকম দেখলে আমার ডেপুটিকে?

নাগরাজন বললেন—জুনিয়ার মুখার্জী খুব ইনটেলিজেন্ট স্যার।

আবার সেই একই মিথ্যে কথাই আবার সেই একই খোশামোদ। সারা জীবন কর্তাদের খোশামোদ করে করেই নাগরাজন আজ চিফ অ্যাকাউনটেন্ট হয়েছে। দেবীপদ মুখার্জীর আমলে নাগরাজন ছিল পেটি ক্লার্ক। শক্তিপদ মুখার্জীর আমালে নাগরাজন তাঁকে খোশামোদ করেই প্রমোশন পেয়েছিল। এখন মুক্তিপদ মুখার্জীকে খোশামোদ করে করেই চীফ অ্যাকাউনটেন্ট হয়েছে। আর তারপর এখন সৌম্যকেও খোশামোদ করা শুরু করেছে। এই-ই হলো নাগরাজনের স্বরূপ। অথচ ফার্মের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে সে। তাকে ফাঁকি দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তার হাতে মুক্তিপদ মুখার্জীর জীয়ন-কাটি। সে ইচ্ছে করলে কোম্পানির মালিককে ফাঁসাতে পারে। ভেতরকার সব রহস্য সে অডিটারকে জানিয়ে দিতে পারে। তাই সে যে মাইনে চায় তাই-ই দিতে হয় মুক্তিপদ মুখার্জীকে। নাগরাজন বাঁচাতে চাইলে মুক্তিপদ বাঁচবেন, নাগরাজনকে মারতে চাইলে মুক্তিপদ মুখার্জী মারা যাবেন। এ এক অদ্ভুত অঙ্কের ভেল্‌কি। এই ভেল্‌কি সামলাতে একদিকে নাগরাজন আর অন্য একদিকে বিজয়েশ কানুনগোর হাতে টাকা গুঁজে দিতে হয়। মোটা মোটা টাকা। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই মুক্তিপদ মুখার্জীর জীবনে। তার ওপরে আছে নন্দিতার আবদার। কথায় কথায় যাবে কনটিনেন্ট। সেখানে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে শপিং করবে। যে নাইটি ইন্ডিয়ায় তিনশো টাকায় কিনতে পাওয়া যায়, সেই 'নাইটি'ই স্টেট্‌সে গিয়ে কিনবে তিন হাজার টাকায়। কাস্টমস-এর বিল চোকাবেন মুক্তিপদ মুখার্জী। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। বাইরের লোক ভাবে আমি কত হ্যাপী। এইটেই হচ্ছে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় ইয়ার্কি।

—হ্যাল্লো—

নাগরাজন টেলিফোনের রিসিভারটা মুক্তিপদর হাতে তুলে দিলে।

—স্যার, আপনার বাড়ির কল্—

মুক্তিপদ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। বললে—এখন আমাদের একটা কনফারেন্স চলছে। এখন ভেরি বিজি... আমার যেতে একটু দেবি হবে...

বলে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিলে। তারপব নাগরাজনকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা নাগরাজন, মানুষ বিয়ে করে কেন বলতে পারো? কী জন্যে মানুষ বিয়ে করে?

এ-কথাব কী উত্তর দেবে নাগরাজন। তার মনিবেব মুখ থেকে নাগরাজন এ-কথা অনেক বার শুনেছে। তবু সে বললে—আপনি এখন বাড়ি যান স্যাব' অফিসের কথা যদি সমস্তক্ষণ ভাবেন তো আপনার শরীর আরো খারাপ হবে—

মুক্তিপদ মুখার্জী নাগরাজনের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে বললেন—ঠিক বলেছ, নাগরাজন, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমরাই সুখে আছো নাগরাজন যাদের টাকা বেশী আছে, তাদের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই। আমার বাবা অল্প বয়সে মারা গেছেন, আমার দাদাও অল্প বয়সে মারা গেছেন। এবার আমাব পালা। এর পর সৌম্য অফিসে এসেছে। এরও সেই একই পরিণতি.. তুমিই ঠিক বলেছ। এখন আমি বাড়ি যাই।

বলে উঠলেন তিনি।

বড় সাহেব লিফ্‌ট দিয়ে নিচেয় নামবেন। লিফ্‌ট্‌ম্যান তাঁকে দেখেই লম্বা একটা সেলাম করছে। সে আগে তাঁর বাবাকেও সেলাম করেছে, দাদাকেও করেছে, তাঁকেও সেলাম করছে। এবার সেলাম করবার লোক একজন বাড়লো। এঁরাই পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখী।

মুক্তিপদ দেখলে ভেতরে সৌম্য রয়েছে।

জিজ্ঞাসা কবলেন—এ কি, তুমি এতক্ষণ অফিসে কী করছিলে?

সৌম্য বললে—ফাইলগুলো দেখছিলুম।

মুক্তিপদ বুঝলেন তাঁর নিজের যে দশা হয়েছে, একদিন এই সৌম্যর সেই একই দশা হবে। জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বুঝলে ফাইলগুলো দেখে।

সৌম্য বললে—আজকে প্রথম দিন, কিছু বুঝতে পারলুম না।

—আমাদেব অডিটারস এ্যানুয়্যাল রিপোর্টটা পড়েছ? যেটা লাস্ট ইয়ারে সব শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে?

—দেখেছি।

—কী দেখলে?

সৌম্য বললে—লাস্ট ইয়ারের চেয়ে এ বছরের প্রফিট কমে গেছে, আগের ইয়ারে ইকুইটি শেয়ারে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছিল পার-শেয়ার একটাকা আশি পয়সা, আবার দেওয়া হচ্ছে একটাকা ষাট পয়সা। প্রোডাকশানে ডিফিসিট হয়েছে, লেবাব ট্রাবলের জন্যে প্রোডাকশান কমে গেছে ফর্টি পার্সেন্ট—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—প্রোডাকশান কেন কমেছে?

সৌম্য বললে—মেইন্‌লি লেবার-ট্রাবল্ আর তারপর আছে ইলেকট্রিক ফেলিওর—

মুক্তিপদ সৌম্যর উত্তর শুনে খুশী হলেন। বললেন—ভেরি গুড, কিন্তু—

ততক্ষণে লিফ্‌ট গ্রাউন্ড-ফ্লোর ছুঁয়েছে। মুক্তিপদ কথার জের টেনে বলতে লাগলেন—কিন্তু আসল কারণ অন্য—

সৌম্য কাকার মুখের দিকে চাইলে। অর্থাৎ তার মানে?

—আসল কারণ হলো ঘুষ!

—ঘুষ?

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ। পরে অবশ্য তুমি সবই জানতে পারবে! তবু এখন শুধু এইটুকুই জেনে রাখো, এর কারণটা হলো পলিটিক্যাল।

সৌম্য আবার জিজ্ঞেস করলে—পলিটিক্যাল কেন?

মুক্তিপদ বলতে লাগলেন—এখানে আমাদের যতগুলো পলিটিক্যাল পার্টি আছে, তাদের সব লীডারদের ঘুষ দিতে হয়। কলকাতায় ছ' সাতটা পলিটিক্যাল পার্টি আছে। আমাকে সব পার্টির লীডার আর চ্যালাদের ঘুষ দিতে হয়—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—সব পার্টিকে কেন ঘুষ দিতে হয়? যে পার্টি ইন পাওয়ার, তাকে ঘুষ দিলেই তো চুকে যায় ঝামেলা—

মুক্তিপদ বললেন—তুমি নতুন, তাই ও-কথা বলছো। পুরনো হলে আর ও কথা বলতে না। কখন কোন পার্টি পাওয়ারে আসে তা তো বলা যায় না, তাই আমরা ভবিষ্যৎ ভেবে সব পার্টিকেই ঘুষ দিই। শুধু আমরা নই, বিড়লা, টাটা, গোয়েঙ্কা, মহীন্দ্র সবাই-ই তাই করে—

সৌম্য জিজ্ঞেস করলে—অডিট রিপোর্টে ওটা কোন খাতে দেখানো হয়?

মুক্তিপদ বললেন—ভালো করে নজর করলে দেখতে পাবে Income and expenditure in foreign exchange বলে একটা আইটেম আছে। সেখানে দেওয়া সোজা—

তারপর প্রসঙ্গটা থামিয়েই মুক্তিপদ বললেন—এসব তুমি পরে বুঝবে, আজ থাক, আমি

... উনি চলে গেলেন।

সৌম্যও তার নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তারপর গাড়ি চলতে লাগলো সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে। কাকার কথাগুলো মাথার মধ্যে গুঞ্জন করতে লাগলো। সব পার্টির লীডার আর তাদের ফলোয়ারদের ঘুষ দিতে হয়।

গাড়িটা সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু দিয়ে যাচ্ছিল। সৌম্য দেখলে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"হলদিয়াতে জাহাজ নির্মাণ
কারখানা
করতে হবে"

সৌম্য দেখলে আর একটি দেওয়ালে লেখা ঃ

"কেন্দ্রের কলকারখানায় কেন্দ্রীয়
পুলিশ বাহিনী
রাখা চলবে না"

আর একটা জায়গায় লেখা ঃ

"কেন্দ্রের আয়ের শতকরা
পঁচাত্তর ভাগ
রাজ্য সরকারকে দিতে হবে"

এতদিন সৌম্যের এই সব দেওয়াল-লিখনের দিকে নজর পড়েনি। কাকার সঙ্গে কথা বলার পর লেখাগুলোর যেন মানে বুঝতে পারা গেল ঃ

"কংগ্রেসের ওই কালো হাত
কতজনকে খুন করেছে
তা ভুললে চলবে না"
আর এক জায়গায় লেখা ঃ
"খুনী সি-পি-এমকে
আর একটিও ভোট নয়"

সৌম্য এতদিন কলেজে গেছে, নাইট-ক্লাবে ফুর্তি করতে গেছে, কিন্তু এ-সব কথা দেওয়ালে লেখা সত্ত্বেও কখনও মন দিয়ে এ-সব দিকে দ্যাখেনি! আজ যেন কাকার কথায় সে কলকাতাকে নতুন করে চিনতে পারলে।

মনে পড়লো মিস্টার হাজরার কথা। কোথায় কোন্ এক মিনিস্টার শ্রীপতি মিশ্রের কাছে কাদের রেশন কার্ডের জন্যে সার্টিফিকেট আনতে যাবে। কিন্তু রেশন কার্ডের জন্যে সার্টিফিকেট লাগবে কেন?

মিস্টার হাজরার কথা মনে পড়তেই আরো একটা কথা মনে পড়লো সৌম্যর।

বিডন স্ট্রীটের ভেতরে ঢুকে বাবোর-এ নম্বর বাড়িটার ভেতরে গাড়িটা অভ্যস্থ গতিতে ঢুকে পড়লো।

এখানেও সেলাম।

গিরিধারী সিংরা এখনও শৃঙ্খলার প্রতীক। এই জন্যেই তো তাদের বাড়িতে কোনও লেখা-পড়া জানা লোক রাখা হয়নি

গাড়ি থেকে নামতেই সৌম্য সদর গেটের সামনে একটা অচেনা লোককে দেখে সেদিকে ঘাড় ফেরালো। লোকটা তাকে নমস্কার করলে।

—কে?

সৌম্যবাবু যে তাকে চিনতে পারবেন, এমন আশা অবশ্য সন্দীপ করেনি। আর সন্দীপও ক'দিন ধরে ভাবছিল কী করে সৌম্যবাবুর সঙ্গে কথা বলা যায়! বিয়ে তো একদিন হবেই ... সময়েই বর আর কনে দু'জনকে প্রথম দেখবে, এইটেই তো বরাবরের নিয়ম।

কিন্তু মাসিমা যদি আগে থেকে জামাইকে দেখতে চায়, তাহলে কি সেটা খুবই অন্যায় আবদার? একমাত্র মেয়ের বিধবা মা। তাঁর জামাইকে তিনি দেখতে চাইবেন এটা তো স্বাভাবিক। দূর থেকে শুধু তিনি দেখবেন। আর তো কিছু নয়। তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—কে?

—সন্দীপ সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেল।

—কে আপনি?

—সন্দীপ বললে—আমি এ বাড়িতেই থাকি—

এককালে যে এই সৌম্যবাবুর সঙ্গে নাইট-ক্লাব থেকে একই গাড়িতে রাত তিনটের সময় এই বাড়িতে এসেছিল তা মনে করিয়ে দেওয়া অর্থহীন। তখন কি আর তার স্বাভাবিক অবস্থা ছিল?

যখন এক রাত্রের জন্য সন্দীপ সৌম্যবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তখন ছিল অন্যরকম। তখন সৌম্যবাবু মদের ঝোঁকে বলেছিল—কী ব্রাদার, তুমিও সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার? তুমিও ব্রাদার ডুবে ডুবে জল খাও?

সৌম্যবাবুর কথায় সন্দীপ বোধহয় বড় ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভালো করে মুখে কথাই যোগায়নি। কিন্তু সৌম্যবাবুর তো তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে লোকের সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় ছিল না। সৌম্যবাবু আর কোনও কথা না বলে সোজা বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল।

তা ছাড়া রাত্রে ক্লাবে যেতে হবে, কথা দেওয়া আছে মিস্টার হাজরাকে। তার জন্যেও সন্ধে থেকে তৈরি হওয়া দরকার—

বিপ্লব যখন আসে তখন বোধহয় এমনি করে নিঃশব্দেই আসে। প্রথমে কেউ তা টের পায় না কিংবা টের পেলেও চোখ বুজে মানুষ সমসাময়িক কালের তালে তাল দিয়ে চলে। তালে তাল দিয়ে চলার অনেক সুবিধে। তাদের মনের কথাটা হচ্ছে—কাজ কী বাপু ঘাঁটিয়ে? যেমন চলছে তেমনিই চলুক না। তোমার বিরাগভাজন হয়ে কী লাভ? তোমার শান্তিতে আমি বাধা দেব না, আমার শান্তিতেও তুমি বাধা দিও না। যদি কোথাও কোনও অন্যায় ঘটে, যদি কোথাও কেউ বেআইনী কাজ করে তাহলে তুমিও চোখ বুজে থাকো, আমিও চোখ বুজে থাকি।

বাঙালী জীবনধারার এইটেই হচ্ছে চিরন্তন ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্তটাই আজ বাঙালীর ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই যখনই কোনও বেয়াড়া প্রকৃতির বাঙালী এর ব্যতিক্রম ঘটাতে গেছে তখনই সব বাঙালী মিলে তাকে বিধ্বংস করতে একজোট হয়েছে।

বাঙালীরা জাতি হিসেবে রাস্তার বেওয়ারিশ সারমেয়র স্বভাব পেয়েছে। আকাশের চাঁদের উদয়-অস্তের সঙ্গে তো রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের কোনও সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু দেখা গেছে, রাস্তার সারমেয় দল আকাশে চাঁদ উঠতে দেখলেই ঘেউ-ঘেউ করে তার প্রতিবাদ জানায়, তার বিরোধ করতে চেষ্টা করে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, সুভাষ বোস—কেউই বাঙালীদের এই জাতীয়-বিষ-বমন থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

এই সন্দীপও তেমনি। সন্দীপ স্মরণীয় ব্যক্তিদের কেউ নয়। সে একটা অতি নগণ্য উপন্যাসের অতি নগণ্য এক নায়ক! তবু সে-ও এই বিষ বমনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

কোর্টের মধ্যে সরকারী উকিল হাকিমের সামনেই তাকে জেরা করেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে নব্বুই লাখ টাকা কেন চুরি করলেন?

সন্দীপ অত্যন্ত শান্ত গলায় বলেছিল—আমার টাকার ওপর লোভ হয়েছিল—

কিন্তু আপনার তো সংসারও নেই, আপনার বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ-ছেলে-মেয়ে কেউই নেই, তাহলে টাকাব ওপর আপনার এত লোভ হয়েছিল কেন?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে? সে উকিলের জেরার জবাবে কিছুই বলেনি। লোভ কি শুধু বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ থাকলেই হয়? মানুষ তো সংসারে সব কিছুই পেতে চায়। তা সে প্রয়োজন থাকুক আর না-থাকুক। লোভও তো একটা রিপু ছাড়া আর কিছু নয়।

—বলুন, উত্তর দিন আমার কথার।

সন্দীপ বলেছিল—হিটলারেরও তো কেউ ছিল না, তাহলে তাঁর এত বড যুদ্ধটা করে এত দেশ জয় করার লোভ হয়েছিল কেন?

এর পর স্ট্যানডিং কাউন্সিল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস কবছি, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

—বলুন।

উকিল প্রশ্ন করলে—বিশাখা দেবী ওরফে অলকা দেবীকে কি আপনি চেনেন?

—আচ্ছা, এবার বলুন তো সেই বিশাখা দেবীর সঙ্গে কি আপনার বিয়ে হয়েছিল?

সন্দীপের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যেন এক ধাক্কায় একেবারে ভিত সুদ্ধ থরথর কবে কেঁপে উঠলো।

—এই নিচের জায়গায় তো আপনি আপনাব নাম সই করেন নি?

যেন এক ঝটকায় সন্দীপ স্বপ্নের জগৎ থেকে একেবারে বাস্তব জগতে এসে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মন এ রকম এলোমেলো হয়ে যায় কেন?

না, এ কোর্ট নয়, ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি। মনে আছে সে ল' কলেজে ভর্তি হবার জন্যে তখন টাকা জমা দিচ্ছিল। তার বরাবর ইচ্ছে ছিল ল' পাশ করে বেড়াপোতার কাশীনাথবাবুর মত উকিল হবে। উকিল হয়ে মা'র আশা-আকাঙক্ষা পূর্ণ করবে। এতদিনে সে ল' কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু তখনও তার কেবল মনে হচ্ছে সৌম্যবাবু তাকে যখন চিনতেই পারলে না তখন মাসিমাকে সে কী বলবে? মানুষ কি তাহলে মদ খেলেই ভালো হয়ে যায়। আর মদ না খেলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়? সেদিন বাত্রে তো ওই সৌম্যবাবুই তার প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আরে ব্রাদার তুমিও শেষকালে সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার...

তখন সৌম্যবাবু তার কত অন্তরঙ্গ আর একদিন চিনতেই পারলে না একেবারে। সৌম্যবাবু তখন সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে।

গিরিধারী সমস্ত ঘটনাটাই এতক্ষণ লক্ষ্য করেছিল। সন্দীপের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো বাবুজী?

সন্দীপ বললে—তুমি তো দেখলে গিরিধারী, নিজের চোখেই তো দেখলে—

গিরিধারী আর এর কী উত্তর দেবে।

শুধু বললে—সাহাব লোগোঁ কা বাত যানে দিজিয়ে বাবুজী—

সন্দীপ বললে না, তা বলছি না। অথচ তুমি তো জানো, সেদিন রাত তিনটের সময় আমিই তো তোমার ছোটবাবুর সঙ্গে একই গাড়িতে বাড়ি ফিরেছি, তখন আমার সঙ্গে তোমার ছোটবাবুর কত গলাগলি ভাব—

উও বাত যানে দিজিয়ে বাবুজী, হাম লোক তো উনকা নৌকর হ্যায়—

কিন্তু তখনও কি সন্দীপ জানতো, নাকি সৌম্য জানতো যে ভবিষ্যতে একদিন ওই সৌম্যবাবুকেই আবাব স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই সন্দীপেরই পা জড়িয়ে ধরতে হবে!

হয়ত এও ঈশ্বরের এক ইয়ার্কি। মানুষের ঈশ্বরও হয়ত মানুষকে নিয়ে এক ধরনের ইয়ার্কি দিতে ভালোবাসেন। নইলে ওই বিশাখাকে নিয়েই বা একদিন সন্দীপকে কেন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। আর সন্দীপকে ঘিরে বিশাখাকেই বা কেন সাত পাক দিয়ে ঘুরতে হয়?

ঈশ্বরের ইয়ার্কি ছাড়া একে আর কী-ই বা বলা যায়?

কোনও একটা বইতে জার্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটে বলেছেন যে ইতিহাসকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়ঃ একটা হচ্ছে বিশ্বাসের যুগ আর অন্যটা অবিশ্বাসের।

বিশ্বাসের যুগ উজ্জ্বল সফল আর গতিশীল। যে যুগে অবিশ্বাসের আধিপত্য তা অনুজ্জ্বল ও বন্ধ্যা। সেই অধ্যায়গুলি ইতিহাসের পশ্চাৎপটে থাকে। লোকে তা ভুলে যায়।

মানুষের বেলাতেও সেই একই নিয়ম।

জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাঁরা সকলেই একটা না একটা কিছু গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন। কোনও কিছুতেই যাঁদের বিশ্বাস নেই তাঁরা ভেসে যান, তলিয়ে যান জীবনের আবর্তে।

কলেজে পড়বার সময় এক বন্ধু তাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিল, সেই বইটাতেই ওপরের ওই কথাগুলো লেখা ছিল।

বইটাতে বার্টান্ড রাসেলের জীবনের কথা লেখা ছিল সবিস্তারে।

বার্টান্ড রাসেলের বই পড়ে অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। কেউ বলতো তিনি স্কেপটিক, সংশয়বাদী, কোনও কিছুতেই তাঁর আস্থা নেই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লোকে বিশ্বাস করেছে যে তাঁর বিশ্বাসের জোরে তিনি পাঠককে অনায়াসে তাঁর বই-এর শেষ লাইন পর্যন্ত আকর্ষণ করতে পারেন।

বইটা পড়ে সন্দীপ নিজেকেও কতবার জিজ্ঞাসা করেছে—সে নিজে কী? বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী?

মানুষ তো অনেক ছিল পৃথিবীতে, অনেক আছে, আর অনেক থাকবেও? কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন নিজের নিজের অক্ষয় কৃতিত্বে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে?

সন্দীপ একজন সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতি সাধারণ মানুষ। তার দ্বারা কোন্ অক্ষয় কৃতিত্ব সাধন করা সম্ভব?

সন্দীপ এমন যুগে জন্মেছে যখন মানুষ যে-কোনও প্রকারে কার্যসিদ্ধি করে টাকা উপার্জন করাটাকেই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে মনে করে।

আসলে বাইরে থেকে দেখতে গেলে সন্দীপ নিজেও তো একজন তাই, নিজে পরের বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেয়ে মানুষ, এখন ল' কলেজে পড়ছে। উদ্দেশ্য সেই একই। একদিন আইন পাশ করে কাশীনাথবাবুর মত ওকালতি করে তাঁর মত টাকা উপায় করে বড়লোক হবে। অন্য সকলের মত একদিন তারও বিয়ে হবে, সন্তান-সন্ততি হবে, সংসার হবে। তারপর কলকাতা শহরে একটা বাড়ি হবে। যা-সব বাঙালীর আজন্ম স্বপ্ন।

কিন্তু তারপর?

তারপর একটা গাড়ি।

—কিন্তু তারও পরে?

তারপরেরও যে একটা তারপর আছে, সেটার কথা কেউই ভাবে না। কিন্তু ভাববে না কেন? তাহলে কি এই পৃথিবীর আদির কথাও ভাববে না, অন্তের কথাও ভাববে না, শুধু বর্তমানের কথাই ভাববে?

বিকেল চারটের সময় সন্দীপের ক্লাশ আরম্ভ হতো। আর সে ক্লাশ শেষ হতো বিকেল পাঁচটার সময়, মাত্র এক ঘণ্টার ক্লাশ। অর্থাৎ প্রায় সারা দিনটাই ছুটি।

বিডন স্ট্রীট থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। হাঁটতে হাঁটতেই সন্দীপ কলেজে যেত আর হাঁটতে হাঁটতেই কলেজ থেকে সে বাড়ি আসতো।

যেদিন কোনও মিছিল যেত রাস্তা দিয়ে সেদিন সন্দীপ ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো। কীসের মিছিল কাদের মিছিল?

কোথায় কিছু অন্যায় বা অবিচার হলে তবেই তো মিছিল হয়। লাল কাপড়ের ওপর লেখা থাকে মিছিলের উদ্দেশ্য। লাল কাপড়টা দুটো লাঠি দিয়ে বেঁধে উঁচু করে ধরা হয়।

একজন ভদ্রলোককে পাশে দেখতে পেয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে--হ্যাঁ মশাই, এ কীসের মিছিল, বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন- আবার কাদের? কমিউনিস্টদের...

বলে যেন বিরক্ত হয়ে অন্য দিকের অন্য ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

মিছিলের সামনের লোকটা তখন চিৎকার করছে -

স্বৈরতন্ত্রী আমেরিকা ভিয়েৎনাম ছাড়ো—

ছাড়ো ছাড়ো ভিয়েৎনাম ছাড়ো—

আর দলের সবাই সুরে সুরে মিলিয়ে চেঁচাচ্ছে।

ভিয়েৎনাম ছাড়ো।

ছাড়ো ছাড়ো ভিয়েৎনাম ছাড়ো।।

আশ্চর্য, সন্দীপ সত্যিই অবাক হয়ে গেল। এই ক'বছর আগেই সন্দীপ তাদের বেড়াপোতায় অন্য কথা শুনেছিল। সে তার ছোট বেলাকার কথা। তখন একবার একটা গান-বাজনার ফাংশান হয়েছিল সেখানে। কলকাতার একটা দল তখন বেড়াপোতায় গিয়ে "নবান্ন" নামে একটা থিয়েটার করেছিল। তারপর একটা কোরাস গান গেয়েছিল তারা :

"কমরেড্ ধরো হাতিয়ার--ধরো হাতিয়ার
স্বাধীনতা সংগ্রামে নহি আজ একলা
বিপ্লবী সোভিয়েট। দুর্জয় মহাচীন
সাথে আছে ইংরেজ নির্ভীক মার্কিন."

এ কী করে হলো? এককালের বন্ধু 'নির্ভীক মার্কিন' হঠাৎ আজ এই ক'বছরের মধ্যেই 'স্বৈরতন্ত্রী আমেরিকা' হয়ে উঠলো কেন? কী করে?

যাক্ গে, চুলোয় যাক্ গে ও-সব। সন্দীপ ভিড় কাটিয়ে আবার একমনে রাস্তা দেখে দেখে চলতে লাগলো কলেজের দিকে। বাইরের জগতের ঝড়-ঝাপটা দেখে ভয় পেলে তার চলবে না। তার নিজের পথ তাকে নিজেকেই করে নিতে হবে। এক মা ছাড়া তার আর কেউ নেই পৃথিবীতে। তার জীবনের এইটেই সার কথা। দল বেঁধে হুজুগ করা যায়, দল বেঁধে হয়ত যুদ্ধও করা যায়। কিন্তু মানুষ হওয়া? মানুষ হতে গেলে তো তাকে একলাই চলতে হবে। দল বেঁধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও হওয়া যাবে না, দল বেঁধে স্বামী বিবেকানন্দও হওয়া যাবে না। দল বেঁধে কেউ সক্রেটিসও হতে পারেনি, দল বেঁধে কেউ যিশুখ্রীষ্টও হতে পারেনি। পরে অবশ্য তাঁদের নামে দল সৃষ্টি হয়েছে। পরে সবাই দল বেঁধে কখনও স্বামী বিবেকানন্দের কখনও বা যিশুখ্রীষ্টের জয়গান গেয়েছে।

এই-ই তো ইতিহাসের শিক্ষা। ইতিহাসের এই শিক্ষা যে গ্রহণ করেছে সে-ই একলা চলার ব্রত উদ্‌যাপন করেছে।

সেই দিনই ঘটনাটা ঘটলো।

কলেজ থেকে বেরিয়ে আবার সেই একই পথ মাড়িয়ে সন্দীপ চলেছে। হঠাৎ রাস্তার মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকানের সামনে কয়েকটা কথা তার কানে এল।

—কাল তো তুম্‌কো পাঁচ রুপাইয়া দিয়া—

আর একজন বললে—জী হাঁ—

— তো আজ ভি পাঁচ রুপাইয়া রাখো।

একজন বলে উঠলো— লেকিন উ লোগ্ আট রূপাইয়া মাংতা হ্যায়—

—উ বাত পিছে হোগা, আজ পাঁচ রূপাইয়া লেও—

তখন আবছা-আলো আবছা-অন্ধকার চারদিকে। হঠাৎ লোকটার দিকে চেয়ে সন্দীপ চমকে উঠলো। গোপাল না?

গোপালও সন্দীপের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছে।

—আরে, তুই?

গোপাল যেন বহুরূপী। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র পোশাকে তাকে দেখে সন্দীপ আগেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আজকে আবার তার একেবারে অন্য এক পোশাক। আগাগোড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর খদ্দরের ধুতি। যেন কংগ্রেসের কোনও লীডার।

সন্দীপকে দেখে গোপাল তার হাত ধরে টেনে নিয়ে সামনের দিকে চললো।

জিজ্ঞেস করলে—কোত্থেকে তুই?

সন্দীপ বললে—আমিও তো তাই-ই জিজ্ঞেস করছি, তুই কোত্থেকে?

গোপাল বললে—আমি আর কোত্থেকে? ঘুরছি ধান্দায়—

—কীসের ধান্দায়?

—টাকা ছাড়া আর কীসের ধান্দায় ঘোরে মানুষ বল? সব ব্যাটা তো কেবল টাকার ধান্দাতেই চিরকাল ঘোরে। মানুষের তো টাকা ছাড়া আর কোনও ধান্দা নেই—

সন্দীপ গোপালের কথায় আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো।

বললে—সত্যিই আর কোনও ধান্দা নেই মানুষের?

গোপাল বললে, না, আর কোনও ধান্দা নেই কারো। যে উকিল সে কেবল টাকার ধান্দাতেই ওকালতি করে, যে ডাক্তার সে কেবল টাকার ধান্দাতেই ডাক্তারি করে, যে পলিটিক্যাল লীডার সেও কেবল টাকার ধান্দাতেই দেশ সেবা করে...

তারপর নিজের কথা থামিয়ে বললে—যাক্ যে, তুই এখন কী করছিস বল্?

সন্দীপ বললে—আমি এখন ল' কলেজে পড়ছি, এখন সেখান থেকেই আসছি—

গোপাল বললে—ওই দ্যাখ্, তুইও সেই একই টাকার ধান্দায় ওকালতি পড়ছিস্।

সন্দীপ একটু লজ্জায় পড়ে গেল। তার মুখে কোনও জবাব এল না।

তারপর বললে—তুই পানের দোকানে কী করছিলি?

গোপাল বললে—পানওয়ালা ব্যাটাকে টাকা দিচ্ছিলুম—

—টাকা দিচ্ছিলি? কেন? ধার ছিল বুঝি?

—দূর। আজকাল কি কেউ ধার দেয় যে ধার শোধ করতে যাবো...

সন্দীপ বললে—আগে আগে তো রাত্তিরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশকে টাকা দিতিস! আমার সব মনে আছে—

গোপাল হাসলো। বললে—এখন পুলিশরা আর রাত্তিরে রাস্তায় টাকা নেয় না—

—কেন?

—ওতে ওদের খুব বদনাম হচ্ছিল। তাই ওরা এখন অন্য ব্যবস্থা করেছে। এখন প্রত্যেক রাস্তার বড় বড় মোড়ে এক-একটা পানের দোকানে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি যে-পানওয়ালাকে টাকা দিয়ে এলুম, তারা রাত্তিরে এক সময়ে এসে ওদের কাছ থেকে সব টাকা হিসেব

করে নিয়ে চলে যাবে। বরাবর সব পানওয়ালাদের পাঁচ টাকা করেই দিতুম, কিন্তু কী আবদার দ্যাখ, এখন আবার রোজ আট টাকা করে চাইছে—

সন্দীপ বললে—কিন্তু তুই টাকা দিস কেন? পুলিশকে টাকা দিয়ে তোর কী লাভ হয়? কই, আমি তো কাউকে টাকা দিই না—

গোপাল বললে—আমাদের যে কারবার তাতে পুলিশকে টাকা না দিলে যে কারবার চলে না—

—কী কারবার তোর?

গোপাল বললে—আরে, কারবার কি আর আমার একটা? হাজারটা কারবার আমার। দেখছিস না, দিনে রাতে সব সময়ে চাকরীর মত ঘুরতে হয় গাড়ি নিয়ে নিয়ে—

সন্দীপ বললে—তাই তো দেখছি। তোর সঙ্গে আমাদের বাড়ির সৌম্যবাবুরও যেমন ভাব, তেমনি আবার রাসেল স্ট্রীটের আন্টি মেমসাহেবেরও ভাব!

গোপালের যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

হাতের ঘড়িটার দিকে চাইতেই সে সাপ্ দেখে ভয় পাওয়ার মত করে লাফিয়ে উঠলো। বললে—ওই যাঃ! তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদম্ ভুলে গেছি।

—কী ভুলে গেছিস?

—আরে আমার আজকে শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যা ছ'টায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট। যাঃ, সব গোলমাল হয়ে গেল—

সন্দীপ তবু ছাড়লে না তাকে। জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমার কথাটার জবাব দিয়ে যা ভাই তুই রাসেল স্ট্রীটের আন্টি মেমসাহেবের সঙ্গেও তোর যেমন ভাব, আবার তেমনি বিড্‌ন স্ট্রীটের সৌম্যবাবুর সঙ্গেও তেমনি—এটা কী করে হলো, তুই বল্ ভাই—

যেন হঠাৎ একটা ভুলে যাওয়া কথা তার এখন মনে পড়ে গেছে। এমনি ভাবে গোপাল বললে—একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। তোকে বলতে ভুলে গেছি...

—কী কথা?

—তোদের বিড্‌ন স্ট্রীটের সৌম্যবাবুর অফিসে সেদিন গিয়েছিলুম রে, তোদের সৌম্যবাবু তো এখন স্যাক্‌সবী মুখার্জী কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেকটার রে।

সন্দীপ বললে—সে তো জানি।

—ছোঁড়াটার লাক্ ভালো। অনেক টাকা মাইনে ওদের। সব চোরাই টাকা!

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—চোরাই টাকা? চোরাই টাকা মানে?

গোপাল বললে—চোরাই টাকা না হলে অত টাকা পার্টিদের দেয়?

—কোন্ পার্টিদের দেয়?

সব পার্টিদের দেয়। এখানে যত পার্টি আছে সব পার্টিকেই দেয়! কোন্ পার্টি কখন পাওয়ারে আসে তা তো আগে থেকে বলা যায় না। তাই এখন থেকে সব পার্টিকেই মোটা মোটা টাকা খাওয়ায়...

তারপরে একটু থেমে আবার বললে—যাক্‌গে সে-সব কথা। তোদের সৌম্যবাবুকে সেদিন আমি তোর কথা বললুম—

—আমার কথা বললি?

—হ্যাঁরে। বললুম ওদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে একটা মেয়েকে রাখা হয়েছে। শুনেছি তার সঙ্গেই নাকি আপনার বিয়ে হবে।

তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করলে কথাটা আমি জানলুম কার কাছ থেকে। আমি তোর কথা বললুম। তা তোকে চিনতেই পারলে না রে—

সন্দীপ বললে আমাকে চিনবে কী করে? আমার মত তো অনেক লোক ও-বাড়িতে থাকে। ক'জনকে চিনবে? কিন্তু মনে আছে তোর সেই যে একদিন নাইট-ক্লাবে সৌম্যবাবুকে আমি ধরে ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলুম...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

সন্দীপ বললে—জানিস, সেই বিশাখার মা একদিন জামাইকে দেখতে চাইছিল

—কেন?

সন্দীপ বললে—মেয়ের মা তো, জামাই এর চেহারা কেমন তা একবার দেখতে ইচ্ছে হবে না? তুই একবার সৌম্যবাবুকে নিয়ে ওদের তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে পারিস?

গোপাল বললে—চেনা নেই শোনা নেই আমি ওকে সে বাড়িতে নিয়ে যাবো?

—তাতে কী?

গোপাল বললে—তুই নিজেই তো সৌম্যবাবুকে একদিন কথাটা বলতে পারিস—

সন্দীপ বললে—ভাই আমার বলতে লজ্জা করে, তা ছাড়া আমার কথা সৌম্যবাবু শুনবেই বা কেন? আমি কে? একদিন বলতে গিয়েছিলুম কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলুম এমন ভাব দেখালে যেন আমাকে চিনতেই পারলে না—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—রাত ন'টার পর তো সৌম্যবাবু রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ি নিয়ে তোদের ক্লাবে যায়। একদিন তুই-ই সৌম্যবাবুকে বলিস না—

গোপাল বললে—ঠিক আছে, আমি বলবো—

বলে আবার হাতের ঘড়িটা দেখেই চমকে উঠলো।

বললে—যাই, শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে যাই—অনেক দেরি হয়ে গেছে—বলে গাড়িতে উঠে চলে গেল। চলে যাবার পর হঠাৎ সন্দীপের মনে পড়লো কথাটা। আন্টি মেমসাহেবের সঙ্গে গোপালের কী করে পরিচয় হলো সেটা তো আর জিজ্ঞেস করা হলো না।

কিন্তু তখন আর সময় নেই, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। গোপালের গাড়িটা তখন অনেক দূরে দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে
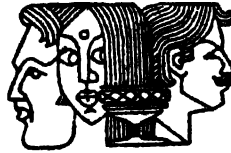
সেদিন রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে যেতেই মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন—কী বাবা, আমার জামাইকে দেখাবার কী হলো? তাকে তো একদিন কই আমাদের কাছে নিয়ে এলে না—

সন্দীপ বললে—আমি চেষ্টা করছি, আপনি কিছু ভাববেন না—

মাসিমা বললে—জান বাবা, কাল একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি—

—স্বপ্ন?

মাসিমা বললে—না বাবা, আমি স্বপ্নের কথা কাউকে বলবো না। তাই মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। তোমার আসার জন্যে পথ চেয়ে বসেছিলাম—

কতদিন যে মাসিমা সৌম্যবাবুকে দেখতে চেয়েছে তার ঠিক নেই। নিজের জামাইকে দেখতে কোন শাশুড়ি না চায়? যার হাতে নিজের সর্বস্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাওয়ার মধ্যে অন্যায়টা তো কিছু নেই।

অথচ সন্দীপ অনেক চেষ্টা করেও সে-ব্যবস্থা করতে পারছিল না। তার জন্যে মনে মনে তার একটা দুঃখ-বোধও ছিল।

মল্লিকমশাই একদিন জিজ্ঞেস করলেন—তোমাকে অত মনমরা দেখছি কেন সন্দীপ? কী হয়েছে তোমার? শরীর ভালো আছে তো?

সন্দীপ বলেছিল—ভালো—

—তা হলে কি তোমার মা-র জন্যে মন কেমন করছে?

সন্দীপ সে-কথার কোনও উত্তর দেয়নি!

মল্লিকমশাই বলেছিলেন—তাহলে কলেজের ছুটির সময়ে একবার গিয়ে দেখা করে এসো না— অনেক দিন তোমার মা তো' তোমাকে দেখেন নি--

সন্দীপ বলেছিল--তাহলে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে কে যাবে?

কথাটা সত্যি। সন্দীপের তো ওটা একটা নিত্য-কর্ম পদ্ধতি। তাকে সেখানে রোজ একবার করে যেতে হবে। রোজ রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বিশাখা আর তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে। দৈনন্দিন সংসার যাত্রায় কাজ তো কম নয়। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গা থেকে দুধ আনতে হবে। বউমার আবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ঠাক্‌মা-মণির হুকুম আছে গরুকে বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে শৈলর চোখের সামনে দুধ দুইতে হবে। তা না হলে গোয়ালারা দুধে জল মিশিয়ে দেবে।

আর শুধু কি দুধ? বাজার থেকে যে শাক-সব্‌জিই কিনে আনা হবে তা যেন ভালো করে নুন-জল দিয়ে ধুয়ে তবে রান্না করা হয়। ফিনাইল দিয়ে রোজ ঘর ধোওয়া মোছা করতে হবে। বাথরুম রোজ জমাদার এসে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করবে।

আর এ-সব নিয়ম-কানুন ঠিক ঠিক মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখবার ভার সন্দীপের ওপর।

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করেন—গরুর দুধ দেওয়ার সময় শৈল দাঁড়িয়ে থাকে তো?

সন্দীপ বলে—হ্যাঁ—

—আর ঘর-দোর সব ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করা হয় তো?

—ডাক্তার কাল এসে বউমার শরীর পরীক্ষা করেছে তো? ওজন নিয়েছে? সব কথাতেই সন্দীপ 'হ্যাঁ' বলে যায়। আর ঠাকমার কথাগুলো ঠিক-ঠিক যাতে মানা হয় তার জন্যে সন্দীপের চেষ্টারও কোন ত্রুটি থাকে না। সন্দীপ প্রতিদিন ও-বাড়িতে সে-সব খুঁটিয়ে দেখতো।

কাজ করবার লোক তো মাত্র ওই একটা। সে ওই শৈল। আর একটা লোক রাখলে অবশ্য ভালোই হয়। কিন্তু পুরুষ মানুষ চাকর লোক রাখলে তো চলবে না। পুরুষ মানুষ চাকর রাখতে ঠাক্‌মা-মণির আপত্তি।

ঠাক্‌মা-মণি বলতেন--না, বাড়িতে বেটাছেলে নেই, আর একজন ঝি রাখলে তবু চলতে পারে—

কিন্তু তেমনি আর একজন বিশ্বাসী মেয়েলোক কোথায় পাওয়া যাবে?

টাকাটা বড় কথা নয়। বিশ্বাসী যেমন হওয়া চাই, তেমনি আবার কাজের মানুষও হতে হবে! এ-রকম লোক কে কোথায় দেখেছে?

মাসিমা আগে মনসাতলা লেনের বাড়িতে অনেক পরিশ্রম করেছে। বাজার করাটাই শুধু করেছে তপেশ গাঙ্গুলীমশাই। কারণ অন্যলোককে বাজার করতে দিলে অপব্যয় হওয়ার ভয়। কিন্তু দোকান থেকে রেশন আনা আর কয়লা, ঘুটে, কেরোসিন থেকে আরম্ভ করে ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা পর্যন্ত সবই ছিল মাসিমার কাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এ-বাড়িতে?

ঠাক্‌মা-মণি বলে দিয়েছিলেন—ও-সব কাজ বউমার মা'কে করতে হবে না। বউমা'কে দেখাশোনা করাই তার মা'র হবে প্রধান কাজ।

মাসিমা জিজ্ঞেস করতেন তা হলে কি শুধু পটের বিবি সেজে চুপচাপ বসে থাকবো? তাহলে যে আমার হাতে পায়ে কোমরে বাত ধরে যাবে—

সন্দীপ বলতো—আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন কেন, বিশাখাকে দেখাশোনা করাও তো একটা কাজ! সে কী খাবে, কোন শাড়ি পরে ইস্কুলে যাবে, ইস্কুল থেকে ফিরে এসে কী শাড়ি পরবে, সে-সব ব্যবস্থা করাও তো একটা কাজ—কাজ কি আপনার একটা মাসিমা? আর যারা কাজ করবে তাদের কাজের তদারকি করবার জন্যেও তো একজন লোকের দরকার। আপনি না হয় সেই কাজটাই করলেন...

এত আরামের মধ্যে থেকেও যোগমায়ার এক-একদিন রাত্রে ঘুম আসে না। যোগমায়া যেন বিশ্বাস করতে পারে না এই সব সুখের কথা। আগেকার মত ভোর রাত্রে ঘুম থেকে ওঠবার দরকার নেই তার। সবই শৈল করে। শৈলই সকালবেলা নিচেয় নেমে গিয়ে গোয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে গরুর দোওয়া দুধ নিয়ে আসে। তারপর সে-ই উনুনে আগুন দেয়।

শৈল ডাকে—মা একবার উঠুন—

রাত্রে যখন বিশাখাও ঘুমোয় শৈলও ঘুমোয় তখন যোগমায়ার এক-একদিন ঘুম আসে না। ঘুম না এলে সেই সব আগেকার জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। মরবার আগে মানুষটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে তার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে। তখনই বলেছিল—বউ তুমি কিছু ভেবো না, আমার মায়ের পেটের ভাই তপেশ রইলো, সে তোমাকে দেখবে। আমিই তার চাকরি করে দিয়েছি, আমিই তার বিয়ে দিয়েছি। সে রইলো, তোমার ভাবনা কী। তা কোথায় চলে গেল সেই মানুষটা, কে কোথায় চলে গেল সেই তার বড় আদরের দেওর—। আজকে আবার কোথাকার কোন বিড়ন স্ট্রীটের বাড়ির গিন্নী, তারাই তার আপনজন হয়ে গেল। ভাগ্যের এও বিচিত্র খেলা।

কিন্তু তার জামাই? বিশাখার সঙ্গে যার বিয়ে হবে সেই সৌম্য। সৌম্যপদ মুখার্জি। যার টাকার শেষ নেই, যে নাকি নিজেদের কোম্পানির কাজে বছরে বছরে বিলেত যায়। তার সঙ্গেই বিশাখার বিয়ে হবে। বিয়ে হওয়ার পর নাকি তার বিশাখাও জামাই-এর সঙ্গে বিলেতে যাবে।

এ সব সুখের কথা কি কল্পনা করা যায়?

তবু এ-সব সুখের কথা কল্পনা করতে ভালো লাগে যোগমায়ার। মনে হয়, ভগবান আছেন। যোগমায়া যে এতদিন বিশাখাকে দিয়ে অত ব্রত করিয়েছে, এ হয়ত তারই ফল।

সকাল থেকেই বিশাখার নানা কাজ থাকে। তাই যোগমায়াই বিশাখাকে ডেকে ডেকে ঘুম থেকে জাগায়। বলে—ওঠো মা, ওঠো, তোমার ইস্কুলের দেরী হয়ে যাবে, ওঠো—

অত সহজে কি মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে?

কিন্তু ওই রকম করেই বিশাখাকে তখনও রোজ ঘুম থেকে ওঠাতে হয়। এই রকম করেই বিশাখাকে খাইয়ে দিতে হয়। বিডন স্ট্রীটের বাড়ির ঠাকমা-মণি মেয়েকে যা-যা খাওয়াতে বলেছিলেন তাই-ই খাওয়ানো হয়। আগে মনসাতলা লেনে যে-মেয়ে লুচি খাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যেত সেই মেয়েরই আবার লুচি খেতে খেতে লুচির ওপর একদিন অরুচি ধরে যায়। দুধ-দই-রাবড়ির ওপর যে-মেয়ের অত লোভ ছিল সেই মেয়েকেই আবার সেধে এই দুধ-দই রাবড়িই গিলিয়ে খাইয়ে দিতে হয়।

তা হোক, বিশাখা যে বড় হয়েছে, বিশাখা যে স্কুলে লেখাপড়া শিখছে, ইংরিজী শিখছে, অঙ্ক শিখছে, নাচ শিখছে, এও তো কম কথা নয়। মনসাতলা লেনে দেওরের বাড়িতে থাকলে কি এইটুকুও হতো। পাড়ায় অন্য সব বাড়ির গরীব লোকের বাড়ির মেয়েদের মত হয়ত চিরকাল মুখ্যু হয়ে থাকতো। আর তারপর অনেক কষ্টে হয়ত একটা গরীব বরের গলায় তাকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হতো। একটা সহায়-সম্বলহীন বিধবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর কোথায়ই বা জুটতো?

একদিনে তার দেওর তপেশ গাঙ্গুলী আবার এসেছিল।

হাজার হোক নিজেরই তো দেওর, বিধবা হওয়ার পর থেকে ওই দেওরই তো তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

তপেশ গাঙ্গুলী আসার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে শৈলকে যেতে হলো বাজারে মিষ্টি কিনে আনতে।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—বাড়ির সব খবর কী ঠাকুরপো, ভালো তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—ভালো, আর কী করে বলি? তুমি চলে আসার পর থেকেই তো তোমার জা আরো খিটখিটে হয়ে উঠেছে। আমার আর ভাল্লাগে না বউদি। আমার আর বাঁচতেও ইচ্ছা করে না। ভাবি, কাদের জন্যে সংসার করছি। কেন যে তখন মরতে বিয়ে করেছিলুম। এক

এক সময় আমার আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে বউদি, তোমায় আমি সত্যি কথাই বলছি—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না—

যোগমায়া তপেশ গাঙ্গুলীকে পেট ভরে খাওয়ালে সামনে বসিয়ে।

বললে—অত ভেবো না ঠাকুরপো, অত ভাবলে শেষে তোমার নিজের শরীরই ভেঙ্গে পড়বে—

—ভাবি কি সাধে বউদি—

জীবনের ওপর তপেশ গাঙ্গুলীর বরাবরের বিতৃষ্ণা। কারণ একটাই। সেটা হচ্ছে অর্থাভাব। অর্থের জন্যে শুধু স্ত্রীর কাছেই নয়, অন্য সব লোকের কাছ থেকেও তাকে কেবল গঞ্জনাই শুনতে হয়েছে। তার ওপর দাদার মৃত্যুতে বিধবা বউদি আর তার নাবালক মেয়ের ভার তার ওপর পড়াতে সেই অভাব আরো তীব্র হয়েছিল।

কিন্তু কয়েকটা বছরের জন্যে শুধু ভাগ্যের দাক্ষিণ্য তার কপালে জুটেছিল।

খেতে খেতে তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে—বিশাখা কোথায়?

যোগমায়া বললে—সে তো ইস্কুলে গেছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—অনেক দিন তাকে দেখিনি, এখন কত বড় হলো?

যোগমায়া বললে—বয়েস তো কারো থেমে থাকে না ঠাকুরপো। সে ফ্রক পরা ছেড়ে এখন শাড়ি ধরেছে—

—তাহলে তো বিজলীরই মতো বিজলীও এখন শাড়ী পরে। কিন্তু শাড়ির দামের কথা শুনে তো আমি একেবারে থ হয়ে গেছি বউদি একটা ছোট মেয়ের শাড়ির দাম কিনা বলে তিরিশ টাকা—

যোগমায়া বললে—আজকাল তো সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—দাম তো বাড়ছে কিন্তু আমাদের মাইনে তো আর সেই রেটে বাড়ছে না—

যোগমায়া বললে—সেদিন ও বাড়ি থেকে বিশাখার জন্মদিনে শাড়ি আর ব্লাউজ দিয়ে গেল, আমি জিজ্ঞেস করতে বললে—ও শাড়িটার দাম নাকি দেড়শো টাকা। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি গেল জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিলে বউদি, তাই—

যোগমায়া বললে—ও কথা বোল না ঠাকুরপো—আমার মত অভাগী যেন কেউ না জন্মায়। জন্মেই বাপকে খেয়েছিলুম, শেষকালে তোমার দাদাকেও খেলুম—

বলতে বলতে যোগমায়ার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগলো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা হোক, তোমার ভগবান তো তবু তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু আমার ভগবানের কাণ্ডটা একবার দেখ তো! আমি ভগবানকে তো কত ডাকি, কই, আমার ভগবান তো একবারও আমার দিকে মুখ তুলেও চায় না—

যোগমায়া হাসলো। বললে—কী সেটা? টাকা?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি তো জানো বউদি, আমি রসগোল্লা খেতে খুব ভালোবাসি। কিন্তু তার চেয়েও আমি বেশি ভালোবাসি আর একটা জিনিস—

—আর দুটো রসগোল্লা নেবে ঠাকুরপো?

তপেশ গাঙ্গুলীও হেসে ফেললে। বললে—কী করে বুঝলে তুমি বউদি?

যোগমায়া উঠে ঘরের কোণের দিকে রাখা আলমারির পাল্লাটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললে। তারপর ভেতর থেকে গোটা কয়েক টাকা নিয়ে এসে তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিয়ে বললে—এই টাকা কটা নাও ঠাকুরপো, আর রসগোল্লাও দিচ্ছি, একটু দাঁড়াও—

বলে পাশের ঘর থেকে আরো দুটো রসগোল্লা এনে সেই প্লেটটার ওপর রাখলে।

বললে—এবার খুশী তো?

তপেশ গাঙ্গুলী তখন টাকাগুলো 'গুনছে', গুনে দেখে বললে—পঞ্চাশ টাকা দিলে? বসগোল্লা আমি খাচ্ছি। তোমাকে সত্যি কথাই বলি, আজকে তোমার জা রান্নাই করেনি—

যোগমায়া অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—সে কী, কেন? দিদি রান্না করেনি কেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তুমি চলে আসার পর থেকে মাসের অর্ধেক দিনই আমি ভাত না খেয়েই আপিসে যাই

যোগমায়া বললে—তা এ কথা আগে বলবে তো? তাহলে তুমি আজ এখানে খেয়ে যাও—আমি তোমাকে আজ আর ছাড়ছি না। আজ তোমাকে আমার বাড়িতে খেয়ে যেতেই হবে--

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমাকে আজ মাফ করো বউদি, আমি বরং অন্যদিন এসে খেয়ে যাবো। তার চেয়ে তোমার কাছে আমি অন্য একটা জিনিস চাই। বলো দেবে?

—বলো না, কি জিনিস?

-আগে বলো তুমি দেবে?

--জিনিসটা কী, না জানলে আমি কী করে দেব?

তপেশ গাঙ্গুলীর মুখটা এবার বড় হয়ে উঠলো।

বললে—তুমি তো জানো না বউদি, আমার কী কষ্টটা। জানো আজকাল মাসের পয়লা তারিখে মাইনেটা পুরো তোমার জা' এর হাতে তুলে না-দিলে তোমার জা আর সেদিন রান্নাই করে না।

যোগমায়া বললে—রান্না না করলে তোমরা সবাই খাও কি?

তপেশ গাঙ্গুলী এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললে।

বললে—তোমার জা আর বিজলী দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খায়—

—আর তুমি? তুমি কী খাও?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি? হাতে পয়সা থাকলে তবে তো খাবো! বিনা পয়সায় তো খাবারের দোকানীরা খাবার দেয় না। আজকাল তো তাদের সব নগদের কারবার—আমি উপোস করে থাকি—

তারপর একটু থেমে তপেশ গাঙ্গুলী আবার বললে—তোমার জা আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করে আমার মাইনে এত কম কেন? আচ্ছা বউদি, আমি এর কী জবাব দেব বলো তো?

কথাগুলো শুনে যোগমায়ার বড় কষ্ট হলো। বললে তুমি একটু বোস ঠাকুরপো—বলে আবার আলমারির পাল্লা খুলে কিছু টাকা বার করে এনে তপেশ গাঙ্গুলীর হাতে দিলে। বললে—এগুলোও তুমি রাখো ঠাকুরপো--

তপেশ গাঙ্গুলী এবার আর থাকতে পারলে না। একেবারে যোগমায়ার পায়ের ওপর ঝপ্ করে উপুড় হয়ে পড়ে নিজের মাথা ঘষতে লাগলো। আর তপেশ গাঙ্গুলীর চোখের জলের ধারায় তখন যোগমায়ার পা দুটো ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেল।

যোগমায়া বললে—ওঠো ঠাকুরপো, ওঠো, করো কী? করো কী ..

কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে ওঠবার আগেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। নিচের দারোয়ান সোজা ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো আর পেছন-পেছন ঢুকলো দুজন অচেনা মানুষ।

দারোয়ান ডাকলো—মাঈজী, এই আমাদের ছোটবাবু আ গয়াঁ...

ছোটবাবু! কথাটা যোগমায়ার কানে গেল বটে কিন্তু তবু বুঝতে পারলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী বুঝেছিল যে যারা ঘরে ঢুকেছিল তারা দুজনেই যোগমায়ার অচেনা। সে তাদের ঢুকতে দেখেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলে, জিজ্ঞেস করলে—ছোটবাবু? আপনারা কে? তার জবাবে দারোয়ান বললে—

—ইনি আমাদের ছোটবাবু, ছোট হুজুর...

—ছোট হুজুর? ছোট হুজুর মানে?

তপেশ গাঙ্গুলী সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বললে— কোথাকার ছোট হুজুর? ব্যাপারটা তাতেও স্পষ্ট হলো না।

একজন ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—ইনি হচ্ছেন বিডন স্ট্রীটের মুখার্জিবাবুদের বাড়ির সৌম্যপদ মুখার্জি ঠাকমা-মণির নাতি—

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালে যেমন লোকের চোখে ধাঁধা লেগে যায় এও যেন তেমনি। যোগমায়া তখন বোবা হয়ে গেছে আর তপেশ গাঙ্গুলী একবার যোগমায়ার দিকে দেখছে একবার সৌম্যপদ মুখার্জির মুখের দিকে। তবু কিছুই বুঝতে পারছে না। জীবনে আর কখনও সে যেন এত চমকে ওঠেনি।

—আর আপনি?

ভদ্রলোক বললে—আমি? এই সৌম্যবাবুর বন্ধু—

— আপনার নাম?

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম গোপালচন্দ্র হাজরা

কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা মোটেই স্পষ্ট হলো না। তপেশ গাঙ্গুলী তখন বউদির দিকে চাইলে। অর্থাৎ বউদি যদি এই রহস্যের ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারে। দু'জনেরই কেউই দু'জন অচেনা লোকদের চিনতে পারছে না।

গোপালচন্দ্র হাজরা তখন বললে—আচ্ছা, এ বাড়িতে বিশাখা বলে কেউ থাকে?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, সে তো আমারই মেয়ে।

গোপাল বললে—তা, তার সঙ্গেই তো আমার এই বন্ধু সৌম্যবাবুর বিয়ে হবে। ইনিই হচ্ছেন সেই আপনার হবু জামাই...

যোগমায়ার মনে হলো যেন সে চোখের সামনে বায়োস্কোপ দেখছে। বহু বছর আগে বিশাখার বাবার সঙ্গে একবার টিকিট কেটে বায়োস্কোপ দেখেছিল। আজকের এই দৃশ্যও যেন ঠিক সেই বহুকাল আগেকার দেখা বায়োস্কোপের মতন। যে জামাইকে দেখবার জন্যে তিনি এতদিন ধরে ছট্‌ফট্ করেছিলেন, এই কি সেই জামাই? এত সুন্দর? জামাই নয়, যেন রাজপুত্র।

যোগমায়া কী করবে আর কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তারপর মুখ দিয়ে শুধু একটা কথা

বেরিয়ে গেল—আপনারা বসুন, বসুন—

গোপাল সৌম্যকে ধরে একটা সোফার ওপর বসালো।

বললে—আমাদের 'আপনি-আজ্ঞে' বলছেন কেন মাসিমা? আমরা তো আপনার ছেলের মতন।

তারপর তপেশ গাঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে?

যোগমায়া তখনও অস্বস্তিতে থরথর করে কাঁপছে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—ইনি আমার দেওর, এঁর নাম তপেশচন্দ্র গাঙ্গুলী। বিশাখার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এতদিন ইনিই আমাদের দেখাশোনা করে আসছিলেন।

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো...আপনারা এঁর মেয়েটিকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু আমারও একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে, সেও ওই বিশাখার বয়েসী, আপনারা তার একটা বিলিব্যবস্থা করতে পারেন না?

যোগমায়ার কানে দেওরের কথাগুলো বড় খারাপ লাগছিল। দেওরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বললে—আপনাদের জন্যে একটু জল খাবারের ব্যবস্থা করি...

এবার সৌম্যই বলে উঠলে—না না, ও-সব করবেন না।

যোগমায়া বলে উঠলো—কেন বাবা, আপত্তি করছো কেন? এই যা-কিছু দেখছো, এ সবই তো তোমার ঠাক্‌মা মণির দেওয়া। বিশাখাকে তো তোমার ঠাক্‌মা-মণিই তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে বলে পছন্দ করে রেখেছেন। তাঁর দৌলতেই তো আমরা খেতে পাচ্ছি।

তপেশ গাঙ্গুলীও বলে উঠলো—হ্যাঁ হ্যাঁ বউদি তো ঠিক কথাই বলেছে। তোমাব ঠাকমা-মণি বোজ গঙ্গাচান কবতে যেতেন আমাব বউদিও যেত সেখানেই ও আমাব ভাইঝিকে দেখে তাকে নাত-বউ কববাব জন্যে। তোমাব ঠাকমা মণি পছন্দ করে রেখে দিয়েছেন

আব তাবপব একটু থেমে আবাব বললে আব এই যে আমি বসগোল্লা খাচ্ছি এও তো তোমাব ঠাকমা মণিব দেওয়া টাকাতেই কেনা

যোগমায়া বললে —শুধু কি তাই, এই যে বাড়িটা, এটাও তো তোমাদেবই বাড়ি এই বাড়িটাতে তোমাব ঠাকমা মণি থাকতে দিয়েছেন বলেই তো এখনও আমবা মাথা গুঁজে আছি। এই খাট সোফা আলমাবি বাসন কোসন আয়না যা কিছু দেখছো সবই তো তোমাদেব। তোমবা বাবা সামান্য কিছু খেতে আপত্তি কোব না—

সৌম্যপদব হয়ে গোপাল হাজবাই বললে এখন কিছু খাবো না মাসিমা এই একটু আগেই সৌম্যবাবু খেয়ে বেবোচ্ছিলেন, আমি একে জোব করে নিয়ে এলুম শুধু আপনি আপনাব জামাইকে দেখতে চেয়েছিলেন বলে—

যোগমায়া জিজ্ঞেস কবলে- তা তোমবা কী করে জানলে বাবা যে আমি আমাব জামাইকে দেখতে চেয়েছি?

গোপাল বললে- আপনাব এখানে সন্দীপ বলে একটা ছেলে থাকে, তাব কাছেই প্রথম শুনেছিলুম যে আপনি আপনাব জামাইকে দেখতে চান—

যোগমায়া বললে—তা বাবা আমি তো বাপ-মবা মেয়েব মা আমাব তো জানতে ইচ্ছে কবে যাব হাতে আমাব মেয়েকে দিচ্ছি সে কেমন ছেলে, তাকে কেমন দেখতে—

গোপাল বললে—তা এখন তো তাকে দেখলেন? এখন আপনাব পছন্দ হলো?

যোগমায়া বললে— আমি বড দুঃখী মানুষ বাবা, আমাব তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমাব মত গবীব মায়েব এমন বাজপুত্তুবেব মত জামাই হবে—আমাব মেয়ে আব জন্মে অনেক পুণ্যি কবেছিল, তাই এমন ঘবে এমন ববে তাব সম্বন্ধ হচ্ছে—

গোপাল বললে—আপনাব জামাই যে রূপেই বাজপুত্তুব, তা ই নয়, গুণেও আপনাব জামাই বাজপুত্তুব—

যোগমায়াব চোখ দিয়ে টস টস করে জল পডতে লাগলো। আচলেব খুঁট দিয়ে চোখ মুছে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাব আগেই তপেশ গাঙ্গুলী বললে— আবে, তুমি কাঁদছো কেন বউদি? তোমাব তো এখন আনন্দ কববাব কথা। তোমাব জামাই বাড়িতে এসেছে আব এখন কিনা তুমি কাঁদছো? কাঁদলে মেয়ে জামাই-এব অমঙ্গল হয়, তা জানো না?

যোগমায়া এবাব আবো জোবে কেঁদে উঠলো। তাব কান্নাব বেগ সে আব কিছুতেই আটকে বাখতে পাবলে না। তাবপব নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে—তোমাব দাদা আমাব এত সুখ দেখে যেতে পাবলে না এ যে কী দুঃখ তা তুমি বুঝবে না ঠাকুবপো—।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা কাদতে হয তুমি পবে কেঁদো। ঘবে তোমাব জামাই বসে বয়েছে আব তাব সামনে তুমি কাঁদছো। ওবা চলে গেলে তুমি তখন যত ইচ্ছে কেদো না, তখন কেউ তোমায় বাবণ কবতে যাবে না—তখন পেট ভবে কেঁদো—এখন কুটুম বাড়িব লোক এসেছে, তাদেব কিছু মিষ্টি-মুখ কবাও—তুমি এত কেপপোন শাশুডি কেন?

গোপাল বললে—না, না, অমন কবলে কিন্তু আমবা উঠে যাবো মাসিমা—

তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলো—আবে ভায়া এত লজ্জা কববাব কী আছে? তোমাদেব নাম করে আমিও কিছু পেতুম। মিষ্টান্নমিতবে জনাঃ—

কথাগুলো কাবোবই শুনতে ভালো লাগলো না। কিন্তু তপেশ গাঙ্গুলীব লজ্জা নেই কিছুতেই। বললে—এ সব তো তোমাদেবই টাকায হচ্ছে ভায়া, এতে তো লজ্জা কববাব কিছু নেই—

কিন্তু সৌম্যপদ গোপালকে বললে—চলুন, যাই-

গোপাল বললে —যে জন্যে আসা তা তো হলো না মিস্টাব মুখার্জি—

তারপর যোগমায়ার দিকে চেয়ে বললে—কই, সন্দীপকে তো দেখছি না। সন্দীপ কোথায়? সে কখন আসে?

যোগমায়া বললে—সে তো অন্যদিন এর অনেক আগেই আসে, আজকে তো এখনও এলো না, বোধহয় কোনও কাজে আটকে গেছে কোথাও—

গোপাল বললে—সে এলে বলে দেবেন—গোপাল সৌম্যপদ বাবুকে নিয়ে আজ এখানে এসেছিল—

তপেশ গাঙ্গুলীর তখন খুব দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাকেও একবারের জন্যে অন্ততঃ অফিসে যেতে হবে। রেলের অফিস হলেও বেশি তো কামাই করা যাবে না।

সে উঠলো। বললে—আমি তাহলে উঠি ভায়া। আমাকে একবার অন্ততঃ অফিসে মুখটা দেখিয়ে আসতে হবে—

—তপেশ গাঙ্গুলী চলে যাচ্ছিল। যোগমায়া বললে—আবার এসো ঠাকুরপো—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—নিশ্চয়ই আসবো, না এসে যাব কোথায়? এখন তুমিই তো আমার ভরসা—

বলে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

এর পরে যোগমায়া বললে—বাবা, তোমাদের ঠাকুমা-মণি আমাদের জন্যে যা করেছেন তা কেউ কারোর জন্যে কখনও করে না। আমার মেয়ে আর জন্মে বোধহয় অনেক পুণ্যি করেছিল, তাই বোধহয় ভগবান আমাদের কপালে এত সুখ দিলেন—

সৌম্যপদ বললে—তাহলে এবার আমরা চলি—

যোগমায়া বললে—তোমরা তো কিছু মুখেও দিলে না, আর খানিকটা বসলে না। তোমাদেরও কাজের খুব ক্ষতি করে দিলুম। আর একটু বসবে না বাবা তোমরা? আমার বিশাখা হয়ত এখুনি এসে পড়বে—

গোপাল বললে—আমরা তো বসতে পারতুম, কিন্তু সৌম্যপদবাবু তো কাজের লোক—

বলতে না বলতেই হঠাৎ এক ঝলক মৌসুমী হাওয়ার মত ঘরে ঢুকলো বিশাখা। সমস্ত শরীরটা তার ঘামে ভিজে গেছে। গরম লেগে লাল হয়ে গেছে সারা মুখটা। সকাল বেলা সামান্য জল খাবার খেয়ে বেরিয়েছিল এখন তার খুব খিদে পেয়ে গেছে। রোজই এই রকম ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সে বাড়ি আসে। বাড়ি এসেই সে মার কোলে শুয়ে পড়ে। মার কোলে খানিকক্ষণ না শুলে তার ক্লান্তি কাটে না। তখন তার জন্যে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ কিংবা ডাবের জল বরাদ্দ থাকে। শৈল আগে থেকেই তার ব্যবস্থা করে রাখে।

সেদিনও কোনও দিকে না চেয়ে সে মা'র কোলে এসে শুয়ে পড়লো।

শৈল তৈরিই ছিল। সে একটা গ্লাসে ডাবের জল এনে তার সামনে ধরলো। যোগমায়া তার গায়ের শাড়িটা গুছিয়ে ভালো করে তাকে ঢেকে দিলে। বললে—এইবার ডাবের জলটা খেয়ে নাও মা—

বিশাখা তখনও মা'র কোলের ভেতরে চোখ বুজে শুয়ে আছে।

যোগমায়া তাকে জাগিয়ে দিলে। বললে—দেখ না, কারা এসেছে। দেখ দেখ, চোখ তুলে দেখ তুমি—

বিশাখা চোখ বুজিয়েই জিজ্ঞেস করলে—কে? কাকা?

—না না, কাকা নয়, অন্য লোক। তুমি ওঠো, উঠে বোস, উঠে বসে দেখ না—

তখন কী যে হলো, এতক্ষণে চোখ মেলে চাইলে। দেখলে ঘরে দু'জন অচেনা লোক বসে আছে।

যোগমায়া বিশাখার গায়ের শাড়িটা গুছিয়ে দিয়ে বললে—পেন্নাম করো মা ওদের, পেন্নাম করো—

বিশাখা অবাক হয়ে গেল। জানা নেই শোনা নেই, তাদের সে প্রণাম করবে কেন বুঝতে পারছে না।

জিজ্ঞেস করলে— ওরা কে মা?

যোগমায়া বললে—ওই তোমার এক বদ স্বভাব, সব কথায় কেবল তক্কো আর তক্কো—যা বলছি তাই করো, যাও পেন্নাম করো—

তবু বিশাখা কিছু বুঝতে পারলে না। আর কখনও তো মা এমন করে কাউকে প্রণাম করাতে বলে না—

ততক্ষণে ড্রাইভার ভলটা খাইয়ে শৈল গেলাসটা নিয়ে ভেতরে চলে গেছে।

যোগমায়া আবার বললে – কই, যাও—পেন্নাম করো—

বিশাখা দু'জনের দিকে আবার ভালো করে চাইলে।

বললে—ওরা কারা মা? কারা ওরা?

যোগমায়া বললে—ওরা তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোক। তোমাকে ওরা দেখতে এসেছেন। ওরা তোমার গুরুজন! যাও, পেন্নাম করো গিয়ে, পেন্নাম করতে হয়-

'গুরুজন' কথাটা শুনে বিশাখা যেন হঠাৎ কেমন অন্য-রকম হয়ে গেল।

যোগমায়ার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে—আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে? তারা?

—হ্যাঁ।

বিশাখা আবার চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল কোন্‌টা আমার বর? ফর্সা মতন লোকটা?

যোগমায়া বললে –হ্যাঁ, যাও এবার, পেন্নাম করো গে—পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করো—

এবার আর বিশাখা আপত্তি করলে না। সোজা গিয়ে সৌম্যপদর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালো। আর তারপর গোপালকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল—কিন্তু গোপাল আপত্তি করে উঠলো। বললে— আরে না-না, আমাকে প্রণাম করতে হবে না। আমি কেউ নই--

যোগমায়া বললে—না-না, করুক বাবা তোমাদের পেন্নাম করলে ওর পুণ্যি হবে--

প্রণামটা কোনও রকমে সেরেই লজ্জায় যোগমায়ার কোলের ভেতরে আবার নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে।

গোপাল বললে—আপনার মেয়ে খুব লাজুক মাসিমা।

যোগমায়া মেয়ের অপরাধটা ঢেকে দেওয়ার জন্যে বললে —আমার মেয়ে তো বাইরের কারোর সঙ্গে মেশে না বাবা, তাই একটু লজ্জা পাচ্ছে—

গোপাল বললে—ভালো-ভালো, খুব ভালো, লজ্জাই তো মেয়েদের ভূষণ—

যোগমায়া বললে—বিয়ে হওয়ার পর তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো বয়েস বেশি নয় বাবা তাই আড়ষ্ট হয়ে আছে—

গোপাল বললে—বিয়ে হওয়ার পর তো আপনার জামাই-এর সঙ্গে আপনার মেয়েকেও আমেরিকা, জার্মানী, জাপান, ইংলন্ড, ফ্রান্স—সব দেশে প্লেনে করে ঘুরে বেড়াতে হবে—

যোগমায়া বললে—সেই জন্যেই তো আমার মেয়েকে ইংরিজী শেখানো হচ্ছে, নাচ শেখানো হচ্ছে, কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া শেখানো হচ্ছে। ঠাক্‌মা-মণি আমার মেয়েকে এই সব শেখানোর জন্যে মাস্টার রাখবার হাজার হাজার টাকা যোগাচ্ছেন—

গোপাল বললে—ও-সব না শিখলে তো মুখুজ্জে বাড়ির বউ হতে পারবে না মাসিমা। কত সাহেব-মেমসাহেবকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে পার্টি দিতে হবে। তখন তো আর আপনার মেয়ের তো লজ্জা করলে চলবে না—

সৌম্যবাবু এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। যা বলার কথা তা সবই বলছে গোপাল। বলতে গেলে সন্দীপের অনুরোধে গোপালই তাকে ডেকে এনেছিল। এবার একবার হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল।

বললে—চলুন মিস্টার হাজরা, বড্ড দেরি হয়ে গেল—

গোপালও বলে উঠলো—হ্যাঁ, চলি মাসিমা—

যোগমায়া বললে—বড় ভালো লাগলো বাবা অনেক দিন ধরে সাধ ছিল যার টাকায় খাচ্ছি পরছি তাকে একবার বিয়ের আগে চোখের দেখা দেখবো। তা তুমি আমার সে-সাধ পূর্ণ করলে বাবা। কিন্তু আমার মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল, তোমরা এত কষ্ট করে এলে আর আমার বাড়িতে একটু মিষ্টিমুখও করলে না—

গোপাল বলে উঠলো—আপনার মিষ্টি কথা শুনলুম, তাতেই আমাদের মিষ্টি মুখ করা হয়ে গেছে।

বলে নিজের রসিকতাতে নিজেই হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তারা নিচের দিকে নামবার উপক্রম করতেই যোগমায়া বললে—আবার এসো বাবা, মাসিমাকে ভুলে থেকো না!

গোপাল বলে উঠলো—সন্দীপকে বলবেন আমরা এসেছিলুম—

যোগমায়া দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

এতক্ষণ সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল তা যোগমায়া বুঝতে পারেনি। এতদিনের স্বপ্ন যোগমায়ার সফল হবে এ কথা আজকে ঘুম থেকে ওঠার সময়েই কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কখন যে যোগমায়া ভাবনার ফ্রেমে নির্জীব একটা ছবি হয়ে উঠেছিল তা সে বুঝতে পারেনি। বুঝলো বিশাখার ডাকে—

—ওমা, আমাকে খেতে দেবে না? আমার বুঝি খিদে পায় না?

এতক্ষণে যোগমায়ার মনে পড়লো—তাই তো! বিশাখা ইস্কুল থেকে অনেকক্ষণ এসেছে, এতক্ষণ একটু ডাবের জল ছাড়া আর কিছুই খায়নি।

তাড়াতাড়ি শৈলকে খাবার দিতে বলা হলো। শৈলই বাজার করে, শৈলই রান্না করে। আর শুধু বাজার করা আর রান্না করাই নয়। সংসারের অন্য সব কাজই করে শৈল। বিশাখা কী কী খেতে ভালোবাসে না, তা সব শৈল জানে। তার সঙ্গে এটুকুও জানে যে তার মাসকাবারি মাইনে, তার খাওয়া-থাকার খরচের সব দায়-দায়িত্ব বিডন স্ট্রীটের বাড়ির ঠাক্‌মা-মণির হলেও লক্ষ্য হচ্ছে ওই এক ফোঁটা মেয়ে—বিশাখা! বিশাখা এই এত বড় বাড়ির একদিন মালিক হবে। সুতরাং বিশাখার ভালো-মন্দের সঙ্গে তাদের সকলের ভালো-মন্দ একাকার হয়ে আছে। তাই বিশাখা যা-যা খেতে ভালোবাসে, শৈল তাই-ই বাজার থেকে আনে আর তাই-ই রান্না করে দেয়।

বিশাখার খাওয়ার সামনে বসে একসময়ে যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—আজকে তোমার বরকে দেখলে তো মা? ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে, বুঝলে?

বিশাখা কোনও উত্তর দিলে না। একমনে খেতে লাগলো।

যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—বরকে কেমন দেখলে? ভালো?

বিশাখা বললে—ভালো না ছাই!

—কেন? ভালো নয় কেন?

বিশাখা বললে—আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম তো একটা আশীর্বাদ পর্যন্ত করলে না—

যোগমায়া বললে—ওমা, মেয়ের এ কী কথার ছিরি! আশীর্বাদ না করলেই মানুষ খারাপ হয়ে গেল? দু'দিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে আবার আশীর্বাদ কী করবে শুনি? তোর চৌদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি যে অমন বরের সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে! তোর বোন বিজলী অমন বর পেলে বর্তে যেত তা জানিস?

বিশাখা বললে—যাও যাও, আমিও ফ্যালনা মেয়ে নই। বিয়ে করে ও কি আমার সাত জন্ম উদ্ধার করবে নাকি?

যোগমায়া মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কী বললি, আর একবার বল্ কী বল্লি?

বিশাখা বললে—বিয়ে করে ও কি আমার সাত জন্ম উদ্ধার করবে নাকি?

যোগমায়া বললে—এ সব কথা তোকে কে বলতে শেখালে বে মুখপুড়ী? বিলিতি ইস্কুলে লেখাপড়া শিখে এই ভাব হল?

বিশাখা বললে—আমাকে বাববাব ওই মুখপুড়ী বলে গালাগালি দাও কেন বলো তো?

যোগমায়া বললে—কেন যে তোকে গালাগালি দিই তা যদি তুই একবাব বুঝতিস—তুই যখন আবাব মা হবি তখন বুঝবি বাপ মবা মেয়েব মা হওয়াব কত জ্বালা।

কথাটা বলেই যোগমায়া বোধহয় নিজেব [illegible] অপবাধ স্খালন কববাব জন্যেই বলে উঠলো—ওবে কী বলতে [illegible] বলে ফেলেছি [illegible] কিছু মনে [illegible] তোকে যা কিছু বলেছি তুই সব ভুলে [illegible] তুই ভুলে যা। [illegible] তোকে [illegible] তুই সুখী হোস আমাব কপালে যা [illegible]

কথা শেষ হওয়াব আগেই দবজা [illegible]

শৈল দবজা খুলে দিতেই সন্দীপ ঢুকলো। সন্দীপ যোগমায়াকে দেখে অবাক। বললে—মাসিমা আপনাব কী হলো? শবীব খাবাপ নাকি আপনাব? চোখ মুখ এমন ফোলা-ফোলা দেখছি কেন?

বিশাখা বললে—মা আমাব সঙ্গে ঝগড়া কবেছিল—

-ঝগড়া? কেন? কী কবেছিলে তুমি?

—তা ওই মাকেই জিজ্ঞেস কবো না তুমি।

যোগমায়া বলে উঠলো—আজকে তোমাদেব বাড়িব ঠাকমা-মণিব নাতি এসেছিল—

—কে? সৌম্যবাবু?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, আব তাব সঙ্গে তোমাব এক বন্ধু গোপালও এসেছিল—

সন্দীপ চমকে উঠেছে। সে যেন বিশ্বাসই কবতে চায় না। বললে—কে? গোপাল? গোপাল হাজবা? আমাদেব সৌম্যবাবুকে নিয়ে এসেছিল? তাবপব? তাবপব কী হলো?

বিশাখা বলে উঠলো—তোমাদেব ছোটবাবু কিন্তু বড় অহঙ্কাবী মানুষ, তুমি যাই বলো আব তাই বলো—

কেন? অহঙ্কাবী কেন?

বিশাখা বললে—আমি কি কচি খুকী যে লোক চিনতে পাববো না? তোমাদেব বাড়িব সেই বুড়ীটাব যে নাতি, সে ভেবেছে তাবা বড়লোক বলে আমাদেব মাথা একেবাবে কিনে নিয়েছে—

কেন কেন? কী হলো, কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পাবছি না।

যোগমায়া বললে—তুমি ওব কথা শুনো না তো বাবা। ওব কথা শুনো না। অনেক মেয়ে দেখেছি বাবা কিন্তু আমি বাপেব জন্মে এমন মেয়ে দেখিনি।

সন্দীপ তবু কিছু বুঝতে পাবল না। বললে—কেন, বলুন না কী কবেছে ও?

যোগমায়া বললে—দেখ বাবা, ওবা তো হঠাৎ এসে হাজিব হলো। আমাব তখন মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। ওদেব অনেক কবে বললুম, তা ওবা বললে ওবা খেয়ে এসেছে। তাবপবেই এই বিশাখা হঠাৎ ইস্কুল থেকে এসে হাজিব হয়েছে—

– তাবপব?

—আমি শুধু মেয়েকে বলাব মধ্যে বলেছি পাত্রকে পেন্নাম কবতে। দুদিন বাদেই যাব সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে পেন্নাম কবতে বলে আমি কী এমন অন্যায়টা কবেছি বলো তো?

সন্দীপ বললে—অন্যায় কেন বলছেন? আপনি তো ভালো কথাই বলেছেন। যাক গে, এখন বলুন, জামাই কেমন হয়েছে? আপনাব পছন্দ তো?

যোগমায়া বললে—আমাব তো পছন্দ অপছন্দেব কথাই ওঠে না বাবা। আমাব মেয়েকে যে ওবা দয়া কবে ঘবে নিয়ে যাচ্ছে এতেই তো হাতে স্বর্গ পেইচি, কিন্তু আমাব বিশাখাকে ওদেব কেমন লাগলো সেইটেই আমাব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে বাবা।

– ওবা কিছু বলে গেল?

—না।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে— আর গোপাল কিছু বলেনি

যোগমায়া বললে—গোপাল তো তোমারই বন্ধু। তুমিই না হয় গোপালের সঙ্গে দেখা করে একবার খবরটা নাও যে আমার জামাই এর কেমন লাগলো বিশাখাকে

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, আমি যত শিগ্‌গির পারি একবার গোপালের সঙ্গে দেখা করে খবরটা নেবার চেষ্টা করবো—

—হ্যাঁ তাই কোর বাবা। আমি খবরটার জন্যে হাঁ করে থাকবো কিন্তু—

এর পরে সন্দীপের আর কোনও কাজ ছিল না। অন্য দিনের চেয়ে সন্দীপ একটু দেরি করেই এসেছে। মল্লিকমশাই এর জরুরী কাজে তাকে একবার বাজারেও যেতে হয়েছিল

বললে তা হলে আমি আসি মাসিমা কাল আবার ঠিক সময়ে আসবো

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সন্দীপের বড়াপোতার কথা মনে পড়ছিল। অনেকদিন মা র কাছ থেকে কোনও চিঠি পায়নি। চিঠি দিতে মা তো কখনও এমন দেরি করে না। কি বা হয়ত চিঠি লেখাবার ঠিক মত লোক পাচ্ছে না। ক'দিন থেকেই মা'কে তার খুবই দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কলেজের ছুটি থাকলেও মল্লিকমশাই এর কাজের তো শেষ নেই। এখন মল্লিকমশাই এর আরো অনেক বয়েস হয়েছে, এখন আর আগের মত দৌড়ঝাঁপ করতে পারেন না। তাই ঠাকমা মণি বলে দিয়েছেন, মল্লিকমশাই এর অন্য অনেক কাজের ভারও সন্দীপের ওপর চাপিয়ে দিতে।

— এই, শোন—

হঠাৎ ওপর থেকে বিশাখার গলার আওয়াজ পেয়েই সন্দীপ থমকে দাঁড়ালো, উঁচু দিকে চেয়ে দেখলে বিশাখা রেলিং এর ওপর থেকে ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে আছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কিছু বলছো?

বিশাখা তর-তর করে নেমে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—তুমি একটা হাঁদা গঙ্গারাম—

বলে আর দাঁড়ালো না। যেমন তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল, আবার তেমনি করে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্দীপ সেইখানে সেই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অঞ্চল খুঁজে বেড়াতে লাগলো। বিশাখার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের রহস্যজাল সে কিছুতেই কোন ক্রমেই ভেদ করতে পারলে না—

সেদিনকার বিশাখার কথাগুলো তারপর তাকে অনেক ভাবিয়েছে, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে অনেক বিনিদ্র রাত কাবার করে দিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু অনেক ভেবেও সন্দীপ ভাবনার কোনও কূল-কিনারা পায়নি।

কেন তাকে বিশাখা অমন করে আঘাত দিলে? কেন তাকে অমন করে আক্রমণ করলে? কী অপরাধ সে করেছে তার ওপর?

এ-কথা অনেকবার বিশাখাকে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে হয়েছে তার কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা তার মুখ দিয়ে আর কখনও আদায় করা যায়নি।

বিশাখা জিজ্ঞেস করেছিল—কই তুমি কিছু বলছো না যে

সন্দীপ বলেছিল—কী বলবো?

বিশাখা বলেছিল—তুমি যে বলেছিলে আমার সঙ্গে তোমার কী একটা কথা আছে?

সন্দীপ বলেছিল—তা আমার তো এখন কিছু আর মনে পড়ছে না—বলেছিলুম নাকি?

বিশাখা সে-কথা শুনে হেসে ফেলেছিল। বলেছিল—এই ভুলো মন নিয়ে তুমি ওকালতি করবে কী করে, বলো দিকিনি?

সন্দীপ সেদিন এ-কথারও কোনও জবাব দিতে পারেনি। চোখ নিচু করেই বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু মল্লিকমশাই-এর চোখ সে এড়াতে পারেনি।

মল্লিকমশাই জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কী হয়েছে বলো তো সন্দীপ? ক'দিন ধরে দেখছি তুমি যেন সব সময়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে মনে মনে কী ভাবো? কেন, মা'র জন্যে তোমার মন কেমন করছে নাকি?

সন্দীপ তার মনের অবস্থার কথা কাকে বলবে? কে বুঝবে তার মনের কথা? সে নিজেই তো নিজেকে বুঝতে পারে না! সে নিজেই তো নিজেকে চেনে না। সে পরের দয়ার ওপর বেঁচে আছে, তার আবার সুখ-দুঃখ কী? সে তো এ-বাড়ির চাকর। এরা যেদিন তাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে সেই দিনই তাকে এই সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। আবার হয়ত তাকে সেই বেড়াপোতায় গিয়ে আবার পরের অন্নদাস হয়ে জীবন কাটাতে হবে। এখানে এই বাড়িতেও সে অন্নদাস, আবার সেখানে বেড়াপোতাতেও সে সেই একই অন্নদাস হওয়া! তার চেয়ে তো এই-ই ভালো, এই বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়ি।

এই বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িতে এসেছিল বলেই তো সে জীবনের এই এত জটিলতা দেখতে পেলে। কোথাকার কোন্ এক বিশাখা। এখানে না এলে কি সে বিশাখাকে দেখতে পেত। নাকি এমন করে বিশাখার সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে সে জড়িয়ে পড়তো!

অথচ বিশাখা তার কে?

দু'তিন দিন বাদে সন্দীপ আবার রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গেল। প্রথমে একটু সঙ্কোচ হয়েছিল। এই দু'তিন দিনের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত সে কেমন করে দেবে সেইটেই ছিল তার প্রধান দুর্ভাবনা।

তাই মাসিমার প্রশ্নের উত্তরে সন্দীপ বললে—আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল—

—শরীর খারাপ হয়েছিল? বলো কী? ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

সন্দীপের শরীর খারাপ হওয়ার ব্যাপারে মাসিমার উদ্বেগ দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের মা ছাড়া সংসারে এমন করে তার শরীর সম্বন্ধে আর কে এত দুশ্চিন্তা করেছে?

সন্দীপ বলেছিল—সে তেমন কিছু নয়, সামান্য অসুখ। ডাক্তার ডাকতে হয়নি—

মাসিমা বলেছিল—তবু বাবা একটু সাবধানে থাকবে। তোমার শরীর খারাপ হলে আমাদের কে দেখবে? তুমি দেখাশোনা করো বলেই তো আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। তোমার ভরসাতেই তো এখানে আমাদের পড়ে থাকা—

সন্দীপ বললে—মল্লিককাকা জিজ্ঞেস করছিলেন জামাই কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

মাসিমা ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—তোমার মল্লিককাকা জামাই আসার কথা কী করে জানলে?

—আমি বলেছি।

মাসিমা বললে—তা হলে তোমার ঠাক্‌মা-মণিও এ-কথা জেনে গেছেন নাকি?

—না না, তিনি কী করে জানবেন? ও তো গোপালই সৌম্যবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। গোপাল আমাদের বেড়াপোতার ছেলে। গোপাল সৌম্যবাবুরও বন্ধু। তা জামাইকে আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন?

মাসিমা বললে—পছন্দ হওয়ার কথা বলছো? আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে কারো পছন্দ না হয়ে পারে?

সন্দীপ কথাটা শুনে খুশী হলো। খুশী হলেও মনের মধ্যে একটা কাঁটা যেন খচ্ করে বিঁধে রইল। কীসের কাঁটা? কেন কাঁটা? তবে কি সৌম্যবাবুকে মাসিমার পছন্দ হওয়াটা সন্দীপের অপছন্দ?

মাসিমা বললে—এত সুখ আমার কপালে সইলে হয় বাবা। এতদিনে মনে হয় আমার ভগবানকে ডাকা, আমার ব্রত করা-টরা সার্থক হয়েছে। আমার আর চাইবার কিছুই নেই—

সন্দীপ বললে—জীবনে তো আপনি কারো ক্ষতি করেননি। কারো সর্বনাশও করেননি আপনি, আপনার ভালো হবে না তো কার ভালো হবে?

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে। যোগমায়া জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। সে-সব এমন দুঃখ যা কখনও ভুলতে পারা যায় না। বিশাখার বাবার মৃত্যুর আঘাতটাই ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বহ। তবে একটা সৌভাগ্য এই যে তার বাবাকে সে দুঃখ দেখে যেতে হয়নি। বিশাখার বাবার মৃত্যুর আগেই যোগমায়ার বাবা মারা গিয়েছিল।

যোগমায়া বললে—আমার মেয়েকে তোমার সৌম্যবাবুর পছন্দ হয়েছে কিনা জানতে পারলে কিছু?

সন্দীপ বললে—সে কথা তো আমি সরাসরি সৌম্যবাবুকে জিজ্ঞেস করতে পারি না—

যোগমায়া বললে—তা তো বটেই, তুমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলে কথাটা পাঁচ কান হয়ে যাবে। তা না হওয়াই ভালো। তা ছাড়া...

সন্দীপ বললে—তা ছাড়া কী?

যোগমায়া বললে—দেখ বাবা, শুভ কাজে বাগড়া দেওয়ার লোকের কখনও অভাব হয় না, আমার দেওরকে তো তুমি চেনো—পর-শত্তুরের চেয়ে ঘর-শত্তুর আরো খারাপ—

সন্দীপ বললে—আমি তো সবই জানি মাসিমা, আমাকে আর আপনি কী বলবেন, উনিই আমাকে বিজলীর জন্যে কতবার একটা পাত্রের ব্যবস্থা করতে বলেছেন—

যোগমায়া বললে—থাক বাবা, ও-সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কোনও লাভ নেই। আমি তো ভগবানের কাছে তাই বলি—ভগবান, তুমি সকলের ভালো করো, সকলকে সুখী করো, সকলের অভাব দূর করে দিও—সকলের ভালো হলেই আমি খুশী—

সন্দীপ বললে—আপনি নিজে ভালো বলেই তাই সকলের ভালো চান—সংসারে তো সবাই আপনার মতো নয় মাসিমা। আমার মা'ও ঠিক আপনার মতো—

যোগমায়া বললে—তোমার মা'কে একবার নিয়ে এসো না, আমি একবার তাঁকে দেখবো।

সন্দীপ বললে—মাসিমা, আমাদের বেড়াপোতায় আমার মা যে চাটুজ্জে-বাড়িতে রান্না করে, সেই বাড়িতে অনেক বই আছে, সেইখানে একটা বইতে আমি একটা কথা পড়েছিলুম। কথাটা হচ্ছে এই যে যতদিন মানুষের দুঃখ অনুভব করবার ক্ষমতা থাকবে, ততদিন তার সুখ অনুভব করবার ক্ষমতাও থাকবে, কথাটা তখন আমার খুব ভালো লেগেছিল, তাই এখনও ওটা আমার মনে আছে—আপনাকে দেখে তাই কথাটা আমার মনে পড়লো।

যোগমায়া বললে—আমি তো বেশি লেখাপড়া শিখিনি বাবা, আমি মনে মনে যা ভালো বুঝি, তাই করি—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—ও বাড়ির সব খবর কী বাবা? সবাই ভালো আছে তো? তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি?

সন্দীপ বললে—এই তো আপনাদের এখান থেকে ও-বাড়ি যাবো, সেখানে গিয়ে ঠাক্‌মা-মণিকে গিয়ে সব রিপোর্ট দেব। এখানে আপনার সঙ্গে যা-যা কথা হলো তা সব তাঁকে বলবো। বিশাখা কেমন আছে, তার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে তাও তাঁকে জানাতে হবে। সপ্তাহে সপ্তাহে ডাক্তার তাকে দেখে কী রিপোর্ট দিয়েছে তাও তাঁকে বলতে হবে। আর এই যে এখন বিশাখা এগ্‌জামিন দিচ্ছে, এর ফলাফলও তাঁকে জানাতে হবে। রোজ তাঁকে এ-সব খবর দিলে তবে আমার ছুটি—

যোগমায়া এ-সব কথা জানে। সন্দীপ বললে—ঠাক্‌মা-মণিকে আজ আর কী কথা বলতে হবে, বলুন তো?

যোগমায়া বললে—বলবার মতো নতুন কোনও কথা তো আর আমার মনে পড়ছে না বাবা—কালও তো তুমি আসছো, যদি নতুন কথা কিছু মনে পড়ে তো তখন তোমাকে বলতে বলবোখন—

তারপরই বললে—তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি বাবা, আমার জামাই যে এ-বাড়িতে এসেছিল তা যেন তোমার ঠাকমা-মণি জানতে না পারেন, আর মল্লিককাকাও যেন তাকে না বলেন—

সন্দীপ বললে—আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন মাসিমা? সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখার এ-বিয়ে হবেই—

যোগমায়া বললে—কী জানি বাবা, আমার বড় ভয় করে কেবল। আমার কপাল তো মন্দ। যতক্ষণ না ওদের দুহাত এক হচ্ছে ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই কিছুতে—

কথার মধ্যিখানেই হঠাৎ বিশাখা ঘরে ঢুকলো।

সন্দীপ আর যোগমায়া দুজনেই অবাক হয়ে গেছে বিশাখাকে দেখে। যোগমায়া বললে—কীরে, এত সকাল সকাল তোর ছুটি হয়ে গেল?

সন্দীপও জিজ্ঞেস করলে—এত আগেই যে চলে এলে?

বিশাখা বললে—তোমাদের সৌম্যবাবুকে আজ দেখলুম—

—সৌম্যবাবু? আমাদের বিড্‌ন স্ট্রীটের সৌম্যবাবু? তাকে কোথায় দেখলে?

—স্কুল থেকে বেরোচ্ছি, তখন

তারপর যোগমায়াকে বললে—আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে মা, খেতে দাও—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে আমার—

যোগমায়া উঠে দাঁড়ালো। বললে—দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি, একটু পাখার তলায় বসে জিরো, জামা-কাপড় বদলে নে, তবে তো?

বিশাখা বললে—কী শাড়ি পরবো তা বলবে তো?

যোগমায়া বললে—এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে হয়েছে, কোন শাড়িটা পরবি, তা আমাকে এখনও বলে দিতে হবে? এ মেয়েকে নিয়ে আমি কী করি?

বলে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিশাখা তার ঘরে ঢুকে শাড়ি বদলাবার জন্যে দরজার খিল বন্ধ করে দিলে।

সন্দীপ বললে—শুনলেন মাসিমা, বিশাখা কী বললে?

—কী বললে?

—আপনি শুনলেন না বিশাখার কথা? ও-বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে নাকি বিশাখার দেখা হয়ে গিয়েছিল আজকে—

যোগমায়া যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সে কী? আমার জামাই-এর সঙ্গে? বিশাখার দেখা হয়ে গিয়েছিল? কোথায়? কখন?

সন্দীপ বললে—আপনি শুনতে পেলেন না। বিশাখা তো ঘরে ঢুকেই তাই বললে—

যোগমায়া বললে—দেখছি সাত ঝামেলায় পড়ে আমার কানটাও কালা হয়ে গেছে কিন্তু কোথায় দেখা হলো?

ততক্ষণে শৈল বিশাখার খাবার নিয়ে এসেছে। এটা জলখাবার। ভাত খাওয়ার পাট পরে একটু বেলায় হবে। খাবারটা রেখে শৈল তার নিজের কাজে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বিশাখাও শাড়ি বদলে এসে পড়েছে। এসেই খেতে বসলো।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—কীরে? কী শুনলাম সন্দীপের কাছে? বিড্‌ন স্ট্রীটের ছোটবাবুর সঙ্গে নাকি আজ তোর দেখা হয়েছে?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ—

—কোথায়? কখন? রাস্তায় আসতে আসতে? তুই যখন বাড়ি আসছিলি তখন? কিছু কথা হলো?

বিশাখা বললে—রাস্তায় নয়, আমার স্কুলের সামনে—

—তোর ইস্কুলের সামনে ছোটবাবু কেন গিয়েছিল?

বিশাখা বললে—কী কাণ্ড দেখ তো সন্দীপদা, ছোটবাবু আমাদের স্কুলের সামনে কেন গিয়েছিল তা আমি কী করে জানবো? পরের মনের কথা আমি বলবো কেমন করে? আমি কি ম্যাজিক জানি?

যোগমায়া সন্দীপকে লক্ষ্য করে বললে—দেখেছ তো বাবা, আমি কী জিজ্ঞেস করছি আর ও কী-কথার কী জবাব দিচ্ছে—

তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—বল্ না মুখপুড়ী, ও-বাড়ির ছোটবাবু তোদের ইস্কুলে এসেছিল কেন? তোকে দেখতে?

বিশাখা বললে—আমাকে দেখতে আসবে কেন? আমাকে তো আগেই দেখেছে আমাদের বাড়িতে। স্কুলে এসেছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে—

—ও মা, কী কাণ্ড! তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল?

বিশাখা বললে—বলছি তো তোমার জামাই আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। নইলে আবাব কী করতে আসবে?

—তা তোর সঙ্গে কী কথা হলো?

—আমাকে তোমাব জামাই জিজ্ঞেস করলে আমাব কী রকম লেখাপড়া হচ্ছে?

আমি বললাম—ভালো।

—তারপর?

বিশাখা বললে—তারপর আমাকে তার গাড়িতে উঠে বেড়াতে যেতে বললে।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তা তুই কি বললি?

—আমি বললুম আমার মা'কে না জিজ্ঞেস করে আমি কোথাও যাবো না।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তুই বললি ওই কথা?

বিশাখা বললে—তা বলবো না? আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি?

—সে কীরে? তুই আমার জামাই-এর মুখের ওপর ওই কথা বললি? তোর মুখে একটু আটকালো না?

বিশাখা বললে—তা তুমিই বলো না, তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কি তোমার জামাই-এর সঙ্গে আমি যেতে—

এবার যোগমায়া কথাটা একটু ভাবলো। তারপর সন্দীপের দিকে চেয়ে বললে—তুমিই বলো না বাবা, যেতে এমন কিছু দোষ আছে?

সন্দীপের কিছু বলবার আগেই যোগমায়া বললে—তা ও-বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে তো হবেই, সে-কথা তো পাকাই হয়ে গেছে। এখন জামাই-এর কথা শুনতে তোর দোষ কী? আর তা হলে সে তো পর নয়। সেদিন এই বাড়িতে তোকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেছে, তার মানেই তাই, না হলে তোদের স্কুলে জামাই যাবেই বা কেন? বলো বাবা, তুমি কী বলো? পছন্দ হয়নি—?

সন্দীপও স্বীকার করলে কথাটা। বিশাখাকে পছন্দ হয়েছে বলেই তো সৌম্যবাবু বিশাখাদের স্কুলে গিয়ে হাজির হয়েছে।

যোগমায়া মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—তা তোর কথা শুনে জামাই কী বললে?

বিশাখা বললে—কী আবার বলবে! আমি অত সস্তা নাকি। তোমার জামাই যা বলবে আমিও তাই শুনবো? এখন কি আমাদের বিয়ে হয়েছে যে তার কথায় আমি উঠবো বসবো?

যোগমায়া বললে—ওরে অত অহঙ্কার ভালো নয় রে, অত অহঙ্কার ভালো নয়। মেয়েমানুষের অত অহঙ্কার ভালো নয়। অত বড় লঙ্কেশ্বর রাবণ, সেই মানুষকেও তার অহঙ্কারের জন্যে শেষকালে কত কষ্টে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। আর এই যে যে-বাড়িতে এখন তুই বসে আছিস এ-বাড়িও তো আমার জামাই-এরই। এই যে তুই যে-গাড়ি চড়ে ইস্কুলে রোজ পড়তে যাস এও তো জামাই-এরই গাড়ি। এই যে তুই দুধ সন্দেশ খাচ্ছিস, এও তো সবই জামাই-এর পয়সাতেই কেনা।

সন্দীপের দিকে চেয়ে যোগমায়া বললে—তুমি কী বলো বাবা? আমি কি কিছু অন্যায্য বলেছি? তুমি কিছু কথা বলছো না কেন?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে! যোগমায়ার এত স্বপ্ন এত আশা এত সাধ, তাতে সে কী করে বাদ সাধবে?

বিশাখার খাওযা তখন হয়ে গিয়েছিল। সে উঠছিল। যোগমায়া বললে—কীরে, কিছু বলছিস নে যে?

বিশাখা বললে—বারে, আমি কি বলবো?

যোগমায়া বললে—একটা 'হ্যাঁ' কি 'না', যা হোক কিছু একটা কথা বলনি তো? কাল যদি জামাই আবার তোদের ইস্কুলে আসে, আবার যদি তোকে বেড়াতে যেতে বলে তো তখন কী বলবি?

বিশাখা বললে—সে কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে, আজ থেকে সেই কথা ভেবে ভেবে মরবো নাকি?

—ওমা, শোনো মেয়ের কথা! শুনলে বাবা শুনলে? আমাব মেয়েব কথা শুনলে?

সন্দীপও কোন কথারই জবাব দিলে না।

যোগমায়া বললে—আমি মেয়ের কথা ভেবে ভেবে মরছি আর মেযে বলে কিনা কাল-ভাববে! শোনো আমার ধিঙ্গী মেয়ের কথা।

সন্দীপের দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

বললে—আমি এখন উঠি মাসিমা—

যোগমায়া বললে—তা তুমি তো আবাব এক্ষুনি বাড়ি গিযে ঠাক্‌মা-মণিব সঙ্গে দেখা করে এখানকার সব কথা বলবে—

সন্দীপ বললে—সে তো আমাকে রোজই বলতে হয়! না বললে ঠাক্‌মা-মণি আবার বিন্দুকে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন—

—এই আজকের এই কথাটাও কি বলবে নাকি? তুমি কী বলো, এই বিশাখাব ইস্কুলে তোমাদের সৌম্যবাবুর বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথাটা বলা কি উচিত হবে? তুমি কী মনে করো?

সন্দীপ খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো। তারপর বললে—আপনি কী বলেন? আপনি যদি বলতে বলেন তো তাঁকে বলবো—আর. .

হঠাৎ জয়ন্তী দিদিমণি ঘরে ঢুকলো। জয়ন্তী এ-বাড়িতে সন্দীপকে অনেকবার দেখেছে। ওই সন্দীপই প্রতি মাসে তার মাইনেটা যথাস্থান থেকে এনে তার কাছে পৌঁছে দেয়।

জয়ন্তীকে দেখেই যোগমায়া মেয়েকে ডাকলে—ওরে বিশাখা, আয়, তোর দিদিমণি এসেছে—

সন্দীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নিচে নেমে এল। প্রতিদিনের মতো তখনও সেখানে দারোয়ানটা ডিউটি দিচ্ছিল। সন্দীপকে দেখে আব একবার সেলাম দিলে। সন্দীপ তাকে নামমাত্র একটা সেলাম করে বাইরের রাস্তায় এসে নামলো। তার কানে তখনও কথাগুলো বাজছিল। সৌম্যবাবু বিশাখার স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে অনুরোধ করেছে।

এটা কী রকম হলো?

রাসেল স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাসিমার কথাগুলো তার মনের তারে বার বার ঝঙ্কার দিতে লাগলো। সৌম্যবাবু কেন বিশাখার স্কুলে যেতে গেল? কীসের আকর্ষণে? তবে কি বিশাখাকে তার ভাল লেগেছে? বিশাখাকে কি তবে সৌম্যবাবুর পছন্দ হয়েছে?

কিন্তু সন্দীপ এ-সব ভাবছে কেন? তার কীসের স্বার্থ? কার সঙ্গে কার বিয়ে হলো, কার বিয়ে হলো না, তা ভেবে তার কী লাভ? তার আপন বলতে তো একজনই আছে, সে তার মা। মায়ের ভালোমন্দ নিয়েই তো তার সমস্তক্ষণ ভাবা উচিত, মা'ই তো তার সব কিছু।

সামনে একটা বাস আসতেই সন্দীপ তাতে উঠে পড়লো।
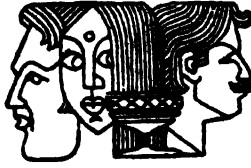
আজ না হয় সন্দীপের বয়েস হয়েছে, কিন্তু তখন তো সন্দীপ ছোট ছিল। জীবন সম্বন্ধে তখন তো সন্দীপের সঠিক কোনও ধারণা ছিল না, তখন সন্দীপ ভাবতো মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা বুঝি ভোগে! সমস্ত রকমের বিলাসিতাব উপকবণ টাকা দিয়ে কেনবার সামর্থ্যেব ওপরই মানুষের জীবনের চবম সার্থকতা। যে মানুষের সে-সামর্থ্য নেই সে-ই অমানুষ।

কিন্তু আজ?

ওই দেবীপদ মুখার্জীর জীবিতকালে বিড়ন স্ট্রীটের এই বাড়িটার নাকি আরো অনেক ঐশ্বর্য ছিল। বেড়াপোতাতে কাশীনাথবাবুদেব পূর্বপুরুষ নাকি আরো বড়লোক ছিল। ওদের বাড়িতে হাতি ছিল, সেই চাটুজ্জেবাবুদের ঐশ্বর্যের ভাগ পেত বেডাপোতা গ্রামের সর্বসাধারণ। পুজোর সময় গরিব-বড়লোক সমস্ত প্রজাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হতো। সে ক'দিন আর কারো বাড়িতে নাকি রান্নাও হতো না।

কিন্তু তারপর?

তারপরের কথা সন্দীপ নিজের চোখে দেখেছিল। আর এখন কলকাতায় এসে এই দেবীপদ মুখার্জীর বাড়ির ওই কঙ্কালটাও দেখেছে।

প্রত্যেক মানুষের ভেতর একটা মন থাকে, সেটা কেউ দেখতে পায় না! তেমনি প্রত্যেক মানুষেব ভেতব আরো একটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে কঙ্কাল। সেটাও কেউ দেখতে পায় না।

কিন্তু কেউ কেউ সেটা দেখতে পায়। যেমন চিন্তামণির কথায় দেখতে পেয়েছিল ঠাকুর বিল্বমঙ্গল। যেদিন প্রথম সেটা দেখতে পেয়েছিল সেইদিনই বলে উঠেছিল—

এই নরদেহ
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম সম পবন উড়ায়
এই নারী, এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে—

মনে আছে—এই ঠাক্‌মা-মণিও সেদিন যখন দেখতে পেলেন যে তাঁর এক সাধের সংসার ভেঙে দুমড়ে তছনছ হয়ে গেল তখনই বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই সংসার মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন তিনিও মনে মনে ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের মতই বলেছিলেন—

এই নরদেহ
ছিঁড়ে খায কুক্কুর শৃগাল
কিংবা চিতা-ভস্ম সম পবন উডায়
এই নারী, এরও এই পরিণাম
নশ্বর সংসারে—

কিন্তু শেষ দেখবার আগে তাঁর এই কথাগুলো মনে আসেনি? এই সামান্য কথাটা মনে আসতে কেন তাঁর এত দেরি হয়েছিল? আগে যখন তিনি রোজ ভোরবেলায় বিন্দুকে নিয়ে বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন তখন কেন মনে আসেনি 'এই নরদেহ'-র কথা।

তার একমাত্র কারণ হয়ত এই যে সংসারে সবাই বর্তমানের মধ্যেই বাস করে। কেবল যাদের দূরদৃষ্টি থাকে তারাই বাস করে ভবিষ্যতের মধ্যে। তাই যখন এই বারোর-এ বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িটা

একটা মরুভূমির মত অসহনীয় হয়ে উঠলো তখন তিনি চিৎকাব কবে গালাগালি দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—বেরো, বেবো সবাই আমাব সামনে থেকে—বেরো, বেরো—

সে কী মর্মভেদী দৃশ্য। ঠাক্‌মা-মণির তখন আরো বযেস হযেছে সমস্ত শবীরে মনে একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন, তখনও তেজ কিন্তু তাঁর কমেনি। চোখের সামনে তিনি তাঁব স্বামীর মৃত্যু দেখেছেন, ছেলে, ছেলেব বউ-এব মৃত্যু দেখেছেন, ছোট ছেলে অনেক আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলেও তখন অথর্ব, কিন্তু তখনও তেজ যাযনি ঠাক্‌মা-মণির।

যে সব ঝি-ঝিউড়ী অতিথি অভ্যাগত একদিন ঠাক্‌মা-মণিকে মিষ্টি কথা না শুনিয়ে জল-গ্রহণ কবতো না, সেই তাবাই আবার তখন অন্য বকম হযে গেল। আড়ালে তারাই তখন বলতে লাগলো— কালে কালে কত দেখবো, পেত্নীব হাতে বাঙা শাঁখা -

কিন্তু কেন এমন হলো?

কেন এমন হলো তা জানতে গেলে আরো অনেকদিন অপেক্ষা কবতে হবে।

কিন্তু শুরুটা কী করে কেমন কবে হলো তা এখানে বলা যেতে পাবে।

এমন যে হবে তা কেউ আগে থেকে কল্পনা করতেও পাবেনি। কালবৈশাখী যখন আসে তা কি আগে থেকে কখনও জানান দিযে আসে?

এও ঠিক তেমনি

টেলিফোনটা যখন এল তখন এ বাড়িব সবাই ঘুমিয়ে অচেতন। মুক্তিপদ একটু দেরী করে এসেছিল সেদিন। সাধাবণত দেরি তাঁর হয় না। ডাক্তাব তাঁকে দেবি করে ঘুমোতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্যাক্টরির কাজ মুক্তিপদ না দেখলে কে দেখবে?

—স্যার, আমি নাগরাজন বলছি।

—কী ব্যাপার? এত রাত্তিরে?

—স্যার, লন্ডন অফিস থেকে টেলেক্স এসেছিল—

—টেলেক্স? কেন?

স্যার মিস্টার মেঠা মারা গেছে। কমললাল মেঠা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কোনও দিক থেকেই কারো মুখে কথা নেই। দুজনের মুখেই তালা-চাবি বন্ধ হয়ে গেল।

মুক্তিপদর মনে হলো তাঁর ডায়াস্টোলিক প্রেসারটা যেন বেড়ে গেল হঠাৎ। সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো যেন দপ্‌-দপ্‌ করে আওয়াজ করতে লাগলো। ওইটেই খারাপ লক্ষণ। এত খাটাখাটির পর হঠাৎ রাতের ঘুমে ব্যাঘাত হলে এই রকমই হয়।

কিন্তু নাগরাজনের দোষ নেই। স্যাক্সবি-মুখার্জী কোম্পানীর ফ্যাক্টরি দিনে রাতে, কখনও বন্ধ করবার নিয়ম নেই। সেখানে তিন শিফ্‌টে কাজ হয়। সেখানে চীফ্‌ ইনজিনিয়ার আছে। তার ডেপুটি আছে। সেখানে রাত-দিন বলে আলাদা কোনও জিনিস নেই। খবরটা সেখানেই প্রথম এসেছিল। সেখান থেকে জানানো হয়েছিল মিস্টাব নাগরাজনকে। মিস্টার নাগরাজনকে বলা ছিল তেমন কোনও এস-ও, এস-মেসেজ হলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে জানাতে যেন দ্বিধা না করে, তা সে দিনই হোক আর রাত দুপুরই হোক।

ওই কমললাল। বড় শার্প ছেলে। অথচ মাথা ঠাণ্ডা। সবে পাঁচ বছর হলো বিয়ে করেছিল সে। আগে লন্ডন অফিসটার বদনাম ছিল। বরাবরের লায়াবেলিটি। প্রফিট্‌ দূরে থাক ডিফিসিট্‌ চলছিল বরাবর। তারপর মেঠা যেদিন থেকে অফিসের চার্জ নিযেছিল সেইদিন থেকেই প্রফিট রান কবছিল। মুক্তিপদ যখনই লন্ডনে যেতেন তখনই দেখতেন কমললাল খুব খাটছেন।

মুক্তিপদ একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—কমল, তুমি তো কখনও ছুটি নাও না।

কমললাল বলেছিল—রেস্ট্‌?

—হ্যাঁ।

কমললাল বলেছিল—রেস্ট কেন নেব স্যার? কাজই তো আমার রেস্ট্—চুপ করে বসে থাকলেই আমার হেলথ্ উইক হয়ে যায়। কাজ করলেই আমি ফিট্ থাকি।

অদ্ভুত! সবাই যদি কমললাল হতো তাহলে ইন্ডিয়ার আর ভাবনা ছিল না। মুক্তিপদ দেখেছেন তাদের অফিসে সবাই দেরি করে আসতো। যত কম কাজ করে যত বেশি টাকা কামানো যায়, সেইদিকেই সকলের লক্ষ্য—। এক এক সময়ে মনে হতো ওই কমললালকে যদি কলকাতার অফিসে এনে বসানো যেত তাহলে বোধহয় কিছু কাজ হতো। কিন্তু না, তাহলে লন্ডনের অফিস কে চালাবে?

এক এক সময়ে মুক্তিপদর মনে হতো সে যদি কমললালের মত স্বাস্থ্য পেত তাহলে বেশ হতো। এমন স্বাস্থ্য যা হাজার পরিশ্রমেও ভেঙ্গে পড়বে না। ব্লাড প্রেশার হবে না, কলেস্টোরল হবে না, সুগার হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেও ঘুম পাবে না। তাহলে মুক্তিপদ কোম্পানিটাকে আবার আগেকার মত দাঁড় করিয়ে দিতেন।

—স্যার, আমার কথা আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

—মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ ভাবছি।

—কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে খবরটা দিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—না না, এখন আমাব তবফ থেকে কী করতে হবে বলো তো? মিসেস মেঠাকে একবার রিং কববো?

—আমার মনে হয় রিং না করাই ভালো।

—কেন?

—যা কববার তা কাল পবামর্শ কবেই কবা ভালো। আপনি এখন ঘুমোতে যান স্যার, আমি ছাড়ি।

--না নাগরাজন, আব আমার ঘুম আসবে না। আমি শুধু একটা কথা ভাবছি, যার হেলথ্ অত ভালো ছিল, যে মানুষ অত পবিশ্রম করতে পাবতো, ও-বকম হঠাৎ স্ট্রোক হলো কেন? কী হয়েছিল?

--তা তো খবর পাইনি। আমি এমন একটা কেস দেখেছি, চোদ্দ বছর বয়েসের একটা ছেলের স্ট্রোক হয়ে মাবা গিয়েছিল।

— সে কী?

নাগরাজন বললে—আপনিই তো স্যাব একদিন বলে ছিলেন—Life is but an empty dream. .যাক গে, আমি লাইন ছাড়ছি। আপনি ঘুমোন—

নন্দিতারও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ততক্ষণে। বললে—কে মারা গেছে?

মুক্তিপদ বললেন—আমাদেব লন্ডন অফিসের চীফ কমললাল মেঠা। বেচারীর মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস। বউ রয়েছে, একটা বাচ্চা।

তারপর একটু ভেবে মুক্তিপদ বললেন—আমার এখন ঘুম পেয়ে গেছে, আর বকবক করো না, তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো--

নন্দিতা পাশ ফিরে শুলো।

মুক্তিপদ আর কথা বললেন না। নন্দিতা ও-সব কথা বুঝবে না। ও আবার আগের মত ঘুমিয়ে পড়বে। সত্যি, ওরা বেশ আছে। সবাই বেশ আছে। কাবো কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সবাই আবামে ঘুমোচ্ছে। শুধু এক একজন মানুষ ঘুমোতে পারে না। এক একজন মানুষ গাছের ডালে ফুল ফোটবার শব্দ শুনবে বলে জেগে বসে থাকে, আকাশের বুক থেকে একটা তারা খসতে দেখবার আশায় সারারাত চোখ মেলে থাকে। আবার এমন পাগলও আছে যে ঢেউ কখন থামবে তাই দেখবার আশায় সমুদ্রের ধাবে বসে জীবন কাটিয়ে দেয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে, না সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, তা দেখবাব জন্যে তারা জীবনপাত করে দেয। সবাই তাদের পাগলই বলে।

এই পৃথিবীতে তারাও যেমন আছে আবার তেমনি নন্দিতারাও আছে। কাদের জন্যে তাহলে পৃথিবীটা চলে? সেই পাগলদের জন্যে, না এই নন্দিতাদেব জন্যে? চলে ওই সব পাগলদেরই জন্যে। ওই সব পাগলরাই বরাবর এই পৃথিবীটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই নন্দিতা বললে—তোমাব চেহাবাটা এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কী হলো?

মুক্তিপদ বললেন—কাল সাবাবাত ঘুমোতে পাবিনি—

—ঘুমোতে পাববে কী কবে? বাত দুপুব পর্যন্ত জেগে জেগে অফিসেব কাজ কবলে শবীব তো খাবাপ হবেই। তোমাব অফিসাবগুলোই যত পাজী, তাদেব স্যাক কবে দিতে পাবো না? যখন-তখন টেলিফোন কবে কেন? যদি কেউ মাবাই যায তাহলে তাব জন্যে কি আমাদেব ভুগতে হবে? কেউ কোথাও মবলে কি আমাদেব পৃথিবী থেমে যাবে?

এ-সব কথাব কী জবাব দেবেন মুক্তিপদ। ও তো জানে না যে সকলে ভালো থাকলেই তবে আমবা ভালো থাকবো? আমাদেব স্বার্থেই কমললালদেব বাঁচিযে বাখা দবকাব।

তাবপব ভোববেলা থেকে অনেক টেলিফোন আসা শুরু হলো। একটাব পব একটা। সকলেব মুখেই সহানুভূতিব সুব। যেন কমললালেব মৃত্যুতে সবাই শোকে কাতব। হঠাৎ যেন সবাই খুব উদাব খুব দযালু, খুব পবোপকাবী হযে উঠলো। বাতাবাতি সবাই সচ্চবিত্র সাধু নিঃস্বার্থপব মানুষ হযে পডলো।

অন্যদিনেব চেযে সেদিন আবো সকাল সকাল অফিসে গিযে পৌঁছলেন মুক্তিপদ। পৌঁছিযেই নাগবাজনেব সঙ্গে দবজা বন্ধ কবে ঘবেব ভিতব আলোচনায বসলেন। পৃথিবীব যত বড বড গোপন সিদ্ধান্ত সমস্তই এই দবজা বন্ধ ঘবে বসেই নেওয়া হযেছে। যখন জাপানেব ওপব এ্যাটম্ বোমা ফেলাব সিদ্ধান্ত নেওযা হলো তাও একটা দবজা-বন্ধ ঘবে। চার্চিল, ট্রুম্যান আব স্ট্যালিন, এই তিনজনই দবজা-বন্ধ ঘবে বসে সে-সিদ্ধান্ত নিযেছিলেন। সিদ্ধান্ত হলো ১৯৪৫ সালেব ৫ই আগস্ট, ববিবাবেব সকালবেলা হিবোসিমাতে বোমা ফেলা হবে।

খুব সাবধান, বাইবেব কোনও লোক যেন আমাদেব সিদ্ধান্তেব কথা না জানতে পাবে। ট্রুম্যান তখন ডিনাব খাচ্ছেন। ওযাশিংটন টাইম বাত আটটা। হঠাৎ ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্কলিন এইচ গ্রাহাম এসে স্যালিউট কবলেন। বললেন—স্যাব মেসেজ—

—কী মেসেজ?

ক্যাপ্টেন মেসেজটা সামনে বেখে দিল। প্রেসিডেন্ট পডলেন—Big bomb on Hirosima August five at seven fifteen P M , Washington time First reports indicate complete success

কিন্তু কোথায গেল সেই ট্রুম্যান, চার্চিল আব সেই স্ট্যালিন? আজ এত বছব পবে কে তাদেব মনে বেখেছে?

কেউ না।

কিন্তু আডাই হাজাব বছব আগে আব এক বাজাব ছেলে একদিন বাজ্য-ঐশ্বর্য সুখ-আবাম ত্যাগ কবে একটা গাছেব তলায় গিযে বসলো। গিযে বলতে আবম্ভ কবলে—আমি সমস্ত পাওযাকে না-পাওযা মনে কবে সব কিছু ত্যাগ কবে পবিত্রাণ পেতে চাইছি। আমি ভেবে দেখেছি আবামেব মধ্যেই অসম্মান, তাই যাবা কিছু পাযনি, সেই প্রবঞ্চিত পবিত্যক্ত পবাজিতেব মধ্যে আমি আমাব আপন সত্তাকে খুঁজে পেযে তাদেব সুখ, তাদেব দুঃখ-কষ্ট-বেদনাকে ভাগ কবে ভোগ কবতে চাইছি। তাই বলছি—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শবীবং
ত্বকমস্থি মাংসং প্রলযঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎপ্র কাযমতঃ চলিষ্যে।।

অর্থাৎ যতক্ষণ না আমাব বোধিলাভ হয ততক্ষণ আমাব কোনও শান্তি নেই, ততক্ষণ আমাব অন্য কোনও কামনা নেই। ততক্ষণ আমাব সাধনাব শেষও নেই—

সেই আড়াই হাজার বছর আগেকা[illegible]ম বু[illegible]কে আজকের লোক মনে রেখেছে, না ওই ট্রুম্যান, চার্চিল আর স্ট্যালিনকে মনে [illegible] এর সাক্ষী আছে ইতিহাস। ইতিহাস আজকের মানুষকে জানিয়ে দেবে কে মানুষের কাছে বেশি স্মরণীয়! কারা বেশি স্মরণযোগ্য।

তখন সন্দীপ কলকাতায় নতুন। কিন্তু মল্লিককাকা এ-বাড়ির পুরনো মানুষ। সেদিন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার কি শরীর খারাপ মল্লিক-কাকা?

—কই, না তো।

—তাহলে আপনাকে একটু গম্ভীর গম্ভীর দেখছি কেন?

মল্লিককাকা বললে—ঠাক্‌মা-মণির লন্ডন অফিসের মেঠা সাহেব হঠাৎ মারা গেছে—

সন্দীপ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। লন্ডন অফিসের মেঠা সাহেব মারা গেছে তো কী হয়েছে? তাতে মল্লিককাকার মুখ গম্ভীর হবে কেন? কারো মৃত্যুতে কি কিছু আটকে থাকে? কারো মৃত্যুতে কি পৃথিবী থেমে যায়?

না, ব্যাপারটা যে সত্যিই গুরুতব তা পবের দিনই সন্দীপ বুঝতে পারলে। সে যথানিয়মে তেতলায় ঠাক্‌মা-মণির ঘরে গিয়ে বিন্দুর মুখে শুনতে পেল—ঠাক্‌মা-মণির আজ সময় নেই, ঠাক্‌মা-মণির শরীর খারাপ। আজ আর ঠাক্‌মা-মণি তার কাছ থেকে রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির খবরাখবর শুনবেন না—

—আমি তাহলে কালকে আসবো?

বিন্দু বললে—হ্যাঁ—

বলে সে তার নিজের কাজে চলে গেল।

এ-রকম ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি। সেই-ই প্রথম!

সন্দীপ ভেবে পেল না লন্ডন অফিসেব মিস্টাব মেঠার মারা যাওয়ার সঙ্গে এ-বাড়ির ঠাক্‌মা-মণি বা মল্লিককাকার মন বা শরীর খারাপ হওয়ার কী যোগসূত্র! আর শুধু ঠাক্‌মা-মণি বা মল্লিককাকাই নয়, সমস্ত বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন বদলে গিয়েছিল। সেদিন ঠাক্‌মা-মণি আর সন্ধ্যারতির সময়ে নিচেয় নামলেনই না। দুপুরবেলা মেজবাবু একবার শুধু এ-বাড়িতে এসেছিলেন। এসে সোজা ঠাক্‌মা-মণির কাছে তেতলায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর দু'জনে দরজাবন্ধ ঘরে বসে নাকি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিলেন। এত কী কথা? আগে তো মা'র সঙ্গে মেজবাবু কথা বলবার সময় কখনও এমন দরজা বন্ধ করেননি।

গিরিধারী যে গিরিধারী, অতি সামান্য লোক, সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল! সন্দীপকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল—কী হলো বাবুজী? ক্যায়া হুয়া?

সন্দীপ বলেছিল—আমি কী করে জানবো, গিরিধারী কী হয়েছে। তুমি পুরনো লোক, তুমি তো আমার চেয়ে বেশি জানবে—

—নেহি বাবুজী। আমরা তো ছোট লোগ আছি। বড়ি বডি বাতসে হামে ক্যায়া পাতা—

তা বটে। বড়লোকদের বাড়ির ভেতবের কথা তাদের বাড়ির চাকর-বাকর-ঝি-দরোয়ানরা কেমন করে জানবে।

সন্দীপ বললে—শুনলাম বাবুদের বিলেতের অফিসের বড়সাহেব মারা গেছেন—

তাতেও কথাটা কিন্তু স্পষ্ট হলো না গিবিধারীর কাছে। কোনও বাবু মারাই যাক আর বেঁচেই থাকুক, তাতে তাদের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তাদের চাকরি থাকতেও পারে, আবার না থাকতেও পারে। এক জায়গায় চাকরি গেলে তারা অন্য জায়গায় চাকরি পাবে। তারা তো বিয়ে বাড়ির আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকা এঁটো কলা পাতার মতন। হয় ঝড়ে উড়ে যাবে, নয় তো গরুতে চিবিয়ে খাবে।

আর সত্যি কথা বলতে গেলে, সন্দীপ নিজেও তো একজন তাই। সেও তো এ-বাড়ির একজন নগণ্য উচ্ছিষ্ট ভোজী জীব! এখানে যতদিন আশ্রয় পেয়েছে, ততদিনই তার মেয়াদ। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই তাকেও একদিন এ-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে—

ল-কলেজে পড়তে পড়তে একদিন একজন নতুন ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো। মধ্যবিত্ত ঘরের অভাবী মানুষ। দুঃখেব সংসারের খবর-টবর রাখে। সে নিজেই তার নামটা বললে—সুশীল। খুব গেরস্ত-পোষা নাম। সুশীল সরকার।

হঠাৎ একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোন্ পার্টির মেম্বার? কংগ্রেস?

সন্দীপ প্রশ্নটা শুনে অবাক। এ প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে তা সন্দীপ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বললে—আমি তো কোনও পার্টির মেম্বার নই—

—সে কী? কোনও পার্টির মেম্বার নন আপনি?

সন্দীপ বললে—না—

সুশীল বললে—তা হলে চাকরি পাবেন কী করে? কেউ তো আপনাকে চাকরি দেবে না—

সন্দীপ বললে—কেন? পার্টির মেম্বার না হলে চাকরি পাওয়া যাবে না?

সুশীল বললে—না, আপনি বোধহয় গ্রামের মানুষ, তাই জানেন না। আপনার বাড়ি কোথায়?

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতায়। এখান থেকে ট্রেনে তিন ঘণ্টার রাস্তা—

সুশীল বললে—আপনি কি বিয়ে করেছেন?

সন্দীপ বললে—কী যে বলেন! আমার নিজের কোনও ইনকাম নেই, তার বিয়ে। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবো কী—

সুশীল বললে—আপনি এম-এ পড়লেন না কেন? প্রাইভেটেও তো এম-এ দেওয়া যায়। আজকাল করেসপনডেন্স কলেজ হয়েছে। মাত্র সাত-আটশো টাকা খরচ করলেই এম-এ ডিগ্রী পাওয়া যায়—

সন্দীপ হাসলো। বললে—আমার অত টাকা নেই, আমি গরিব লোক—টাকা কোথায় পাবো?

সুশীল বললে—এম-এ পাস করে স্কুল-মাস্টারি করতে গেলেও তো পার্টির মেম্বার হতে হবে আপনাকে—

—কেন?

সুশীল বললে—তা জানেন না আপনি? আজকাল স্কুলের চাকরিতেই তো বেশ লাভ—

সন্দীপ জানতো না। বললে—কী লাভ?

—তা জানেন না বুঝি? বছরে ছ'মাস ছুটি আর চাকরিতে ঢুকলেই সব মিলিয়ে এক হাজার টাকার মত মাইনে। কিন্তু পার্টি ব্যাকিং চাই—

সন্দীপ বললে—আমি ঠিক করেছি কোর্টে প্র্যাকটিশ করবো, এ্যাড্‌ভোকেট হবো—

—উকিল? ওকালতিতে তো পয়সা নেই। কে আপনাকে ও পরামর্শ দিয়েছে।

সন্দীপ বললে—বেড়াপোতায় আমার মা যাদের বাড়িতে কাজ করে, তাঁর নাম কাশীনাথ চাটুজ্জে, তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। প্রথম প্রথম আমি তাঁর জুনিয়ার হয়ে কাজ শিখবো—

ছুটির পর দু'জনেই একসঙ্গে রাস্তায় বেরোল। সুশীল জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোন্‌দিকে যাবেন?

—নর্থের দিকে—

সুশীল বললে—আমি যাবো সাউথের দিকে। চলুন না একটা সিগারেট খাই—

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি সিগারেট খান? সিগারেট খাওয়া তো শুনেছি নাকি শরীরের পক্ষে খুব খারাপ, প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে—

সুশীল বললে—ও রকম কত কী তো চারদিকে লেখা থাকে, ও-সব মেনে চললেই হয়েছে—

সন্দীপ বললে—না-ই বা খেলেন। ও তো ভাত নয় যে না খেলে চলবে না।

সুশীল বললে—তা যদি বলেন তো এই যে এত বড় বড় সিগারেট কোম্পনি, সব কি ফেল মেরেছে? দিব্যি তো রমরমা করে সব চলছে, কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক সে-সব কোম্পানিতে চাকরি করছে। তাদের কারো চাকরিও তো যাচ্ছে না—

বলে একটা সিগারেট সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—খান্ খান্ একটা সিগারেট খান, একটা খেলে জাত যাবে না। পার্টি মেম্বারও হবেন না, আবার সিগারেটও খাবেন না, তাহলে বেঁচে থেকে কী লাভ?

সন্দীপ বললে—না, সে জন্যে নয়, মা জানতে পারলে রাগ করবে কিনা, তাই। আমার বাবা নেই তো, আমার এক মা ছাড়া নিজের বলতে পৃথিবীতে আর কেউ নেই! মা'র কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি কলকাতায় এসে বিড়ি খাবো না, সিগারেট খাবো না, মদ খাবো না—

—তাই নাকি? তা এত নিয়ম মেনে আপনি কি ওকালতী করতে পারবেন?

সন্দীপ বললে—সে পরের কথা। আগে উকিল হই—

একটা রাস্তার মোড়ের মাথায় এসে সেই সুশীল বাসে উঠে পড়লো। আর সন্দীপ একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা বিড্‌ন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়ালো।
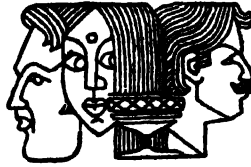
সেই অনেকদিন আগে ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাই জার্মানীব পট্‌সড্যাম শহরে একটা দরজা বন্ধ ঘরে তিন ইতিহাস পুরুষ ট্রুম্যান, চার্চিল আর স্ট্যালিন মিলে যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন তার ফলেই হিরোসিমা শহরের মাথার ওপর পৃথিবীর প্রথম এ্যাটম বোমটা ফাটলো।

আর তা নিয়ে সারা পৃথিবীময় সে কী হৈচৈ!

আর স্যাক্সবি মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মুক্তিপদ মুখার্জী আর ডাইরেক্টর শ্রীমতী কনকলতা মুখার্জী ওরফে ঠাক্‌মা-মণি দরজা বন্ধ ঘরে যে সিদ্ধান্তটা নিলেন তা নিয়েও কি কম হৈচৈ হয়েছে?

আর এই সিদ্ধান্তটা হলো বলেই তো সন্দীপের জীবনে সে এক চরম বিপর্যয় নেমে এল অপ্রত্যাশিতভাবে—

তা সে সব কথা এখন থাক, এখন সেই দরজা বন্ধ ঘরের ভেতরে দু'জনে যে-সব কথা হয়েছিল তাই এখানে বলি! এ-বাড়ির ঠাকুরের বোন বিন্দু সেদিন সবই শুনতে পেয়েছিল—

কথা বলতে বলতে মুক্তিপদর নাকি তখন গলা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ঠাক্‌মা-মণির কথা শুনে।

বলেছিলেন—তোমার জন্যেই তো আজ সৌম্য এই রকম হয়েছে। তুমি অত আব্দার দিয়েই তো ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়েছ—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তুই তো কেবল আমারই দোষ দেখিস, আর তোর নিজের কথাটা একবার ভাব দিকিনি! তুইও কি মানুষ হয়েছিস? তোর বউ...

মুক্তিপদ বাধা দিয়ে বললেন—দেখ, এখন ওসব কথা শোনবার সময় নেই আমার। আমি তোমাকে যা বলতে এসেছি তাই বলি—আমি চাই সৌম্য ক'দিনের জন্যে লন্ডনে যাক্—

ঠাকমা-মণি বললেন—ও কেন যাবে? তুই নিজে যা না—

মুক্তিপদ বললেন—তুমি আমাকে যেতে বলছো? আমি কি করে যাই বলো তো। এদিকে আমার এখন ইয়ার্লি বাজেট তৈরি হচ্ছে, আমি ইণ্ডিয়ায় না থাকলে যে সব পণ্ড হয়ে যাবে। কখন আমার দরকার পড়বে, তার কিছু ঠিক আছে? কেন, সৌম্য গেলে দোষটা কী?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ও তো ছেলেমানুষ, ও বিদেশ-বিভুঁইতে একলা যাবে কী করে?

মুক্তিপদ বললেন—সৌম্য কোম্পানির ডাইরেক্টার হয়েছে, ওদিকে কমললাল মারা গেছে, এই জন্যে অন্ততঃ একজন ডাইবেক্টারের তো যাওয়া উচিত। তা ছাড়া এখানে থেকে তো ওর কোন লাভ নেই, ও তো অর্ধেক দিন অফিসেই আসে না—

—সে কী ও অফিসে যায় না?

—না। এই দেখ না, আমি আজ ওকে অফিসে খুঁজলুম, নাগরাজন বললে ও আজকে অফিসেই যায় নি। ফ্যাক্টবিতেও যায়নি—

—অফিসে যায় নি তো কোথায় গেল?

মুক্তিপদ বললে—সে ও-ই জানে। এত বয়েস হলো অথচ এখনও ওর কোনও দায়িত্ব জ্ঞানই হলো না। সেই জন্যেই তো আমি এখন থেকে ওকে অফিসের সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজকর্ম দেখাচ্ছি। আমার তো মনে হয় লন্ডন অফিসে গেলে ও অনেক কাজ শিখতে পারবে।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ঠিক আছে যাক তাহলে। কিন্তু তার আগে আমি ওব বিয়ে দিয়ে দেব—

—বিয়ে?

মুক্তিপদ চমকে উঠলেন, কি?

—হ্যাঁ, বিয়ে। কনে তো ঠিক করেই বেখেছি। ওর বিয়ে না দিয়ে আমি ওকে লন্ডন অফিসে পাঠাতে দেব না—

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু সে তো অনেক সময় লাগবে। বিয়ে তো আব একদিনে হয় না। ততদিনে আমার লন্ডন অফিস চলবে কী করে? আমি তো বেশিদিন ওর বিয়ের জন্যে অপেক্ষা কবতে পারবো না।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আমিও বলে দিচ্ছি ওর বিয়ে না দিয়ে আমি ওকে কিছুতেই বাইরে পাঠাতে পারব না—ওর বিয়ে দিয়ে একেবাবে বউ নিয়ে ও যাবে—

—কিন্তু ততদিন আমার কাজ চলবে কী করে? বিয়ে তো বললেই হবে না। আর এ মাসে তো আবার বিয়ের তারিখও নেই—। মেঠা মারা গেছে, সেখানে কি হচ্ছে তা-ও তো বুঝতে পারছি না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—রাজা মরে গেলে কি রাজ্য চলে যায়। তোর বাবা মরে যাওযাতে কি কোম্পানি উঠে গেছে?

মুক্তিপদ বললেন—দেখ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আমি যা ভালো বুঝেছি তোমাকে তাই-ই বললুম—এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—আমার শেষ কথা সৌম্যর বিয়ে দিয়ে তবে বউকে সঙ্গে নিয়ে ওকে আমি লন্ডনে যেতে দোব। তার আগে নয়—

ঠাক্‌মা-মণি আবার বললেন—হ্যাঁ, বউমাকে আমি মেমসাহেব রেখে ইংরেজি শেখাচ্ছি, গান শেখাচ্ছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি। এ-সব করছি কেন? করছি এই জন্যে যে যাতে দরকার হলে বউমা সৌম্যর সঙ্গে বিলেতে গিয়ে মুশকিলে না পড়ে—

মুক্তিপদ বললেন—তাহলে তাই-ই করো, মোটমাট যা করবে একটু তাড়াতাড়ি করবে। যেন বেশি দেরি না হয়—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ঠিক আছে, আমি কাশীতে গুরুদেবের কাছে খবর পাঠাই, তিনি যা বলবেন তাই-ই হবে—

...। এর পর থেকেই শুরু হলো যত গণ্ডগোল।
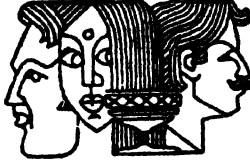
... ...িসাবেব আকস্মিক মৃত্যুতে যে একটা প্রতিষ্ঠানেব ভিত নডবডে হয়ে যায় ... ...ব মুখার্জী ...কোম্পানীই প্রথম নয়। এর আগেও অনেকবাব এ-বকম ঘটেছে। ১৯১৯ সালেব প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব কাবণটাও তো ছিল এমনি সামান্য একটা ঘটনা। তাবপব ১৯৩৯ সালে?

১৯৩৯ সালেব যুদ্ধ আবম্ভ হওযাব পবেব বছরে এমনি একটা সামান্য ঘটনা ঘটলো ১৯৪০ সালে হল্যাণ্ডে।

তখন জার্মানী আক্রমণ কবেছে হল্যান্ড। হল্যান্ড গবিব দেশ। সে দেশ কখনও কল্পনাও কবেনি যে পাশেব প্রতিবেশী দেশ জার্মানী তাকে আক্রমণ কববে।

মানুষেব সবচেযে বড শত্রু কে? শত্রু তাব লোভ নয, তাব বিলাসিতা নয, তাব পাপ নয, তাব বেহিসেবীপনা নয। এ-সব কিছুই মানুষেব শত্রু নয। মানুষেব সবচেয়ে বড শত্রু হলো মানুষই। জার্মানী নিজে নিজেব যত শত্রুতা কবেছে, অত শত্রুতা বাশিযা, আমেবিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্সও তা কবেনি।

সেই হল্যান্ড-এব সেনাপতি তাডাতাডি এক মিটিং ডাকলেন। সব মিলিটাবি অফিসাববা হাজিব হলেন সেই মিটিং-এ।

একজন জেনাবেল—জার্মানীব মত অত বড শত্রুব সঙ্গে লডাই কববো এত ক্ষমতা আমবা কোথায পাবো? আব একজন জেনাবেল বললেন—আমাব তো মনে হয যত তাডাতাডি সম্ভব জার্মানীব সঙ্গে আমাদেব সন্ধি কবে ফেলা উচিত—

তখন আলোচনা কবতে কবতেই অনেক সময নষ্ট হযে যাচ্ছে। তত ভাববাব বড সময়ও নেই তখন হাতে। যে-কোনও মুহূর্তেই জার্মানী ঝাঁপিযে পডতে পাবে তাদেব বাজধানীতে।

হল্যান্ডেব প্রধান সেনাপতি তখন চিৎকাব কবে উঠলেন। বললেন থামুন, থামুন সবাই থামুন—

সবাই চুপ। প্রধান সেনাপতি তখন সকলকে উদ্দেশ্য কবে বললেন—প্রাণ দিতে পাববেন কেউ আপনাবা? প্রাণ? জীবন?

প্রধান সেনাপতিব কথাব উত্তবে সবাই চুপ। কাবো মুখে আব কোনও কথা নেই। প্রধান সেনাপতি আবাব জিজ্ঞেস কবলেন—কই? কেউ প্রাণ দিতে বাজি নয? কেউ বাজি নয প্রাণ দিতে?

তাবপব অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতাব পবে একজন জেনাবেল বললেন—আমি প্রাণ দিতে বাজি—

—কিন্তু আপনাবা কেউ প্রাণ দিতে বাজি নন?

তখন অন্যান্যবা, অন্য জেনাবেলবাও বলে উঠলেন—আমবাও প্রাণ দিতে বাজি—দেশেব জন্যে আমরাও প্রাণ দেব—

কিন্তু তখন হল্যান্ডেব সমস্ত অধিবাসীবা যে যেদিকে পাবছে ঘব বাডি ছেডে পালাতে আবম্ভ কবেছে। চাবিদিকে নৈবাজ্য, চাবিদিকে অচলাবস্থা। বাস্তায বাস নেই, কোনও যানবাহন নেই। সে এক চবম বিহ্বল অবস্থা চাবদিকে।

সেই দুর্যোগেব ওপব আব এক চবম দুর্যোগ নেমে এল দেশেব মাথায। হঠাৎ দেশেব সমস্ত আলো নিভে গেল মুহূর্তেব মধ্যে। বিদ্যুৎ বন্ধ হযে গেল সাবা দেশে। বিদ্যুৎ বন্ধ হওযা মানেই সব

কিছু বন্ধ হওয়া। অর্থাৎ আলো তো নেই-ই, তার সঙ্গে পাখাও নেই, জলও নেই। হাসপাতাল, অফিস, কারখানা, মিলিটারি ছাউনি—সব অচল, সব অলস।

এমন অবস্থা কেন হলো? কে করলে? এও কি জার্মানিব এক অন্তর্ঘাতমূলক শত্রুতা? তবে কি দেশের মধ্যে কোনও কুইসলিং আছে। কোনও বিভীষণ আছে?

যদি তেমন কেউ থাকে তো তাদেব খুঁজে বাব করো, তাদের ধরে শাস্তি দাও। তাদের ফাঁসি দাও।

কিন্তু তবু তাদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তবু তাদের কোনও হদিস পাওয়া গেল না। তবু তাবা দেশের কোণে কোণে তল্লাসী চালাতে লাগলো। মহাবানীব দেশেব এই অন্তর্ঘাত কেউ সহ্য করবে না। যদি অপবাধীকে ধবা না যায় তো পাওয়াব হাউস মেরামত কববাব ব্যবস্থা করা হোক। কারণ আমাদের আলো চাই, হাওয়া চাই, জল চাই। আমরা বাঁচতে চাই। আমরা জার্মানীব সঙ্গে লড়াই করতে চাই—

—তারপর? তারপর কী হলো?

মনে আছে বহুদিন আগে বেড়াপোতাব কাশীনাথবাবুর কাছ থেকে সন্দীপ একদিন এই গল্প শুনেছিল? কাশীনাথবাবু থামতেই সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—তারপর? তারপর কী হলো?

কাশীনাথবাবু বলেছিলেন—এইসব ঘটনাই হচ্ছে ইতিহাসেব শিক্ষা। এই ইতিহাস থেকে যে-মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না তাকেই মানুষ বলে অশিক্ষিত। সে বি-এ. ডি-লিট্ পদবীধারী হলেও অশিক্ষিত। এই জন্যেই জার্মানীর এক কবি বলে গেছেন—It is from history we learn that we do not learn from history.

সন্দীপ তখন হল্যান্ডের ঘটনা শোনবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

—তারপর কী হলো? আলো এল?

কাশীনাথবাবু বললেন—সেও এক বিচিত্র কাহিনী। যখন কোথাও কোনও অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তখন হঠাৎ টের পাওয়া গেল গলদটা কোথায়?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—গলদটা কোথায়, বলুন তো?

—গলদটা খুব সামান্য। দেখা গেল পাওয়ার হাউসের একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গিয়েছে—

—একটা স্ক্রু?

কাশীনাথবাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ, খুব সামান্য একটা জিনিস ওটা। কিন্তু ওই সামান্য জিনিসটাই সেদিন সেই দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এই যে আমাদের ইন্ডিয়া, আজকে যে আমাদের ইন্ডিয়াব এই দুর্দশা, এর পেছনেও একটা ওই রকম সামান্য কারণ আছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কী সে কারণটা?

কাশীবাবু বলেছিলেন—চরিত্র।

—চরিত্র?

—হ্যাঁ, আমাদের ইন্ডিয়ার মানুষের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—চরিত্র মানে কী?

কাশীবাবু সেদিন বলেছিলেন—দেখ, ডিক্সনারিতে 'চরিত্রে'র অনেক রকমের মানে লেখা আছে—'স্বভাব', 'রীতি-নীতি', 'আচার-আচরণ' এই সব মানে। কিন্তু তা নয়। চরিত্রের আসল মানে সমস্ত জীবন ধরে খুঁজলে তবে জানতে পারবে—তার আগে নয়—

এসব কথা বহুদিন আগেকার। তারপরে অনেক বছর কেটে গেছে। সে সেই ছোটবেলাকার বেড়াপোতা ছেড়ে কতদিন আগে কলকাতায় এসেছে। তখন থেকে ভেবে এসেছে 'চরিত্র' কথাটার মানে কী? যে পরের উপকার করে, যে পরের দুঃখে কাতর হয়, যে সমাজের সেবা করে, তাকেই কি চরিত্রবান মানুষ বলা যায়? কিংবা যে মদ খায়, যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মিথ্যে কথা বলে, যে মানুষকে খুন করে, তাকেই কি চরিত্রহীন বলা যায়?

কিন্তু কাশীনাথবাবু বলে গিয়েছিলেন, সারা জীবন ধরে খুঁজলেই তবেই নাকি 'চরিত্র' কথাটার মানে জানতে পারা যাবে। আজ সন্দীপেরও তো অনেক বয়েস হলো, এখনও কি 'চরিত্র' কথাটার মানে সে বুঝতে পেরেছে? এখনও যদি সে মানে না বুঝতে পেরে থাকে তো কবে মানে বুঝতে পারবে?

মনে আছে, সেই মুখার্জী বাড়ির লন্ডন অফিসের ম্যানেজার কমললাল মেঠার মৃত্যুর পর থেকেই যেন সমস্ত পরিবারের মধ্যে একটা নতুন আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। সৌম্যবাবু কি বিলেতে যাবে? বিলেত যাওয়ার আগে কি তাহলে বিশাখার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যাবে?

কথাটা মল্লিককাকার কানেও এল। ঠাক্‌মা-মণি মল্লিককাকাকে একদিন ডেকে পাঠালেন।

মল্লিককাকা ঠাক্‌মা-মণির কাছে যেতে তিনি বললেন—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সরকার মশাই?

মল্লিককাকা বললেন—বলুন, কী কাজ?

—কাশীতে গুরুদেবকে একটা চিঠি লিখতে হবে। খুব জরুরী চিঠি, লিখতে হবে আমার নাতি সৌম্যর বিয়ে দিতে চাই আমি। পাত্রী তো পছন্দ করাই আছে। আপনি সৌম্য আর বউমা দু'জনের দুটো কোষ্ঠী নকল রেখে পাঠাবেন। জানতে চাইবেন সামনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহের কোনও শুভদিন আছে কিনা? আর তার সঙ্গে প্রণামী বাবদ পাঁচশো টাকাও পাঠিয়ে দেবেন—

মল্লিকমশাই ঠাক্‌মা-মণির সঙ্গে অন্যান্য দৈনিক হিসেব নিকেশের কাজ সেরে এসে কাশীতে যথা-বিহিত চিঠি লিখে দিলেন। আর তার সঙ্গে পাঁচশো টাকাও প্রণামী বাবদ পাঠিয়ে দিলেন।

বললেন—তুমি রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে যেন এ-সব কথা কিছু বোল না—বুঝলে?

এ-কথা বললে বিশাখার কী ক্ষতি আর ঠাক্‌মা-মণিরই বা কী লাভ তা সে বুঝতে পারলে না। বললে—বলবো না?

—না। এত আগে থেকে বলে কী লাভ? দেখাই যাক না কাশী থেকে গুরুদেব কী লিখে পাঠান?

মল্লিককাকা একটু হেসে আবার বললেন—তা ছাড়া এখনও তো পাকা কথা কিছু হয়নি। ধরো যদি বিয়েটা এখন না-ই হয়—

—কেন? বিয়েটা হবে না কেন? সব বন্দোবস্ত তো পাকাই হয়ে গিয়েছে!

মল্লিক-কাকা বললেন—এ-বাড়ির বিয়ে তো তেমন বিয়ে নয় যে কথা দিলুম আর হুট্ করে বিয়ে হয়ে গেল। তোড়জোড় করতে করতে সকলকে খবর দিতেই তিন-চার মাস সময় লেগে যাবে। কত লোককে যে নেমন্তন্ন করতে হবে তার কি ঠিক আছে? সারা কলকাতা ঝেঁটিয়ে লোক আসবে। তাও একদিনে সব শেষ হবে না। অন্ততঃ তিন দিন ধরে সব লোক খাবে। আগে তো দেখেছি কিনা। এ অন্য বাড়ির মত বিয়ে নয়। এখানকার বিয়ের দিনে পরবার জন্যে এ-বাড়ির সবাই একখানা করে নতুন কাপড় পাবে। তুমিও একটা নতুন ধুতি পাবে, কিংবা প্যান্ট, যা তুমি চাও সে যখন হবে, তুমি দেখতেই পাবে—

সন্দীপের অনেক কথা ছিল বলবার। বলবার ছিল সে সৌম্যবাবু বিশাখার স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে। তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু সে-সব না বলাই ভালো। মল্লিককাকা হয়ত কী মনে করবে!

মল্লিককাকা বললেন—তাহলে তুমি যাও এখন, আমি পোস্টাফিসে গিয়ে মানিঅর্ডারটা করে দিয়ে আসি—

সন্দীপ জামা-প্যান্ট পরে বাড়ির বাইরে পা বাড়ালো।
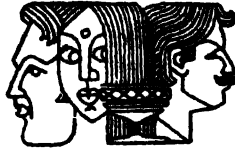
মুক্তিপদ মুখার্জী সেই দিন থেকেই বড ব্যস্ত হযে পডলেন। পৃথিবীতে চিবকাল কেউ বেঁচে থাকতে আসে না। একদিন তাকে যেতেই হয।

কিন্তু কমললালের মৃত্যু সে-রকম মৃত্যু নয। শুধু সে আকস্মিক মৃত্যু বলেই অস্বাভাবিক, তা নয়, কমললাল ছিল এ-কোম্পানির প্রাণ। এক কথায় প্রাণপুরুষ। কোম্পানী নানাভাবেই কমললালের কাছে ঋণী। কমললাল এ-কোম্পানীকে নানাভাবে লাভবান করেছে। সৌম্য লন্ডনে গিয়ে যে বাতাবাতি কোম্পানীব আর্থিক উন্নতি ঘটাতে পারবে সে-আশা নেই। তবু তাকে পাঠানো হচ্ছে এই কারণে যে সে হাতে-কলমে সব ব্যাপাবটা দেখে শুনে বুঝে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। আর তা ছাড়া এখন থেকে তো সব জিনিসটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হওযা ভালো। ব্যবসাদারদের রক্ত আছে গায়ে, সেইটাই সৌম্যর জীবনেব সবচেয়ে বড় মূলধন। যাকে বলে বংশ-পরম্পরা। বাকি যেটা সেটা বদলায়. অনেক সময় বা মুছেও যায়।

মুক্তিপদ সৌম্যব খোঁজ করলেন—ডেপুটি ডাইবেক্টার অফিসে এসেছেন?

—না স্যার!

খবব নিয়ে মুক্তিপদ জানলেন সৌম্য নাকি প্রাযই অফিস কামাই করে। অথচ মা'র কাছে গিয়ে খবব নিয়ে এসেছেন সে নাকি ঠিক সময়েই গাড়ি নিয়ে অফিসে বেরোয়।

নাগরাজনকে বলতেই সে বললে—কিন্তু মিস্টার মুখার্জী তো ঠিক সময়েই অফিসে আসেন স্যাব। আমি নিজেব চোখে দেখেছি। চিঠিপত্র যা আসে আমি তাঁকে সই করবার জন্যে দিই। তিনিও সেগুলো পড়ে সই করে দেন—

—কী রকম দেখছো তাকে?

নাগরাজন বললে—ভেরি ইনটেলিজেন্ট বলে মনে হয় আমার।

—এ কোম্পানী কি সে একলা চালাতে পারবে একদিন?

—নিশ্চয়ই। আমি তো বললাম উনি ভেরি ইনটেলিজেন্ট।

—এই যে তাকে এখন লন্ডনে পাঠাচ্ছি, তাতে সে সেখানকার সব বিজনেস কি একলা ম্যানজে করতে পারবে?

—কী বলছেন স্যার আপনি? আমি বলছি আপনি দেখবেন সমস্ত ঠিক কবে দেবেন উনি—

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু শুনি নাকি সে রোজ নিয়ম করে অফিসে আসে না।

নাগরাজন একটুখানি ভাবলো। কী বলবে তা প্রথমে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—না স্যার, আসেন, তারপর এক একদিন কিছুক্ষণ থেকে আবার বেরিযে যান। আর অফিসে ফেরেন না—

—কোথায় যায়, তা কি তুমি জানো?

নাগরাজন বললে—না স্যার, আমি তা কী করে জানবো? তিনি আমার মাস্টার, আমি তাঁর সারভেন্ট হয়ে সে-কথা কী করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি?

নাগরাজনের সঙ্গে সৌম্য সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে হয় মুক্তিপদর। কিন্তু তাঁর সে-সময় কোথায়? এক গাদা লোক সকাল থেকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা করে থাকে। মুক্তিপদর কাছে নানা লোকের নানা আর্জি। কেউ চায় কনট্র্যাক্ট, কেউ চায় পেমেন্ট, কেউ চায় চাকরি, কেউ চায় প্রমোশন, কেউ চায় তাঁকে কক্‌টেল্ পার্টিতে নেমন্তন্ন করতে। কেউ শুধু তাঁকে খোশামোদ করতেই আসে। সকলেরই সম্পর্ক টাকার সঙ্গে। মুক্তিপদর জীবন টাকার গাঁটছড়ার শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

তার ওপর আছে মানুষের উন্নতি বিধানের প্রয়াস। সেখানে দরকার কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা। তার জন্যে অনেক অফিসার আছে। তারা সবাই-ই মোটা মাইনে পায়। মুক্তিপদর নিজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই ইস্পাত সম্বন্ধে কিন্তু যারা ইস্পাত তৈরির কারিগর, তাদের কেমন করে চালাতে হয়—সেটা জানে মুক্তিপদ। আর সেই জানাটাই আসল জানা। সে-ব্যাপারে মুক্তিপদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সেদিন শ্রীপতি মিশ্র এলেন।

আগে থেকে খবর দিয়েই এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল গোপাল। মুক্তিপদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিনিস্টারকে দেখে।

মিস্টার মিশ্র বললেন— আপনার কাছে এলাম একটা বিশেষ কাজে। জানি না কতটা সাহায্য পাবো—

মুক্তিপদ বললেন—সে কী? আমি কি আগে কখনও আপনাদের সাহায্য করিনি? যখন যা করতে বলেছেন তাই-ই তো আমি করেছি।

তারপর গোপাল হাজরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কে?

মিস্টার মিশ্র বললেন ইনি আমার পি এ, মিস্টার গোপাল হাজরা।

গোপাল হাজরা নমস্কার করলেন মুক্তিপদ হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। গোপাল বললেন—আপনার ভাইপো মিস্টার সৌম্য মুখার্জী আমার বন্ধু—

শ্রীপতিবাবু বললেন—আপনি তো জানেন সামনে আমাদের জেনারেল ইলেকশান আসছে, আর আমাদের ভলান্টিয়াররা সবাই হাঁ করে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। পার্টি ফান্ডের অবস্থাও খুব ভালো নয়। জানেন তো কত বড় একটা ফ্লাড গেল। সেন্টার থেকেও আমরা যতটা হেলপ পাবার আশা করেছিলাম তা পাইনি—

মুক্তিপদ বললেন—কত টাকা আপনার চাই তাই ই বলুন না, আমি তো হেলপ করবার জন্যে তৈরি—

শ্রীপতিবাবু বললেন —না সব ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে না বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। এতদিন যারা আমাদের কাজ করে এসেছে তাদের সবাইকে আমরা এখনও কোনও এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারিনি। তার ওপর হাজার হাজার লোক বাঙলাদেশ থেকে রোজ বর্ডার পেরিয়ে ওয়েস্টবেঙ্গলে আসছে তাদের নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছি—

মুক্তিপদ বললেন—একটু বসুন, আমি আসছি—

বলে যা আগে কখনও করেননি তাই-ই করলেন। পাশের ঘরে অ্যাকাউনটেন্ট নাগরাজনের কাছে গেলেন। নাগরাজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—কী স্যার, আপনি?

মুক্তিপদ বললেন—ওই স্কাউন্ড্রেলটা আবার এসেছে—

—কে? কে স্কাউন্ড্রেল?

—ওই বাস্টার্ড শ্রীপতি মিশ্রটা। ব্যাটা তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করে মিনিস্টার হয়েছে বলে যেন একেবারে আমার মাথা কিনে নিয়েছে।

মুক্তিপদ তখন রাগে একেবারে থর থর করে কাঁপছেন। বললেন— আমাদের রেজিস্টারটা একবার দেখ তো, আগে কত টাকা ওদের পার্টিকে দেওয়া হয়েছে?

নাগরাজন পুরনো খাতাপত্র দেখে বললে—এই তো লেখা রয়েছে স্যার। তিন লাখ সত্তর হাজার টাকার এন্ট্রি রয়েছে—

—কোন্ তারিখে?

—গেল আগস্টের তিরিশ তারিখে।

মুক্তিপদ বললেন —এরই মধ্যে আবার পার্টি-ফান্ডের চাঁদা চাইতে এল। এত বড় হারামজাদা। কেন যে লোকে এদের ভোট দেয় তা বুঝি না—

নাগরাজন বললে—স্যার, আপনি মাথা গরম করবেন না। মাথা গরম করলে ওদের তো কোনও ক্ষতি হবে না। মাঝখান থেকে শুধু আপনারই ব্লাড্-প্রেশার বেড়ে যাবে।

মুক্তিপদ বললেন—তুমি ঠিক বলেছ নাগরাজন। কিন্তু কী করি বলো তো! যাকে ভোট দেব সেই-ই যদি এই রকম স্কাউড্রেল হয় তাহলে আমরা ফ্যাক্টরি চালাবো কী করে? যাক্‌গে—যা হবার তা হবে—

নাগরাজন জিজ্ঞেস করলে—কত লিখবো স্যার?

মুক্তিপদ বললে—এবার এক লাখই দাও—ক্রস্ কোর না—

চেক লেখা হয়ে গেলেই সেটা নিয়ে মুক্তিপদ নিজের চেম্বারে এসে শ্রীপতিবাবুর হাতে দিলেন।

শ্রীপতিবাবু চেকের ওপরকার অঙ্কটা দেখে মনে মনে অখুশী হলেন খুব। কিন্তু কিছু বললেন না। চেয়ার ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আসি, আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে—

গোপালও উঠে পেছন পেছন বাইরে গেল।

শ্রীপতিবাবু গাড়িতে উঠেই বললেন—দেখেছ গোপাল তোমার বন্ধুর কোম্পানীর মালিক কত বড় একটা স্কাউড্রেল।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—কত দিলে স্যার?

—মাত্র এক লাখ! আমি নিজে এলুম, তবু বেশি দিলে না। একটু চক্ষুলজ্জাও নেই এই ক্যাপিট্যালিস্ট্‌দের।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—স্যাক্সবীতে ইউনিয়ন ক'টা গোপাল?

—তিনটে স্যার—

শ্রীপতিবাবু বললেন—একটা লেবার ট্রাবল্ করিয়ে দিতে পারো না?

গোপাল বললে—খুব পারি স্যার, আপনি বললেই সব করিয়ে দিতে পারি। আপনি একবার হুকুম দিয়েই দেখুন না, করতে পারি কিনা?

শ্রীপতিবাবু বললেন—তুমি তাই করিয়ে দাও গোপাল। তা না হলে এরা শায়েস্তা হবে না—

গোপাল বললে—ঠিক আছে স্যার—

শ্রীপতিবাবু বললেন—আর একটা কথা, আর কেউ সার্টিফিকেট নিতে আসছে না তো? বাঙলাদেশ থেকে লোক আসা কি বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

গোপাল বললে—কে বললে স্যার বন্ধ হয়ে গেল? আমি স্যার এ-ক'দিন এ দিকটা দেখতে গিয়ে ও-দিকটায় বেশি নজর দিতে পারিনি।

শ্রীপতিবাবু বললেন—এখন সার্টিফিকেটের রেটটা একটু বাড়িয়ে দাও—। এখন সব জিনিসের দাম বাড়ছে, আর আমার সার্টিফিকেটের দাম তিরিশ টাকা থাকবে—এটা ঠিক নয়। এখন থেকে ওর রেট করে দাও পঞ্চাশ টাকা। যারা তিরিশ টাকা দিতে পারে, তারা পঞ্চাশ টাকাও দিতে পারবে। এই সার্টিফিকেটটা পেলে তারা র‍্যাশন্ কার্ড পাবে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করতে পারবে। ভোটারদের লিস্টে নামও ওঠাতে পারবে। ওতে ওদের কম সুবিধে? আর ইলেকশানের সময়ে ওরা আমাদেরই ভোট দেবে—। তাই ও-দিকটায় তুমি নজর রাখবে—

ততক্ষণে গাড়িটা রাইটার্স বিলডিং-এর সামনে এসে গিয়েছিল। শ্রীপতিবাবু নামতেই চার পাঁচজন পুলিশ লম্বা করে সেলাম ঠুকলে। গোপালকে নিয়ে গাড়িটা উল্টোদিক দিয়ে বড় রাস্তার ওপরে গিয়ে পড়লো। শ্রীপতিবাবুর পি-এর অনেক কাজ। শুধু যে পার্টির চাঁদা আদায় করা কাজ, তাই-ই নয়। হাজারটা লোকের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা ছাড়াও রাত্রের কাজটাও কম জরুরী নয়। তখন সে রাস্তার মোড়ের মাথায় পুলিশদের হাতে টাকা দিয়ে বেড়ায়। আবার কখনও কখনও নাইটক্লাবেও গিয়ে ঢুঁ মারে। বিচিত্র লোক গোপাল হাজরা। তা না হলে আন্টি মেমসাহেবের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়ই বা হলো কী করে?

রাস্তায় গাড়িতে যেতে যেতে এক জায়গায় গিয়ে গাড়িটা থামাতে বললে গোপাল।

অন্য দিকের ফুটপাথের ওপর দিয়ে সন্দীপ আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল। তাকেই ডাকলে গোপাল। চিৎকার করে বললে—এই সন্দীপ এই সন্দীপ—এই—

গোপালকে দেখেই সামনে এগিয়ে এল সন্দীপ। গোপাল বললে—কীরে, কোথায় যাচ্ছিস?

সন্দীপ বললে—কলেজে—

—আয়, গাড়িতে এসে ওঠ্—

সন্দীপ গাড়িতে উঠতেই গাড়ি আবার চলতে লাগলো।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছিস?

—ভালো, তুই?

গোপাল বললে—আজকে তো তোর বাবুদের অফিসে গিয়েছিলুম রে। এই এখন সেখান থেকেই তো আসছি—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী করতে গিয়েছিলি?

গোপাল বললে—আমার মিনিস্টারকে নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কে মিনিস্টার?

—যার কথা বলেছিলুম তোকে। সেই শ্রীপতি মিশ্র। পার্টিফান্ডের চাঁদা চেয়ে নিয়ে এলুম।

—কীসের পার্টি-ফান্ড!

গোপাল বললে—সে তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। যাক্ গে, তোর কী খবর, বল্? সেই রাসেল স্ট্রীটে আর গিয়েছিলি? সেই আন্টি-মেমসাহেব কেমন আছে? এখনও তার চাকরি আছে?

সন্দীপ বললে—আছে, কিন্তু আর বেশিদিন চাকরি থাকবে না ভাই। বিশাখার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—

গোপাল বললে—বিশাখা? বিশাখা কে?

—আরে মনে নেই? সেই যে সৌম্যবাবুর সঙ্গে যার বিয়ে হওয়ার কথা। সেই বিয়ে তো এবার হচ্ছে—

গোপাল বললে—বিয়ে হচ্ছে? ওই লম্পটটার সঙ্গে? সব্বোনাশ করেছে।

সন্দীপ বললে—কেন? তার সঙ্গে তো বিয়ে হওয়ার কথা আগে থেকেই পাকা হয়ে ছিল—

গোপাল বললে—মেয়েটার কপালে অনেক দুঃখ আছে রে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—কেন জানিস না? তুই সেই চৌরঙ্গীর নাইট-ক্লাবে গিয়ে নিজের চোখেই তো সব দেখেছিস! তবে দেখবি বিয়ের পরে মেয়েটা ঠিক শেষকালে সুইসাইড্ করবে, এই আমি বলে দিচ্ছি—মেয়েটা নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করবে, দেখে নিস—

গোপালের দিকে চেয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

গোপাল বললে—সুন্দরী মেয়েরা জীবনে কখনও সুখী হয় না রে, এটা জেনে রাখিস—

—কেন?

—এটা ভগবানের এক অভিশাপ। জানিস না, মেয়েলি ছড়ায় আছে—অতি চতুর না পায় ভাত, অতি সুন্দরী না পায় ভাতার—

কথাটা শুনে সন্দীপের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোনও কথা বেরোল না। তারপর বললে—কিন্তু ঠাকুমা-মণির গুরুদেব যে বিশাখার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন এ মেয়ে সুখী হবে। এর সঙ্গে বিয়ে হলে সৌম্যবাবুরও ভালো হবে—

গোপাল বললে—ও-সব কুষ্ঠি-ফুষ্টির কথা রাখ্ তুই। ও-সব স্রেফ্ বুজরুকি। তুই দেখ্ না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

—শেষ পর্যন্ত কী হবে? বিয়ে হবে না?

গোপাল বললে—বিয়ে হোক আর না-হোক, সেটা বড় কথা নয়। ওদের কোম্পানীটাই শেষ পর্যন্ত থাকে কিনা তাই দেখ্ আগে।

—কোম্পানীটা থাকবে না মানে?

গোপাল বললে—সে অনেক কাণ্ড। পরে তুই সব দেখতে পাবি সব জানতে পারবি—

—এখনই বল্ না তুই। তুই-ই তো ছোটবাবুকে নিয়ে রাসেল স্ট্রীটে গিয়েছিলি। ছোটবাবুকে নিয়ে পাত্রীকে দেখিয়েও এনেছিলি। তা পাত্রী পছন্দ হয়েছে ছোটবাবুর?

—পছন্দ হবে না মানে? কী বলছিস তুই? অমন আগুনের ফুল্‌কির মত মেয়ে, ওকে কার না পছন্দ হবে? এখন ওই বিশাখাকে দেখবার জন্যে ছোটবাবু তো কেবল ছুঁক ছুঁক করছে। দেখবি আবার একদিন ছোটবাবু একলাই ওই মেয়ের টানে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।

সন্দীপ কথাটা শুনে চুপ করে রইল। তার এ সব কথাব মধ্যে থাকা উচিত নয়। থাকা ন্যায়সঙ্গতও নয়। সে সামান্য একজন গরিবের ছেলে, পরের বাড়ির অন্নদাস। পরের হুকুম পালন করতেই সে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। এর বাইরে কোনও ব্যাপারে আগ্রহ থাকা তার পক্ষে তো অপরাধ।

গোপাল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কীরে, কী ভাবছিস?

সন্দীপ বললে—কিছু না—

গোপাল বললে—কোনও পার্টির মেম্বার-টেম্বার হয়েছিস তুই?

সন্দীপ বললে—না।

—সে কীরে? এখনও কোনও পার্টির মেম্বার হোস্‌নি? তাহলে তোর ফিউচার একেবারে ডার্ক। তাহলে তুই চাকবি পাবি কী করে?

সন্দীপ বললে—আমাদের ল' ক্লাসের একটা ছেলে আছে, সেও আমাকে ওই কথা বলেছে—সেও বলছিল কোনও পার্টির মেম্বার না হলে নাকি এ-যুগে চাকরি পাওয়া যাবে না।

—ঠিক কথাই তো বলেছে। যে-কোনও পার্টির মেম্বার হলেই হলো। তবে যদি কখনও কোনও পার্টির মেম্বার হোস্ তো শাঁসালো পার্টি দেখে হবি, যাতে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারিস—

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমি তো চাকরি করবো না—

—চাকরি করবি না তো কী করবি?

—হাইকোর্টে ল' প্র্যাকটিশ করবো—

—তাতে টাকা হবে তোর?

সন্দীপ বললে—তা জানি না। বেড়াপোতার কাশীবাবু বলেছেন আমাকে তিনি তাঁর জুনিয়র করে নেবেন।

গোপাল বলল—সেখানেও পার্টি-মেম্বার হতে হবে তোকে। কাশীবাবু কোন্ পার্টির লোক?

সন্দীপ বললে—তা জানি না।

গোপাল বললে—হাইকোর্টেও খুব পার্টি বাজি চলে রে। তা যাক্ গে, তুই যা ভালো বুঝবি তাই করবি, আমি আর কী বলবো। তবে একটা কথা তোকে বলে রাখছি, এখন থেকে তোর কাজকর্ম সব গুছিয়ে নে, তোদের বিডন স্ট্রীটের মুখুজ্জেদের আর বেশি দিন নয়—

—বেশি দিন নয়, মানে?

গোপাল বললে—সেই কথায় আছে না, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে উড়ে যাবে, ওদেরও তাই হবে! অত বাবুআনি, অত বিলেত-টিলেত ঘোরা, অত নাইট-ক্লাবে যাওয়া, ও সব কি চিরদিন চলে রে? চিরদিন চলে না। তাই আগে থেকে তোকে সাবধান করে দিচ্ছি—সময় থাকতে থাকতে নিজের আখের গুছিয়ে নে—

সন্দীপ ভয় পেয়ে গেল গোপালের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—তার মানে? আমাকে ও-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে? বাড়ি ছেড়ে দিতে হলে আমি যাবো কোথায়? আর শুধু তো আমি নয়!

আমার মত আরো অনেক গরিব মানুষজন আছে, তারাই বা কোথায় যাবে? আর আমাদের বেড়াপোতার মল্লিককাকাও, তো আছেন। তাঁর কী হবে?

গোপাল বললে—তাদের কথা তোকে ভাবতে হবে না, তুই তোর নিজের কথা ভাব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কিন্তু কী হবেটা কী? কী হতে পারে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ওদের এত টাকা, ওদের এত বড ব্যবসা, বিলেত আমেরিকা জড়িয়ে বড কারবার, সব নষ্ট হয়ে যাবে? তা হলে বিশাখার কী হবে? ও-বাড়িটার অবস্থা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে ছোটবাবু আর বিশাখা কী করবে? ওদের খরচ-খরচা তাহলে চলবে কী করে?

ততক্ষণে গাড়িটা কলেজের কাছাকাছি এসে গেছে।

গোপাল বললে—তুই তো এখানে নামবি, এই তো তোর কলেজ—

সন্দীপ তখনও নড়লো না সেখান থেকে। বললে—সত্যি বল না, ওদের কী সব্বোনাশ হবে?

গোপাল বললে—আরে, এ তো দেখছি মহা মুশকিল হলো আমার! ওদের সব্বোনাশ হলে তোর কী ক্ষতি? তুই ওদের জন্যে অত ভাবছিস্ কেন? তুই ওদের কে? তোর সঙ্গে ওদের ভালো মন্দের কী সম্পর্ক? তুই সময় থাকতে থাকতে নিজের কাজ গুছিয়ে নে না—

সন্দীপ তখনও নড়লো না। রাস্তায় নেমে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। মুখটাও তার তখনও অন্ধকার হয়ে রইল। বললে—সত্যিই ভাই, ওদের জন্যে আমার খুব ভয় লাগছে—

গোপাল বললে—তোর ভয় হবার কারণটা কী?

সন্দীপ বললে—ওদের যদি সব্বোনাশ হয় তা হলে কী হবে?

—কী আবার হবে, সব্বোনাশ হলে হবে। তাতে তো তোর কোনও ক্ষতি হচ্ছে না—

সন্দীপ বললে—কিন্তু মাসিমার যে নিজের বলতে কেউ নেই। বিশাখার সব্বোনাশ হলে মাসিমা কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?

গোপাল বললে—তোর সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্-বক্ করবার সময় নেই আমার, আমি যাই—

বলে ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপালের গাড়িটাও সন্দীপের চোখের সামনে থেকে সামনের দিকে চলতে চলতে কখন দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সন্দীপ তখনও পাথরের মত স্থির হয়ে সেই জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে তখন বিশাখার শীর্ণ দীর্ণ একখানা কঙ্কালসার নিষ্প্রাণ চেহারা যেন বাতাসের তাড়নায় একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুলতে লাগলো।
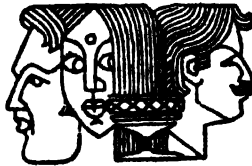
সেসব দিনের কথা ভাবলে সন্দীপের এখন হাসিই পায়। সত্যিই, কত ছেলেমানুষ যে সে ছিল তখন! মনে আছে তখন সে কিছুই বুঝতো না। কিন্তু তবু সে কী করে যেন বুঝে গিয়েছিল যে যারা পার্টিতে থাকে তাদের নিজেদের কোনও স্বাধীন সত্ত্বা থাকে না। সে আরো এইটে বুঝেছিল যে সব পার্টির লীডাররাই চায় যে তাদের দলের মেম্বাররা যেন কখনও স্বাধীনভাবে চিন্তা না করে। যারা সকলের তালে তাল দিয়ে চলতে পারে তারাই এ-পৃথিবীতে যত সব সুবিধেগুলো ভোগ করে। তারা জীবনে তেমন কিছু কষ্ট পায় না। তারাই কোনও না কোনও পার্টির খাতায় নাম লিখিয়ে নিশ্চিন্ত হয়!

কিন্তু ভবিষ্যৎ পৃথিবীব কেউই কি তাদেব মনে বাখে?

মনে বাখে তাদেবই যাবা সকলের তালে তাল না দিয়ে নিজের পথ ধরে চলে। তাদেব জন্যেই পৃথিবী কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। আব সেই তাবাই উত্তরসূবীদেব পথ দেখায় চিবকাল ধবে।

কিন্তু নিজেদেব স্বাধীন চিন্তাব জন্যে তাদের কষ্টেব আব শেষ থাকে না কোনও দিন। তাদের কষ্ট তাদেব যন্ত্রণা তাদেব আত্মাহুতিই শেষ পর্যন্ত ইতিহাস হয়ে যায়। তাবাই অমর হয়ে বেঁচে থাকে ইতিহাসের পাতায়।

কিন্তু এরা ছাড়াও আবো তো একদল লোক থাকে যাবা কোন দলে তো থাকেই না, আবার কোনও দলেব বাইরে থাকলেও তারা কাবো কাছে কোন সহানুভূতি স্নেহ-ভালবাসা মায়া বা মমতাও পায় না। তাব ওপব কালেব ইতিহাসের পাতাতেও তাদের বড় স্থানাভাব হয়।

এদের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। এই যারা কোন দলে থাকে না।

সন্দীপ লাহিড়ীও এদের শ্রেণীর একটি শোচনীয় উদাহরণ। তার নিজের দোষেই সে গোপাল হাজরাও হতে পারেনি, কিংবা সুশীল সবকারও হতে পারেনি; আর সৌম্য মুখার্জী হওয়া তো আরো দূরের কথা! সে এই আমাদের কোনও শ্রেণীতেই একজন কেষ্ট বিষ্টুও হতে পারেনি! মাত্র একটা ব্যাঙ্কের একটা সামান্য শাখার সামান্য একজন ম্যানেজার হয়েই জীবন কাটিয়েছে। এর জন্যে কে দায়ী? সে নিজে না বিশাখা, কে?

সেদিন সকালে রাসেল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে অন্য দিনের মতই যথারীতি বিশাখা স্কুলে গিয়েছিল।

রোজকাব মত শৈল তাব সকালবেলার জলখাবার করে দিয়েছে। যোগমায়া তার আগেই ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে সমস্ত কিছু যোগাড় করে রেখে দিয়েছিল। কোন্ ব্লাউজ আর কোন্ শাড়ি সে পরবে, কোন্ জুতো সে পরবে, তাও যোগমায়া রোজ সামনে সাজিয়ে গুছিয়ে স্কুলে পাঠাবার জন্যে যত রকম বিলাসিতার উপকরণ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তার সব ব্যবস্থাও ঠাক্‌মা-মণি করে দিয়েছে।

তারপর মেয়েকে ডেকেছে—ওরে, ওঠ্ ওঠ্—দেরি হয়ে যাবে—ওঠ্ মা, ওঠ্—

সেই অত বড় ধাড়ি মেয়েকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তখন তার স্নান করার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করেছে। তারপর আছে খাওযাব পাট। আর খাওয়াটাও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। যোগমায়া তার বাপের জন্মেও অমন খাওয়ার আয়োজন দেখেনি। কর্ন-ফ্লেক্স কিংবা ওটস্-পরিজ্ দিয়ে ব্রেকফাস্ট আরম্ভ। তার সঙ্গে কোয়ার্টার বয়েলড্ দুটো আন্ডাক্রাই, তার সঙ্গে কিছু ফ্রুট্‌স। তাতে কোনও দিন কলা, কোনও দিন আঙুর কি বেদানা। তার সঙ্গে টোস্ট আর বাটার। কিংবা কখনও কখনও বাটারের বদলে জ্যাম্ বা জেলি। আর তারপর বড় কাপের এক কাপ দুধ। চা একেবারে নয়।

তা খেতে কি চায় মেয়ে! বিশাখার পছন্দ লুচির সঙ্গে কিছু ভাজা। কিন্তু সে-সব খাবার ডাক্তারের ডায়েট্ তালিকায় নেই। ওটা নাকি অত ভাল নয়। ইচ্ছে হলে দুটো টোস্টের বদলে চারটে টোস্ট খাও, কিন্তু কখনও ওসব খেয়ো না। কাবণ আজকাল ঘি বা তেল কোন জিনিসটাই খাঁটি নয়। টোস্টের মধ্যে ওসব ভেজাল দেওযার উপায় নেই।

এর পরে নিচে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হবে ড্রাইভার। গাড়ির আসার খবরটা ওপরে এসে দারোয়ান জানিয়ে দিয়ে যাবে। ড্রাইভার অরবিন্দ। বুড়ো মানুষ। ঠাক্‌মা-মণি ছোকবা ড্রাইভার পাঠান না। ড্রাইভার বুড়ো মানুষ হলে নিবাপদ। সে বিশাখাকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে স্কুলের বাইরে গাড়ি নিয়ে বসে থাকবে। আবার ছুটির পব বিশাখাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে যাবে। এই তার রোজকার ডিউটি।

স্কুলের ছুটির পর বিশাখা বাড়িতে এসে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে মা'র কোলে শুয়ে পড়বে। তখন এক গ্লাস ডাবের জল খেতে হয়। তারপর আসবে আন্টি মেমসাহেব ইংরেজী পড়াতে। আন্টি

মেমসাহেব পড়িয়ে চলে যাবার পর দুপুরের খাওয়া। এই দুপুরের খাওয়ারও একটা ডায়েট্-মেনু করে দিয়েছে ডাক্তার। সেই মেনু ছাড়া অন্য কোনও খাওয়া চলবে না।

তারপরে একটু ন্যাপ্। মানে তন্দ্রা। ভাত-ঘুম। ওটা মাস্ট।

তারপরে আসবে জয়ন্তী দিদিমণি। বাংলা পড়াবে, অঙ্ক কষাবে, হিস্ট্রী পড়াবে। আরো যা যা সিলেবাস আছে তাই পড়াবে। এ ছাড়া সপ্তাহে একদিন নাচ শেখানোরা মাস্টারনী আসবে। আর রবিবার দুপুর বেলা ওয়ার্ক-এডুকেশন। তখন বিশাখাকে নিজের হাতে ছবি আঁকতে হয়।

তারপর সন্ধের আগে লাইট্ রিফ্রেশ্মেন্ট্। হালকা জলযোগ।

আর তারপর?

তারপর আর কোনও কাজ নেই। তখন গল্প করো। রেডিও শোন কিংবা কেউ বেড়াতে এলো তো তার সঙ্গে গল্প করো।

তারপর রাত আটটায় ডিনার। সেই ডিনারেরও চার্ট আছে। কোন্টা খেলে ফ্যাট্ হবে না, কোন্টা খেলে কোলেস্টরল হবে না, কোন্টা খেলে সুগাব হবে না—অথচ কোন্টা খেলে শরীরে শক্তি বাড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনও ভালো থাকবে, তারই নিখুঁত ব্যবস্থা।

সেদিনও যথারীতি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বিশাখা স্কুলে গেছে। অরবিন্দ রোজকার মত সেদিনও ঠিক সময়ে এসে বিশাখাকে যথাস্থানে নিয়ে গেছে। তার অন্য সব ব্যবস্থাও কবে রেখেছে যোগমায়া। শৈল বাজার করে আনবার সময় রোজকার মত একটা ডাবও কিনে এনে ফ্রিজের মধ্যে বেখে দিয়েছিল।

কিন্তু দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, তখনও বিশাখা ফিরলো না।

কী হলো আজ? বিশাখা এখনও স্কুল থেকে ফিরলো না কেন?

শৈলও এসে জিজ্ঞসা করলে—খুকুদিদি তো এখনও এলো না মা—

যোগমায়াও সেই কথা ভাবছিল। বললে—আমিও তো তাই ভাবছি—

তারপর বললে—একবার দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে এসো তো অরবিন্দ এসেছে কিনা—

না, দারোয়ানও বললে—সে গাড়ি তখনও ফিবে আসেনি—

—তাহলে কী হবে? আগে তো কখনও এমন হয়নি—

কী হবে কে জানে! যোগমায়ার মনে বড় ভয় হতে লাগলো। গেল কোথায় বিশাখা?

তারপর বেলা আরো বাড়লো, আন্টি মেমসাহেব এসে সব শুনতে পেলে।

বললে—তাহলে আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?

তাও তো বটে! সে তো এক জায়গাতেই কাজ করে না! তাকে আরো দশটা বাড়িতে গিয়ে ইংরিজী শেখাতে হয়। এখানে বসে-বসে আর কতক্ষণ সে তার সময় নষ্ট করবে? সকলেরই তো সময়ের দাম আছে। সুতরাং ..

সুতরাং আন্টি মেমসাহেব চলে গেল।

যোগমায়ার খাওয়াও হলো না। মেয়ে বাড়িতে এল না আব মা নিজে খেয়ে নেবে, এটা কী করে সম্ভব। আর যোগমায়া যখন খেলে না, শৈলই বা খেয়ে নেয় কী করে?

যোগমায়া শৈলকে বললে— তুমি খেয়ে নাও বাছা, তুমি কেন মিছিমিছি উপোস করে থাকবে? খেয়ে নাও তুমি—

কিন্তু শৈল খেল না।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে খাঁ খাঁ করতে লাগলো। বেলা করে আসে জয়ন্তী দিদিমণি। সেও এসে সব শুনে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—পুলিশে খবর দিয়েছেন?

যোগমায়া তখন কাঁদতে শুরু করেছে। বললে—কে খবর দেবে মা? আমার তো লোকজন কেউ নেই—

জয়ন্তী বললে—কেন, সেই যে সন্দীপবাবু আসতেন, তাকে একবার খবর দিন না—

যোগমায়া বললে—সেও তো আজকে সারাদিন আসেনি। অন্যদিন তো সকালবেলার দিকেই এসে যায়—

—তা আপনাদের বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে একবার টেলিফোন করে না-হয় খবরটা জানিয়ে দিন—এ-রকম চুপ করে বসে থাকা তো ঠিক নয়—

যোগমায়া বললে—তা তো বুঝলুম মা, কিন্তু কে টেলিফোন করে। আর এ-বাড়িতে তো আমাদের টেলিফোনও নেই—

জয়ন্তী বললে—কিন্তু ও-বাড়িতে তো একটা খবর দেওয়া উচিত। তাদের বউ তারাই তো খোঁজ-খবর করবে। আর তাদের খোঁজ-খবর করবার মত লোকেরও তো অভাব নেই—

জয়ন্তী আব কতক্ষণই বা ছাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তার ছাত্রী এল না তখন উঠলো। বললে—তাহলে এখন আমি আসি মাসিমা—আবার কাল আসবো—

এ ছাড়া আর কী-ই বা তাদের করবার আছে। যোগমায়া বললে—হ্যাঁ. মা তুমি আর মিছিমিছি বসে থেকে কী করবে তুমি এসো—

যোগমায়া তেতলার ঘর থেকে রাসেল স্ট্রীটেব দিকে চেয়ে দেখলে। বাস্তা দিয়ে অনেক লোক অনেক গাড়ি চলেছে। কেউ যাচ্ছে উত্তর দিকে, কেউ দক্ষিণ দিকে। অথচ কোনও গাড়িই তাদের তিন নম্বর বাড়িটার সামনে থামছে না।

হঠাৎ নিচেব দারোয়ান ওপবে এসে ডাকলে—মাইজী—

যোগমাযা দৌড়ে এসে বললে—কী দারোয়ান?

দরোয়ান বললে—ড্রাইভার এসেছে মাইজী—এই যে—

ড্রাইভারের মুখটা তখন শুকিয়ে গেছে। যোগমায়া বললে—কী হলো বাবা, আমার মেয়ে কই? আমার সমস্ত দিন নাওযা নেই খাওয়া নেই। তোমাব পথ চেয়ে বসে আছি—কী হয়েছিল তোমার?

অরবিন্দ অপরাধীর মত ভঙ্গি করে বললে—মা, আমাবও তো খাওয়া হয়নি. আমি তো সাবাদিন গাডি নিযে ইস্কুলের সামনে বসেছিলুম—

—কেন? আমার মেয়ের ইস্কুলের ছুটি হয়নি?

—হ্যাঁ, হযেছে মা, ইস্কুলের ছুটির পর খুকু দিদিমণি আমার গাডিব দিকে আসছিল হঠাৎ ছোট হুজুর এসে গেল।

—ছোট হুজুব? ছোট হুজুর কে? তোমাদের সৌম্যবাবু?

অরবিন্দ বললে—হ্যাঁ মা. ছোট হুজুর খুকু দিদিমণিকে নিয়ে তাঁর নিজের গাড়িতে তুললে. তারপর আমাকে সেখানে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে. আমি তাই সেখানেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম—

যোগমায়া বললে—তা আমার মেয়ে এখন কোথায়?

অরবিন্দ বললে—তা তো জানি না মা—আমি এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে যখন দেখলুম যে খুকু দিদিমণি আর ফিরছে না তখন এখানে চলে এলুম। সারাদিন আমার কোনও কাজই হয়নি। নাওয়া হয়নি, খাওয়া হয়নি, কিছুই হয়নি আমার—

যোগমাযা এ-কথার পর আর কী বলবে বুঝতে পারলে না। তবু বললে—তা হঠাৎ তোমার ছোট হুজুর ইস্কুলে আসতে গেলেনই বা কেন?

—তা কী করে জানবো মা? আমরা তো ছোট হুজুরের চাকর। তিনি কিছু বললে আমরা কি 'না' বলতে পারি, বলুন?

যোগমায়া বললে—তা তো বটেই বাবা, তোমরাই বা তাঁর কী করবে?

তারপর আবার বললে—কিন্তু আমি তো মেয়ের মা, আমার তো ভাবনা হয় বাবা। তোমারও তো বাড়িতে বউ-ছেলে মেয়ে আছে। তুমি তো আমার মনের কষ্ট বুঝতে পারো! তুমিই বলো, এখন এই অবস্থায় আমি কী করি! আমি মা হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি?

অরবিন্দ আর কী বলবে!

যোগমায়া বললে—তুমি তো এখন ও-বাড়িতে যাচ্ছো, তুমি একবার সন্দীপবাবুকে এই খবরটা গিয়ে দিয়ে আসতে পারবে? দেখা করে বলে দিও যেন আমার এখানে একবার সে আসে! সে ছাড়া আমার তো নিজেব বলতে এখানে আর কেউ নেই—

হঠাৎ পেছন থেকে তপেশ গাঙ্গুলী এসে পৌঁছুলেন।

—এ কী বউদি, কী ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে যে? এরা কারা?

যোগমায়া বললে—তুমি এসেছ? ভালোই হয়েছে। এই হচ্ছে আমার এ-বাড়ির দারোয়ান, আর এ হচ্ছে অরবিন্দ, আমার মেয়ের গাড়ির ড্রাইভার—

তপেশ গাঙ্গুলী ওদের দিকে চেয়ে বললেন—এরা কী চায়?

যোগমায়া বললে আমার ভীষণ বিপদ হয়েছে ঠাকুরপো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমাদের ওই বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে একটা খবর দিতে হবে। বলতে হবে যে বিশাখা সকালবেলা ইস্কুলে গিয়েছিল, এখনো পর্যন্ত সে বাড়ি ফেরেনি।

—কেন, ফেরেনি কেন? কারো সঙ্গে পালালো নাকি বিশাখা?

যোগমায়া বললে—ওই তো ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করো না তুমি। ও বলছে সকালবেলা নাকি ও-বাড়ির ছোটবাবু ইস্কুলে এসে বিশাখাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে, তারপর...

—ছোটবাবু কে?

—ওই যে যার সঙ্গে আমার বিশাখার বিয়ে হবে।

তপেশ গাঙ্গুলী চমকে উঠলো—সে কী! বিয়ে হওয়ার আগেই কনেকে নিয়ে বর পালিয়ে গেল? এখন কী হবে?

যোগমায়া বললে—আমিও তো তাই ভাবছি। জানো, সারাদিন আমাদের খাওয়া হয়নি। আমিও খাইনি, আর শৈলও খায়নি। বিশাখা না খেয়ে রইল আমরা কী করে খাই, বলো! তুমি এলে, তবু একটু বাঁচলুম। সব তো শুনলে, এখন কী করি তাই বলো তো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—পুলিশে খবর দিয়েছ?

যোগমায়া বললে—পুলিশে খবর দেওয়া কি ভালো হবে?

—কেন? ভালো হবে না? তোমার মেয়ের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হওয়ার আগেই যদি জামাই তোমার মেয়েকে নিয়ে পালায় তাহলে তো কিডন্যাপিং এর চার্জে তোমার জামাই-এর জেলও হয়ে যেতে পারে! আমার জানা ভালো উকিল আছে, তুমি যদি বলো তাহলে সেই উকিলের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, যাবে? তুমি যাবে?

যোগমায়া বললে—না ঠাকুরপো, আমার জামাই তো ড্রাইভারকে জানিয়ে শুনিয়েই নিয়ে গেছে! লুকিয়ে চুরিয়ে তো আর নিয়ে যায়নি। আমার তো মনে হয় এ-ব্যাপারটা পুলিশকে না জানালেই ভালো—

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না বউদি! আমি এ-রকম কেস অনেক দেখেছি। ধরো তোমার মেয়ে কাল কি পরশু বাড়ি ফিরে এল। তখন যদি তোমার জামাই তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তখন? তখন যদি তোমার জামাই বলে যে তোমার মেয়ে ক্যারেক্টারলেস্ সেই গ্রাউন্ডে যদি বিয়ে না হয়।

দেওরের কথা শুনে যোগমায়া ভয়ে দুর্ভাবনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলেন—ভগবান না করুন, যদি তেমন ঘটনা ঘটে, তখন তুমি কী করবে? তুমি একলা বিধবা মানুষ, আমিও কাছে নেই, নিজের বলতে এক আমি ছাড়া তো তোমার পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তখন? তখনকার কথা একবার ভাবো?

যোগমায়া কী বলবে বুঝতে পারলে না।

তপেশ গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলেন—এই জন্যেই তো বলি বউদি যে বুড়ো পীরিত বালির বাঁধ! তুমি তখন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে দু হাত তুলে একেবারে ধেই-ধেই করে নেচে উঠলে! গট্‌গট্ করে গাড়ি চড়ে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে এলে। আমি কিচ্ছুছু বলিনি। বুঝলে

বউদি? আমি তখন ভাবছিলাম দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আমি জানতুম একদিন এই-ই হবে।

অরবিন্দ আর দারোয়ান তখনও দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে তপেশ গাঙ্গুলী খেয়াল গেল সেদিকে। বললেন—তোমরা এখানে আব দাঁড়িয়ে আছে কেন ভাই? তোমরা কী শুনছো? তোমবা নিজের নিজের কাজে যাও না। আমরা দেওর-ভাজে কথা বলছি। তার মধ্যে তোমরা কেন নাক গলাচ্ছো ভাই? তোমাদের এমন স্বভাব তো ভালো নয়।

এ কথার পর দরোয়ান আর অববিন্দ দু'জনেই নিচেয় নেমে গেল।

তপেশ গাঙ্গুলী দবজায় খিল লাগিয়ে দিলে। বললে—দেখলে তো বউদি দেখলে তো? এদের আক্কেলখানা একবার দেখলে তো? আমরা দু'জনে প্রাইভেট কথা বলছি, আর ওরা কিনা দাঁড়িয়ে সেই কথা শুনে মজা মারছে।

যোগমায়া বললে—ওদের কথা তুমি ছেড়ে দাও ঠাকুরপো, ওরা চাকর-বাকর মানুষ, ওদের কথা শুনিয়ে লাভ কী?

তপেশ গাঙ্গুলীও সে কথায় সায় দিয়ে বললেন—ঠিক বলেছ তুমি বউদি, ঠিক বলেছ, এই না হলে আমার বউদি তুমি! কিন্তু তুমিই বলো তো, আমি কি অন্যায্য কথা বলেছি? ওরা বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমরাও কি ভিখিরি? বড়লোক জামাই বলে কি তার সাতখুন মাফ?

যোগমায়া তখন বিশাখার কথা ভেবে অস্থির হচ্ছিল। বললে তুমি একটু চুপ করো ঠাকুরপো, আমার মাথায় এখন কোনও কথা ঢুকছে না। আজ পর্যন্ত কখনও তো বিশাখা দেরি করে না! আমি কি করবো তা বুঝতে পারছি না—

—তপেশ গাঙ্গুলী বলে উঠলেন—তুমি একটু ধৈর্য ধরো বউদি, আমি এখ্খুনি থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে তোমার জামাই-এর নামে ডায়েরী করে আসছি—

যোগমায়া তাকে নিরস্ত করলে। বললে—না ঠাকুরপো, আমায় একটু ভাবতে সময় দাও। আমার মাথা ঘুরছে। পোড়ারমুখী যে আমাকে এমন করে জ্বালাবে তা যদি আমি আগে জানতে পারতুম তো আমি ওকে আঁতুড় ঘরেই গলা টিপে মেরে ফেলতুম। আর...

যোগমায়ার কথা শেষ হওযার আগেই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো!

—কে?

দরজা খুলতেই দেখা গেল সন্দীপ। সন্দীপের হাসি হাসি মুখ। বললে—মাসিমা, একটা সুখবর আছে। সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখাব বিয়ে হবে। সব পাকা হয়ে গেছে। কাশীর গুরুদেবের কাছে সরকারমশাই আজ চিঠি লিখেছেন, তার সঙ্গে পাঁচশো টাকা প্রণামীও পাঠিয়ে দিয়েছেন মানি-অর্ডার করে—

যোগমায়া যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—বিয়ে হবে? কবে?

সন্দীপ বললে—এখনও দিন-ক্ষণ স্থির হয়নি। গুরুদেব যে-সময় লিখে দেবেন, সেই তারিখেই বিয়ে হবে।

কথাটা শুনে তপেশ গাঙ্গুলীর মুখটা শুকিয়ে যেন আম্‌সি হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন—সত্যিই বিয়ে হবে, না গুল্ দিচ্ছ ভায়া?

কথাটা সন্দীপের ভালো লাগলো না। জিজ্ঞেস করলে—ও—কথা কেন বলছেন?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ভাই, অনেক বড়লোক আমার দেখা আছে কিনা। সব ব্যাটা মুখে বারফট্টাই করে। কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। আমি তখনই বউদিকে বলেছিলাম, বউদি বড়লোকের কথায় ভুলো না, বউদি তো তখন গরীবের কথা শুনলে না, এখন তাই পস্তাচ্ছে—

সন্দীপ বললে—মুখুজ্জ্যে-বাড়ির কর্তারা সে-রকম বড়লোক নয় তপেশবাবু, এরা কথা দিয়ে কথা রাখে। আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন! বিয়ে এখানে হবেই—

—হলে তো ভালোই ভায়া। আমি কি চাই না যে বিশাখার বিয়ে এখানে না হয়? আমি তো বিশাখার কাকা, বিশাখার গুরুজন। এখন এদ্দিকে কী হয়েছে শুনেছো?

—কী?

—তোমাদের ছোটবাবু তো সকালবেলা বিশাখাকে নিয়ে বেপাত্তা!

সন্দীপ আকাশ থেকে পড়লো। বললে—তার মানে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তার মানে আমার এই বউদিকেই তুমি জিজ্ঞেস করো। বিশাখা সেই সকাল বেলা ইস্কুলে গেছে এখনও সে বাড়িতে ফেরেনি—

—সে কী?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তুমি অমন অবাক হচ্ছো কেন ভায়া?

সন্দীপ বললে—তাতে আপনার এত আনন্দ হচ্ছে কেন বলুন তো? বড়লোকের বাড়িতে আপনার ভাইঝির বিয়ে হচ্ছে বলে আপনার মনে কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—ঠিক আছে, আমার সম্বন্ধে যদি তোমার এই ধারণাই হয় তাহলে আমি চলে যাচ্ছি—তবে এও বলে যাচ্ছি, এর শেষ দেখে যাবো তবে আমি মরবো। তার আগে নয়—

বলে আর দাঁড়ালেন না। সেইদিনই প্রথম তপেশ গাঙ্গুলী না-খেয়ে না-টাকা নিয়ে প্রথম এ-বাড়ি থেকে বাইরে চলে গেলেন।

যোগমায়া বললে—কেন তুমি আমার দেওরকে ও-সব কথা বলতে গেলে বাবা? হাজার হোক আমারই দেওর তো ও। ওকে চটিয়ে দিয়ে কি ভালো হলো?

সন্দীপ বললে—আপনার ভয় কী? আমি তো আছি। আপনি আমার নিজের মায়ের মত। আমি যদি দু'বেলা দুমুঠো খেতে পাই তো আপনি আর বিশাখাও উপোস করে থাকবেন না। আমি এই আপনাকে বলে রাখলুম—

যোগমায়ার চোখ দুটো জলে ভরে এল। অচেনা মানুষের কাছ থেকে এমন নিঃস্বার্থ, ভালোবাসা যোগমায়া জীবনে কখনও পায়নি। অথচ এও তো অকারণ। যোগমায়াকে খুশী করে সন্দীপের কী লাভ?

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে যোগমায়া বললে—যাক গে ও-সব কথা, এখন কী করি তাই বলো তো বাবা, এখন বিশাখাকে কোথায় খুঁজে পাব? কে বিশাখাকে খুঁজে আনবে?

সন্দীপ বললে—কিন্তু যে-ড্রাইভার বিশাখাকে নিয়ে রোজ স্কুলে যায়, সে কোথায়?

যোগমায়া বললে—সে-ই তো একটু আগে খবর দিয়ে গেল যে আমার জামাই নাকি নিজে ইস্কুলে গিয়ে বিশাখাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

সন্দীপ অবাক হয়ে গেল শুনে। বললে—সৌম্যবাবু? সৌমবাবু বিশাখাকে নিয়ে চলে গিয়েছেন?

যোগমায়া বললে—গাড়ির ড্রাইভার অরবিন্দ তো এখন তাই-ই বলে গেল—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—এখন কী করি বলো তো বাবা? বিয়ের আগে কি জামাই-এর এই মেলামেশা ভালো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি আজকে ছিলে না তাই আমি সমস্ত ক্ষণ কেবল বিশাখার কথা ভেবেছি আর তোমার কথা ভেবেছি। ভেবে-ভেবে আমার মাথাটা ব্যথায় টন্-টন্ করছে তখন থেকে সারাদিন এক গেলাস জল পর্যন্ত পেটে পড়েনি—

সন্দীপ বললে—আপনি এখন একটু খেয়ে নিন, আপনি না-খেয়ে থাকলেই কি আপনার বিশাখা বাড়ি ফিরবে?

যোগমায়া বললে—তুমিও এই বলছো? মেয়ে সারাদিন না খেয়ে, বাড়ির বাইরে রইল আর আমি মা হয়ে ভাত গিলবো? আমার গলা দিয়ে কি ভাত নামবে? তুমি নিজে মেয়ের মা হলে কি তা করতে পারতে?

সন্দীপ বললে—দাঁড়ান, আমি একটু ভেবে দেখি কী করা যায়...

যোগমায়া বললে—এ-রকম হবে জানলে কি আমি আমার দেওরের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠতুম? তুমি তো আমার দেওরকে দেখলে, আমার অবস্থা দেখে মুখে কেমন এক গাল হাসি বেরিয়েছে দেখতে পেলে না?

সন্দীপ বললে—তা ঘুঁটে পুড়লে গোবব তো হাসবেই মাসিমা, কিন্তু তপেশবাবু এখনও আমাকে জানেন না বলেই ওই কথা বলে গেলেন। তবে আমিও বলে রাখছি মাসিমা যে, যতক্ষণ না আমি এর শেষ দেখছি ততক্ষণ জীবনপাত করে লড়াই করে যাবো। বিশাখার কোনও ক্ষতি হলে মনে করবো সেটা আমারই ক্ষতি। বিশাখাব ভালো হলে মনে করবো আমারই ভালো, বিশাখার মন্দ হলে মনে কববো আমাবই মন্দ—এই আজকে আপনার কাছে আমি বলে বাখলাম—

সন্দীপেব কথায যোগমাযা আনন্দে চোখের জল আব চাপতে পাবলে না। বললে—তুমি এত বড় কথা আমাকে বললে, এ আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন মনে বাখবো। কিন্তু একটা অনুরোধ আমি তোমাকে করি বাবা, আমাকে যেন আবাব সেই দেওবেব খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়ে জা-এর খোঁটা না খেতে হয়। তাহলে আমি আব বাঁচবো না। আমি বড মুখ কবে এখানে চলে এসেছিলুম, ভগবান যেন আমার সে মুখ বাখেন, এর চেয়ে বড কামনা আর আমার নেই—

সন্দীপ বললে—আমি দেখি মাসিমা, কী করতে পারি—

বলে বাইরে চলে যাচ্ছিল। যোগমায়া বললে—কোথায় যাচ্ছো তুমি বাবা?

—আমি জানি না কোথায় যাবো, কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে এখানে বসে থাকলেও তো কোনও লাভ নেই। একটা-না-একটা কিছু ব্যবস্থা করেই আমি আজ আসছি—

সন্দীপ চলে যাওয়ার পর যোগমায়া দবজা বন্ধ করে দিয়ে আবার পুব দিকের জানলায় এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে বাসেল স্ট্রীটটা স্পষ্ট দেখা যায়। যোগমায়া দেখলো সন্দীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলতে লাগলো। যতক্ষণ না সে উত্তর দিকে জনারণ্যে হারিয়ে গেল ততক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল যোগমায়া। তখনই মনে হলো বিশাখা তার মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতো তাহলে কি তার আজ এত ভাবনা হতো! ভগবান যোগমায়াকে মেয়ে না দিয়ে একটা ছেলে দিলেন না কেন? কেন বিশাখা তার মেয়ে হয়ে জন্মালো?
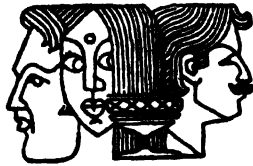
বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িতে ঠাক্‌মা-মণি বিকেল থেকেই বিন্দুর কাছে জানতে চাইছিলেন খোকা বাড়ি এসেছে কিনা। খোকাকে তাঁর বড় দরকার। লন্ডন অফিসের কমললাল মারা গেছে। খবরটা জেনে পর্যন্ত ঠাক্‌মা-মণির মনে বড় কষ্ট হচ্ছিল। আহা, এমন করে যে সে হঠাৎ চলে যাবে তা ঠাক্‌মা-মণি ভাবতেও পারেননি। বহুকাল আগে ঠাক্‌মা-মণি যখন লন্ডনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেই ছেলেটিকে দেখেছিলেন তিনি। সে তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছে। সেই দিন থেকেই তার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, ইন্ডিয়াতে এসে ঠাক্‌মা-মণি কমললালকে এদেশের আমসত্ত্ব আর বড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খেয়ে কমললালের খুব ভালো লেগেছিল। সে-কথা সে একটা লম্বা চিঠিতে লিখেও পাঠিয়েছিল।

বিন্দুকে ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ওরে, ও-বাড়িতে মুক্তিকে একবার টেলিফোন কর তো—

ঠাক্‌মা-মণি সাধারণত নিজের হাতে কখনও টেলিফোন করেন না—বিশেষ করে মুক্তির বাড়িতে। মুক্তির বাড়িতে যদি বউমা টেলিফোন ধরে তো তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বউমার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলতে চান না। এক কথায় বউমার মুখও দেখতে চান না তিনি। বলেন—ওই বউ মাগীটার জন্যেই মুক্তি আমার পর হয়ে গেল।

বিন্দু বললে—মেজবাবু বাড়িতে নেই ঠাক্‌মা-মণি—

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কে ধরেছিল রে তোর টেলিফোন?

—আপনাব বউমা।

—ঠিক আছে, এবার মুক্তির আপিসে টেলিফোন করে দ্যাখ্—

সেখানকার নম্বরও বিন্দুব জানা। না, মেজবাবু আপিসেও নেই্।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তাহলে বেলুড়ে ফ্যাক্টরিতে টেলিফোন কব্—

শেষ পর্যন্ত ফ্যাক্টরিতে তাঁকে পাওয়া গেল। ঠাক্‌মা-মণি এবার টেলিফোন ধরলেন। বললেন—কে রে? মুক্তি?

ওধার থেকে মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ মা, আমি মুক্তি। কিছু বলবে?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—হ্যাঁরে, সৌম্য এখন বাড়ি এল না কেন রে? সে কি এখনও অফিসে রয়েছে?

মুক্তিপদ বললেন—সৌম্য তো আজ অফিসে আসেনি। কেন মা?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তাকে খুঁজছিলুম। অন্যদিন তো সে এতক্ষণে বাড়ি এসে যায়। আমি শুনলুম সে এখনও বাড়ি আসেনি। তা সে অফিসে যায়নি কেন? বাড়ি থেকে তো সে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল! অফিসে যায়নি তো সে কোথায় গেল?

মনে হলো মুক্তি যেন মা'র টেলিফোন পেয়ে খুব বিরক্ত হয়েছেন। বললেন, তোমার নাতি কোথায় গেল তা তোমার নাতিই জানে! আমি তা কী করে জানবো? সে কি আমাকে বলে গেছে কোথায় সে যাবে?

এধার থেকে ঠাক্‌মা-মণি চেঁচিয়ে উঠলেন—তা তোর হয়েছে কী বল্ তো? অত রেগে রেগে কথা বলছিস কেন? কাকে অত রাগ দেখাচ্ছিস?

মুক্তিপদ বললেন—আমার এখন খুব ট্রাবল চলছে—

—কীসের ট্রাবল?

—আবার কীসের ট্রাবল; লেবার ট্রাবল! একটা ইউনিয়ন স্ট্রাইকের ভয় দেখাচ্ছে—

ঠাক্‌মা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—তোর ফ্যাক্টরিতে লেবার ট্রাবল হচ্ছে তো আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস কেন? আমাকে চোখ রাঙালে কি তোর লেবার ট্রাবল মিটবে? ঠিক আছে, আমি ছাড়ছি—

মুক্তিপদ চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—মা, শোন শোন, মা—

কিন্তু ততক্ষণে এদিক থেকে ঠাক্‌মা-মণি লাইন ছেড়ে দিয়েছেন। মুক্তিপদও হতাশ হয়ে রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর ঘর থেকে বেরোলেন। মিটিং-এর টেবিল থেকে টেলিফোন ধরতে এ-ঘরে চলে এসেছিলেন মুক্তিপদ, আবার পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন। তখনও বাইরে থেকে সমবেত কোরাসের ধ্বনি আসছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। মুক্তিপদ মুখার্জী মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ...

ওয়েলফেয়ার অফিসার ভার্গব খুব কড়া স্বভাবের লোক। এত বছর ধরে যখনই কোম্পানিতে শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে তখনই ভার্গবের চেষ্টায় তা মিটে গেছে। লন্ডন অফিসের যেমন কমললাল মেটা ছিল, এই কারখানারও তেমনি আছে যশোবন্দ ভার্গব। শুধু ওয়েলফেয়ার অফিসার ভার্গবই নয়, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জীও অনেক কাজের লোক।

মুক্তিপদ বললেন—এইবার যে-কথা হচ্ছিল, আমি তো বরাবর অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বোনাস দিয়ে আসছি। তবু ওরা এই স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে কেন?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে—বাজারে সব জিনিসের প্রাইস্ লেভেল বেড়ে গেছে, তাই এবার ওদের বোনাসের পার্সেন্টেজও বাড়াতে হবে—

মুক্তিপদ বললেন—বোনাসের পার্সেন্টিজ বাড়াতে বললেই বাড়াতে হবে? এ কি মামার বাড়ি যে ওরা যা আবদার করবে তাই-ই দিতে হবে?

চ্যাটার্জী বললে—ওদের ইউনিয়ন আমাকে যা বলেছে তা-ই আমি আপনাকে বললুম স্যার—

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, আমিও দেখে নিতে চাই ওদের কতদূর দৌড়—

চ্যাটার্জী বললে – আপনি একবার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করবেন স্যার?

মুক্তিপদ বললেন—যদি সে দেখা করতে চায় তো আমার কোন আপত্তি নেই—

ঘোষাল। ঘোষাল পাকা সমাজসেবী। অন্তত সে নিজে সবাইকে তাই বলে। সমাজ সেবার জন্যে সে যে কত স্বার্থ ত্যাগ করেছে তা দেশের সবাই জানে। অনেক বড় বড় অফিসের অনেক বড় বড় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সে। অফিসের কর্মচারীদের মঙ্গল কামনায় সে জীবন-যৌবন বলি দিয়েছে। ববদা ঘোষালকে শুধু 'ঘোষাল' বললেই এক ডাকে সবাই চিনে নেবে। বাঙলা খবরের কাগজে নানা কারণে তার নাম ছাপা হয়ে থাকে। সেই সংবাদে সে একজন বিখ্যাত লোকও বটে। রীতিমত মানাগণ্য।

এ হেন লোককে অশ্রদ্ধা করবে এমন লোক কলকাতার শিল্পপতি সমাজে নেই বললেই চলে।

কলকাতার বঞ্চিত-শোষিত-পীড়িত শ্রমিক সমাজ তাদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা দূর করবার জন্যেই ঘোষালকে তাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছে। ঘোষাল সেই শোষিত শ্রমিক সমাজের নিয়ামক এবং ত্রাণকর্তা দুই-ই। তাকে খবর দিলেই যে সে আসবে তত সময় তার নেই। তার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে শ্রমিকরা তাকে বাড়ি দিয়েছে, গাড়ি দিয়েছে, টেলিফোন দিয়েছে, টেলিভিশন দিয়েছে, ভিডিও দিয়েছে।

আশ্চর্য, এত যে কাজের লোক ঘোষাল, সেও দয়া করে ফ্যাক্টরিতে আসতে রাজি হলো। যদি শ্রমিক সমাজের কিছু উপকার হয় তো তার জন্যে ঘোষাল সব কিছু দিতে প্রস্তুত।

ঘোষাল আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে শ্রমিক-ভাইদের শ্লোগান ছোঁড়া বন্ধ হলো। ঘরের মধ্যে তখন কান্তি চ্যাটার্জী, যশোবন্ত ভার্গব, নাগরাজন, মুক্তিপদ সবাই আছেন।

ঘোষাল ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই সকলের দিকেই তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে। হাসিমুখ। এক মুখ পান।

একটা চেয়ারে বসে বললে—কী সব গোলমাল হচ্ছে শুনছি আপনাদের এখানে—

ওয়ার্কস্ ম্যানেজার চ্যাটার্জী বললে—সবই তো আপনি জানেন—

ঘোষাল বললে—আমার তো শুধু একটা ইউনিয়ন নিয়ে থাকলে চলবে না। আমার এইটেই মুশকিল হয়েছে, আমি নিজে যেদিকে না দেখবো সেই দিকই বানচাল হয়ে যাবে—

মুক্তিপদ বললেন—আমাদের এটা তো কলকাতার সবচেয়ে পুরনো ফার্ম, আমরা তো সকলের চেয়ে বেশি বোনাসই দিই, ওরা বারবার আমাদের এখানেই বেশি গোলমাল করে!

ঘোষাল হো-হো করে অমায়িক হাসি হাসলো! বললে—মিস্টার চ্যাটার্জী, সেইটেই তো নিয়ম। বড় গাছেই তো ঝড় ঝাপটা বেশি লাগে। বড় হওয়ার তো এই-ই দোষ—

মুক্তিপদ বললেন—আপনারা বেঙ্গলে আর বড়দের থাকতে দিচ্ছেন কই? বড়রা যারা ছিল সব তো অন্য স্টেটে কারখানা সরিয়ে নিয়ে গেল, বাঙালী ছেলেদের তো আর বেঙ্গলে চাকরি হবে না—

ঘোষাল বললে—আমি তা জানি না ভাবছেন? আমি তো সব সময়ে এই কথাটাই ভাবি, ভাবি আমাদের বাঙালীদের কী হবে? বাঙালী ছেলেরা বাঙলা দেশেও চাকরি পাবে না বাঙলার বাইরেও চাকরি পাবে না, তা হলে তারা যাবে কোথায়?

ওয়ার্কাস্ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জী বললে—আমাদের কথা একটু একটু ভাববেন স্যার! আমরাও তো মানুষ।

ঘোষাল বললে—জানেন, ও-ব্যাটাদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমি আর পারি না। আমি তো ওদের তাই বলি—ওরে, যাদের আশ্রয়ে তোরা আছিস তাদের কথাও একটু ভাবিস। ওরা এত আহাম্মক যে কী বলবো। আহাম্মক না হলে ওরা ওইভাবে অভদ্র স্লোগান দেয়? এর নামই হলো সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

মুক্তিপদ বললেন—তা আপনি ওদের এই কথাগুলো বোঝাতে পারেন না?

ঘোষাল বললে—কী বলছেন আপনি? আপনি কি ভাবছেন আমি এ-কথা ওদের বলিনি?

মিস্টার ভার্গব বললে—তাহলে আমাকে ওবা চব্বিশ ঘণ্টা কেন ঘেরাও করে রেখেছিল? পুলিশকে খবর দেওযা হয়েছিল, তবু কেন পুলিশ আসেনি—কে পুলিশকে আসতে বারণ করেছিল?

ঘোষাল বললে—তাই নাকি? পুলিশ আসেনি? আশ্চর্য তো! তাহলে দেশে কি গভর্নমেন্ট নেই? আমি তো আপনাদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনারা কোম্পানি লক-আউট করে দিন। হ্যাঁ, লক-আউট করে দিন। যেখানে ওয়ার্কাররা ওপরওয়ালার কথা শোনে না, সেখানে কারখানায় লক-আউট করে দিলে ব্যাটারা ঠিক জব্দ হয়ে যাবে। আমি বলছি আপনারা কাবখানা লক-আউক করে দিন। ব্যাটারা জব্দ হোক—

ততক্ষণ চা-কফি স্ন্যাকস্ এসে গিয়েছিল।

ঘোষাল বললে—আবার এ-সব করতে গেলেন কেন?

যশোবন্ত ভার্গব বললে—এ সামান্য জিনিস—একটুখানি নিন—

ঘোষাল বললে—এর আগে তিনবার চা হযে গেছে, আমি এবার উঠবো। আরো কয়েক জায়গা আমাকে যেতে হবে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে ওদের বোনাসের কী হবে?

ঘোষাল বলে উঠলো—ওই লাস্ট-ইয়ারে যে-বোনাস দিয়েছেন এ-বছরেও তাই-ই দেবেন, এ কি মামার বাড়ির আবদার পেয়েছে নাকি যে যা চাইবে তাই-ই দিতে হবে। কিছুতেই বেশি দেবেন না--কিছুতেই না—এই আমি বলে রাখলুম—

বলে বরদা ঘোষাল তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল। নিচেয় তার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। বরদা ঘোষাল গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। ঘোষাল বললে—চলো কলকাতা—

বরদা ঘোষালের চা-কফি-স্ন্যাকস্ সব পড়ে ছিল। একটা দানাও সে মুখে দেয়নি। ওয়ার্কস্ ম্যানেজাব, ওয়েলফেয়ার অফিসার, চীফ্ অ্যাকাউটেন্ট, সবাই মুক্তিপদর মুখের দিকে চাইলে। কারোব মুখে কোনও কথা নেই।

হঠাৎ বাইরে থেকে আবার কোরাস্ শুরু হলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মুক্তিপদ মুখার্জী—মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

ওদিকে বরদা ঘোষালের গাড়িটা তখন বেলুড় ছেড়ে হু-হু বেগে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে। অনেক কাজ বরদা ঘোষালের। সাবা দেশের বঞ্চিত-শোষিত মানুষের ত্রাণকর্তা বরদা ঘোষাল। এতগুলো মানুষের ভালো-মন্দের দায়িত্ব যার মাথায় তার বিশ্রাম করা চলে না। দুঃখী লোকদের কথা ভেবে ভেবে তার কোনও রাতেই ঘুম আসে না। কিন্তু উপায় নেই। নিজের ভালো-মন্দের চেয়ে দুঃখী মানুষদের ভালো-মন্দের কথাই তাকে আগে ভাবতে হবে।

বরদা ঘোষালের গাড়ির পেট্রল খরচা দৈনিক পনেরো থেকে কুড়ি লিটার। তা হোক, টাকার কথা ভাবলে চলবে না। সকলের আগে মানুষ। মানুষ বাঁচলে তবে সমাজ বাঁচবে, সমাজ বাঁচলে তবে দেশ বাঁচবে। দেশ বাঁচলে তবে পৃথিবী বাঁচবে। তাই এই পৃথিবীর মানুষের দায়িত্ব নিয়েছে বরদা ঘোষাল। এই পেট্রল খরচের কথা ভাবলে বরদা ঘোষালের চলবে না। চলো, যতদূর ইচ্ছে চলো, তার গাড়ির পেট্রল যোগাবে মানুষ।

গাড়িটা গিয়ে যে-বাড়ির সামনে পৌঁছুলো তার সামনে দু'জন পুলিশ তখন পাহারা দিচ্ছে। রোজই যে একই পুলিশ পাহারা দেয়, তা নয়। তাদের ডিউটি বদলায়। একজোড়া পুলিশের বদলে আবার অন্য জোড়া পুলিশ ডিউটি দিতে আসে। তাতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তাই বরদা ঘোষালের গাড়ি যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো তারা চ্যালেঞ্জ করলে না। তাকে স্যালিউড্ দিয়ে অভ্যর্থনা করলে।

ভেতরের ঘরে যেতেই আর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে চিনতে পারা যায়নি। তারপর বললে আরে গোপালবাবু না?

গোপাল হাজরাও দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে।

—আরে আপনি? স্যার কোথায়?

গোপাল বললে --চলুন চলুন, ঠিক সময়েই এসে গেছেন। স্যার একলা আছেন—

এ-বাড়িটার দুটো মহল আছে। স্যার থাকেন বাইরের মহলে. ভেতরের মহলে তাঁর ফ্যামিলি, সামনের মহলে স্যার তখন একটা টেবিলের সামনে বসে টেলিফোনে কথা বলছিলেন।

বরদা ঘোষাল আর গোপাল হাজরা দু'জনে গিয়ে সামনের দুটো খালি চেয়ারে বসে পড়লো।

স্যার তখনও কথা বলে চলেছেন—না না. ও-সব হিসেবের ব্যাপার আমি শুনতে চাই না। টাকা দিলে কিনা তাই বলো—

তারপর একটু পরে বললে—এই যে বরদা এখন আমার সামনে বসে আছে, ওর সঙ্গে কথা বলো—

বলে রিসিভারটা বরদা ঘোষালের দিকে এগিয়ে দিলেন।

বরদা ঘোষাল বললে—হ্যাঁ, কী হলো? আমি তো আগেই বলেছিলুম, টাকা যদি দেয় তবে কথা বলতে পারি, টাকা দেবার নাম করে আগে থেকে কথা আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা, এটা ভালো নয়। আমি আগে টাকা চাই, তারপর কথা-

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—কী বললে? ওই কথা বলছে? তাহলে বলে দিও 'স্যাক্সবী'-র যে-অবস্থা করেছি, ওদেরও সেই অবস্থা করে ছেড়ে দেব। আমাদের সে-রকম পাওনি। এ হচ্ছে ওয়েস্ট-বেঙ্গল, এ বিহার নয়, এ কর্ণাটক নয়। এখানে আমরা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় দল-বদল করি না। এখানে চালাকি করলে আমরা হরতাল ডেকে ছাড়বো। কী বললে? হরতাল ডাকলে গরিব লোকদের কষ্ট? হোক কষ্ট। গরিব লোকদের কবে কষ্ট হয়নি? কবে কষ্ট ছিল না? সেই হিন্দু আমলেও কষ্ট ছিল। মোগল আমলেও কষ্ট ছিল, ইংরেজ আমলেও কষ্ট ছিল। ওদের কষ্ট চিরকাল ছিল, চিরকালই থাকবে, তা বলে আগে পার্টির কথা ভাববো, না আগে গরিব লোকদের কথা ভাববো? রাখো তোমার সব বাজে কথা। ও-সব কথা আমার শোনবার সময় নেই এখন। আমি ছাড়ছি—

বলে বরদা ঘোষাল ঝপ করে রিসিভারটা রেখে দিল। তার মনের-সব রাগটা ঘোষাল যেন টেলিফোনের ওপরেই ঝেড়ে ফেলে দিলে।

শ্রীপতি মিশ্র এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন—কী হলো?

ঘোষাল বললে—দেখুন না, বলছে কিনা হরতাল ডাকলে ফেরিওয়ালা রিকশাওয়ালাদের কষ্ট হবে। দেখুন তো কী সব ইডিয়টদের মত কথা বলে?

শ্রীপতি মিশ্র বললেন--টাকার কথার ব্যাপারে কী বললে?

---বললে টাকা নেই।

—টাকা নেই? বললে ওই কথা? বলতে জিভটা একটু কাঁপলোও না। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের ইউনিয়ানের হেলপ্ নিতে হবে। স্ট্রাইক না করালে দেখছি ওদের শিক্ষা হবে না—

ঘোষাল বললে—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন স্যার --

—আর মুখার্জীরা কী বললে?

বরদা ঘোষাল বললে—মুক্তিপদ মুখার্জীরও ওই একই কথা। বললে আমরা ফ্যাক্টরি হায়দ্রাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাবো। তবু বোনাস বাড়াবো না।

শ্রীপতি মিশ্র বললেন—ওরা কি ভেবেছে আমাদের পার্টি মরে গেছে।

বরদা ঘোষাল বললে---আমিও তাই ওদের বলে এলুম। বলে এলুম আমাদের পার্টি কি মরে গেছে? আমাদের হাতে গভর্নমেন্ট, আমরা যা ইচ্ছে তাই করবো। তাতে দিল্লীর কিছু বলবার নেই—

শ্রীপতি মিশ্র বললেন—ঠিক করেছ। আমিও দেখে নেব ওরা কী করে আমাদের বুকে বসে আমাদেরই দাড়ি ওপড়ায়। গোপাল—

গোপাল বললে—বলুন স্যার—

—তোমার মনে আছে তো, মুক্তিপদ সেদিন আমাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করলে। আমরা যেন ভিখিরি। পার্টি ফাণ্ডের চাঁদার জন্যে গিয়েছি, আমি নিজে সশরীরে গিয়েছি, তবু আমাকে মাত্র এক লাখ টাকা দিলে—। স্কাউণ্ড্রেলটার একবার লজ্জাও করলো না—তা ঠিক আছে। গোপাল, তোমাকে যা বলেছি তাই আরম্ভ করে দাও। তোমার বন্ধু বলে যেন আবার চক্ষুলজ্জা কোর না—

গোপাল বললে—কি বলছেন স্যার, আমি করবো চক্ষুলজ্জা?

শ্রীপতিবাবু বললেন—না, আমাদের কাছে আগে আমাদের পার্টি, তারপর বন্ধুত্ব! শেষকালে যেন বন্ধুত্বের জন্যে পার্টির কাজে হেলা-ফেলা না হয়। তুমি তো শুনছি আবার মুক্তিপদর ভাইপো'র সঙ্গে খুব ঘোরাফেরা করো। সেদিন যেন তাকে নিয়ে তুমি রাসেল স্ট্রীট না কোন্ স্ট্রীটে কাদের বাড়িতে গিয়েছিলে?

গোপাল লজ্জায় পড়লো। বললে—না না, সে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীট। সেখানে মুক্তিপদ মুখার্জীর ভাইপো সৌম্যপদর সঙ্গে সে-বাড়ির একটা মেয়ের বিয়ে হবে, সে সেই মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছিল, তাই...

—ওসব কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হবে না গোপাল। কে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে?

বরদা ঘোষাল এবার উঠলো। বললে—আমি উঠি স্যার আমাকে আবার আর একটা ক্লায়েন্টের বাড়ি যেতে হবে—

গোপাল বললে—আমিও তাহলে উঠি স্যার—

ওদিকে শ্রীপতিবাবুর টেলিফোনের ঘণ্টা আবার বেজে উঠলো। শ্রীপতিবাবু রিসিভারটা তুলে বললেন—হ্যালো—

বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে তখন আর একটা লোক গাড়ি নিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। গেটের দরোয়ান দেখতে পেয়ে সেলাম ঠুকলো সাহেবকে।

দারোয়ানের ছেলেটা বাপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—ও কৌন হ্যায় বাবুজী?

দারোয়ান বললে—ও চ্যাটার্জী সাহাবকা ডেপুটি—অর্জুনবাবু—

হ্যাঁ, অর্জুন সরকারের ওই-ই পরিচয়। সে ওয়ার্কাস ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জীর ডেপুটি। ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার। সে শুধু কান্তি চ্যাটার্জীর ডেপুটিই নয়, মুক্তিপদ মুখার্জীর একজন বিশ্বস্ত সংবাদ-সংগ্রহকারীও বটে। কারখানার কে কোথায় কী করছে, কে কী বলছে, কে কোন্ পার্টির লোক, সব খবর অর্জুন সরকারের নখদর্পণে। বরদা ঘোষাল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও পেছন পেছন গাড়ি নিয়ে দূর থেকে তাকে অনুসরণ করেছিল।

মুক্তিপদ এতক্ষণ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। অর্জুন সরকার এসেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের ঘরে ঢুকলো।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? গিয়েছিলে?

অর্জুন সরকার বললে—হ্যাঁ স্যার—

—তারপর?

—এখান থেকে বেরিয়ে বরদা ঘোষাল সোজা শ্রীপতি মিশ্রের বাড়িতে গেলেন। এক ঘণ্টা সেই বাড়িতে থেকে তারপর বেরিয়ে এলেন গোপাল হাজরাকে নিয়ে।

মুক্তিপদ বললেন—বুঝতে পেরেছি! ওই শ্রীপতি মিশ্রই ঘোষালকে এখানে পাঠিয়ে ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যাও, পরে তোমাকে খবর দেব। ইতিমধ্যে যদি কোনও খবর পাও তো আমাকে জানিও—

অর্জুন চলে গেল। মুক্তিপদ মনে মনে ভাবতে লাগলেন। তাঁর প্ল্যানমত যদি কাজ হতো তা হলে এ-সব কোনও গণ্ডগোলই হতো না। সেই চ্যাটার্জীরা মিডল ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার

কাজের কনট্রাক্ট পেয়েছিল, তাদের মেয়েটাও এম এ পাস করেছিল। তার সঙ্গে সৌম্যের বিয়ে দিলে টাকার দিক থেকেও লাভ হতো, আবার লেবার ট্রাবলটাও থাকতো না। তাদের ছেলেটা একজন ট্রেড ইউনিয়ন লীডার বলে সেদিক থেকেও মুক্তিপদ মুক্তি পেত। কিন্তু মার যেমন কাণ্ড। কোথা থেকে একটা বিরবার বাপ মরা মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলেছে—

বেলুড় থেকে আর মুক্তিপদ নিজের বাড়ি গেলেন না।

বললেন —একবার বিডন স্ট্রীটে চল রে—

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে মা তখন সবে সিংহবাহিনীর সন্ধ্যা বাতি সেরে ওপরে উঠছেন, হঠাৎ মুক্তিপদ এসে হাজির। ঠাকমা মণি অবাক দেখে

বললেন— কীরে, তুই? কী করতে?

—তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলুম।

—কী ব্যাপার?

মুক্তিপদ বললেন —সৌম্যর বিয়ের ব্যাপারে।

ঠাকমা মণি বললেন – সৌম্যর বিয়ে মানে?

মুক্তিপদ বললেন— তুমি যদি আমার চেনা পার্টির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যের বিয়ে দাও তাহলে আমাদের কোম্পানির খুব সুবিধে হবে—

ঠাকমা-মণি বললেন—সে তো তুই আমাকে বলেছিস, আজ আবার সে-কথা পাড়ছিস কেন?

পাড়ছি এই জন্যে যে আমাদের কোম্পানিতে আবার নতুন করে গোলমাল শুরু হয়েছে—

—কীসের গোলমাল?

মুক্তিপদ বললেন—আবার কীসের? বোনাস নিয়ে গোলমাল। আজকে লেবার লীডার ঘোষাল আবার এসেছিল, মুখে আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেল, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে মিনিস্টারদের সঙ্গে স্ট্রাইক করবার মতলব আঁটছে। তাদের জ্বালায় আমি একেবারে নাজেহাল হয়ে গেলাম। আমি বোধহয় আর বাঁচবো না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—এ-সব তো চিরকাল ছিল, চিরকালই থাকবে। তোর বাবার আমলেও ছিল। তা বলে বাঁচবি না কেন? কারবার করতে গেলে এ সব ঝামেলা তো থাকবেই, তা বলে শরীর খারাপ করতে যাবি কেন? এ নিয়ে শরীর খারাপ করলে তো লেবারদেরই সুবিধে।

মুক্তিপদ বললেন—তোমার সঙ্গে এ সব আলোচনা করতে চাই না। তুমি ঠিক বুঝবে না। সেকালের সঙ্গে এ কালের কোনও তুলনা কোর না। এখন আমি সৌম্যের বিয়ের কথা বলতেই এসেছি—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—সৌম্যর বিয়ের কথা আবার নতুন করে কী বলবি? সে-কথা তো আগেই পাকা হয়ে গেছে।

মুক্তিপদ বললেন—তুমি কি তাদের একেবারে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছ?

ঠাক্‌মা মণি বললেন- তার মানে? তুই তো জানিস নাত বউ করবো বলে আমি তাদের তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে রেখে তাদের মা মেয়েকে আমি পুষছি। তাদের জন্যে আমি মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা খরচ করছি, এখন কি তা বদলানো যায়?

মুক্তিপদ বললেন না, তা বলছি না, কিন্তু বলছি এদের এখানে বিয়ে না দিয়ে আমার পার্টির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যের বিয়ে দিলে আমারও উপকার হতো তোমারও উপকার হতো—

—তা আমার কী উপকার হতো শুনি?

মুক্তিপদ বললেন —তোমাকে তো আগেই আমি সব বলেছি মা। আমার ভালো আর তোমার ভালো কি আলাদা? আমার ভালো হওয়া মানেই তো তোমার ভালো হওয়া। তার তোমার ভালো

হওয়া মানেই তো আমার ভালো হওয়া। তাতে আমাদের কোম্পানির আরো বেশি প্রফিট হতো, আর আমাদের এখন যে লেবার-ট্রাবল চলছে তাও চলতো না—

ঠাকমা-মণি বললেন—দ্যাখ্ মুক্তি, আমি বরাবার এক-কথার লোক। একবার আমি যা বলি তার আর নড-চড় করি না। তুই বলছিস্ তাই আমি শুনছি। কিন্তু এটা জেনে রাখ, আমি আমার মত আর পাল্টাবো না—আমি সে-রকম বাপের মেয়ে নই—

মুক্তিপদ এ-কথা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর উঠলেন।

বললেন--তাহলে উঠি—

হঠাৎ বিন্দু দরজার বাইরে থেকে জানালো -ঠাক্মা-মণি, খোকাবাবু বাড়ি এসেছেন--

—ওই খোকা এসেছে--

বলে বিন্দুকে ডেকে দিতে বললেন সৌম্যকে। মুক্তিপদ খবরটা শুনে আবার বসে পড়লেন।

সৌম্য আসতেই বললেন—কী হলো, আজকে তুমি অফিসে যাওনি কেন?

সৌম্য বললেন— কেন আমি তো গিয়েছিলুম। তুমিই তো ছিলে না।

—হ্যাঁ, অবশ্য আজকে আমি সমস্ত দিনই ফ্যাক্টরিতে ছিলুম। কিন্তু হেড-অফিসে আমি একবার টেলিফোনও করেছিলুম, কিন্তু তুমি যে অফিসে গিয়েছ তা তো আমাকে কেউ বলেনি—

সৌম্য বললে--আমি অফিস থেকে অন্য একটা কাজে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—আজকে ফ্যাক্টরিতে খুব হাঙ্গামা করেছে আমার লেবাররা। সেই বরদা ঘোষাল এসেছিল, তাকেও সব বুঝিয়ে বললুম। কালকে ফ্যাক্টরিতে গেলে তুমি সব জানতে পারবে।

তারপর প্রসঙ্গ বদলে মা'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তাহলে সৌম্যর লন্ডন যাওযার কী ঠিক করলে?

ঠাক্মা-মণি বললেন—আমার গুরুদেবের চিঠি এলেই আমি সব ঠিক করবো। আর তোকে তো আমি বলেই রেখেছি সৌম্যর বিয়ে না দিয়ে ওকে বিলেতে পাঠাবো না—

কথাটা শুনে মুক্তিপদ যেন একটু নিরাশ হলেন! উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাক্, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে, ও ব্যাপারে আমার আর কিছু বলবার নেই—

তারপর যাওয়ার সময় সৌম্যর দিকে চেয়ে বললেন—কাল ফ্যাক্টরিতে যেও একবার—

বলে আর দাঁড়ালেন না মুক্তিপদ।

একেবারে তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে একতলায় পৌঁছুলেন। তারপর একতলার বাঁদিকে সিংহবাহিনীর মন্দির। বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা ধরে সোজা নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা মুক্তিপদ মুখার্জীকে নিয়ে সোজা বেলুড়ের দিকে চললো।

বিড়ন স্ট্রীটের বাড়িতে যখন এই দৃশ্য তখন রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে আর এক দৃশ্যের অবতারণা চলছে। যোগমায়া সারাদিন খায়নি। আর যোগমায়া যখন সারাদিন উপোস করে আছে তখন শৈলই বা খায় কী করে?

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে যোগমায়া তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

সন্দীপ ঘরে ঢুকে বললে—বিশাখা এসেছে?

—না বাবা, এখনও তো আসেনি।

সন্দীপ বললে--ও-বাড়িতে খুব হৈ হৈ হচ্ছে দেখে এলুম আবার। মুক্তিপদবাবু এসেছিলেন আজ ঠাক্মা-মণির কাছে। ওদের ফ্যাক্টরিতে আজ খুব গোলমাল হয়েছে। তারপরে সৌম্যবাবু এসে হাজির হলেন---

—তা ও বাড়িতে তোমার সৌম্যবাবু ফিরে এল, তাহলে আমার বিশাখা ফিরলো না কেন এখনও? দু'জনে তো একসঙ্গেই বেরিয়েছিল। একজন যখন ফিরলো তখন আর একজন কোথায় গেল? বিশাখাও তো এখন বাড়ি ফিরবে--। কী জানি বাবা কী হবে! আমার বড় ভয় করছে—

সন্দীপও ভাবনায় পড়লো। কলেজ থেকে ফিরে যখন সে বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরেছিল তখনই মল্লিককাকা বলেছিল—আজ মেজবাবু এ-বাড়িতে এসেছেন—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

—ওঁদের কারখানায় হামলা শুরু হয়েছে।

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে কী হবে?

মল্লিককাকা বলেছিলেন—কী আর হবে? কিছুই হবে না। প্রত্যেক বছরেই এই রকম একটা-না-একটা ব্যাপার নিয়ে হামলা হয়। কিন্তু শুনছিলুম মেজবাবুর শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না।

তারপর সন্দীপ যখন খবর পেলে যে ছোটবাবু বাড়ি এসেছে তখন দৌড়ে এসেছে রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে। এসে যখন শুনলো বিশাখা তখনও আসেনি তখন কী করবে বুঝতে পারলে না।

বললে—তাহলে থানায় একটা খবব দিয়ে আসবো মাসিমা?

এ-কথার উত্তরে যোগমায়া কী বলবে? এমন বিপদে তো যোগমায়া আগে কখনও পড়েনি। কলকাতা শহরের হালচাল তো যোগমায়া কখনও দেখেনি।

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না। বললে—যাই, আমি একবার থানাতেই যাই। পুলিশকে একবার খবরটা জানিয়ে আসা ভালো। খবরটা জানিয়েই এখুনি আসছি—

বলে সন্দীপ বেরিয়ে গেল। থানাটা পার্ক স্ট্রীটের ওপব। আগে কোনও থানাতেই সন্দীপ ঢোকেনি। থানার ভেতর একজন কন্‌স্টেবলকে দেখতে পেয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—থানার বড়বাবু আছে?

কন্‌স্টেবলটা বললে—বড়বাবু বেরিয়ে গেছেন। আপনার কী চাই?

সন্দীপ বললে—একটা মেয়ে রাসেল স্ট্রীট থেকে হারিয়ে গেছে সেইজন্যে ডায়েরী করবো—

—তাহলে ওই দিকের ঘরে যান, ওখানে এস-আই বাবু আছেন—

সন্দীপ তার নির্দেশমত সেই ঘবেই গেল। যেতেই একজন উর্দিপরা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কী চাই?

সন্দীপ বললে—একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে তাই ডায়েরী কববো—

ভদ্রলোক একটা খাতা বের করলেন। খাতার পাতাটা খুলে জিজ্ঞেস কবলেন—বলুন কী নাম মেয়েটার?

—বিশাখা গাঙ্গুলী।

—বয়েস কত?

বয়েস, কোন্ স্কুলে পড়ে, বাড়ির ঠিকানা, সব কিছু লেখার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন— কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

সন্দীপ বললে—না—

—পাড়ার কোনও ছেলেদের সঙ্গে তার ভাব-টাব ছিল?

সন্দীপ আবার বললে—না—তবে একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল—

—সে কে? তার ঠিকানা কী?

সন্দীপ বললে—তার নাম সৌম্যপদ মুখার্জী, ঠিকানা বারো-বাই-এ বিড্‌ন স্ট্রীট। আজকেও বিশাখা সকালে ইস্কুলে গিয়েছিল। ড্রাইভার রোজ তাকে গাড়িতে করে ইস্কুলে পৌঁছিয়ে দিত, তারপর আবার ইস্কুলের ছুটির পর তাকে গাড়িতে করে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতো—কিন্তু আজ ড্রাইভার খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো। সে বললে যে বিশাখা তার গাড়িতে আসেনি, সৌম্যপদবাবু নাকি বিশাখাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন।

ভদ্রলোক বললেন—যার সঙ্গে বিয়ে হবে সেই-ই তো বিশাখাকে নিয়ে চলে গেছে। তাহলে আর আপনাদের ভাববার কী আছে?

সন্দীপ বললে—এখনও তো বিয়ে হয়নি তাদের। এখন কি তাদের মেলামেশা ভালো? তা ছাড়া যদি কোনও বিপদ ঘটে যায়?

—কী বিপদ?

সন্দীপ বললে—বলা তো যায় না, ছেলে-মেয়েও তো হয়ে যেতে পারে। তখন কি আর সৌম্যপদবাবু তাকে বিয়ে করবেন?

থানার সাব্-ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক বললেন—আজকাল তো আকছার এ-সব ঘটনা ঘটছে। এ-সব ব্যাপারে থানায় ডায়েরী করতে এসেছেন কেন?

সন্দীপ বললে—কেন ডায়েরী করতে এসেছি তা তো আপনাকে বললুম। শেষকালে যদি সৌম্যপদবাবু বিশাখাকে বিয়ে না করে? তখন তো মেয়েটা ভেসে যাবে—

সাব্-ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক বললেন—এ রকম কত মেয়েই তো ভেসে গেছে। তা নিয়ে আজকাল কি আর কেউ ভাবনা করে?

তারপর বললে—তা ঠিক আছে। আপনি এখানে একটা সই করে দিন—

কিন্তু তার পরই কি মনে করে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনি কে? মানে মেয়েটির কে হন?

সন্দীপ বললে—আমি কেউ না—

—কেউ না মানে?

সন্দীপ বললে—কেউ না মানে মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—

সাব্ ইনস্পেক্টার ভদ্রলোক আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—সে কী মশাই, মেয়েটি যদি আপনার কেউ না হবে তাহলে আপনি কেন এখানে ডায়েরী করতে এসেছেন? আপনি কি তাহলে মেয়েটির পাড়ার লোক?

সন্দীপ বললে—না। মেয়েটির বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ না থাকাতে আমাকেই থানায় আসতে হয়েছে—

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আপনি কোথায় থাকেন?

সন্দীপ বললে—আমি থাকি বারো-বাই-এ বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িতে, ওই যেখানে সৌম্যপদ মুখার্জী থাকেন।

—তাহলে আপনি যার নামে কম্‌প্লেন করছেন তাদেরই বাড়িতে আপনি থাকেন?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আমি ও বাড়িতে থাকি খাই আর এই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বিশাখা আর তার মা'র দেখাশোনা করি। এই কাজটা করাই আমার চাকরি—বলতে গেলে আমি এই বাড়ির মা আর মেয়ের গার্জিয়ান।

সাব্-ইন্‌সপেক্টার ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে. আপনি এখানে এই ডায়েরীর পাতায় একটা সই করে দিন—

ওদিকে যখন সন্দীপ পুলিশের থানায় গিয়ে কথা বলছে, তখন এদিকে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। যোগমায়া দৌড়ে গিয়ে বিশাখাকে দেখে আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—তুই?

বিশাখার মুখ চোখ তখন শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি হয়ে গেছে। দেখে মনে হলো যেন তার ওপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে, সে আর তখন ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। মার বুকের ওপরেই সে ঢলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া তাকে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরেছে। সেইভাবে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বিছানায় শুয়েই বিশাখা নিজের চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললে।

যোগমায়ার নাকে কী রকম যেন একটা উৎকট খারাপ গন্ধ এল।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—কীরে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ, বল্? বল্ কোথায় ছিলি?

বিশাখা কিছু জবাব দিলে না, যেমন চোখ বুজে শুয়েছিল তেমনি শুয়েই রইল।

যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, কথা বলছিস না যে? বল্ কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি আর শৈল দুজনেই না খেয়ে উপোস করে আছি, আমাদের কথা এতক্ষণ তোর মনেই ছিল না? বল কোথায় গিয়েছিলি? আন্টি মেমসাহেব, জয়ন্তী দিদিমনি, ডাক্তারবাবু, সবাই এসে তোকে না পেয়ে ফিরে গেল। বল্, কে তোকে নিয়ে গিয়েছিল?

তবু বিশাখার মুখে কোন কথা নেই।

যোগমায়া মেয়েকে ঠেলে ঠেলে বিরক্ত করতে লাগলো। বলতে লাগলো—কথার জবাব দিবি নে? দিবিনে কথার জবাব? মুখ দিয়ে কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে, বল্? কীসের গন্ধ?

এতক্ষণে বিশাখার মুখে একটু কথা বেরোল। বললে—মদের—

—মদের? মদের গন্ধ? তুই মদ খেয়েছিস?

বিশাখা আবার চুপ হয়ে গেল। যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—মুখপুড়ী, তুই আমার পেটের মেয়ে হয়ে আমার এমনি করে মুখ পোড়ালি? বল্, কেন মদ খেতে গেলি? কে তোকে মদ খেতে বললে? কে তোকে মদ খাওয়ালে বল্?

বিশাখা অস্ফুট স্বরে বললে—তোমার জামাই—

—আমার জামাই? আমার জামাই তোকে মদ খাওয়ালে আর তুই সেই মদ খেলি? তোর লজ্জা করলো না মদ খেতে?

বিশাখা নিজেও তখন কেঁদে ফেলেছে। তার চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

যোগমায়া নিজের আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন মদ খেতে গেলি তুই? আমার জামাই তোকে জোর করে মদ খাওয়ালে?

—হ্যাঁ।

যোগমায়া বললে—আমার জামাই তোকে কোথায় নিয়ে গিয়ে মদ খাওয়ালে? দোকানে?

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতে বললে—না, হোটেলে।

যোগমায়া বললে—জামাই তোকে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল? হোটেলে গিয়ে কোথায় উঠলি তোরা?

বিশাখা তখনও কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে কোনও রকমে বললে—হোটেলের একটা ঘরে—

—সে কী? হোটেলের একটা ঘরে তোকে নিয়ে উঠলো? সে ঘরে আর কে ছিল? বল্, আর কে ছিল সে ঘরে? বল্, তোরা ছাড়া আর কে ছিল সে ঘরে?

বিশাখা বললে—আর কেউ ছিল না—

—আর কেউ ছিল না? তারপর?

বিশাখা চুপ। যোগমায়া আবার জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর কী করলি বল্?

বিশাখা এবারও কোনও উত্তর দিলে না।

যোগমায়া এবার মেয়ের খোঁপাটা ধরে নাড়া দিতে লাগলো। বললে—বলবি নে মুখপুড়ী, জবাব দিবি নে? তাহলে দ্যাখ্ আমি তোর কী করি।

বলে বাইরে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা বঁটি নিয়ে এল। বঁটি নিতে দেখে শৈলও কী একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের আঁচ পেয়ে পেছন-পেছন এসে বলতে লাগলো—ও কী করছো মা, ও কী করছো? মেয়েকে খুন করবে নাকি?

যোগমায়া বলে উঠলো—তুই নিজের কাজ করগে—

বলে ভেতর থেকে দরজার খিল বন্ধ করে দিল। শৈল তখন বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগলো—মা, ওকে মেরো না, ও ছোট মেয়ে, কী করতে কী করে ফেলেছে, ওকে মেরো না মা, দরজা খোল—

যোগমায়া তখন ভেতরে মেয়েকে নিয়ে পড়েছে। বাইরের শব্দ তখন আর যোগমায়ার কানে আসছে না, বলছে—বল হোটেলের ঘরে ঢুকে কী করলি তোরা? কী করলি বল?

বিশাখা মা'র হাতের বঁটিটা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে ভয়ে ভয়ে বললে—আমাকে মেরো না তুমি, আমাকে মেরো না—

– তাহলে শিগগির বল ঘরে ঢুকে তোরা কী করলি?

– আমরা খেলুম।

– কী খেলি?

বিশাখা বললে ভাত, মাংস মাছ

আর কী? আর কী খেলি?

বিশাখা বললে—কাটলেট

আর?

বিশাখা থমকে রইল। চুপ করে শুধু কাঁদতে লাগলো

বল আর কী খেলি?

বিশাখা বললে – আর কিছু না-

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে ঘরে খাট ছিল?

হ্যা --

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে— খাটে শুয়েছিলি?

বিশাখা অনেকক্ষণ পরে বললে—হ্যাঁ—

- মদ কখন খেলি?

বিশাখা বললে--তখন--

- শুয়ে শুয়ে খেলি, না মদ খাবার পর শুলি?

বিশাখা বললে—শোবার আগে -

—তারপর?

বিশাখা উত্তর দিচ্ছে না দেখে যোগমায়া আবার ধমক দিয়ে উঠলো— বল মুখপুড়ী, তারপর কী হলো? বল্ —

কিছুতেই আর বিশাখার মুখ থেকে কোনও জবাব বেরোল না।

-কই, কিছু জবাব দিচ্ছিস না যে? এবার জবাব না দিলে এই বঁটি দিয়ে তোকে দু'খানা করে ফেলবো। বল, তারপর কী হলো?

বিশাখা বঁটি দেখে ভয় পেয়ে বললে আমাকে মেরো না মা, মেরো না মা আমাকে—

যোগমায়া বললে— তাহলে বল তারপর কী হলো—জামাই তোকে কী করলে, বল—

বিশাখা বিছানায় মুখ লুকিয়ে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারলে না।

—বল, জামাই কী করলে?

- আমাকে চুমু খেল -

—তারপর?

ওদিকে দরজায় তখন হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হতেই শৈল দরজা খুলে দেখে সন্দীপবাবু এসেছে।

সন্দীপ ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে—বিশাখা বাড়ি এসেছে?

শৈল বললে—হ্যাঁ, ওই ঘরে —

--আর মাসিমা? মাসিমা কোথায়?

—মাসিমাও ওই ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

সন্দীপ মাসিমার শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। শৈলকে জিজ্ঞেস করলে—মাসিমা ঘরের খিল বন্ধ করে দিয়ে কী করছে?

শৈল বললে— বিশাখাকে মারছে—

সন্দীপ বললে—কেন, বিশাখাকে মারছে কেন মাসিমা? বিশাখা কী করেছে? বিশাখা সমস্ত দিন কোথায় ছিল?

তারপর বাইরে থেকেই জোরে জোরে ডাকতে লাগলো---মাসিমা মাসিমা, আমি সন্দীপ, আমি খানার দিয়ে ডায়েরী করে দিয়ে এসেছি। দরজা খুলুন। মাসিমা—
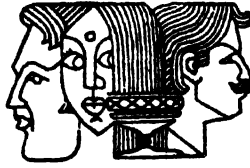
কিন্তু তখনও কি সন্দীপ জানতো যে দৈনন্দিন বাস্তব অঙ্কের সঙ্গে জীবনের অঙ্কের এত গরমিল? দুই আর দুই মিলে যে চার হয় এটা যেমন সত্য তেমনি দুই আর দুই মিলে যে পাঁচও হয় সেটাও কি তেমনি সমান সত্য নয়?

খবরের কাগজে যে-খবর ছাপা হয়ে বেরোয় সেটা মিথ্যে নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সত্য। কিন্তু সেই খবরটাই আবার ইতিহাসের পাতা থেকে নিয়ে যখন চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল অব্ টু সিটিজ' নামে উপন্যাস লেখেন তখন তা হয়ে ওঠে আরো বড় সত্য। ফরাসী বিদ্রোহ একটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু সেই একই ফরাসী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'এ টেল অব টু সিটিজ্' আরো আরো গভীর, আরো নিবিড় সত্য হয়ে ওঠে।

এতদিন পরে সন্দীপের মনে হয় জীবন যেমন সত্য তেমনি সত্য মৃত্যুও। তবু মৃত্যু সত্য জেনেও জীবনের ওপর মানুষের কেন অত মায়া? সৌম্যবাবু কি জানতেন না যে জীবন নিয়ে তিনি অত ছিনিমিনি খেললেন তা জীবন নয়, জীবনের মাত্র একটা ভগ্নাংশ? সে অনেকটা গানের মতন। গান যখন শুরু হয় তখনই বোঝা যায় না গানের স্বরূপটা কী। তার একটা অংশ যখন সম্পূর্ণ হয়ে ফিরে আসে তখনই বোঝা যায় রাগিণীটা কী এবং সেই গানের অন্তরাটা কোন দিকে গতি নেবে আর তার পরিণতিটাই বা কেমন হবে।

সৌম্যবাবুর জীবনটাও কি সেই রকম নয়?

গোপাল হাজরা সেই বহুদিন আগে তাকে চৌরঙ্গীর নাইট ক্লাবে না নিয়ে গেলে কী সন্দীপই সৌম্যবাবুর সঠিক চরিত্রটার আঁচ পেত?

কিন্তু তখন সন্দীপের মনে হয়েছিল ওটা কম বয়সের ধর্ম। বয়েসটা একটু বাড়লে ওটা হয়ত কমবে।

সন্দীপ সারাদিন নিজের মনেই নিয়ম করে কাজ করে যেত। সে যেমন নিয়ম করে সব কাজ করে যেত তেমনি চাইতো সবাই ই সব কাজ সেই রকম নিয়ম করে করুক। ছোটবেলা থেকেই মা তাকে তাই ই করতে বলতো। সন্দীপের মা ই ছিল তার আদর্শ। মা যে তাকে সেই সব কথা মুখে মুখেই শেখাতো তা ই নয়, মা নিজেও তার সব কাজ নিয়ম করে করতো। কোথাও কিছু বেনিয়ম দেখলেই মা'র খারাপ লাগতো।

কলকাতায় এসে সন্দীপ দেখলে এখানে সবাই বেনিয়ম করে। কলকাতায় যেন সকলের বেনিয়ম করাটাই নিয়ম। কলেজে যারা পড়তো তারাও কেউ নিয়ম করে কলেজে আসতো না। ছেলেরাও তাই। এটা ভালো লাগতো না সন্দীপের।

মা বলতো---লোকে যা করে করুক তুমি একমনে নিজের কাজ নিয়ম করে, করে যেও বাবা, পরের কথা শুনো না—

মা'র কথা মনে পড়লেই সন্দীপের তার কোনও হুঁশ থাকতো না। মার চিঠি আসতে দেরি হলে কেমন মনটা ছটফট করতো। মাকে লিখতো মা তুমি এত দেরি করে চিঠির উত্তর দাও কেন? তোমার চিঠি না পেলে রাত্রে আমার ঘুম আসে না। রাত্রে কলেজের বই পড়তে পড়তে কেবল তোমার মুখখানা মনে পড়ে। এবার একটু তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও—

মা'ও তেমনি। ছেলের চিঠি এলেই মা সেটা নিয়ে ছুটতো চাটুজ্জে-বাড়িব বউ-এর কাছে। বলতো—সন্দীপের চিঠিটা একটু পড়ে দাও না দিদি—

তারপর চেনাশোনা যার সঙ্গেই দেখা হতো তাকেই মা বলতো—জানো বাবা, আমার খোকা বি. এ পাশ করেছে—

সন্দীপ বি এ. পাশ করলো কি করলো না তা নিয়ে বেড়াপোতার কারোবই মাথা ঘামাবার দরকার হতো না। আর শুধু সন্দীপের পাশ করার ব্যাপারই না, পৃথিবীর কারো কোনও ব্যাপারেই মাথা ঘামাবার দবকার হতো না কারো। সবাই নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে তখন এত ব্যস্ত ছিল যে কে কী করছে, তা ভাববারও সময় বা ইচ্ছে হতো না কারো। তবু মা'র কী যে স্বভাব সকলকে ডেকে ডেকে মা সন্দীপের খবর জানিয়ে তৃপ্তি পেত।

একবার মা লিখেছিল—সন্দীপকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

সন্দীপ উত্তরে লিখেছিল—এখন আমি এখানে নানা ব্যাপারে খুব ব্যস্ত রয়েছি। আমি এখানে না থাকলে এ-বাড়ির খুব ক্ষতি হবে। তুমি আমাব কথা বেশি ভেবো না মা, আমি ভালো আছি। তুমি নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে। সামনেই আমার পরীক্ষা! দিনের বেলায় অনেক কাজ থাকায় পড়াশোনা করবার তেমন সময় পাই না, তাই রাত জেগে পড়াশোনা করতে হয়। একটু সময় পেলেই আমি বেড়াপোতায় গিয়ে তোমাকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বলবো। আমার সম্বন্ধে তুমি বেশি দুশ্চিন্তা কোর না। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে। বিনতঃ—সন্দীপ।

সত্যিই তখন সন্দীপ খুবই ব্যস্ত। কারণ তখন মল্লিকমশাই কলকাতায় নেই। তিনি গিয়েছেন কাশীতে গুরুদেবের কাছে। গুরুদেবের চিঠিব জন্যে ঠাক্‌মা-মণি অনেক দিন থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। শেষকালে অধৈর্য হয়ে মল্লিকমশাইকে বললেন—আপনি একবার নিজেই যান সেখানে। গিয়ে আমার সমস্যার কথা নিজের মুখেই সব বুঝিয়ে বলুন তাঁকে। নইলে তিনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না আমার কথা।

শেষ পর্যন্ত তা-ই ব্যবস্থা হলো। মল্লিকমশাই একদিন 'দুর্গা-দুর্গা' বলে কলকাতা ছেড়ে কাশী রওনা হলেন। আর তখন থেকেই সন্দীপের কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক কাজের নিয়মানুবর্তিতার প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। তার ওপর আছে হিসেব। বিরাট সংসারের প্রাত্যহিক আয়-ব্যয়ের হিসেব। আয়ের হিসেব লেখবার আলাদা নিয়ম, ব্যয়ের হিসেব লেখবার নিয়ম আলাদা। সে-সব লেখবার কায়দা আগে শিখিয়ে দিয়েছিলেন মল্লিককাকা। বলে গিয়েছিলেন—মেজবাবু যদি কোনও দিন অফিসে ডাকেন তো তুমি যাবে, বুঝলে?

কথাটা শুনে সন্দীপের ভয় লেগেছিল। মেজবাবুর সামনে সে কী করে দাঁড়াবে?

কিন্তু সেই যে কথায় আছে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়', তাই-ই হলো সন্দীপের বেলায়। সেই মেজবাবুই সেদিন ডেকে পাঠালেন মল্লিকমশাইকে।

ওপর-তলা থেকে ডেকে পাঠালেন ঠাক্‌মা-মণি। বললে—মেজবাবুর টেলিফোন এসেছিল অফিস থেকে, তোমাকে একবার যেতে হবে সেখানে—মেজবাবুর অপিসে—

—কখন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—এই এখুনি। মল্লিকমশাই তো নেই, তাই তোমারই ডাক পড়েছে। মেজবাবু যা দেবেন তুমি তা নিয়ে আসবে, এনে আমাকে দেবে—বুঝলে?

তখনও খাওয়া হয়নি সন্দীপের। না হোক, মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করার পর খেলেই চলবে—সন্দীপ সেদিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। তৈরি হয়ে নেওয়া মানে প্যান্ট-শার্ট পরে নেওয়া আর জুতো পরা। সঙ্গে একটা ব্যাগও নিয়ে নিলে। মল্লিককাকা যখনই বাইরে কোথাও যান, ওই ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে যান। ব্যাগের ভেতরে কিছু থাকুক আর না-থাকুক ব্যাগটা সঙ্গে থাকা চাই।

সকালবেলাই স্নান করা হয়ে যায় রোজ। বেরোবার মুখে মল্লিককাকার মত সেও দুর্গা-দুর্গা শব্দ উচ্চারণ করলে। কী জানি কী কথা হবে মেজবাবুর সঙ্গে। মুখোমুখি তো কখনও দেখা বা কথা হয়নি আগে। তাই ভয়ও হতে লাগলো।

রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে সেদিন যাওয়া হলো না। মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় গেলেও চলবে।

কিন্তু ঠিকানা খুঁজে ডালহৌসীতে 'স্যাক্সবি মুখার্জী' কোম্পানীর অফিসের সামনে গিয়ে সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। এত ভিড়, এত লোক! চারদিকে গিজ-গিজ করছে মানুষ। তাদের সকলের হাতে বড়-বড় পোস্টার। দূর থেকে পোস্টারের লেখাগুলো পড়ে দেখলে। তাতে লেখা রয়েছে—"স্যাকসবি মুখার্জী মুর্দাবাদ।" কোনওটাতে লেখা রয়েছে—"শ্রমিক মেরে মুনাফা লোটা চলবে না, চলবে না।" যে-সব কথাগুলো পোস্টারে লেখা রয়েছে সেই কথাগুলোই তারা চড়া গলায় স্লোগান দিয়ে হাওয়া গরম করছে। আর তাই দেখতে কলকাতার কর্মমুখর অঞ্চলে অনেক অকর্মা লোকের সমাগম হয়েছে। সেই অকর্মা লোকদের সমারোহ দেখতে ক্রমে ক্রমে আরো অনেক কর্মহীন লোক এসে সেখানে জুটছে। আশ্চর্য! সন্দীপ দেখে অবাক হয়ে গেল যে কলকাতায় এত লোক কর্মহীন! এত লোকের কাজ নেই এই কাজের শহরে?

সন্দীপ ভিড় এড়িয়ে একটু অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালো, অথচ তার তো এখান থেকে চলে গেলে চলে না, তাকে তো আজ মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

ততক্ষণে ভিড় বাড়তে বাড়তে সমস্ত অঞ্চলটা একেবারে অচল হয়ে দম বন্ধ হওয়া অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে উঠলো। চারিদিকে শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। যেন ইচ্ছে করলে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে সহজেই রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়া যায়। গাড়ি-চলাচল অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাসও নেই। মানুষ কী করে? তাহলে কি শহরে কাজের লোকের চেয়ে অকাজের লোকের সংখ্যা বেশি?

—ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ! ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ—

মানুষের ভিড়ের সঙ্গে কান ফাটানো চিৎকারের শব্দে পাড়াটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কেউ কোনও অফিসে ঢুকতে পারে না, আবার কেউ কোনও অফিস থেকে বেরোতেও পারে না। যারা ফুটপাথে নানারকম খাবার ফিরি করতে বসে তারাও ভয় পেয়ে দোকান-পাট-সওদা-পত্র নিয়ে সরে যেতে আরম্ভ করলো।

পাশের একজন দর্শককে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী চায় মশাই এরা?

লোকটা বললে—দেখছেন না, কোম্পানী ইউনিয়ন ঘেরাও করতে এসেছে। কোম্পানীর মালিককে—

—কোন্ কোম্পানী? স্যাক্সবি মুখার্জী কোম্পানী?

—হ্যাঁ।

—তা কাকে ঘেরাও করবে ওরা?

—কাকে আবার, কোম্পানীর মালিককে। মুক্তিপদ মুখার্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। তিনি তো ভেতরে আছেন। তাই তো ওদের অত ভিড় এখানে! এখানেই তো কোম্পানীর হেড-অফিস।

সন্দীপ বললে—কিন্তু এখানে তো আরো অফিস আছে, তারাও তো ঘেরাও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তাদের কেন কষ্ট দিচ্ছে এরা?

—নইলে তো হুঁশ হবে না কারো। তাহলে কেউ আর লেবারকে ঠকাতে সাহস পাবে না।

তাহলে সন্দীপ কী করবে? মেজবাবুর সঙ্গে দেখা না করে আবার বাড়ি ফিরে যাবে? তা হলে ঠাক্মা-মণি কী ভাববেন? সামান্য একটা কাজও কি হবে না সন্দীপকে দিয়ে? তাহলে তাকে রেখে কী লাভ? একটা মানুষের খেতে কি কম খরচ হয় আজকাল?

সন্দীপের মনে হলো সমস্ত কলকাতা যেন এসে জমেছে এই ডালহৌসী স্কোয়ারে। পাশের লোকটা কোথায় কখন অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ আর এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। এত লোকের ভিড়, এত রকমের বিশৃঙ্খলা, তবু একটা পুলিশ নেই কোথাও। পুলিশ থাকে না কেন?

হঠাৎ কোত্থেকে আর একদল ছেলে সেখানে দৌড়ে এসে হাজির হলো। তাদের মুখে মার-মার শব্দ। তারাও দলে কম ভারি নয়। দু'দলে মারামারি কাটাকাটি বেঁধে গেল। সন্দীপ কোন্ দিকে পালাবে বুঝতে পারলে না! তারই মধ্যে হঠাৎ একটা বোমা ফাটার শব্দ। শব্দটা হতেই ধোঁয়ায়-ধোঁয়া হয়ে গেল জায়গাটা। যারা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে মজাটা দেখছিল এবার তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালাতে আরম্ভ করলে।

কে একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বললে—পালিয়ে যান মশাই, পালিয়ে যান—

সন্দীপ কথাটা শুনে পালাতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলে—এরা কারা মশাই? কারা এরা?

দৌড়তে-দৌড়তে লোকটা বললে—এরা দু'নম্বর ইউনিয়ন—

—দু'নম্বর ইউনিয়ন মানে?

এর উত্তর দেবার মত নির্বোধ নয় লোকটা, যারা 'দু'নম্বর ইউনিয়নে'র মানে জানে না তারা কলকাতা শহরের আবর্জনা।

সত্যিই তখন সন্দীপ জানতো না 'দু'নম্বর ইউনিয়নে'র মানে। তা সে তো অনেক পরের কথা। তখন সন্দীপের পায়ের তলা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে তখন সে ব্যাঙ্কে চাকরি করছে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে। চাকরিতে উন্নতি করবার আগ্রহে সে তখন দিন আর রাতের পার্থক্য বোঝেনি। সেই ব্যাঙ্কের চাকরিতেও তখন দু'নম্বর ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল।

জীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় একটা চরম সত্য বুঝে নিয়েছিল। সেটা এই যে যারা সব দিক থেকে শুধু সত্যকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় মানুষের সমাজ তাদের নির্বোধ মনে করে। সন্দীপকেও তাই এতদিন ধরে সবাই নির্বোধই মনে করে এসেছে। কিন্তু নিজে সে তো জানে সে কী? নিজেকে ভালো করে জানতে হলে যে সংসারে নির্বোধ সেজে থাকার ভান করতে হয় এ-কথা সন্দীপ কাকে বোঝাবে, কে-ইবা তা বুঝবে? আর নিজেকে জানার চেয়ে বড় জানা সংসারে আর কী আছে? নিজেকে জানলে তবেই তো নিজের চেয়ে যে বড় তাকে জানা যায়।

কিন্তু এ-সব কথা এখন কেন বলছি? তার আগে সেদিনকার সেই দুর্যোগের ঘটনার কথা আগে বলাই ভালো। মনে আছে অনেক দূর থেকেও বোমা ফাটানোর বিকট শব্দগুলো কানে আসছিল। বোমার শব্দ নয় তো, যেন কামান, কামানের শব্দ। কামানের শব্দ কখনও শোনেনি সন্দীপ। কিন্তু লোক-মুখে কামানের শব্দের বিকটতা সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল সন্দীপের মনে।

দূরে ডালহৌসী পাড়ার কেন্দ্র থেকে তখন প্রচণ্ড ধোঁয়া উড়ছে। লোকজনের আলোচনা থেকেই বোঝা গেল পুলিশ এসে গোলমাল থামিয়ে দিয়েছে ওখানে। এখন সব নাকি শান্ত—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী করে শান্তি হলো? গুলি চালিয়েছে বুঝি পুলিশ?

লোকটা বললে—না, যে দুটো ইউনিয়ন এতক্ষণ গোলমাল করছিল, তাদের পুলিশ ঠাণ্ডা করে দিয়েছে—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এখন তাহলে ওদিকে যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব নরম্যাল—

সন্দীপ আস্তে আস্তে রাস্তায় পা বাড়ালে। কোথাও আর কোনও বোমার আওয়াজ নেই। দেখা গেল, আবার দু' একটা গাড়ি আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছে। প্রথমে যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়। একটু আগেই যে খানিক দূরে বোমা-গুলি চলেছে তা এখন আর বোঝা যায় না। সব স্বাভাবিক। আবার বড় রাস্তা দিয়ে বাস চলতে আরম্ভ করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার সে মেজবাবুর অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। আগেকার সেই মানুষের ভিড় আর নেই। সন্দীপ অফিসটার সামনে এসে সদর গেট পেরিয়ে একেবারে লিফটের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লিফ্‌টটা একতলায় নামলো। সেখানে তখন আরো অনেক লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের পেছন পেছন সন্দীপও ভেতরে গিয়ে উঠলো।

চারতলায় পৌঁছোবার আগেই সন্দীপ বলে উঠলো—আমি চারতলায় নামবো—

চারতলায় পৌঁছুতেই লিফট থেমে গেল। সন্দীপ লিফট থেকে নেমে বাইরে বেরোতেই সুশীলকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সুশীল লিফটের ভেতরে উঠতে যাচ্ছিল। সন্দীপকে দেখে সেও অবাক হয়ে গেছে।

বললে—আপনি এখানে?

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আপনি এখানে কি করতে?

সুশীল বললে—আমি একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি?

সন্দীপ তার নিজের কাজের কথা বললে।

সুশীল বললে—আপনি তাহলে স্যাকস্‌বি মুখার্জী কোম্পানীতে' একটা চাকরি যোগাড় করে নিলেই পাবেন। বিকেল বেলা ল' পড়বেন আর দুপুরবেলা এদের অফিসে চাকরি করবেন!

সন্দীপ বললে—এখানে চাকরি করলে আমি অন্য কাজগুলো কখন করবো? আমাকে রাসেল স্ট্রীটের একটা বাড়িতে যেতে হয়, সেখানেও আমার অনেক কাজ। সেই কাজের জন্যেই তো আমাকে ওরা রেখেছে—

—কী কাজ?

সন্দীপ সবই বললে। বিশাখার কথা বললে, সৌম্যবাবুর কথা বললে, যোগমায়া দেবীর কথা বললে। তারপর বললে—এই দেখুন না, এখানে যে এখন এসেছি, এও আমার একটা কাজ। মল্লিকমশাই কাশী চলে গেছেন, তাঁর সব কাজগুলো এখন আমাকেই করতে হচ্ছে। কাজ কি কম? কাজ না করলে কি ওরা আমাকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দিচ্ছে, থাকতে দিচ্ছে—

সন্দীপের সঙ্গে সুশীলের এতদিনের পরিচয়, কিন্তু এ-সব খবর জানতো না সে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আপনি?

সুশীল বললে—আমি এখানে এসেছিলুম চাকরির খোঁজে। চাকরি না করলে আমার আর চলছে না। আমাকে একজন কথা দিয়েছিল চাকরি পাইয়ে দেবে। তার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলুম। তার কথাতেই আমি তাদের পার্টিতে ঢুকেছিলুম, তা এখানে এসে হঠাৎ বোমা-মারামারিতে আট্‌কে গিয়েছিলুম। অথচ যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, তিনি আজ অফিসেই আসেননি। আমি তিন বছর ধরে পার্টির দাদাদের কাছে ঘোরাঘুরি করছি, কিন্তু কাজের কিছুই হচ্ছে না। কী যে করি বুঝতে পারছি না। আপনি বাবুদের বলে আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না, অত বড়লোকদের বাড়িতে রয়েছেন, আপনি একটু মুখ ফুটে বললেই হয়ে যায়—

সন্দীপ হাসলো। বললে—আপনি ঠিক লোককেই ধরেছেন দেখছি। আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার কথা। আপনি তো বললেন আপনি পার্টির মেম্বার হয়েছেন—

—হয়েছি তো। তিন বছর ধরে পার্টির অফিসে ব্যাগারও খাটছি, কিন্তু একটা পয়সাও পাই না।

—কী কাজ করতে হয় আপনাকে?

সুশীল বললে—রাস্তায় ঘাটে লোকের কাছে ভিক্ষে করে পার্টির জন্যে চাঁদা তুলি। সেই চাঁদা পার্টির অফিসে জমা দিই—

—তার বদলে পার্টি কী দেয়?

—কী আবার দেবে? যখন পার্টি পাওয়ারে আসবে তখন আমরাই বড় বড় চাকরি পাবো। আর তা ছাড়া ইলেকশানের সময়ে আমরা অনেক হাত-খরচ পাই।

—তাতে আপনাদের চলে?

সুশীল বললে—চলেই তো না। তারপর পাড়ায় আমরা সার্বজনীন দুর্গাপুজো কালীপুজো করি, সেই সময়ে দু'তিনটে মাস হেসে-খেলে চলে যায়। এই দেখুন না আজকে এখানে এসেছিলুম চাকরির চেষ্টায়, কিন্তু বোমাবাজির জ্বালায় মিছিমিছি সময়টা নষ্ট হয়ে গেল। কোনও কাজ হলো না—

হঠাৎ কথা বলতে গিয়েও কথা বলতে পারলে না সন্দীপ। যেন আগুনের ওপর জল পড়লো।

সুশীল অবাক হয়ে গেছে সন্দীপের হাব ভাব দেখে। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কাকে দেখাচ্ছেন? ওদিকে কে?

সন্দীপ তখনও ভূত দেখছে, বললে— ওই মেজবাবু

- মেজবাবু মানে?

সুশীলও চেয়ে দেখলে। মাঝবয়েসী প্যান্ট কোট দুরস্ত একজন ভদ্রলোক ভেতরের কোন ঘর থেকে বেরিয়ে হনহন করে লিফটে উঠলো। উঠতেই লিফটম্যান তাঁকে সেলাম করে লিফট নিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

সন্দীপের মুখে-চোখে তখন আতঙ্কের ছাপ সুশীল সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে—উনি কে?

সন্দীপ বললে—উনিই তো স্যাকসবি মুখার্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুক্তিপদ মুখার্জী, ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই তো আমি এখানে এসেছিলুম। এখন কী হবে?

সন্দীপ ভয়ে শিটিয়ে উঠলো সুশীল সান্ত্বনা দিয়ে বললে—বললেন অফিসের সামনে বোমাবাজির জন্যে আপনি ঠিক সময়ে আসতে পারেননি

সন্দীপ সে কথার কিছু উত্তর দিলে না, সুশীল বললে— আপনি ওঁকে বলে এ-অফিসে একটা চাকরি যোগাড় করে নিন না- আপনার তো হাতের কাছে এত বড় সুবিধে রয়েছে—

কিন্তু সে কথায় কোনও সান্ত্বনা না পেয়ে সন্দীপ লিফটের দিকে না গিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়েই নিচেয় নামতে লাগলো। তার কেবল মনে হতে লাগলো—এখন কী হবে? যদি তার চাকরিটা চলে যায়। ঠাকমা মণি যদি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়? তখন সে কোথায় থাকবে? কী খাবে? তাহলে মা'র আশা কী করে সে সার্থক করবে?
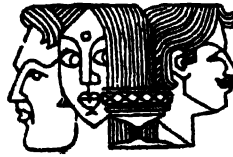
মুক্তিপদ মুখার্জী গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন--চল, বেলুড়—

মুক্তিপদ মুখার্জী যেদিন থেকে কোম্পানীর হাল ধরেছেন সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর যুদ্ধ। কিন্তু মুক্তিপদ জানতো না যে ব্যক্তিবোধ বড়, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিবার-বোধ। আর ব্যক্তিবোধ বা পরিবার-বোধের চেয়ে যে জিনিসটা আরো বড় তার নাম হলো বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধই মানুষকে নিজের তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা থেকে আরো ঊর্ধ্বে তুলে তাকে সুস্থ করে, তাকে সবল করে, তাকে শক্তিমান করে।

নন্দিতাও তাকে প্রায়ই বলে তুমি বড্ড ভীতু, অত নরম স্বভাব হলে কি কারবার করা চলে? তুমি আরো কড়া হতে পারো না?

মুক্তিপদ বলতেন—তুমি মেয়েমানুষ সে সব তুমি ঠিক বুঝবে না--

নন্দিতা বলতো—একবার আমার ওপর ভার দিয়ে দেখ না আমি চালাতে পারি কিনা -। আমি তোমার চেয়ারে বসলে এক-কথায় সকলকে স্যাক্ করে দিতুম—

মুক্তিপদ বললেন—সে-সব দিন চলে গিয়েছে। এখন চোখ রাঙিয়ে কোনও কাজ করানো যায় না। ইংরেজদের আমলে চলতো এখন ও সব অচল—

নন্দিতা বলতো—তার চেয়ে বলো মালিক হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই —

এর পর নন্দিতার সঙ্গে কথা বলবার আর কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না মুক্তিপদ। নন্দিতার সঙ্গে বরং অন্য কথা বলা ভালো। নতুন শাড়ি বা নতুন প্যাটার্নের কোন গয়না, বা হাউস্-কোট, এই সব বললেই নন্দিতা বুঝবে।

আর পিকনিক?

ঠাকমা-মণি প্রথমে আদর করে নাতনীর নাম রেখেছিলেন 'প্রীতিময়ী'। কিন্তু নন্দিতার পছন্দ হয়নি নামটা। বলেছিলেন—ও আবার কী নাম?

তাই প্রীতিময়ী' বদলে নন্দিতা রেখেছিল 'পিপি'। সেকালের বুড়ী আজকালকার মেয়েদের নামের মাহাত্ম্য কী বুঝবে? স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সেটা হয়ে গেল 'পিকনিক' পিক্‌নিক মুখার্জী। নন্দিতা নিজে পিপিকে স্কুলে ভর্তি করবার পর থেকে ওই নামটাই পাকা হয়ে রইল।

শাশুড়ি আর বউতে আগে থেকেই মন কষাকষি চলছিল, তার ওপর নাম বদলে এই তুচ্ছ সামান্য কারণটা হঠাৎ একটা অসামান্য কারণে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বোমা যত ছোট তার যত বড়ই হোক, তার বিস্ফোরণের জন্যে একটা তুচ্ছ দেশলাই-এর কাঠিই যথেষ্ট।

তখন থেকেই নন্দিতা মুক্তিপদকে কেবল বলতো—তুমি একটা আলাদা বাড়ি করো—নন্দিতার আবদার শুরু। ঘুরে-ফিরে কেবল ওই একটাই কথা—তুমি একটা আলাদা বাড়ি করো—

শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করেছিলেন— আলাদা বাড়ি করবো কেন? তোমার কি এ-বাড়িতে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?

নন্দিতা বলেছিল—কষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, তুমি তো তা বুঝবে না। তোমাকে তো সারাদিন বাড়ির মধ্যে কাটাতে হয় না—

—কেন, বাড়িতে কাটাতে তোমার কী কষ্ট হয়?

নন্দিতা বলতো—আমি তো বলেছি তা তুমি বুঝবে না—

অনেক পীড়াপীড়ি করলেও নন্দিতা কিছু বলতো না।

কিন্তু বার বার নন্দিতার কাঁদুনি শোনার চেয়ে আলাদা বাড়ি করাই ভালো। মুক্তিপদ শেষ পর্যন্ত একটা আলাদা বাড়িই করলেন ফ্যাক্টরির কাছাকাছি। ঠাক্‌মা-মণি প্রথমে খুব বকা ঝকা করেছিলেন। কিন্তু ছেলে বড় হয়েছে, ছেলের বিয়েও হয়েছে। তার ওপর নাতনীও হয়েছে। তারও বয়েস হচ্ছে। ঠাক্‌মা-মণি তো আর চিরকাল সংসার আগলে থাকতে আসেননি। তাঁকেও তো একদিন এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং বড় নাতি সৌম্যকে নিয়েই থাকতে লাগলেন। সৌম্যকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন, সৌম্যর বিয়ে দেবার সময়ে ভেবে-চিন্তে জন্ম কুণ্ডলী দেখিয়ে রাজ-যোটক মিলিয়ে বিয়ে দেবেন। তাহলে আর সৌম্যর বউ মেজ বউ এর মত বাড়ি ছেড়ে যাবে না। বাড়ি ছেড়ে আলাদা হবে না—

এই জন্যেই ঠাক্‌মা-মণি নিজের মনের মত পাত্রী খুঁজে বেড়িয়েছেন। তারপর যখন সে পাত্রী পাওয়া গেছে তখন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

ঠিক এই সময়েই লণ্ডন অফিস থেকে খবর এল সেখানকার ম্যানেজার কমল মেটা মারা গেছে। এই অবস্থায় এখানকার কাউকে না-কাউকে লণ্ডনে যেতে হয়। কিন্তু কে যাবে?

মুক্তিপদ বলেছিলেন—আমি যেতে পারবো না, এখানে আমার অনেক কাজ—

ঠাক্‌মা-মণি বলেছিলেন—তাহলে সৌম্য কী করে যায়? সে কী-ই বা কাজের বোঝে?

—খুব বোঝে, খুব বোঝে— । তুমি ভাবছো তোমার নাতি বুঝি সেই আগেকার মত ছোটই আছে। কিন্তু মেঘে মেঘে যে অনেক বেলা হয়েছে, তা তো তুমি বুঝতে পারছো না—

কিন্তু সে ব্যাপারেও সৌম্যর বিয়ে না দিয়ে ঠাকমা মণি তাকে বিলেতের অফিসে পাঠাবেন না। পাঠালে হয়ত ঠাক্‌মা-মণির সমস্ত স্বপ্ন সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আর কী হতে পারে ঠাক্‌মা-মণির জীবনে সেই জন্যেই সরকারমশাইকে পাঠানো হয়েছে কাশীতে।

গাড়িতে যেতে যেতে মুক্তিপদ এই সব কথাই ভাবছিলেন। যদি সৌম্য লণ্ডনে না যেতে পারে, তাহলে কে সেখানে যাবে? একজনকে তো যেতে হবেই। অফিসের কাজকর্ম তো বন্ধ রাখলে চলবে না।

বাড়িতে আসতেই নন্দিতা অবাক হয়ে গেছে।

বললে—এ কী, তুমি যে বললে আজকে বাড়িতে খেতে আসতে পারবে না—

—না, অফিসে আজ এক কাণ্ড হয়েছে—

—আবার কী কাণ্ড?

—সে আব বোল না। সেই একই কাণ্ড! আবাব ওরা ঘেরাও করেছিল আমাকে।

—কারা? কোন ইউনিয়ন?

মুক্তিপদ বললেন---এক নম্বর ইউনিয়ন—

--তা তোমাদের তো তিনটে ইউনিয়ন আছে। অন্য ইউনিয়ন অবস্থা সামলাতে পারলে না?

মুক্তিপদ বললেন---সেই দু নম্বর ইউনিয়নই তো শেষ পর্যন্ত এসে সামলালে—

তারপর একটু থেমে বললেন—আর পারি না। জানো, ওদিকে লণ্ডন অফিসে যে কাকে পাঠাবো তা ভেবে পাচ্ছি না। মা তার নাতিকে বিয়ে না দিয়ে পাঠাবে না, আর আমার এখানেও এই ঝঞ্ঝাট। একা কোন্ দিক সামলাই বলো? আমাব যে কী বিপদ তা কেউ বুঝবে না। এর চেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো—দাও, খাবার দিতে বলো, এখনি আবার একবার ফ্যাক্টবিতে যেতে হবে। ফ্যাক্টরি থেকে কেউ টেলিফোন করেছিল?

নন্দিতা বললে—না—

মুক্তিপদ বললেন—দেখ কাণ্ড! হেড অফিসে এত বড একটা ব্যাপার হয়ে গেল, কেউ একবার খবরও নিলে না? তাহলে অত টাকা মাইনে দিয়ে লোক পুষে কি লাভ আমার?

ততক্ষণে খাবার এসে গেল।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—পিপি এখনও আসেনি?

নন্দিতা বললে—এইবার আসবে। তুমি এখন খেয়ে নাও। পিপি এলে আমি তার সঙ্গেই খাবো--

তারপর বললে—বিকেলে তোমার সময় হবে?

—কেন?

নন্দিতা বললে—আজকে 'লাইট-হাউসে' একটা ফিলম্-শো আছে বিকেল সাড়ে পাঁচটাব সময়ে—

নন্দিতা বললে—এই বয়সে কি পিপির এ-সব দেখা ভালো? আর ওরও তো নিজের পড়াশোনা আছে—

মুক্তিপদ বললেন—আজকাল তো সবাই সব দেখছে। কেউ তো কোনও জিনিস দেখতে বাকি রাখছে না। রাস্তায় যেসব পোস্টার দেখি, তাতে আমারই লজ্জায় চোখ বুজে আসে। অথচ লক্ষ্য করি রোজই তো 'হাউস-ফুল'। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যদি না-ই দেখে তো 'হাউস-ফুল' হয় কী করে?

নন্দিতা বললে—সেই জন্যেই তো তোমাকে সঙ্গে যেতে বলছি—

মুক্তিপদ বললেন—দয়া করে আমাকে, তুমি একটু মুক্তি দাও, আমি আর পারছি না। দেখবে কোন্ দিন হয়তো 'সেরিব্র্যাল-হেমারেজ' হয়ে মারা যাবো। আর কত ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খাবো? আর আমিও তো মেশিন নই, মানুষ একটা—

নন্দিতা বললে—সেইজন্যেই তো বলছি তোমার একটু রিল্যাক্স করা দরকার—ডাক্তার তো তোমাকে তাই-ই করতে বলছে—

মুক্তিপদ বললেন—ডাক্তারদের কী? তারাও আজকাল তেমনি হয়ে গেছে। যা হোক একটা হোল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেসক্রিপশন্ লিখে দিলুম। ডিউটি খতম্। আর একটু কিছু বাড়াবাড়ি হলেই বলবে—নার্সিং-হোমে যাও—। ওই একটা ব্যবসা হয়েছে আজকাল ডাক্তারদের —

খাওয়ার মাঝপথেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। নন্দিতা রিসিভারটা ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুক্তিপদ বললেন—না, ধোর না, বাজুক। সাবাজীবন যদি টেলিফোনই ধবতে হয় তাহলে জীবন যে নবক হয়ে যাবে —

কিন্তু ততক্ষণে টেলিফোনটা ধরলে বাড়ির কাজের লোক।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে— কে রে? কে টেলিফোন করছে?

লোকটা বললে—রং নম্বার —

বাঁচা গেল! মুক্তিপদ আবার নিজের খাওয়ার দিকে নজর দিলেন। খেয়ে নিয়েই আবার ফ্যাক্টরিতে দৌড়তে হবে। সেখানে এখন কী কাণ্ড হচ্ছে কে জানে! তেমন কিছু হলে নাগরাজন একটা খবর দিতই।

হঠাৎ হুড়-মুড় করে এসে হাজির হলো পিপি। হাঁফাচ্ছে তখনও। রোজই এই সময়ে সে আসে! আজকে এ সময়ে বাবাকে বাড়িতে দেখে সে অবাকও হলো, আবার তার আনন্দও হলো।

বললে—বাবা, আজকে কাজিনকে দেখলুম! কাজিন-ব্রাদার—

—কাজিন? কাজিন মানে?

—পিপি বললে- -মানে তোমার ব্রাদারের ছেলে!

—কে সৌম্য? কোথায় দেখলে তাকে?

—আমাদের স্কুলে।

—সে কী? কেন?

মুক্তিপদ পিপিদের স্কুলে সৌম্যকে যেতে শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এখন তো সৌম্যর ফ্যাক্টরিতে থাকার কথা। এমন সময়ে সে মেয়েদের স্কুলে যায় কেন? মেয়েদের স্কুলে তার কী কাজ?

পিপি বললে—আমাদের স্কুলে যে স্টুডেন্টটা পড়ে তার সঙ্গে আমার কাজিন-ব্রাদার দেখা করতে এসেছিল—

—কে স্টুডেন্ট তোমাদের স্কুলে পড়ে? নাম কী তার?

পিপি বললেন—মিস্ বিশাখা গাঙ্গুলী—

—সে কে?

পিপি ঘাড় নাড়লো। বললে—তা আমি কী জানি! তার সঙ্গে আমার কাজিন ব্রাদারের বিয়ে হবে। এখন এনগেজমেন্ট চলছে—

সে কী? এনগেজমেন্ট চলছে! মুক্তিপদর হঠাৎ মনে পড়ে গেল মা'র কথা। সৌম্যর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তাকেই তো স্টেট্ থেকে সব খরচপত্র দেওয়া হচ্ছে, এ-কথা তো মা-ই তাকে বলেছিল। রাসেল স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়িটাতে তো তাদেরই মা-মেয়েকে পোষা হচ্ছে। সেই জন্যেই তো মাসে মাসে এতগুলো টাকা খরচ হচ্ছে! সৌম্য তাহলে কি অফিস কামাই করে পিপিদের স্কুলে যায়?

নন্দিতা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম দেখতে রে মেয়েটাকে?

পিপি চোখ বড়-বড় করে বললে—নাইস্, ভেরি নাইস্—ভেরি স্মার্ট—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন,—তা তোমাকে কে বললে যে মিস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তোমার কাজিন-ব্রাদারের বিয়ে হবে?

পিপি বললে—কে আবার বলবে? মিস্ গাঙ্গুলীই বলেছে।

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—মিস্ গাঙ্গুলী তোমাকেই বলেছে, না স্কুলের সবাইকেই বলেছে?

পিপি বললেন—সবাই-ই জানে। আন্টিরাও জানে—মিস্ গাঙ্গুলী সবাইকেই বলেছে—

নন্দিতা মুক্তিপদকে বললে—দেখেছ কাণ্ড? দেখ, দেখ, তোমার মা'র কাণ্ডটা দেখ—

মুক্তিপদ গম্ভীর হয়ে খাওয়া ছেড়ে উঠলেন। তাঁর কিছু ভালো লাগলো না। এদিকে রাত ন'টার আগে সৌম্যকে বাড়িতে ফিরতে হুকুম করে দিয়েছে মা আর ওদিকে দিনের বেলা অফিস কামাই করে সেই সৌম্য মেয়েদের স্কুলে গিয়ে ফুর্তি করে?

নন্দিতা বললে—এই জন্যেই তো বিডন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে চলে এলুম। ওখানে থাকলে পিপিও ওই তোমার ভাইপো'র মত হয়ে যেত—

পিপি বললে—জানো, আমার কাজিন্ রোজ স্কুলের সামনে গিয়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—

—তারপর?

—তারপর মিস্ গাঙ্গুলীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় চলে যায় কেউ দেখতে পায় না—

মুক্তিপদ বললেন—আর মিস্ গাঙ্গুলীর যে-গাড়ি যায় সেটার কী হয়? সেই ড্রাইভার কী করে?

—তা জানি না—

মুক্তিপদ আর দাঁড়ালেন না। কোটটা আবার গায়ে গলিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে এগোলেন। সমস্ত পৃথিবীটার ওপর যেন রাগ হলো মুক্তিপদর। শুধু ব্যক্তিসত্তার ওপর রাগ নয়, শুধু পরিবার-সত্তার উপরও রাগ নয়, যেন সমস্ত বিশ্বসত্তার ওপরই রাগ হলো তাঁর। পৃথিবীর সবাই-ই যেন মুক্তিপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে।

নন্দিতা পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললে—কী হলো, আজকে ইভনিং-এ লাইটহাউসে যাবে?

মুক্তিপদ মুখ দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিলেন। বললেন—সত্যিই তোমরা বেশ আছো—

নন্দিতা এ-কথার কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। ততক্ষণে মুক্তিপদ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। মুক্তিপদ ততক্ষণে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়েছেন।

ড্রাইভার তৈরিই ছিল। সাহেব হুকুম দিলেন—চলো ফ্যাক্টরি—

কোন্ দিকটা দেখবেন মুক্তিপদ? হেড-অফিস, না ফ্যাক্টরি, না ফ্যামিলি, না বিডন স্ট্রীট, না লণ্ডন-অফিস? একটা মানুষ জীবনের ক'টা দিক সামলাতে পারে? একটা মানুষের তো দশটা হাত নেই, দশটা মাথাও নেই। পরমায়ুও মানুষের ধরা বাঁধা। দেবীপদ মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে, দাদা শক্তিপদ মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে পঁচিশ বছর বয়েসে। এখন মুক্তিপদর নিজের বয়েস হলো চল্লিশ। আর কতদিন এই মেশনটাকে বয়ে বেড়াবেন মুক্তি? আর কতদিন।

গাড়ি সোজা ফ্যাক্টরির দিকেই যাচ্ছিল, কিন্তু মুক্তিপদ বাধা দিলেন।

বললেন—ওরে, না না, বিডন স্ট্রীটের বাড়ির দিকে চল্, এখন আর ফ্যাক্টরিতে যাবো না—

গাড়ি আবার মুখ ঘোরালো। পশ্চিম থেকে একেবারে সোজা পুবে।
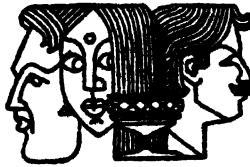
ঠাক্‌মা-মণি দুপুর থেকেই ছটফট করছে।

বলছেন—বিন্দু অ বিন্দু, কোথায় গেলি রে?

বিন্দু কাছেই ছিল। সামনে এসে বললে—কি ঠাক্‌মা-মণি, এই তো আমি—

ঠাক্‌মা-মণি রেগে যান। বলেন—কোথায় থাকিস তোরা? ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না—

বিন্দু বলে—আমি নিচেয় খবর পাঠিয়েছিলাম।

—কেন? নিচেয় তোর কী কাজ?

বিন্দু বলে—আপনিই তো বললেন নিচেয় খবর নিয়ে দেখতে সরকারমশাই এসেছে কিনা—

—সরকারমশাই? সরকারমশাইকে ডাকতে তোকে কখন বললুম? সরকারমশাই তো কাশীতে গেছে—

বিন্দু বলে—বুড়ো সরকারমশাই নয়, ছোট সরকার মশাই। আপনি তো বললেন ছোট সরকার মশাইকে ডাকতে—

— তা ছোট সরকারমশাই এলো না কেন?

বিন্দু বলে—বাড়িতে নেই যে, কী করে আসবে?

তা বটে, মুক্তি ডেকে পাঠিয়েছিল সরকারমশাইকে, তাই সন্দীপকে যেতে বলেছিলেন ঠাক্মা-মণি। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন? সামান্য যাবে আর আসবে, তাতেই এত দেরি। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন ঠাক্মা-মণি। কোনও কাজ কি কেউ ঠিকমত করবে না? করলেও ঠিক সময়ে খবরটা দেবে না—

হঠাৎ বিন্দু আবার এল। বললে—ঠাক্মা-মণি, মেজবাবু এসেছেন—

মেজবাবু! ঠাকমা-মণি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বলা নেই, কওয়া নেই মুক্তি আবার হঠাৎ আসতে গেল কেন? মেজবাবু এ বাড়িতে আসা মানে যে কী তা এ-বাড়ির সবাই জানে।

মেজবাবু বরাবর এ বাড়িতে এলে যা হয় এবাবও তাই হলো। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গিরিধারী লম্বা স্যালুট দিলে। মেজবাবু গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে ওপরে চলে গেলেন।

ঠাক্মা-মণি তৈরিই ছিলেন। ছেলেকে দেখে বললেন—কী রে, তুই হঠাৎ?

মুক্তিপদ বললেন—এলুম তোমার কাছে। কেন, আসতে নেই?

ঠাক্মা-মণি বললেন—তোর আবার এ কী কথা? তুই তো কাজ ছাড়া আমার কাছে আসিস না, নেহাৎ দরকার না থাকলে কি তুই আসিস?

মুক্তিপদ বললেন—তুমি তো আমার জ্বালাটা বুঝবে না—

ঠাক্মা-মণি বললেন—রাখ, তোর জ্বালার কথা! জ্বালা সংসারে কার নেই শুনি? আমার নিজের জ্বালা নেই? সব জ্বালা বুঝি একলা তোরই?

বাড়ির নিচেয় সদর দরজার কাছে আসতেই সন্দীপেব নজর পড়লো মেজবাবুর গাড়িটার ওপর। গিরিধারী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেট পাহারা দিচ্ছিল।

সন্দীপকেও সেলাম করলে গিরিধারী।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—মেজবাবু এসেছেন বুঝি গিরিধারী।

—হ্যাঁ, হুজুর—

—কতক্ষণ এসেছেন?

গিরিধারী বললে—থোড়া পহেলে—

আর দেরি-করা উচিত নয়। মেজবাবু বোধহয় সন্দীপের ওপর খুব রাগ করেছেন।

সে যথারীতি খবর দিয়ে ওপরে গেল। ঠাক্মা-মণির ঘরের সামনে বিন্দু পাহারা দিচ্ছিল। সন্দীপকে দেখে বললে—দাঁড়াও বাছা, এই একটু আগেই মেজবাবু এসে ভেতরে ঢুকেছেন—

সন্দীপ সেই বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভেতরে ঠাক্মা-মণির সঙ্গে মেজবাবুর কথা-বার্তা কানে আসতে লাগলো। সন্দীপ এক মনে শুনতে লাগলো কথাগুলো।

মেজবাবু বললে—জানো মা, আজকেও ইউনিয়নের লোক আমাকে হেড্ অফিসে ঘেরাও করেছিল—

—তা তোদের তো তিনটে ইউনিয়ন আছে? তোদের কোম্পানীর ইউনিয়ন কিছু বাধা দিলে না।

মেজবাবু বললেন—শেষ পর্যন্ত তারা বাধা দিলে বলেই তো ছাড়া পেলুম। সেই জন্যেই তো সকাল বেলাটা কোনও কাজ হলো না—

ঠাক্মা-মণি বললেন—এ নিয়ে অত মাথা ঘামাস কেন? যদ্দিন ফ্যাক্টরি থাকবে অদ্দিন তো এ-সব হবেই। তোর বাবাকে ওরা কতবার ঘেরাও করেছে। ওদের খাটিয়ে টাকা উপায় করবি আর তারা তোকে এমনি ছেড়ে দেবে। সেই জন্যেই তো তোর বাবা অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

মেজবাবু বললে—দেখ মা, তুমি আমার নিজের মা বলেই তোমাকে এই সব কষ্টের কথা বলি। তা তুমিও যদি আমার দুঃখের কথা না শোন তো কে শুনবে আমার কথা, আর কাকেই বা এ-সব শোনাবো? এমনকি তোমার বউমাও শুনতে চায় না এ- সব কথা। সে কেবল শিখেছে টাকা খরচ করতে, টাকা উপায় করবার যন্ত্রণার ভাগ নিতে চায় না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কেন নেবে সে তোর যন্ত্রণার ভাগ? তার কীসের দায় পড়েছে? তোর টাকা দেখেই তো তোর শ্বশুর তোর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আমি তখন তোর বাবাকে ওখানে বিয়ে দিতে পই-পই করে বারণ করেছিলুম, কিন্তু তোরা যেমন আমার কথা শুনিস না, তেমনি তোর বাবাও আমার কথা কখনও শোনেনি। এখন বোঝ ঠ্যালা—

মেজবাবু বললেন—আজকে অফিস থেকে ফিরে বাড়ি আসতেই তোমার বউমাকে সব ঘটনা বলতে তোমার বউমা কী বললে তা জানো?

—কী?

—বললে 'লাইট-হাউসে' সন্ধে.ব ' কী একটা হিন্দী ছবির শো আছে, সেইটে দেখতে তার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। ভাবতে পারো?

ঠাক্‌মা-মণি বললে—থাক-থাক, ও-সব বলতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। আমার এখানে থেকে ও-সব বাঁদরামি চলতো না বলেই তোকে নিয়ে আলাদা সংসার করলে। তা আমার আর কী ক্ষতি করবে সে! এখন তুই বোঝ তোর ক-পালে আরো কী আছে, আমি কী করতে পারি?

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমাকে আমি যে টেলিফোনে বলেছিলুম আমার অফিসে সরকারমশাইকে পাঠাতে, তার কী হলো! যায়নি তো আজ —

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—সে কী? যায়নি?

—না!

ঠাক্‌মা-মণি চমকে উঠলেন। বললেন—আশ্চর্য, কাউকে একটা কাজের ভার দিয়েও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না!

তারপর ডাকলেন—বিন্দু—

মেজবাবু বললেন—থাক, এখন বিন্দুকে আর ডাকতে হবে না, আমি টাকা এনেছি সঙ্গে করে, এই নাও

বলে একটা বাণ্ডিল বাড়িয়ে দিলেন ঠাক্‌মা-মণির দিকে। বললেন—এতে পঞ্চাশ হাজার ক্যাশ আছে—

তারপর বললেন—শোন মা, আমার পিপি আমাকে একটা কথা বলছিল। পিপি যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলেই নাকি তোমার বউমা মানে—

—আমার বউমা? আমার 'বউমা' পড়ে—

মেজবাবু বললেন—তোমার 'বউমা' নেই। দু'দিন পরে সেই মেয়েই তো তোমার নাত্‌-বউ হবে। যাকে তুমি আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে পুষছো। সেই তার কথা বলছি—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। বিশাখা! সৌম্যর সঙ্গেই তো বিয়ে হবে, তা তার কী হয়েছে?

—সে আর পিপি একই স্কুলে পড়ে। তা পিপি কী বলছিল জানো?

—কী?

মুক্তিপদ বললেন—সেই স্কুলে নাকি সৌম্য রোজ যায়।

—আমার সৌম্য। সে বিশাখাদের ইস্কুলে যায়?

মুক্তিপদ বললেন—তাই-ই তো পিপি বললে। আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট নাগরাজন বলছিল সৌম্য নাকি আজকাল নিয়ম করে অফিসেও যায় না। এখন বুঝতে পারছি সৌম্য অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় যায়!

ঠাক্‌মা-মণির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলেন—তুমি তো নিয়ম করে দিয়েছো রাত ন'টার সময় গিরিধারী সদর-গেট বন্ধ করে দেবে, যাতে তোমার নাতি তার আগে বাড়িতে ঢুকে পড়ে! তা তো হলো, কিন্তু দিনের বেলায় সে কী করছে তা তো তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছো না। এখন এই অবস্থায় তুমি কী করবে বলো?

এবারও ঠাক্‌মা-মণির গলা শোনা গেল না। সন্দীপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব কথা শুনছিল। এবার তার কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। তার ভয় করতে লাগলো। যদি হঠাৎ কেউ তাকে এই অবস্থায়, দেখে ফেলে! যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যায় সে। লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির মালিকদের কথা শোনা তো পাপ! আর তা ছাড়া, সৌম্যবাবু যে বিশাখাদের স্কুলে যায়, বিশাখাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় যায় তা তো সন্দীপ জানে। যদি জানে সে তো সে-কথা ঠাক্‌মা-মণিকে জানায়নি কেন? তার কাজই তো রাসেল স্ট্রীটের বাড়ির সব খবর রোজ এসে ঠাকমা-মণিকে জানানো। কিন্তু সে তো জানায়নি। সে তো তার কাজে গাফিলতি করেছে!

হঠাৎ বিন্দু এসে বললে—সরকারবাবু ঠাক্‌মা-মণি আপনাকে ভেতরে ডাকছেন—

সন্দীপের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলো। বলির পাঁঠার মত সে ভেতরে গিয়ে হাজির হলো।

মুক্তিপদ তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে তুমিই সরকারমশাই-এর কাজ দেখাশোনা করছো?

সন্দীপ মাথা নাড়লো। বললে—হ্যাঁ—

—আজকে সকালে তো তোমার যাওয়ার কথা ছিল আমার হেড অফিসে। যাওনি কেন?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলুম—

মুক্তিপদ বললেন—আবার মিথ্যে কথা বলছো? তুমি যাও নি—

সন্দীপ বললে—আমি যখন গিয়েছিলুম তখন ওখানে খুব বোমা মারামারি চলছিল, গাড়ি, বাস, ট্রাম সব কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সব লোক পালাচ্ছিল চারদিকে— তাই—

ঠাক্‌মা-মণি কথার মাঝখানে বলে উঠলেন—এই বয়সেই এত মিছে কথা বলতে শিখে গেছ? একটা কাজ কি তোমাদের কাউকে দিয়ে হবে না? যদি কাজ করতে ইচ্ছে না থাকে তো এ কাজ ছেড়ে দাও। আমি কাউকে জোর করে —

মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, আমার অফিসের সামনে বোমা মারামারি হচ্ছিল বটে, তুমি কি সেই সময় গিয়েছিলে?

ঠিক কথার মাঝখানেই বিন্দু আবার ঘরে ঢুকলো। বললে—ঠাক্‌মা-মণি, সরকার-মশাই কাশী থেকে ফিরে এসেছেন!

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—সে কী? কে বললে?

—ওই তো দোতলার কালিদাসী এখুনি বললে?

ঠাক্‌মা-মণি জিজ্ঞেস করলে—তা কালীদাসী কার কাছ থেকে শুনলে?

বিন্দু বললে—একতলার ফুল্লরা খবর দিয়েছে ওকে—

—তা কাশীর ট্রেন এই দুপুর বেলায় কলকাতায় এল কেন?

সে কথার উত্তর বিন্দু বা কালিদাসী বা ফুল্লরা কী করে দেবে?

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—সরকারমশাইকে কোথায় পাঠিয়েছিলে?

ঠাকমা-মণি বললেন—কাশীতে—

—কেন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ওমা, তুই কিছুই জানিস নে? তোকে আমি আগেই বলে ছিলুম তোর মনে নেই। কাশীতে আমারগুরুদেবকে চিঠি লেখা হয়েছিল সৌম্যর বিয়ে তারিখ, সময়, লগ্ন ঠিক করতে। সেখান থেকে উত্তর আসতে দেরি দেখে আমি মল্লিকমশাইকে পাঠিয়েছিলাম। সেই তিনি কাশী থেকে এখন এলেন—

তারপর বিন্দুকে বললেন—যা বিন্দু, ফুল্লরাকে বলতে বল্ যেন সরকারমশাই সোজা ওপরে চলে আসেন। মেজবাবুও এখানে বসে আছেন—

মুক্তিপদ ঠাক্‌মা-মণিকে জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে কি শেষ পর্যন্ত তোমার সৌম্যর সঙ্গে ওই মেয়েরই বিয়ে দেবে?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা বিয়ে দেব না কি মিছিমিছি আমি এত হাজার হাজার টাকা খরচ করে এই পাত্রীকে পুষছি। পয়সা কি আমার এত সস্তা?

সন্দীপের বুকটা তখনও দূর-দূর করছিল।

মুক্তিপদ সন্দীপকে বললেন—তুমি আর মিছিমিছি দাঁড়িয়ে আছ কী করতে? তুমি এখন এসো—

সন্দীপ যেন ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। মনে আছে তার নিজেরও তখন জানতে ইচ্ছে করছিল কাশীর গুরুদেব কী বলেছেন? সৌম্যবাবুর বিয়ের ব্যাপারে তিনি কী রায় দিলেন। বিলেত যাওয়ার আগে সৌম্যবাবুর বিয়ে কি হবে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দোতলার সিঁড়িব মধ্যে দেখা হয়ে যায়ে মল্লিককাকার সঙ্গে।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী কাকা, এত দেরি করে এলেন যে?

মল্লিক-কাকা বললেন—আরে, বলো কেন, ট্রেন আট ঘণ্টা লেট—

বলে ওপরের দিকে উঠতে লাগলেন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—সৌম্যবাবুর বিয়ের তারিখ ঠিক হলো?

মল্লিক-কাকা বললেন—সে তোমায় পরে বলবো—আমি আসছি—

বলে তিনি যেমন ওপরে উঠছিলেন তেমনিই উঠতে লাগলেন।
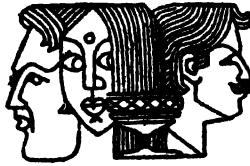
তপেশ গাঙ্গুলী তখনও হাল ছাড়েনি। মাঝে মাঝে বউদির কাছে আসে রসগোল্লা পান্তুয়া খায় আর বসে বসে নিজের বাড়ির দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা সবিস্তারে বলে যায়।

বলে—আমি অনেক পাপ করেছি, বউদি, তাই আমার এই কষ্ট। তুমি যদ্দিন আমার কাছে ছিলে ততদিন আমার কোনও কষ্ট ছিল না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিইনি, তাই আজ আমার এই ভোগান্তি—

যোগমায়া দেওরকে সান্ত্বনা দেয়। বলে—না ঠাকুরপো, তুমি কিছু দুঃখ করো না। আমার বিশাখার বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি আবার তোমার সংসারে চলে যাবো! তখন তো আমি ঝাড়া হাত পা মানুষ! আমি আবার তোমার সংসারে গিয়ে সব ভার নিজের মাথায় তুলে নেব —

তপেশ গাঙ্গুলী যোগমায়ার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

বলতো—আমার মা নেই বউদি, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো আমার যেন অফিসে মাইনে বাড়ে—

যোগামায়া বলতো—আমি কে ঠাকুরপো, ভগবানকে ডাকো, ডাকার মতো ডাকতে পারলে ভগবান সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না—দাঁড়াও তোমাকে কিছু খেতে দিই—

তপেশ গাঙ্গুলী যেদিনই আসতো কিছু-না-কিছু না-খেয়ে যেত না। রসগোল্লা আসতো, কখনও নোনতা খাবার।

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তোমার বাড়িতে আজ কী রান্না হয়েছে বউদি?

যোগমায়া বলতো—আমাদের শৈলই তো বাজার করে। সে যা বাজারে পায় তাই-ই আনে। আজকে ভেটকী মাছ এনেছিল, তারই কালিয়া করেছিলাম। তুমি খাবে?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তুমি নিজেব হাতে তুলে যা দেবে তাই-ই আমার কাছে অমৃত। তবে বিশাখার মাছ কম পড়বে না তো?

যোগমায়া বলতো—না, না, বিশাখা না হয় একটা দিন মাছ কমই খেল। ও তো আর্ধেক দিন খেতেই চায় না, আমি জোর করে গিলিয়ে গিলিয়ে খাওয়াই—

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—ঠিক করো, তুমি ঠিক করো। আগে স্বাস্থ্য, তার পরে সব। আর তুমি তো আমাকেও গিলিয়ে খাওয়াও—

যোগমায়া বলতো—দাঁড়াও, আমি তোমাকে মাছের কালিয়া দিচ্ছি, তার পরে তোমার জন্যে একটু মিষ্টি—

এ-বাড়িতে যতদিন তপেশ গাঙ্গুলী এসেছে ততদিন কিছু না-কিছু খেয়ে গেছেই। একদিনও যোগমায়া দেওরকে না খাইয়ে ছাড়েনি।

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—আহা, কী চমৎকার রান্না তোমার মাছের কালিয়া—

—আর দুটি ভাত নেবে ঠাকুরপো?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—তোমার ভাতে কম পড়বে না তো?

যোগামায়া বলতো—কী বলছো তুমি ঠাকুপো, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, তুমি মুখ ফুটে খেতে চাইছো আর আমি তোমাকে না-খাইয়ে ছেড়ে দেব?

—না, মানে তোমাদেব তো মাপা ভাত, তাব থেকে একজন লোক খেলে তো তোমাদের কম পড়ে যেতে পারে!

যোগমায়া বলতো—কী যে বলো তুমি ঠাকুরপো তার ঠিক নেই। ভাত কম পড়লে না-হয় আবার ভাত রাঁধবো।

তারপর বলতো—তা পেট ভরে তোমার খাওয়া হয় না-ই বা কেন ঠাকুরপো? আমি থাকতে তো কোনদিনও তোমাকে না-খেয়ে থাকতে হয়নি।

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—সে সব পুরোন কথা থাক বউদি। যে-যেমন কপাল করে এসেছে তাই-ই তো তার হবে। পেট ভরে খাওয়া আমাব কপালে না-থাকলে আমি কী করবো?

তারপর তপেশ গাঙ্গুলীর সামনে ভাতের থালা আসতো, নতুন করে আর একটা মাছের টুকরোও আসতো। আর তপেশ গাঙ্গুলী তা চেটে-পুটে খেয়ে ফেলতো।

যোগমায়া জিজ্ঞেস করতো—তুমি আজ আপিস যাবে না?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—যাবো বইকি, তবে সরকারী আপিস তো। দেরি করে আপিসে গেলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না—

তারপর বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে নিজের জায়গায় বসে বলতো—বিশাখার বিয়ের কদ্দূর বউদি? কথাবার্তা এগুচ্ছে?

যোগামায়া বলতো—শুনছি তো এগুচ্ছে! তা সবই তো ভগবানের ইচ্ছে ঠাকুরপো, আমি আর কি বলবো? তাঁর যদি ইচ্ছে হয় তো হবে! এদিকে তোমার বিজলী কেমন আছে?

তপেশ গাঙ্গুলী বলতো—বিজলীর কথা আর কী বলবো বউদি মেয়ে যত বাড় বাড়ন্ত হচ্ছে আমার বুক তত ভয়ে দূর-দূর করে কাঁপছে—কী হবে বুঝতে পারছি না—

যোগমায়া বলতো—তাঁকে ডাকো, সব ঠিক হয়ে যাবে—

—তুমি তো বলেই খালাস! আমার যে কী জ্বালা সে আমি জানি। আমি মেয়ের মুখের দিকে আর চেয়ে দেখতে পারি না।

যোগামায়া বলতো—মেয়ের বাপ যখন হয়েছ তখন জ্বালা তো তোমাকে সহ্য করতে হবেই—

তপেশ গাঙ্গুলী সেদিন এসে বললে—তুমি আমার একটা কাজ করবে বউদি?

—কী কাজ বলো?

কথাটা বলে তপেশ গাঙ্গুলী নিজের ব্যাগ থেকে একটা কৌটো বার করলে।

—এটা কী?

—এ একটা টিনের কৌটো। এই দেখ কৌটোর মাথার ওপর একটা গর্ত আছে, দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে আমি এই কায়দাটা করেছি —বলে তার কায়দাটা বুঝিয়ে দিলে। বললে— এই টিনের কৌটোর মুখের ঢাকনাটা বাংঝাল দিয়ে এঁটে দিয়েছি—

যোগমায়া তবু ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারলে না। বললে—এতে কী হবে?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে- -এর মাথায় একটা লম্বা ফুটো আছে দেখতে পাচ্ছো তো?

যোগমায়া বললেন—তা তো দেখতে পাচ্ছি—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে- এই ফুটো দিয়ে আমি এর ভেতরে যত ইচ্ছে টাকা-পয়সা নোট ফেলবো। এর ঢাক্‌না না ভাঙলে তো আর এই সব টাকা-পয়সা ভেতর থেকে বার করা যাবে না। তার মানে টাকাগুলো সব জমবে, ইচ্ছে করলেও খরচ করা যাবে না। ধরো রোজ যদি এর ভেতরে কিছু কিছু টাকা ফেলি, তাহলে কিছুদিন পরে অনেক টাকা জমে যাবে এক মাসে পঞ্চাশ টাকাও জমে তাহলে বছরে মোট কত টাকা হয়? বছরে হয় ছ'শো টাকা। তা হলে বছরে ছ'শো টাকা হলে পাঁচ বছরের মোট কত টাকা হবে? হবে তিন হাজার টাকা। হবে না?

যোগমায়া অত হিসেব-টিসেব বোঝে না? বললে—তা তো হবেই।

তাহলে আর পাঁচ বছর পরেও যদি বিজলীর বিয়ে দিই, তাহলে তিন হাজার টাকা মরলগ আমার হাতে এসে গেল। গেল না?

যোগমায়া বললে—তা তো এসে গেলই—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তাহলে বুঝে দেখ ওই তিন হাজার টাকার জন্যে কারোর কাছে আর আমাকে হাত পাততে হলো না। এটা কি আমার কম লাভ? বলো?

যোগমায়া স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে এটা কম লাভ নয়।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে— আমি ক'মাস ধরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতুম আমি মেয়ের বিয়ের টাকা কোত্থেকে যোগাড় করবো? কে আমায় টাকা ধার দেবে? শেষকালে ভগবান বুদ্ধি জুগিয়ে দিলে। তারপরেই আজ সকাল বেলা দোকানে গিয়ে এই কোটোটা বানিয়ে নিয়ে তোমার কাছে এলুম— । এখন বলো আমার কায়দাটা কেমন? ভালো নয়?

যোগমায়াও জানিয়ে দিলে যে দেওরের কায়দাটা ভালো।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—কিন্তু তোমার ছোট জা' যে-রকম আখ্‌খুটে মানুষ, বাড়িতে এ কৌটো রাখলে কোন্‌দিন এটা ভেঙ্গে টাকা বার করে নেবে। আর তাই দিয়ে নিজের একটা-না একটা গয়না গড়িয়ে ফেলবে, তখন আমি কিছু বলতে পারবো না। তাই ভেবেছি এটা আমি তোমার এখানে রেখে যাবো—

যোগমায়া বললে- -তা রেখে যাও না—

হ্যাঁ, মানে তুমিও এই ফুটোর মধ্যে সুবিধে মতন টাকা পয়সা যা বাড়তি হাতে থাকবে ফেলতে পারবে। হাজার হোক, বিজলী তো তোমার পর নয়, তোমার নিজের দেওর-ঝি। তার বিয়েতে, তো তোমারও কিছু আশীর্বাদী দিতে হতো। বলো ঠিক কিনা—

যোগমায়া বললে—তা তো ঠিকই, বিজলীও তো আমার নিজের পেটের মেয়ের মতন—

কথাটা শুনে তপেশ গাঙ্গুলীর মুখে হাসি আর ধরে না। বললে—কেমন ভগবান বুদ্ধিটা মাথায় জুগিয়ে দিলে বলো তো বউদি? বিজলীর বিয়ের সময় তোমারও আশীর্বাদী দিতে কিছু গায়ে লাগবে না আমাকে অফিসের কো-অপারেটিভ্ থেকে টাকা ধার করতে হবে না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে— বিজলীর পাত্র খুঁজছো নাকি তুমি?

—খুঁজছি মানে? গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি। খবরের কাগজে বক্স-নাম্বার দিয়ে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছি—কিন্তু আমার কপাল কি আর তোমার মতন বউদি?

ততক্ষণে তপেশ গাঙ্গুলীর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে।

তপেশ গাঙ্গুলীরা সারা দিন কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই ঘোরাঘুরি করে আর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই তাদের অন্তর্ধান হয়ে যায়। তপেশ গাঙ্গুলীব খাওয়া হয়ে গিয়েছিল আর তার সঙ্গে অর্থ-প্রাপ্তির একটা সুনিশ্চিত পন্থাও সে আবিষ্কার করে তার একটা সুসমাধানও করে ফেলেছিল। সুতরাং তার আর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না।

—বুঝলে বউদি, আসছে অনেক পাত্র, কিন্তু সব অন্য জাত। বামুনেব পাত্রগুলো সব কোথায় গেল বলো তো?

তাবপর একটু থেমে বললে—যাহোক, তুমি কিন্তু বউদি এখন থেকেই ওই কৌটোটার ফুটো দিয়ে টাকা-পয়সা ফেলতে আরম্ভ করে দাও, বুঝলে?

পেছন থেকে শৈল এসে বলল—মা, আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দেব?

যোগমায়া বললে—কেন, ভাত কি সব ফুরিয়ে গেল নাকি?

শৈল বললে—হ্যাঁ, ভাত আমাদেব কম পড়বে—

তপেশ গাঙ্গুলীর কানে কথাগুলো যেতেই বললে—সে কি? আমি তোমাদের সব ভাত ফুরিয়ে দিয়ে গেলুম নাকি? তোমাদের আর ভাত নেই।?

যোগমায়া বললে—না না, তোমার ক্ষিধে পেয়েছিল, তুমি খেয়েছ। ভাত না হয় আবার চড়ানো হবে, তাতে কী?

—ছি ছি, কী কাণ্ড দেখ দিকিনি! আমাকে বলবে তো যে তোমাদের ভাতে কম পড়বে। তাহলে আমি খেতুম না—

যোগমায়া শৈলকে বললে—এ কী রকম আক্কেল গা তোমার মেয়ের? আমার দেওরের সামনে ভাতের কথা বলতে হয়? কথাটা পবে বললে চলতো না?

এ-কথার পর শৈল আর সেখানে দাঁড়ালো না।

তপেশ গাঙ্গুলী বললেন—তাহলে তো তোমার খুব ক্ষতি করে দিলুম বউদি! আহা, আমার মোটে খেয়ালই ছিল না — ছি ছি—

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সন্দীপ।

—কী ভায়া, খবর সব ভালো তো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সন্দীপ বললো—মাসিমা, খবর আছে...

তপেশ গাঙ্গুলীব আর যাওয়া হলো না। বললে—কী খবর ভায়া? বিশাখার বিয়ের খবর?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

বলে ভেতরে ঢুকলো। তপেশ গাঙ্গুলীর যাওয়া হলো না। এত বড় খবরের পুরোটা না শুনে সে যেতে পারে না—

যোগমায়া সব কিছু শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়েই ছিল। বললে—খবরটা কী খুলে বলো বাবা, বিয়ে হবে তো—?

সন্দীপ বললে—না।

—না মানে? বিশাখার বিয়ে হবে না? কী আশ্চর্য এত কাণ্ডের পর...

তপেশ গাঙ্গুলী তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিশাখার বিয়ের ব্যাপারে যেন আর সকলের চেয়ে তপেশ গাঙ্গুলীরই বেশি দায়। বললে—সত্যিই বিশাখার বিয়ে হবে না ও-বাড়িতে। সত্যি বলছো? তাহলে তুমি আমাকে বড় ভাবনায় ফেললে ভায়া—

—তার মানে?

সন্দীপ বললে—ঠাক্‌মা-মণি সরকার মশাইকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের মতামত আনতে। তা এখন সরকার মশাই সেই গুরুদেবের মতামত নিয়ে এসেছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলেন—কী মতামত দিয়েছেন গুরুদেব? বিয়ে হবে না?

সন্দীপ বললে— না, হবে না—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমি তখনই জানতুম! তোমাকে তো আমি পই-পই করে বলেছিলুম বউদি যে বড়লোকদের কথায় ভুলো না তুমি, বড়লোকদের কথার কখনও ঠিক থাকে না। বলিনি?

সন্দীপ বললে—বিয়ে হবে না কে বলেছে? বিয়ে তো হবে?

—বিয়ে হবে?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, আলবৎ হবে। গুরুদেব নিজে কুষ্ঠি দেখে বিচার করে দেখেছেন, বলেছেন এ বিয়ে হলে বর কনে দুজনেরই সুখের হবে! কিন্তু পাত্রীর কুষ্ঠিতে একটা খারাপ যোগ আছে, তাই বছর দেড়েক দেরি করতে বলে দিয়েছেন—

—দেড় বছর বাদে?

যোগমায়ার মুখটা শুকিয়ে গেল খরবটা শুনে। আরো দেড় বছর বাদে? ততদিন কি যোগমায়া বাঁচবে। ততদিন কি ঠাক্‌মা-মণি বাঁচবেন। দেড় বছরে পৃথিবীর কত কী পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। কত ভূমিকম্পতে কত দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পাবে, কত আগ্নেয়গিরিতে আগুন লেগে কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হতে পারে, আকাশে কত নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়ে কত উল্কাপাত ঘটাতে পারে। দেড় বছর কি অল্প সময়?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—তা হলে আর বিয়ে হচ্ছে না, এ তুমি দেখে নিও—বড়লোকের খেয়াল, হতেও যেমন যেতেও তেমনি—

সন্দীপ অভয় দিলে—না মাসিমা, আপনি ভাববেন না। সৌম্যবাবু বিলেত থেকে ফিরে এলেই বিয়ে হবে। ঠাকমা-মণি নিজে কথা দিয়েছেন—

তপেশ গাঙ্গুলী তখনও দাঁড়িয়েছিল। বললে—ভায়া, আমারও তো বয়েস কম হলো না, আমিও অনেক দেখেছি। কথায় আছে না যে 'যে বড়র পিরিতি বালির বাঁধ' এও হয়েছে তাই—

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না, বললে—আপনার তো আপিস আছে, আপনি অফিসে যাবেন না?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—আমার তো ভাই সরকারী আপিস, আমাদের আপিসে অনেক লোক, আমি না গেলেও গাড়ির চাকা চলবে—

সন্দীপ বললে—এই আপনাদের জন্যেই তো আজ রেল গাড়ি ঠিক সময়মত চলে না, আপনাদের জন্যেই তো রেলের এত এ্যাকসিডেন্ট্ হয়—দোষ তো আপনাদেরই আর আপনারা গর্ভমেন্টের দোষ দেন কথায়-কথায়—

তপেশ গাঙ্গুলী হয়ত সন্দীপের এ-কথার একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু যোগমায়া মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলে—হ্যাঁ ঠাকুরপো, সত্যিই তো, আমাদের জন্যে তুমি কেন অফিস কামাই করবে, তুমি অফিস যাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—। আমাদের কপালে যদি দুঃখ থাকে তো তুমি কী করবে?

এরপর তপেশ গাঙ্গুলী বাধ্য হয়ে চলে গেল।

যেন এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো সন্দীপ। বললে—আপনার দেওরের জন্যে এতক্ষণ ভালো করে কথাই বলতে পারছিলুম না। আপনাদের খিদিরপুরের বাড়ি থেকে চলে এসেও দেখেছি এদের কাছ থেকে আপনাদের রেহাই নেই।

যোগমায়া বললে—ওদের কথা ছেড়ে দাও তুমি বাবা, বিশাখার বিয়ের সম্বন্ধে কী কী শুনে এলে তাই বলো তুমি—

সন্দীপ সবিস্তারে সবই বলে গেল। মেজবাবু বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর কারবার নিয়ে। লণ্ডন অফিসে একজন বড় অফিসার হঠাৎ মারা যাওয়াতে সেখানে দেখবার তেমন লোক নেই। মেজবাবুরই সেখানে গেলে ভালো হতো, কিন্তু এদিকে কলকাতার অফিস নিয়েও মহা গোলমাল বেধেছে। ইউনিয়নে-ইউনিয়নে খুব ঝগড়া-মারামারি, বোমাবাজি চলছে। মেজবাবুকে ইউনিয়নের লোক তার অফিসে কয়েক ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখেছিল। তাতে মেজবাবুর শরীরও খুব খারাপ। সৌম্যবাবুকে শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে পাঠানোর স্থির হয়েছে। ঠাক্‌মা-মণি তো চেয়েছিলেন সৌম্যবাবুর

বিয়ে দিয়ে তবে পাঠাবেন। কিন্তু গুরুদেবের অনুমতি না পেয়ে তো তিনি কিছু করতে পারেন না—

যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—তা গুরুদেব কুষ্ঠিতে কী দোষ পেয়েছেন?

সন্দীপ বললে—সৌম্যবাবুর কুষ্ঠিতে নাকি 'কাল-সর্প-যোগ' আছে। তাই এখন বিয়ে দিতে বারণ করেছেন—

—'কাল-সর্প-যোগ' মানে?

—মানে আমি কি করে জানবো মাসিমা? মল্লিকমশাই-এর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই আমি আপনাকে বললুম—

—কবে সেই যোগ কাটবে?

—দেড় বছর বাদে। এখন থেকে দেড় বছর বাদে বিয়ে হলে নাকি সব দোষ কেটে যাবে!

দেড় বছর! যোগমায়ার মুখটা শুকিয়ে গেল। বললে—তাহলে আর বিশাখার বিয়ে হয়েছে! আমি তো আগেই বলেছিলুম আমার কপালে কি অত সুখ আছে? আর জন্মে আমি কত পাপ করেছিলুম ভগবানের কাছে, তাই এ জন্মে আমার এত দুর্ভোগ!

সন্দীপ হঠাৎ বললে—তা আজ বিশাখার ইস্কুল থেকে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন মাসিমা? ওর তো আসার সময় হয়ে গেছে—

যোগমায়া বললে—আজকাল প্রায়ই ওর এমনি দেরি হয়।

—হ্যাঁ, একটা কথা—

বলে সন্দীপ বললে—আর একটা কথা শুনে এলুম ও বাড়ি থেকে—

—কী কথা?

হঠাৎ দরজার কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। যোগমায়া বললে—ওই বোধহয় ও এসেছে—

কিন্তু দরজাটা খুলে দিয়ে দেখা গেল—না, বিশাখা নয়, অরবিন্দ। বিশাখার ড্রাইভার।

অরবিন্দ আগের দিনের মত সেদিনও বললো—মা ছোটবাবু খুকুদিদিকে নিয়ে গেছেন, আমি বাড়ি যাচ্ছি, ছোটবাবু পরে নিজেই খুকুদিদিকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন—

সন্দীপ সব শুনলো। বললে—এই রকম রোজ হয় নাকি মাসিমা?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ বাবা, আর একদিন হয়েছিল—

সন্দীপ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—সেই কথাই তো শুনে এলুম ও বাড়ি থেকে—

—কী শুনে এলে বাবা?

সন্দীপ বললে—মেজবাবু সব ব্যাপারটা জেনে গেছেন—

—কী রকম?

সন্দীপ বললে—মেজবাবু ঠাক্‌মা-মণিকে এই কথাই বলছিলেন। মেজবাবুর মেয়ে যে ইস্কুলে পড়ে বিশাখাও সেই একই ইস্কুলে পড়ে। মেজবাবুর মেয়ে বাবাকে বলে দিয়েছে যে সৌম্যবাবু নাকি রোজই ওদের ইস্কুলে গিয়ে বিশাখাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় যায়—

—কোথায় যায়?

—হোটেল-টোটেল কোথাও বোধহয় নিয়ে গিয়ে বিশাখার সঙ্গে কথা-টথা বলে। বিশাখা কিছু বলেছে আপনাকে? আপনি কিছু জানেন?

যোগমায়া বললে—হ্যাঁ, এই আগের দিন বিশাখা বলছিল আমাকে। আমি তো শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছি বাবা। শেষকালে বিয়েটা যদি আটকে যায়? তা তোমার ঠাক্‌মা-মণি শুনে কী বললেন?

সন্দীপ বললে—তা আমি শুনতে পাইনি। আমিও তো তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। রোজ সৌম্যবাবুর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে মেলামেশা করা কি ভালো, আপনিই বলুন?

যোগমায়া বললে—আমিও তো তাই ভাবছি। পোড়ারমুখী নিজের ভালো বুঝতে শেখেনি, এমন বোকা মেয়ে নিয়ে আমি কি করি বলতো বাবা?

সন্দীপ নিজেও সেই একই কথা ভাবছিল। সেদিন গোপাল হাজরার সঙ্গে নাইট ক্লাবে গিয়ে দেখা দৃশ্যটার কথাও তার মনে পড়লো। সেই সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে কি বিশাখা সুখী হবে? যে লোক মদ খেয়ে মাতলামি করে আর অত রাতে বাড়ি ফেরে, তার স্ত্রীর জীবন কি সুখের হয়?

তাহলে 'চবিত্র' কথাটার মানে কী? মদ খাওযা, মদ খেয়ে মাতলামি করা, নাইট-ক্লাবে গিয়ে অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্তি করা কি চরিত্র হীনতা নয়? সন্দীপ কি জেনে শুনে সৌম্যবাবুর সঙ্গে বিশাখার এই বিয়ে অনুমোদন করবে?

তারপর আবার তার মনে হলো—দরকাব কী তার এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বাব, সে পরের বাড়িতে অন্নদাস, তার বিধবা মা দেশে পরের বাড়িতে রান্না করে জীবিকা চালায়, সে বলতে গেলে পৃথিবীতে অনাথ। তার এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকারটা কী? সে তো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই প্রাণান্ত। সে তো গোপাল হাজরা নয় যে সৎ অসৎ বিচার না করে বড় বড় মিনিস্টারেব সঙ্গে মেলামেশা করাকেই জীবনের পরমার্থ বলে মনে করবে। কিংবা সে সুশীল সরকারও নয় যে যে কোনও একটা পার্টির মেম্বার হয়ে জীবনের উন্নতি করবার প্রথম দৃঢ় সোপান বলে মনে করবে! তাহলে তার নিজের পথটা কী? কোন্ পথে সে যাবে? কোন্ পথকে সে সংসারে শ্রেষ্ঠ পথ বলে বরণ করে নেবে? কোন্ পথে গেলে সে আদর্শ 'চরিত্র' খুঁজে পাবেন?

কাশীবাবু বলেছিলেন—এই যে আমাদেব ইণ্ডিয়ায় ওই দুর্দশা, এর পেছনেও একটা সামান্য কারণ আছে। কী সে কারণটা। কারণটা হচ্ছে 'চরিত্র'! বিরাট মেসিনের মধ্যে একটা ছোট 'স্ক্রু'র মতো—

সন্দীপ প্রশ্ন করেছিলেন—চরিত্র মানে?

কাশীবাবু বলেছিলেন—আসলে আমাদের ইণ্ডিযার মানুষদের চরিত্রটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কী ওপরের তলায়, কী নিচের তলায়। সব জাযগাতেই ওই জিনিসটার অভাব ডিক্সনারিতে 'চরিত্রে'র অনেক রকম মানে লেখা আছে দেখবে। যেমন 'স্বভাব' 'রীতি-নীতি' 'আচাব-আচরণ' 'চরিত্রের' আসল মানে কিন্তু তা নয় ঃ মদ খেলেই চরিত্র নষ্ট হয় না, চুরি করলে কি ঘুষ খেলেও চরিত্র নষ্ট হয় না। তাহলে 'চরিত্র' কথাটার মানে কী? পরের উপকার করা? পরের দুঃখে কাতর হওয়া? পরের সেবা করা?

তাও না। তা হলে?

'চরিত্র' কথাটির মানে বুঝতে গেলে নাকি সারা জীবন ধরে তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে। এখন তো সে ছোট। কম বয়েস তার। এখন সে কোন্ পথ বেছে নেবে? সকলের তালে তাল দিয়ে যে-কোনও একটা পার্টিতে ঢুকে পড়লে সারা জীবন নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। তাই-ই সে করবে নাকি? গোপাল হাজবা যা করছে, এতকাল আর সুশীল সরকার যা করতে চাইছে, কিন্তু করতে পারছে না, তাই-ই করবে? আর নয়তো অন্য একটা পথও আছে। সে পথটা হচ্ছে সকলের তালে তাল না দেওয়া। সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে যাওয়া।

হঠাৎ আবার সদর দরজার কলিং-বেলটা বেজে উঠলো।

ওই বোধহয় বিশাখা এসেছে!

যোগমায়াই দরজা খুলে দিলে। আর যা ভেবেছে তা-ই। মেয়ে এসেছে।

কিন্তু এক কী চেহারা হয়েছে মেয়ের?

—কী রে, এত দেরি?

সোনার বর্ণ বিশাখার দেহ রোদ্দুরে পুড়ে যেন কালো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

—কী রে, কথাব জবাব দিচ্ছিস নে যে?

বই খাতা ব্যাগ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশাখা কোনও রকমে বললে- -একটু জল দাও—

শৈল তৈরিই ছিল। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা ডাবের জলটা এনে দিতেই বিশাখা সেটা এক চুমুকে খেয়ে নিলে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। যোগমায়াও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গিয়ে মেয়েকে ধরেছে। বললে—কী রে এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই? অরবিন্দ খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। বল কোথায় ছিলি?

ঘরের ভেতরের মা মেয়ের কথা কানে আসছিল

-কথার জবাব দিচ্ছিস না যে? কোথায় গিয়েছিলি বল?

মা র কথার জবাবে বিশাখা বললে -তোমার জামাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল—

—কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

—হোটেলে।

—তুই কেন হোটেলে গেলি?

বিশাখা বললে—বা রে, আমি কি করবো? আমাকে জোর করে নিয়ে- -

—তোর মনে নেই যে তোর এখনও বিয়ে হয়নি? বিয়ে হওয়ার আগে কি বরের সঙ্গে কোথাও যেতে আছে? লেখাপড়া শিখেও কি তোর এই বাদ্ধিটা হলো না?

তারপর একটু থেমে আবার যোগমায়া বললে—তোর মুখে এটা কিসের দাগ?

এ কথার কোনও উত্তর এলো না বিশাখার মুখ থেকে।

—বল এটা কীসের দাগ তোর মুখে?

তবু বিশাখার দিক থেকে কোনও উত্তর নেই।

—বল, কথার জবাব দে। তোর গাল থেকে রক্ত পড়ছে কেন বল্? তোর গালে কি হল? কেউ আঁচড়ে দিয়েছে?

তবু বিশাখা চুপ।

যোগমায়া মেয়ের পিঠে বোধহয় ওম ওম করে কিল্ মারতে লাগলো। তারপর বোধহয় মেয়ের চুলও টানতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপের কানে এল বিশাখার কান্না বিশাখা বলতে লাগলো—আঃ, চুল টানছো কেন? লাগছে, বড্ড লাগছে উঃ ছাড়ো, ছাড়ো মা ছাড়ো

সন্দীপের একবার মনে হলো সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিশাখাকে যোগমায়ার অত্যাচার থেকে বাঁচায়। অসহায় মেয়েকে একান্তে পেয়ে মা তাকে মারবে এ সে কেমন করে সহ্য করবে। তার মনে হলো যোগমায়া যেন বিশাখাকে মারছে না, যোগমায়া যেন বিশাখার চুল টানছে না, যেমন সমস্ত আঘাতটা সন্দীপের শরীরেই এসে প্রত্যাঘাত করছে। যেন বিশাখা নয়, সন্দীপই যেন অসহ্য যন্ত্রণার শিকার হয়ে চিৎকার করে উঠছে—লাগছে, বড্ড লাগছে, উঃ, ছাড়ো ছাড়ো মা ছাড়ো

—বল পোড়ার মুখী বল্ কে আঁচড়ে দিয়েছে? বল্ ?

বিশাখা বললে—আঁচড়ায়নি

—আঁচড়ে দেয়নি তো রক্ত বেরোচ্ছে কেন তোর গাল দিয়ে?

কোন উত্তর নেই বিশাখার দিক থেকে।

যোগামায়া আবার চিৎকার করে উঠলো—বল কেন রক্ত বেরোচ্ছে তোর গাল দিয়ে?

বিশাখা কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার গাল কামড়ে দিয়েছে ও—

সন্দীপ এবার আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। তার মাথা ঘুরেতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে সিঁড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। আর তারপর সোজা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাসেল স্ট্রীটের ওপরে গিয়ে পড়লো। কাশীবাবুর কথাটা তার মনে পড়লো। 'চরিত্র'। কোন পথে সে যাবে? কোন পথকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে বরণ করে নেবে? কোন পথে গেলে সে আদর্শ চরিত্র খুঁজে পাবে?

তখন এক-এক সময় সন্দীপের মনে হতো যে ভগবানের সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা বলবার জন্যে একটা হট্‌-লাইন্ থাকলে বোধহয় ভালো হতো। হঠাৎ দরকার পড়লে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যেত যে এমন হলো কেন? জিজ্ঞেস করা যেত যে এমন হওয়ার দরকার পড়লো কেন? আরো জিজ্ঞেস করা যেত যে এর জন্যে কে দায়ী? কীসের দরকার ছিল খিদিরপুরের মনসাতলা লেন থেকে যোগমায়া দেবীকে তাঁর মেয়ে বিশাখাকে নিয়ে তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে আসার? কে ঠাকুমা-মণিকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এত খরচপত্র করে তাঁর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে রাখার? তাতে বিধাতা-পুরুষের মনের কোন্ শুভ ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছিল।

আর যদি তেমন শুভ ইচ্ছে ছিলই তো কেন তা ঠিক সময়মত পূরণ হলো না কেন এবং কার ইঙ্গিতে ঠিক সেই সময়েই মুখুজ্জে বাড়ির লণ্ডন অফিসের কর্তা কমললাল মেহতার মৃত্যু হলো?

কমললাল মেহেতার মৃত্যু না হলে তো আর সৌম্য মুখার্জীকে অত তাড়াতাড়ি বিলেতে ছুটতে হতো না। সৌম্যবাবুকে বিলেত যেতে হলো বলে তো সন্দীপের জীবনে অমন অসময়ে কাল-রাত্রি নেমে এল। আর কাল রাত্রি নেমে এল বলেই তো সন্দীপ এত বছর ধরে জেল খাটার পর আজ এখানে এসে পৌঁছিয়ে বলতে পারছে 'চরিত্র জিনিসটা কী?

মনে আছে সেদিন দুপুরবেলা রাসেল স্ট্রীটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সন্দীপ আকাশ পাতাল তোলপাড় করে কেবল ভেবেছিল এর প্রতিকার কী? কিন্তু কীসের প্রতিকার, সৌম্যবাবুর সঙ্গে যদি বিশাখার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েই থাকে তো তাহলে এই মেলামেশায় অন্যায়টা কোথায়?

না, আবার নিজের মনের মধ্যেই তার জবাবটাও পেয়ে গিয়েছিল সে! মানুষ নিজেই তো সমাজ সৃষ্টি করেছে, সেই মানুষই সমাজের একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের সম্পর্কের রীতি-নীতিও তো সৃষ্টি করেছে। যে মানুষ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রীতি-নীতি সৃষ্টি করতে পেরেছে সেই মানুষের সেই সব রীতি-নীতি বদলাবার বা সংশোধন করবার তো পূর্ণ অধিকার আছে। তাহলে তার এত ভাবনা কীসের?

আসলে ব্যাপারটা অন্য জাতীয়। আমাদের যারা ভালোবাসে, যারা আমাদের স্নেহ করে, যারা আমাদের ভালো চায় তাদের মনে রাখার দায় আমাদের নেই। আমরা শুধু মনে রাখি তাদেরই যারা আমাদের অবহেলা করে, যারা আমাদের নিন্দে করে, যারা আমাদের হিংসে করে।

পৃথিবী মানুষের সমাজের এ এক অদ্ভুত মানসিকতা।

সেদিন সুশীল সরকারও তাকে দেখে চমকে বললে—এ কী, আপনার কী হয়েছে? আপনার চেহারা এ-রকম হলো কেন?

সন্দীপ বললে—কই, আমার তো কিছু হয়নি—

—না, দেখে মনে হচ্ছে রাত্তিরে আপনার ভালো ঘুম হয়নি।

সন্দীপ চুপ করে রইল, কোনও উত্তর দিলে না। তারপর বললে—আপনারা চাকরি-টাকরি হলো?

সুশীল সরকারেরও মনটা বহুদিন ধরে খারাপ ছিল। বললে—এই সামনে ইলেকশন আসছে, তাতে হয়ত কিছু পয়সা আসতে পারে। যে-কটা টাকা পাই এই ক'দিনে, তারপর তো আবার যে-কে-সেই—

—আচ্ছা ইলেকশনে আপনাদের মাথা-পিছু কত টাকা করে হয়?

সুশীল বললে—সে ঠিক হয় কাজ হিসেবে—

—কী কী কাজ?

সুশীল বললে—কাজ কী কম? যার ষণ্ডা গুণ্ডা চেহারাব ছেলে একটু লেকচার-টেকচার দিতে পাবে, তাদের বাস্তাব মোড়ে মিটিং করতে পাঠানো হয। সে মিটিং-এ লীডাররা থাকে না। তাদেব রেট্ একটু বেশি। দিনে আট-দশ টাকা পর্যন্ত পায তারা।

—আর অন্যরা?

—অন্য ছেলে-মেয়েরা মই আর আঠার হাঁড়ি নিয়ে দেওযালেব গায়ে পোস্টার সাঁটতে যায়। তাদের খাটুনি বেশি। ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠেই বেবিযে পডতে হয়। তারা পায় মাথা-পিছু চার টাকা করে। অথচ তাদের কাজটা সোজা নয—

—আর আপনি? আপনাকে কী কাজ দেবে?

—আমার কাজ দেয়ালে লেখা। লীডাররা স্লোগান বলে দেয় আব আমরা বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে সেগুলো রঙ-তুলি দিয়ে লিখি—

—সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী লিখেন—

সুশীল বলে—সেসব তো আপনারা দেখেছেন—রসা বোডের দেওযালে যত ছড়া লেখা দেখবেন, সব আমার লেখা—

—একটা নমুনা বলুন না—

—তবে শুনুন—

বলে সুশীল আবৃত্তি করতে লাগলো ঃ

"রাস্তার মোড়ে লালবাতি জ্বেলে
শকুনেরা দেয় সন্ধে।
জোড়া-বলদকে দেওয়ালে লট্‌কে
ঠোঁট চেটে বলে ভোট দে।।"

সন্দীপ শুনে বললে—বাঃ, চমৎকার। এ-সব কারা লেখে?

সুশীল বললে—আমাদের পার্টির ভাড়া করা কবি আছে, তারা লেখে। এ রকম আরো আছে, শুনবেন?

"আয় লো অলি কুসুমকলি
বাবুর-বাগানে,
জোড়া-বলদে ভোট দিলে
চাকরি পাবি সবাই মিলে
গাড়ি বাড়ি যা কিনবি
এই নে টাকা, নে।।"

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—এই সব ছড়ার জন্যে কত টাকা পার্টি দেয়?

সুশীল বললে—কত দেওয়া হয় তা ঠিক জানি না। যারা আমাদের পার্টিতে লেখে তারা আবার অন্য পার্টির হয়েও লিখে দেয়। তারা ভাড়া করা পোয়েট সব।

তারপর একটু থেমে বললে—আর তা ছাড়া ভোট তো আর রোজ হয় না। পাঁচ বছরে একবার হলো তো বাস তারপর তো শুধু বসে থাকা। তারপর কবে দুর্গাপুজো, কবে সরস্বতী পুজো, কবে কালীপূজো, আর বড় জোর একবার হয়তো সন্তোষী মার পুজো, এই করেই তো আমাদের জীবন কাটে।

কথা বলে সুশীল গম্ভীর হয়ে রইল।

সুশীলের কথা শুনে সন্দীপের মনে কষ্ট হলো। এত কাণ্ড করেও কিনা সুশীল একটা চাকরি পাচ্ছে না। ঠিক সন্দীপের মতই অবস্থা সুশীলের।

সুশীল বললে—না, আপনার অবস্থা তবু আমাদের চেয়ে একটু ভালো। কিন্তু আমার অবস্থাব কথা একটু ভাবুন তো। আমাব মত কত ছেলে যে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। এই যে দেখছেন আমাদের কলেজে ছেলেরা পড়ছে এরা কেন পড়ছে জানেন? চাকরি পায় না বলে সবাই বাড়িতে বসে বসে কী করবে তাই পড়ছে। আর যারা লেখাপড়া শিখতে পায়নি তারা গুণ্ডা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় বোমাবাজি করে হাজি-মস্তান হচ্ছে—

—অথচ দেখুন—

বলে সুশীল একটু থেমে আবাব বললে—এসব কথা তো পার্টিব দাদাদের বলা যায় না। দাদারা ভরসা দিচ্ছে এবার ইলেকশনে জিতলে সক্কলকে চাকরি করে দেব, কিন্তু কতবার ইলেকশন হলো, দাদারা জিতলও, কিন্তু কই, কারো চাকরি তো হলো না।

সন্দীপ নিজের সঙ্গে সুশীলের ভাগ্য তুলনা করে দেখলে। সে তো ওদের চেয়ে ভালোই আছে। তার নিজের অবস্থা তো সুশীলদের অবস্থার চেয়েও ভালো! তাকে তো নিজেকে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের দুর্ভোগ সইতে হয় না। তাকে তো বুড়ো অথর্ব বাপ-মা'র ভাব বইতে হয় না। তার তো সুশীলদের মত অবিবাহিত বোনের বোঝা বইবার দায় নেই। তাহলে কেন তার মনে এত অশান্তি? সে অশান্তি কি তার নিজেব অক্ষমতার কথা ভেবে, না সমস্ত দেশের সমস্ত সুশীলেব কথা কল্পনা করে?

সেদিন হাতীবাগানেব বাজারের পাশ দিয়ে আসতে আসতে সন্দীপ আবার দেখতে পেলে রাস্তার মোড়ের ওপরে একটা জায়গায় বেদীর মত তৈরি কবা। তাতে একটা ইলেক্‌ট্রিকেব আলো জ্বলছে। পাশে অনেক রকম ফুল ছড়ানো রয়েছে, আর ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে অনেকগুলো। আব তার মাথায় সাইনবোর্ডেব ওপর লেখা রয়েছে ঃ

শ্রীশ্রী জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে
বিশ্বশান্তি স্থাপনের নিমিত্ত
এই দেবস্থানে প্রত্যহ
পূজা-পাঠ ও যাগযজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হইবে।
ঈশ্বরের সেই নির্দেশ পালনেব হেতু
আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।
সেবাইত ঃ শ্রীললিত কুমাব মাইতি (লালটু)

আগের বারে এই রকম সাইন বোর্ড টাঙানো ছিল মির্জাপুর স্ট্রীটে, আর এবার-সেই একই বকম সাইনবোর্ড রয়েছে এই হাতীবাগানেব বাজারের মোড়ে। সেবারেও বেদীর ওপর কিছু খুচবো আধুলি-সিকি দশ-নয়া, পাঁচ-নয়া ছড়ানো ছিল, এবারও সেই একই রকম খুচরো ছড়ানো। তফাতের মধ্যে হচ্ছে সেবারে সেবাইত ছিল শ্রীভূতনাথ দাস (ভূতো) আর এবাবে শ্রীললিত কুমার মাইতি (লালটু)।

সন্দীপ অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে সাইনবোর্ডটা দেখতে লাগলো। অবিকল একই চেহারা, একই স্টাইলের লেখা সেই একই জগন্মাতার স্বপ্নাদেশ, সেই একই ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের জন্যে যথাসাধ্য সাহায্যের আবেদন। সবই হুবহু এক। ব্যতিক্রম শুধু সেবাইতের নামের। সেবারকার সেবাইত শ্রীভূতনাথ দাস (ভূতো) আর এবারকার সেবাইত শ্রীললিত কুমার মাইতি (লালটু)।

সন্দীপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে চলে আসছিল। হঠাৎ একটা ছেলে ডাকলে— দাদা, অ দাদা—

সন্দীপ পেছন ফিরে দেখলে সেই একই রকম চেহারার একটা ছেলে তার দিকে চেয়ে আছে। ছেলেটা বললে—কই দাদা, কিছু চাঁদা দিলেন না যে?

সন্দীপ বললে—ভাই, আমিও তোমার মত, আমারও অবস্থা খারাপ, চাকবি-বাকরি কিছু নেই—

ছেলেটা কিন্তু হতাশ হলো না। বরং উৎসাহিত হলো একটু। বললে—আপনারও চাকরি-বাকরি নেই।

সন্দীপ বললে—না ভাই, নেই—

ছেলেটা বললে—আমারও নেই। তা আপনি কী করেন?

সন্দীপ বললে—একজনদের বাড়ির কাজকর্মের দেখাশোনা করি তাই সেইখানে থাকা খাওয়টার জন্যে কোনও খরচা লাগে না। আর ল'কলেজে পড়ি—

—তাহলে তো আপনি বি-এ পাস করেছেন। তবু চাকরি পাচ্ছেন না?

—না!

ছেলেটা বললে—আপনি এই কাজ করবেন? এই আমি যা করছি—?

সন্দীপ বললে—কী কাজ? কোথায়?

ছেলেটা বললেন—জোড়াসাঁকোর বাজারের মোড়ে একটা ভালো জায়গা এখনও খালি পড়ে আছে, সেখান দিয়ে দিনে-রাতে দশ বারো হাজার লোক রোজ যাতায়াত করে। সেখানে আমি আপনার জন্যে একটা জায়গা করে দিতে পারি। এই রকম একটা সাইনবোর্ড আপনি সেখানে লাগিয়ে দেবেন। এতে দিন গেলে ফেলে ছড়িয়ে আপনি আট দশ টাকা পেয়ে যাবেন—

—আট-দশ টাকা প্রতিদিন?

—হ্যাঁ, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে। অথচ খরচ বেশি নয়। এই সাইন-বোর্ডটা আমি আপনাকে পাঁচ টাকার মধ্যে তৈরি করিয়ে দিতে পারি। ওইটেই আবার অন্য জায়গায় তৈরি করতে দিলে তারা আপনার ট্যাঁক থেকে বারো টাকা খসিয়ে নিয়ে ছাড়বে। আর খুব যদি কমে তো বড় জোর দশ টাকা। দশ টাকার কমে কিছুতেই নয়। কিন্তু আমি ওই একই জিনিস পাঁচ টাকাতেই করিয়ে দেব আপনাকে —

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—অত কম টাকায় কী করে দেবে তুমি?

ছেলেটা বললে—সে আমার জানা শোনা ছুতোর-মিস্ত্রী আছে একজন। সে আমার পার্টির লোক—। আমি নিজে সে-ভার নিয়ে নেব। যাতে ভালো কাঠ দেয়, তা আমি দেখবো—

এখানেও পার্টি! এই লালটুও পার্টি করে?

সন্দীপ আবার জিজ্ঞেস করলে—তা আর কিছু খরচ লাগবে না?

লালটু বললে—আর মাত্র পাঁচ টাকা লাগবে—

—আর পাঁচ টাকা লাগবে কিসের জন্যে?

লালটু বললে—জোড়াসাঁকো বাজার কমিটির চাঁদা। ওটা আপনাকে মাসে মাসে দিতে হবে না।, একবার জায়গাটা দখল করার জন্যে আগাম দিয়ে দিলেই চলবে। আপনি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে দেবেন, তাহলে আমি সব করে দেব। ওই জায়গাটাও আপনার নামে রিজার্ভ হয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে এই সাইনবোর্ডটাও—

সন্দীপ বললে—ঠিক আছে, পরে আবার একদিন আসবো, আমি ভেবে দেখি—

বলে চলে আসছিল। লালটু বললে—একটু তাড়াতাড়ি করবেন দাদা, নইলে আরো অনেক লোকের লোভ আছে ওই জমিটার ওপর, বেশি দেরি করবেন না যেন—

সন্দীপ রাজি হয়ে সেখান থেকে চলে এল। অবাক কাণ্ড! সব জায়গাতেই পার্টি! এই পার্টিরা কি সমস্ত দেশটাই দখল করে নেবে একদিন? সব মানুষই কি একদিন পার্টির ভাড়াটে হয়ে যাবে? ওই সুশীল, ওই শ্রীভূতনাথ দাস (ভূতো), ওই শ্রীললিত মাইতি (লালটু), ওরাই কি একদিন এই কলকাতার মালিক হয়ে বসবে? যেমন করে তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করা মিনিস্টার শ্রীপতি মিশ্রের পি-এ হয়েছে গোপাল হাজরা, ঠিক তেমনি করে? কলকাতায় এক ইঞ্চি ফাঁকা জমিও আর থাকবে না?

বাড়ির সদর গেটের সামনে আসতেই গিরিধারী রোজকার মত সন্দীপকে সেলাম করলে। সন্দীপও তাকে সেলাম করলে কপালে হাত ঠেকিয়ে। গিরিধারী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে— আচ্ছা বাবুজী, এক বাত্ পুছ?

সন্দীপ দাঁড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—কী কথা, বলো?

গিরিধারী জিজ্ঞেস করলে—শুনা হ্যায় ছোটাবাবু বিলাইত্ যা রহা হ্যায়? ইয়ে সাঁচ হ্যায় ক্যা?

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ, গিবিধারী, তুমি ঠিকই শুনেছ—

—কিত্‌নে দিনো কে লিয়ে?

সন্দীপ বললে—ত বলতে পাবি না গিবিধারী। তবে যা শুনছে তুমি তা ঠিকই শুনছে, ছোটবাবু বিলেত যাচ্ছে —

কথাটা শুনে গিরিধাবী যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে যাওয়ার কারণও আছে। এতদিন ধরে বে-আইনী কাজ করে আসছিল সে। রাত ন'টার সময়ে সদর-গেটে চাবি লাগিয়ে দেওয়ার হুকুম ছিল তার ওপর। বাড়ির মাল্‌কিনের কড়া হুকুম। গিরিধারী সে-হুকুম অমান্য করে করে সৌম্যবাবুকে রাত ন'টাব পরও গেটের তালা খুলে দিত! তার জন্যে সৌম্যবাবু গিরিধারীকে মাসে মাসে মোটা মাসোহারা দিত! এখন যদি সৌম্যবাবু বিলেতে চলে যায় তো তাতে তার একটা বাঁধা উপরি-আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তার তো বিমর্ষ হওয়ার কথাই।

গিরিধারী আবার জিজ্ঞেস করলে—তা কতদিনের জন্যে যাবে ছোটবাবু?

সন্দীপ বললে—তা আমি বলতে পারি নে—

বলে সন্দীপ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।
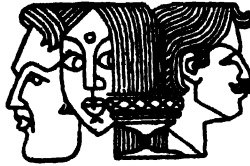
মার্ক টোয়েন তাঁর একটা বইতে লিখেছিলেন—Be good and you will be linesome

অর্থাৎ পৃথিবীতে যে ভালোমানুষ হয় সংসারে তাকে নিঃসঙ্গ হয়েই জীবন কাটাতে হয়। সন্দীপেরও তাই কোনও দিন কোনও বন্ধু হয়নি। সে নিঃসঙ্গ বলেই সকলকে দেখবার নিরপেক্ষ দৃষ্টি সে পেয়েছে। শুধু নিবপেক্ষ দৃষ্টিই নয়, একলা চলবার শক্তিও সে তাই অর্জন করেছে। একলা কে চলতে পারে? ঈশ্বরও একলা, তাই ঈশ্বর অত শক্তিমান। দুর্বলরাই তো দল বাঁধে! নইলে কত অসহ্য ব্যথায়, কত নিদারুণ অত্যাচারে তো সে কখনও সাহস হয়নি। সেদিন কে তাকে সাহস জুগিয়েছিল? কে তাকে অভয়বাণী শুনিয়েছিল? সে তার নিজের শুভ বুদ্ধি। যে নিঃসঙ্গ মানুষ, তার একমাত্র সঙ্গী তার শুভবুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধিই সেই নিঃসঙ্গ মানুষকে আমরণ সঙ্গ দিয়ে সজীব রাখে। বরাবর এই শুভবুদ্ধিই ছিল সন্দীপের একমাত্র পাথেয়।

সেদিনও সেই তার শুভবুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়েই তিন নম্বর রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েছিল। এও তো তার একটা কাজ। কাজ মানে দায়িত্ব। এই দায়িত্বের জন্যেই তো তাকে রাখা হয়েছে।

—কে?

ভেতরে কি তাহলে আর কেউ নেই? অন্যদিন তো জবাব দেয় শৈল কিংবা মাসিমা তারা তাহলে কোথায় গেল?

সন্দীপ বললে—আমি, সন্দীপ।

দরজাটা খুলে যেতেই সন্দীপ একেবারে বিশাখার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, বাড়িতে তুমি একলা নাকি?

—হ্যাঁ—

—মাসিমা কোথায় গেলেন?

বিশাখা বললে—ওমা, জানো না তুমি, আজ যে মা'র হিতসাধিনী ব্রত, মা তাই শৈলদি'কে নিয়ে গঙ্গায় গেছে!

সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—কিসে গেলেন?

বিশাখা বললে—অরবিন্দ গাড়ি নিয়ে এসেছিল, আগে থেকে বলে রাখা হয়েছিল তাকে—

—আর তুমি? তুমি ইস্কুলে যাওনি?

বিশাখা বললে—কী বোকা, আজ পাব্‌লিক হলিডে, তাও জানো না? ওই দেখ ক্যালেন্ডারটার দিকে চেয়ে দেখ হাঁদারাম, লাল-তারিখ দেখতে পাচ্ছো না?

তাও তো বটে! যে-মানুষ চাকরি করে না সে-মানুষ লাল-তারিখের হিসেব রাখবে কেন? তাহলে তো তার কলেজও ছুটি! আজ তাকে কলেজেও যেতে হবে না তাহলে!

সন্দীপ বললে—তোমাকে একলা রেখে মাসিমা চলে গেলেন?

বিশাখা বললে—কেন, একলা থাকতে কীসের ভয়? দারোয়ান তো রয়েছে নিচেয়—

—তবু দারোয়ানও তো পুরুষ মানুষ!

বিশাখা বললে—কেন, তুমিও তো পুরুষ মানুষ—

—আমি?

বিশাখা তেমনি করেই হাসতে লাগলো। বললে—হ্যাঁ, তুমি বুঝি আমার কোনও ক্ষতি করতে পারো না?

—আমি তোমার ক্ষতি করবো? বলছো কী তুমি?

—হ্যাঁ, পুরুষ মানুষ তো মেয়েদের সব রকম ক্ষতি করতে পারে!

—তা বলে আমি? এতদিন পরে তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে?

বিশাখা বললে—কেন, আমি অন্যায়টা কী বলেছি?

সন্দীপ বললে—অন্যায় নয়? তোমার দেখাশোনা করবার জন্যেই তো আমাকে রাখা হয়েছে।

বিশাখা বললে—কিন্তু অনেকে তো রক্ষক হয়েই ভক্ষক সাজে! সাজে না?

—অনেকে সাজে বলে কি আমিও তাই?

বিশাখা বললে—অনেকেই যখন ভক্ষক হয় তখন তুমিই বা হবে না কেন? তুমি কি আলাদা?

সন্দীপের মুখটা শুকিয়ে গেল। বললে—এ-কথার পরে আমার আর কিছু বলবার নেই, আমি তাহলে এখন আসি, মাসিমাকে বলে দিয়ো এসেছিলুম—

বিশাখা বললে—মনে করেছ আমি তোমার পথ আটকে দাঁড়াবো? মোটেই না। আমি তেমন মেয়ে নই—। আমি তোমাকে চলে যেতেও বলবো না, থাকতেও বলবো না—

সন্দীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—দেখ বিশাখা, একটা কথা তোমাকে বলে যাই। এত চালাক চতুর হওয়া ভালো নয়!

বিশাখা বললে—তা তো বটেই, চালাক-চতুর হলে যে পরের পেটের কথা জেনে ফেলা যায় কিনা, তাই ও-কথা বলছো—

সন্দীপ বললে—সত্যি, আমি যত দেখছি তোমাকে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি—দেখ, যে মানুষ সময়ে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে মানুষের সমাজ তাকে নির্বোধই ভাবে! কিন্তু তা বলে সত্যিই আমি নির্বোধ নই। আমি সব বুঝি—

—সত্যিই তুমি বোঝ?

—বুঝি না? সব বুঝি!

বিশাখা বললে—কিন্তু সব বুঝলে তুমি চুপ করে থাকো কেন? প্রতিবাদ করো না কেন?

—কীসের প্রতিবাদ?

—অন্যায়ের প্রতিবাদ!

সন্দীপ কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—কীসের অন্যায়?

বিশাখা বললে—অন্যায় কীসের নয়? সব রকম অন্যায়—

সন্দীপ তবু বুঝতে পারলে না। বললে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ভালো করে স্পষ্ট করে বলো...

বিশাখা বললে—এই যে তুমি বলছো তুমি নির্বোধ নও, সব বুঝতে পারো? তাহলে এই যে তোমাকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করি, তোমাকে কত কী খাবাপ কথা বলি, তুমি তো কই রাগ করো না—প্রতিবাদ করো না—

সন্দীপ চুপ করে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। বললে—তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয় বিশাখা?

—কেন, তুলনা হয় না কেন?

সন্দীপ বললে—দেখ, সব মানুষের সব রকম অধিকার থাকে না, আমাকে ঠাট্টা করবার বা গালাগালি দেবার অধিকার তোমার আছে বলেই তো তোমার ওপরেও আমার রাগ করবার বা প্রতিবাদ করবার অধিকার থাকবে, তা তো নয়—আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কী, বলো?

সন্দীপ বললে—বললে তুমি রাগ করবে না তো?

—না, বলো—

সন্দীপ বললে—যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে আমি তাঁর চাকর। কিংবা বোধহয় প্রায় চাকরেরও অধম। একদিক থেকে তোমার কাছেও আমি তাই। তোমার ঠাট্টার তোমার গালাগালির আমি প্রতিবাদ করবো এমন আহাম্মক আমাকে ভেবো না আমি যাই—

বিশাখা হঠাৎ সন্দীপের একটা হাত ধরে ফেললে। ধরে তাকে কাছে টেনে বললে—সরে এসো, এই দেখ, আমার গালে কী হয়েছে দেখ—দেখছো—

সন্দীপ বিশাখার গালটা দেখে চমকে উঠলো। বললে—এ কী, এটা তো আগে দেখিনি, এটা কী করে হলো?

বিশাখা বললে—তোমার মনিব কামড়ে দিয়েছে—

সন্দীপ হতবাক্। বললে—সে কী? কেন?

বিশাখা বললে—আদর করে—

হঠাৎ সদরে কলিং-বেলটা বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা সন্দীপকে দূরে ঠেলে দিলে। বললে—সরে যাও, শিগগির সরে যাও, মা এসেছে—
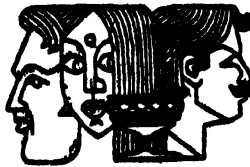
ছোট-ছোট দুঃখ, ছোট-ছোট সুখ, ছোট-ছোট হাসি, ছোট-ছোট কান্না, আনন্দ, ছোট-ছোট বিস্ময় এই নিয়েই তো মানুষের জীবন। কে যেন বলেছিল—সময় হু হু করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। সময় স্থির হয়ে থাকে। আমরাই চলে যাই—

সক্রেটিস চলে গেছেন, তথাগত বুদ্ধদেব চলে গেছেন, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, যীশুখ্রীস্ট, পরমহংসদেব সবাই-ই চলে গেছেন। এমনকি আমার বাবা, মা, ঠাক্‌মা-মণি, মল্লিকমশাই, সবাই-ই চলে গেছেন। কিন্তু সময় সেই আগেকার মত স্থাণু হয়ে আছে। একদিন আমিও তাদের মত চলে যাবো কিন্তু সেদিনও সময় থাকবে। আমরা সবাই চলে যাওয়ার জন্যেই বেঁচে আছি, কিন্তু সময় চলে যাবার নয় বলেই সে বেঁচে আছে।

জেলে বসে বসেই সন্দীপ এই কথাগুলো ভেবেছিল। জেল থেকে বেরিয়েও সন্দীপ এই কথাগুলোই ভাবছে।

স্যাক্সবী মুখার্জী ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানীর ওপর সেদিন সে কী দুর্যোগের অশনিপাত আরম্ভ হলো! একটা নয়, একটার পর একটা। যে মেজবাবু কাজ করতে করতে কাজের চাপে হিমশিম খেয়ে যেতেন সেই মেজবাবুরই শেষকালে পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হলো। সব সময়ে কেবল মুখে বলতো—আর পারি না—

নাগরাজন এক-একটা চিঠি নিয়ে দেখাতে আসতো। দিল্লীর জরুরী সব চিঠি। কত রকম হুকুম, কত রকম হুম্‌কি। ওপর নিচ আশ-পাশ, সব দিক থেকেই আসতো সেই হুকুম আর হুম্‌কি।

কিন্তু কেন যে জিনিস পত্রের দাম বাড়ে আর কেন যে স্টাফের মাইনে বাড়াবার দাবি জোরদার হয়, এর সহজ অঙ্কটা দিল্লীও বোঝে না, রাইটার্স বিল্ডিংও বোঝে না।

মেজবাবু বলেন—তুমি লিখে দাও নাগরাজন যে পলিটিক্যাল পার্টির দাদাদের চাঁদার জুলুম যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে আমাদের প্রোডাকশানের দাম বাড়বেই—বাড়তে বাধ্য কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।

নাগরাজন বললে—না না, ও-কথাটা লিখবেন না স্যার, চাঁদার জুলুম তো নতুন নয়, ও জুলুম তো সব পার্টির আমলেই ছিল, এখনও আছে—থাকবেও চিরকাল—

—কিন্তু তাহলে মার্কেট প্রাইস্ আমরা কী করে ঠিক রাখবো? আমাদের ওপর পার্টির চাঁদার জুলুমও কমবে না, বোনাসের চাপও কমবে না, বাড়তি মাইনের দাবিও কমবে না অথচ প্রাইস্ ফিক্সড্ রাখতে হবে, এ কী করে সম্ভব?

নাগরাজন বললে—স্টীল্ অথরিটি তো এ সব জানে, এর পরও যদি আমরা ওই আর্গুমেন্ট দিই তাহলে আমরা ওদের বিষ নিজরে পড়ে যাবো স্যার—

—তাহলে লিখে দাও কলকাতার পাওয়ার শর্টেজের জন্যে প্রাইস্ না বাড়িয়ে আমাদের উপায় নেই—

কিন্তু সেটা লেখাও তো খারাপ। কত ফার্ম তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে অন্য স্টেটে কারখানা সরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে তাতে ক্ষতিটা কার হয়েছে? ক্ষতি তো বেঙ্গলেরই। এখানকার লোক্যাল লোকরা চাকরি পাবে না এখানকার কোনও ডেভেলপ্‌মেন্ট হবে না। সেটা কি ভালো? সারা দেশের শরীরের মধ্যে মাথা কাঁধ পা বুক সব কিছু মজবুত রইল, আর একটা হাত কি একটা পা যদি পঙ্গু হয়ে থাকে, তাহলে কি সেটা দেশের পক্ষে ভালো? সে-দেশের মানুষ কি সুস্থ হয়, সুখী হয়?

নাগরাজনের সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অনেক গোপন আলোচনা হয় এই নিয়ে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় না। মাঝখান থেকে শরীর খারাপ হয় মুক্তিপদ মুখার্জীর।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করে—কী হলো, তোমার লন্ডন অফিসের কী খবর?

মুক্তিপদ বলেন—সৌম্য তো লন্ডন যাচ্ছে—

নন্দিতা বলে—দেখবে, শেষ পর্যন্ত ও যাবে না। শুধু কথার কথা—

—কেন? যাবে না কেন?

নন্দিতা বলে—তোমার মা-ই নানা বায়না করে ওকে যেতে দেবে না—দেখো—

মুক্তিপদ বলেন—না-না, কাশী থেকে তো মা'র গুরুদেব খবর দিয়েছে যে ওর বিয়ে না দিয়েই লন্ডনে পাঠাতে। এখন নাকি ওর কুষ্ঠিতে কী একটা খারাপ যোগ আছে, তাতে এখন বিয়ে দিলে ওর ক্ষতি হবে।

নন্দিতা বলে—ওই সব গুরুদেবরাই তোমার মা'র সব্বোনাশ করবে, দেখে নিও—

এ-সব কথা নতুন নয়। আগেও এসব কথা নন্দিতা অনেকবার বলেছে। মুক্তিপদ সে-সব কথায় তেমন কান দেয়নি। কিন্তু যখন সত্যিই সৌম্যর যাওয়াব বন্দোবস্ত পাকা হলো তখন নন্দিতা একটু মুষড়ে পড়লো।

মুক্তিপদ তখন বললেন—কী হলো, তুমি যে বলেছিলে সৌম্য বিলেতে যাবে না?

পিক্‌নিক্‌ কাছেই ছিল। সে-ই কথাটার জবাব দিলে। বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কাজিন-ব্রাদার লন্ডনে যাচ্ছে—

নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে—তুই কী করে জানলি?

—আমাকে মিস্‌ গাঙ্গুলী বলেছে যে—

—তুই তার সঙ্গে কথা বলিস?

পিক্‌নিক্‌ বললে—হ্যাঁ, মিস্‌ গাঙ্গুলী খববটা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। ভেরি স্যাড্‌ নিউজ, শুনে গম্ভীর হবে না?

এ-সব কথা শুনতে ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ শোনবার সময় থাকে না মুক্তিপদর। সৌম্য চলে যাবে, তার সব ব্যবস্থা করতে হবে মুক্তিপদকেই। টেলেক্সও করা হয়েছে অনেকবার। শুধু থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাই নয় বা তাব কাজের প্রোগ্রামই নয়, তাকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছেন মুক্তিপদ। তুমি বেশি কথা বলবে না, যারা বেশি কথা বলে তারা ভাবে কম। তুমি ভাববে বেশি, বলবে কম! কারো সঙ্গে বিজনেসের কথা বলবার সময়ে বরাবর একটা বোতল নিয়ে বসবে। বোতল নিয়ে বসলে মাঝে মাঝে গেলাসে সিপ্‌ দেবে, তাতে তোমার কম কথা বলতে হবে। সেই জন্যেই ইংরিজীতে একটা কথা আছে—They never taste who always drink. They always talk who never think. আর ড্রিঙ্ক করতে-করতে কথা বললে পার্সোন্যালিটিও কমে যায়। কিংবা তার চাইতে আর একটা কাজ করতে পারো—

সৌম্য বললেন—কী?

মুক্তিপদ বললে—তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ অনেক লোক সিগ্রেট না খেয়ে পাইপ খায়। পাইপেও পার্সোন্যালিটি বাড়ে, আর তাতে কথাও কম বলতে হয়। তুমি দেখবে যারা পাবলিকের কাছে নিজেদের বাজার-দরটা বাড়াতে চায় তারা সবাই পাইপ টানে। তবে সুবিধেটা এই যে কথার জবাব দিতে দেরি হলে কেউ কিছু মনে করে না, মেপে-মেপে ওজন করা কথা বলা যায়—আর ভাববার জন্যে একটু সময়ও পাওয়া যায়—

এর পর আছে টেবল্‌ ম্যানার্স।

মুক্তিপদ সৌম্য মুখার্জীর গার্জিয়ান। সুতরাং অভিভাবক হিসেবে সৌম্যকে তাঁর সবই শেখানো উচিত। স্পুন আর ফর্ক দিয়েই সবাই খায় ওখানে। হাত দিয়ে যেন খেয়ো না। প্রথমে দেবে 'স্যুপ'। 'স্যুপ' খাওয়া শক্ত খুব, জানো তো? কলকাতার অনেক হোটেলেই তুমি লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছ নিশ্চয়ই। বলো তো 'স্যুপ' কী করে খাবে?

সৌম্য জানে না।

—অনেকেই 'স্যুপ-প্লেটটা' বাঁ হাত দিয়ে ধরে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে খায়। সেটা ব্যাড ম্যানার্স। প্লেটটা নিচের দিকটা উঁচু করে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে খাবে। ওটাই নিয়ম—

সৌম্য চুপ কবে আঙ্কেলের কথাগুলো শোনে। কথাগুলো সে বোঝে কি বোঝে না, তা জানা যায় না।

এর পর অফিস এ্যাফেয়ার্স! এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে শক্ত! তুমি তো নাগরাজনের কাছে এতদিন সব শিখেছ। ডেবিট ক্রেডিট, ব্যালেন্স-শীট—সব ব্যাপারটাই তো তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। আর এ সব শেখবার জিনিসও নয় ঠিক। সাউথ-ইন্ডিয়ানরা হচ্ছে বর্ন-ম্যাথামেটিসিয়ান। এ্যাকাউন্টস্‌টা তাদের শিখতে হয় না, ওটা ওদের রক্তের মধ্যে আছে। আমাদের লন্ডন অফিসেও আমি একজন সাউথ-ইন্ডিয়ানকে রেখেছি, তার নাম আয়েঙ্গাব। আমি আয়েঙ্গারকেও টেলেক্স করে দিয়েছি, সে তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে। দেখ, একটা কথা আমার কাছে জেনে রাখো— হোয়াট ইজ ট্যালেন্ট?

সৌম্য নিয়ম-মাফিক চুপ করে রইল।

মুক্তিপদ বলতে লাগলেন, ট্যালেন্টের বাঙলা মানে হচ্ছে প্রতিভা। জীবনে উন্নতি করতে গেলে দুটি জিনিস অপরিহার্য। একটা হচ্ছে ক্যারেকটাব আর একটা ট্যালেন্ট্‌। একটা কথা শোন, সেটা

শুনলে বুঝতে পারবে ও-দু'টো কী জিনিস। কথাটা হলো ঃ Talent is developed in retirement; character is formed in the rush of the world কথাটা জার্মানীর কবি গোটের। তুমি যদি প্রতিভাবান হতে চাও তো তোমাকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে, আর যদি চরিত্রবান হতে চাও তো তোমাকে মানুষের ভিড়ের মধ্যে সময় কাটাতে হবে। অর্থাৎ তোমাকেই ভেবে বের করতে হবে তুমি কোনটা হতে চাও—প্রতিভাবান না চরিত্রবান—

এমনি আরো অনেক কথা বলতে লাগলেন মুক্তিপদ। মুক্তিপদ নিজের জীবনে যে কথাগুলো সব ভেবে ভেবে বার করেছিলেন অথচ নিজের ওপরে তা ভালো করে প্রয়োগ করতে পারেন নি, সেই কথাগুলো ভাইপোকে শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন।
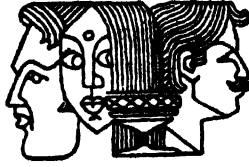
শেষকালে বলেছিলেন—আমি যা জেনেছি যা শুনেছি তাই-ই তোমাকে বলে গেলাম, এখন তুমি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যা পারবে করবে, আমি আর কী বলবো! আজ রাত্রে তোমার প্লেন ছাড়বে, সেখানে গিয়েই আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলবে। তুমি যা দেখবে শুনবে আমাকে জানাবে, আমিও তোমাকে আমার এ্যাড্‌ভাইস দেব—

এই পর্যন্তই কথা হয়েছিল সেদিন। আর সেই দিনই রাত্রে মুক্তিপদ সৌম্যকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

মানুষ তো ভাবে অনেক কিছু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সব মানুষের সব ইচ্ছে ফলে? এই যে স্যাক্সবী মুখার্জী ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার এম মুখার্জী তাঁর ভাইপো কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার এস মুখার্জীকে এত উপদেশ দিলেন তাও কি সব ফলেছিল?

এর উত্তর এখন পাওয়া যাবে না, উত্তর পাওয়া যাবে তখনই যখন 'এই নরদেহ' উপন্যাস শেষ হবে।

তার আগে অন্য কথা বলে নিই।

সেদিন মল্লিক-মশাই রাত্রে হঠাৎ সন্দীপকে ডাকতে লাগলেন—ও সন্দীপ, ওঠো, ওঠো—

মল্লিককাকার ডাকাডাকিতে সন্দীপ জেগে উঠলো। বললে—কী হলো মল্লিককাকা, কী হলো?

মল্লিককাকা বললেন—ওঠো, ওদিকে সব গোলমাল হয়ে গেছে—

—কী গোলমাল?

মল্লিককাকা বললেন—সৌম্যবাবুর লন্ডন যাওয়া হলো না—

—কেন?

মল্লিককাকা বললেন—ঠাক্‌মা-মণি আমাকে ডাকছেন, সৌম্যবাবু দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর প্লেন আজকে খারাপ হয়ে গেছে, ছাড়বে না। কালকে ছাড়বে।

বলতে বলতে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। ওপরে ঠাক্‌মা-মণির কাছে যেতেই তিনি বললেন—জানেন তো সরকার মশাই, খোকা ফিরে এসেছে এয়ারপোর্ট থেকে—

—হ্যাঁ, তাই তো শুনলুম, কিন্তু খোকাবাবু কেন ফিরে এলেন?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—শুনলুম তো যে প্লেন নাকি মেরামত করতে হবে! যাক্ গে, ও-রকম হয় মাঝে মাঝে; আমি একবার কর্তার সঙ্গে জার্মানী গিয়েছিলুম, সেখান থেকে লন্ডনে আসবো,

ঠিক সেই সময় প্লেন খারাপ হয়ে গেল। আমরা একদিনের জন্যে আটকে গিয়েছিলুম। এখন আমি আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি—

—বলুন।

—ওদিকে অন্য আর একটা বিপদ হয়েছে—আমাদের বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে নাকি কী একটা মেসিনে আগুন লেগে গেছে। মেজবাবু এখানে এসেছিলেন, টেলিফোনে সেই খবরটা আসতেই তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে সেখানে চলে গেছেন। তাই আপনাকে ভোরবেলা খোকাকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে যেতে হবে—

মল্লিকমশাই বললেন—তা যাবো। কখন বাড়ি থেকে রওনা দিতে হবে বলুন—

—কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ভোর পাঁচটার সময়। সেখানে গিয়ে পৌঁছিয়ে যতক্ষণ না প্লেন ছাড়ে ততক্ষণ আপনাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে—

মল্লিক-মশাই বললেন—ঠিক আছে—। আমি তার আগেই তৈরি হয়ে থাকবো—

সত্যিই সে এক বিপরীত পরিস্থিতি। একদিকে ফ্যাক্টরির একটা মেসিনে আগুন লেগে পুড়ে গেল, অন্য দিকে ঠিক সেই দিনই সৌম্যর প্লেনের মেসিন বিগড়ে গেল।

এ কীসের ইঙ্গিত?

হয়ত এরই নাম জীবন। হয়ত এরই নাম জগৎ। যখন মানুষ আনন্দের আতিশয্যে হাসে তখন সে টেরও পায় না যে তার সামনেই হয়তো কান্না আসছে। কান্না মানুষের অর্থ, খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুরই পরোয়া করে না। সে তার দাবি ষোল আনা না আদায় করে কাউকে রেহাই দেবে না। সে বড় নির্দয়, সে বড় নিষ্ঠুর।

এই কান্না কিন্তু অমঙ্গলও বটে, কারো ক্ষেত্রে আবার মঙ্গলও বটে। সংসারী লোকের পক্ষে কান্না বড় কষ্টের। অনেক কষ্ট পেলেই তবে সংসারী মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু নিরাসক্ত মানুষ এই কান্নাতেই আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বিষয়ী লোকের কান্না যত বিষাক্ত, ভক্তের কান্না তত পবিত্র। বিষয়ী লোকের কান্নায় ভগবান বিরূপ হন আর ভক্তের কান্নায় ভগবান বিচলিত হন। তাই পরমহংসদেব বলতেন—কাঁদা ভালো, কাঁদলে কুম্ভক হয়।

দু'রকম কান্নাই দেখেছে সন্দীপ। তাই সব দেখে সব কিছু অনুভব করে আজ সে অন্য আর এক সন্দীপ হতে পেরেছে। দোষ কাকে দেবে সে? সৌম্যবাবুকে, নাকি বিশাখাকে? আসলে দোষী বোধ করি কেউই নয়, দোষী সন্দীপ নিজেই। তাই সারাজীবন সন্দীপই ওদের চেয়ে বেশি কেঁদেছে।

বাইরে আগুন লাগলে কারো কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঘরে যার আগুন লাগে সে ই বুঝতে পারে দহন জ্বালা কী ভয়ঙ্কর। মেজবাবু মুক্তিপদ মুখার্জীর সব কিছু থেকেও কিছু ছিল না। চীফ অ্যাকাউনটেন্ট নাগরাজন ছিল, ওয়েলফেয়ার অফিসার, যশোবন্ত ভার্গব ছিল, ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার ছিল। তাকে সাহায্য করতে তার স্টাফের কোনও অভাব ছিল না, এমনকি ট্যাক্সের ব্যাপারে ট্যাক্স স্পেশালিস্ট বিজয়েস কানুনগো থাকা সত্ত্বেও তাকে সব ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে হতো।

সেই অত রাত্রে মুক্তিপদ মুখার্জী নিজে যখন ফ্যাক্টরিতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সবাই ই সেখানে হাজির। ফায়ার ব্রিগেডকেও সময়-মত খবর দেওয়া হয়েছিল। তারা তখন তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

ওয়াকস ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জী তখন খুব পরিশ্রান্ত। সে এসে দাঁড়াতেই মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছিলটা কী?

কান্তি চ্যাটার্জী বললেন—ইনভেস্টিগেশন করে তবে আপনাকে রিপোর্ট দেব স্যার—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—শর্ট সার্কিট নাকি?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে তা কখনও হতে পারে না স্যার। আমি তো রোজ সব মেসিনগুলোর চেকিং-রিপোর্ট দেখি। আমার স্ট্যান্ডিং অর্ডার আছে সেকশান অফিসারের ওপর, তারা রোজ আমাদের চার্ট পাঠায়। কালকেও তো কোথাও কোনও ইরেগুলারিটি দেখতে পাইনি—

—তাহলে কেন এমন হলো?

কান্তি চ্যাটার্জী বললে—সে স্যার এখন আমি বলতে পারবো না, ইন্‌ভেসটিগেশন না করে কিছুই বলা যাবে না—

মুক্তিপদ সেই দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থলে বসেও নিজেকে স্থির রাখবার চেষ্টা করলেন।

কোনও কারণেই বিচলিত হলে চলবে না। যে বিচলিত হয় সে-ই হেরে যায়—

ওয়ার্কস্ ম্যানেজারকে ডেকে বললেন—আপনি ইন্‌ভেস্টিগেশন করুন, করে আমায় রিপোর্ট দেবেন—আমি তখন ভাববো কী স্টেপ নেওয়া যায়—

তারপর যশোবন্ত ভার্গবকে ডেকে বললেন—ডে-শিফ্‌টে যে-মেসিন চলেছিল সে-মেসিন হঠাৎ এমন বিগডোল কেন? এ সিফ্‌টের ইন্-চার্জ কে? তাকে একবাব ডাকুন তো।

সেই ইন্‌চার্জকে ডেকে আনা হলো। লোকটার নাম বেণুগোপাল।

মুক্তিপদর সামনেই ওযার্কস্-ম্যানেজার বেণুগোপালকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার কত বছর সার্ভিস হলো?

—কুড়ি বছর স্যাব—

—আগে কখনও মেসিনে আগুন লেগেছে?

—না স্যার!

আবার প্রশ্ন হলো—শিফ্‌ট্ শুরু হওয়ার সময এই মেসিন সম্বন্ধে কি কোনও কমপ্লেন ছিল?

বেণুগোপাল বললে—না স্যার, যে-ওয়ারকার এটাতে কাজ করছিল সেও এই মেসিন সম্বন্ধে কোনও কমপ্লেন করেনি—

—আপনি কি বোজ ডিউটিতে এসে সব মেসিন চেক্ করেন?

—হ্যাঁ স্যার করি—

—আজকেও এ মেসিনটা চেক্ করেছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার, সেটা আমাব ডিউটি। যে-ফোরম্যান যখন ডিউটিতে আসেন তিনিই রোজ সকলেব রিপোর্ট পড়ে তবে কাজ শুরু করেন। আমার ডিউটির পর আমিও আমার শিফ্‌টের সব বিপোর্ট দিতাম—

এ সব যান্ত্রিক কাজ। মুক্তিপদ মুখার্জী এ সব কাজের কিছুই বোঝেন না। তাঁর দাদা শক্তিপদ মুখার্জীও কিছু বুঝতেন না, আব বাবা দেবীপদ মুখার্জীও বুঝতেন না কিছুই। তবুও তাঁরা কাজ চালিয়ে গিয়েছেন, তখন কোনও গণ্ডগোল ঘটেনি। তখন যে গণ্ডগোলটা ছিল সেটা অন্যরকম। তখন পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না, ছিল এজেন্ট, ছিল ব্রোকার। আর ছিল ইন্টার ন্যাশান্যাল মার্কেট। বার্মা, সিলোন, চাযনা, হংকং আরো অনেক মার্কেট। সেখানে এজেন্সি দিলেই কাজ শেষ হয়ে যেত। তবু মাঝে মাঝে সে-সব দেশেও যেতে হতো। আর সেই সূত্রে ইংলন্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান—ওখানেও যেতে হতো। মার্কেট খুঁজতে বা মার্কেট এক্সপ্যাণ্ড করতে। তার জন্যে জায়গায় জাযগায় কক্‌টেল পার্টি দিতে হতো। একবার একটা গাডিও ভেট দিতে হয়েছিল একজন জেনারেল ম্যানেজারকে। আর বাকিটা ইন্টাবন্যাল মার্কেট। তার মাঝে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, ম্যাড্রাস, কেরল গভর্নমেন্ট। তখন একটা বড় মার্কেট ছিল রেলওয়েজ। রেলওয়েজগুলো কম মাল কিনতো না 'স্যাক্সবী'র। 'স্যাক্সবী'র তৈরি Fish Plate Truss, Wagon Components, Track Fittings, Slippers তখন ছিল মনোপলি বিজনেস। তার জন্যে অবশ্য অফিসারদের ঘুষ দিতে হতো, কিন্তু তা নগণ্য। সামান্য খরচ হলেও সেটা প্রোডাকশন-এর আইটেমের মধ্যে পুরে দিলেই চলতো।

ফ্যাক্টরি থেকে চলে আসতে আসতে বাত কাবার হয়ে এসেছিল। যখন সব গোলমাল মিটে গেল তখন মুক্তিপদ বাডি আসবার জন্যে গাড়িতে উঠতেই অর্জুন সরকার এক পাশে বসলো। অর্জুন সরকার মানে কন্‌ফিডেনশিয়াল ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার।

—কী ব্যাপার সরকার?

গাডি তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

অর্জুন সরকার বললে—স্যার, একটা খবর আছে—

—কী?

অর্জুন সরকার গলা নিচু করে বললে—এটা স্যার এ্যাক্সিডেন্ট নয়—

—এ্যাক্সিডেন্ট নয়?

—না, পিওর স্যাবোটাজ।

—স্যাবোটাজ? তুমি ঠিক জানো?

—হ্যাঁ স্যার, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এটা ওই শিফ্‌ট্ ইন্-চার্জ বেণুগোপালের কাজ।

—কীসে বুঝলে?

অর্জুন সরকার বলল—ও এক নম্বর ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ওকে ওদের পার্টি থেকে ইন্‌স্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে। ওর জন্যে ও টাকাও পেয়েছে—

—তার প্রমাণ কী? ও তো অনেক টাকা স্যালারি পায়।

—তাতে কী হয়েছে স্যার? টাকার লোভের কি মানুষের শেষ আছে?

মুক্তিপদ খুব ভাবনায় পড়লেন।

—তুমি প্রমাণ দিতে পারো?

অর্জুন সরকার বললে—ও এক লাখ টাকা পেয়েছে পার্টির কাছ থেকে—

—প্রমাণ? ব্যাঙ্কের পাশ বই?

অর্জুন সরকার বললে—না স্যার, ওরা অত বোকা নয় যে টাকাটা ও ব্যাঙ্কে রাখবে। ও নিজের বাড়িতেই টাকাটা রেখেছে। কালকের মধ্যেই বাড়ি সার্চ করলে টাকাটা পাওয়া যাবে। দেরি করলেই টাকাটা সরিয়ে ফেলবে!

এটাও বড় গোলমেলে কাণ্ড! বাড়ি সার্চ করে যদি টাকা না পাওয়া যায়, তখন কী হবে।

অর্জুন সরকার বললে—না স্যার, আমি বলছি, টাকা পাওয়া যাবে।

—কে দিয়েছে তোমাকে খবরটা? সোর্স কে?

—ওদের ইউনিয়নের এক মেম্বার।

—কেন সে তোমাকে খবরটা দিলে?

অর্জুন সরকার বললে—সে আমার একজন ইন্‌ফরমার। আমার কাছ থেকে সে রেগুলার টাকা পায়—

মুক্তিপদ নিজের মনেই কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। সারা রাত তাঁর ঘুম হয়নি। আর একটু পরেই ভোর হবে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু অর্জুন সার্চ কে করবে?

অর্জুন সরকার বললে—কেন স্যার, পুলিশ—

মুক্তিপদ বললেন—কিন্তু পুলিশ তো আমাদের পক্ষে নেই—

—তাতে কী? টাকা দিলেই তারা আমাদের পক্ষে হয়ে যাবে। আর তা যদি না করতে চান তো ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকেও আমরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি। তবে যাদের দিয়েই সার্চ করা হোক, কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। একেবারে কালকের মধ্যেই। নইলে একটু সেন্ট পেলেই সব সরিয়ে ফেলবে।

মুক্তিপদ একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এত তাড়াতাড়ি ইনকাম-ট্যাক্স অফিস কাজ তুলতে পারবে?

অর্জুন সরকার বললে—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন স্যার, দেখি আমি কতদূর কী করতে পারি—

—ঠিক আছে, যা ভালো বোঝ তাই করো। এখন আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, বড্ড টায়ার্ড... বলে তিনি বাড়ির সামনে নেমে গেলেন। নেমে ড্রাইভারকে বললেন—বিশু, তুই সাহেবকে কোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিয়ে গ্যারাজে গাড়ি তুলে দিস—

বিশু মানে বিশ্বনাথ। বিশু বললে—কাল সকালে কখন আসবো স্যার?

—যেমন রোজ আসিস, সকাল আটটায়—

বলে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে বাজে। আটটা বাজতে আর ক'ঘণ্টাই বা বাকি। বিশু গাড়িটা ঘুরিয়ে সরকাব সাহেবকে নিয়ে তার বেলুড়ের দিকে ফিরে চললো।

সরকাব সাহেবকে তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দিতেও কিছু সময় লেগে গেল বিশুর। বেলুড়ের ফ্যাক্টরিতে তখন জ্বলন্ত মেসিনেব আগুন নিভে গেছে। তখন সবই অন্ধকার। শুধু ফ্যাক্টরিব অন্য মেসিনগুলোতে তখন নাইট-শিফ্‌টেব কাজ চলছে। যে মেসিনটাতে আগুন লেগেছিল সেটা পাশেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সেই মেসিনের স্টাফরাও যে-যার বাড়ি চলে গেছে অনেকক্ষণ। আজকের মত তাদেব কাজ বন্ধ। কালকে আবার সেই মেসিন চলবে কিনা তার কোনও ঠিক নেই।

বিশু ফ্যাক্টরি থেকে অনেক দূরে একটা অন্ধকাব মত জায়গায় গাড়িটা রেখে দিয়ে সেটা লক্ করে দিলে। তারপর আস্তে-আস্তে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পায়ে-পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। সমস্ত শহর ঘুমে আচ্ছন্ন। শেষ রাত্রের ঘুম বড় গাঢ়। কেউ কোথাও জেগে নেই। যারা জেগেও আছে তাদের সংখ্যা নগণ্য। তবু সাবধানের মার নেই। এমন ভাবে বিশুকে এগোতে হবে যাতে কেউ টের না পায়। টের পেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাতে তার চাকবিও চলে যেতে পারে। এ-সব কাজের ঝুঁকি খুব। তবু বিশু আগে অনেকবার এ-রকম ঝুঁকি নিয়েছে। তাতে তার আমদানিও কম হয়নি।

কয়েক পা এগিয়েই ফ্যাক্টরির গেট। চব্বিশ ঘণ্টার দরোয়ান পাহারা দিচ্ছিল। সে বিশুকে দেখলে, কিন্তু কিছু বললে না। বিশুদের মত লোকেদের জন্যে ফ্যাক্টরির গেট বরাবর অবারিত দ্বার। গেট পেরিয়ে ডান দিকে ফ্যাক্টরি আর বাঁ দিকে সারি সারি কোয়ার্টার, কোয়ার্টারের ব্যারাক। ইংরেজদের আমলের সব পাকা ব্যবস্থা এখনও তত কাঁচা হয়নি। সব আগেকার মালিকদের নিয়মেই চলছে।

বেণুগোপালবাবুর কোয়ার্টার বিশুর চেনা।

শিফ্‌ট্-ইন্-চার্জ বেণুগোপালবাবুর সঙ্গে বিশুর বাইরে বাইরে না থাকলেও ভেতরে ভেতরে ঘনিষ্ঠতা আছে।

ঠিক জায়গাটায় এসে বিশু দাঁড়ালো। কিন্তু ডেপুটি ওয়ার্কস্ ম্যানেজার সরকার সাহেবের চর আছে সব জায়গায় ছড়ানো। কে কোথা থেকে কখন তাকে দেখতে পাবে, তার কিছু ঠিক নেই। বাড়ির সামনের দিক থেকে না গিয়ে পিছন দিক থেকে যাওয়া ভালো। তাতে লুকিয়ে-লুকিয়ে কথা বলা যাবে।

শেষ পর্যন্ত বিশু তাই-ই করলে।

একবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শব্দ এল—কে?

বিশু শুধু বললে—দরজাটা খুলুন তো একবাব—

—কে তুমি?

বিশু বললে—বেণুগোপাল সাহেব আছেন?

—হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু তুমি কে?

বিশু এবার গলাটা আরো নামিয়ে বললে—আমি বিশু—

এবার মন্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল। দরজার পাল্লা দুটো একটু ফাঁক হতেই মূর্তিটা বললে—এসো, ভেতরে চলে এসো—

সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মূর্তিটা বললে—এ কী? এই অসময়ে?

বিশু বললে—সায়েব কোথায়? একটা জরুরী কাজ আছে—

খবরটা ভেতরে যেতেই বেণুগোপাল সাহেব যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থাতেই বেরিয়ে এসেছে। বিশু এ-বাড়িতে আসা মানে খুব বড়দরের একজন ভি. আই. পি'র আসা। বেণুগোপাল বিশুকে নিয়ে সোজা তার ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসলো।

বললে—এত সকালে?

বিশু বললে—আমার তো এখনই ডিউটি শেষ হলো—

—এখন? এই ভোরবেলায়? তাহলে তো তুমি মোটা ওভার-টাইম পেয়ে গেলে।

বিশু বললে—সে জন্যে নয়, একটা জরুরী কথা আছে—

—জরুরী?

—হ্যাঁ, মুখার্জী সায়েবকে এখুনি বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসে এখানে সরকার সাহেবকে ছাড়তে এসেছিলুম। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—

—খবর আছে কিছু?

বিশু বললে—খবর আছে বলেই তো আপনার কাছে এসেছি স্যাব—

বেণুগোপাল খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলো—বলো বলো, খববটা কী?

তারপর বিশুকে খাতির দেখাবার জন্যে বললে—তুমি চা খাবে?

বিশু বললে—না স্যার, এখন আমি বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমোব, তার পরেই আবার সকাল আটটায় ডিউটি দিতে হবে—আমার চা খাবার সময় নেই এখন...

—ঠিক আছে, এখন খবরটা কী তাই বলো?

বিশু এবার একটু দম নিয়ে নিলে। তারপব বললে—খবরটা খুব খাবাপ স্যার, আমি তো গাড়ি চালাচ্ছিলাম, পেছনের সিটে মুখার্জী সায়েব আর সরকার সায়েব বসে বসে কথা বলছিলেন। আমি মন দিয়ে সব শুনছিলুম আর গাড়ি চালাচ্ছিলুম—

বেণুগোপাল বললে—তারপর?

—তারপর সরকার সাহেব বলতে লাগলেন কেন মেসিনটা পুড়লো—

—পোড়বার কারণটা কী বললে সরকার সাহেব?

বিশু বললে—না স্যার, ঘরের দরজা-জানলাগুলো সব খোলা রয়েছে, এ-অবস্থায় কিছু বলা যাবে না, দেওয়ালেরও তো কান থাকতে পারে কিনা—

ঠিক আছে। বেণুগোপালবাবু ঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিলে। তারপর দরজাতেও খিল লাগিয়ে দিলে।

তারপর তাদের কথাবার্তা বাইরে থেকে আর কিছু শুনতে পাওয়া গেল না, যখন দরজা খুললো তখন বিশুর মুখে একগাল হাসি। হাতে তখন তার অনেকগুলো নোট। নোটগুলো বিশু বেশ যত্ন করে জামার ভেতর পকেটে রেখে দিলে।

বেণুগোপাল বললে—এখন ওই পাঁচশো টাকাই তোমাকে দিলুম, কিন্তু, পরে আরো পাবে, সেজন্যে কিছু ভেবো না—

বিশু একটু সাবধান করে দিলে বেণুগোপালকে। বললে—দেখবেন স্যার, কথাটা যেন কাক-পক্ষীতেও না জানতে পারে, নইলে স্যার বুঝতেই তো পারছেন, আমার চাকরি নিয়ে—

বেণুগোপাল বিশুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—আরে, তুমি কি পাগল হলে বিশু, এ-সব কথা কি কাউকে বলতে আছে?

এ-কথার পর বিশু নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ির বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। আর তারপর ফ্যাক্টরির গেট পেরিয়ে সোজা তার গাড়িটাতে গিয়ে বসলো। আর তারপর স্টিয়ারিংটা ধরে পা দিয়ে এ্যাকসিলাটেলারে চাপ দিতেই গাড়িটা সোঁ-সোঁ করে মুক্তিপদ মুখার্জীর গ্যারাজেরদিকে চলতে লাগলো।

বারো বাই এ'র বিড্‌ন স্ট্রীটের বাড়িতে সেদিন রাতে ঠাক্‌মা-মণির আর ভালো করে ঘুম হলো না। খোকা একবার এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসেছে। আবার রাত তিনটের সময় বাড়ি থেকে বেরোবে।

ঠাক্‌মা-মণি রাত্রেই খোকাকে বলে রেখেছিলেন—তুই শুগে যা, আমি তোকে ঠিক সময় ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেব'খন—তোর কোনও ভাবনা নেই।

এমনিতেই ঠাক্‌মা-মণির ধারণা যে তাঁর খোকা রাত ন'টার আগেই বাড়ি এসে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার ওপর যদি আবার তাকে বাত তিনটের সময় বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় তাহলেই যত বিপদ।

কিন্তু মল্লিকমশাই-এর ভাবনা তার চেয়েও বেশি। চাকরি বলে কথা। তিনি যদি ঘুমিয়ে পড়েন তো তখন কী কৈফিয়ৎ দেবেন?

সন্দীপ বললে—আমি আপনাকে জাগিয়ে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

মল্লিকমশাই বললেন—তুমি থামো। তোমার বয়েস কম, এখন তো তোমরা ঘুমোবে, আমি বুড়ো মানুষ, আমাদের কি অত ঘুম হয়?

তা শেষ পর্যন্ত সেদিন রাত্রে কারোই ঘুম হলো না, ওপরে ঠাক্‌মা-মণি জেগে নিচেয় মল্লিক-মশাই, সন্দীপ, তাদেরও ঘুম নেই।

মল্লিকমশাই একবাব ওঠেন, দরজা খুলে বাইরের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটা একবার দেখেন, তারপর আবার এসে শুয়ে পড়েন।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করে—ক'টা বেজেছে কাকা?

মল্লিককাকা আর একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে বলেন—এ কী, তুমি এখনও ঘুমোওনি? এখন সবে সাড়ে বারোটা, তুমি ঘুমোও—

সন্দীপ বলে—আমার আর ঘুম আসবে না—

—কেন? তোমার আবার কী হলো? তোমার ঘুম আসবে না কেন?

সন্দীপ বলে—আমার অত সহজে ঘুম আসে না—

—এ কী? এই বয়েসেই তোমার এত কম ঘুম? তাহলে আমাদের বয়েস হলে তুমি কী করবে?

সন্দীপ বলে—এ ভাবে আমার ঘুম হয় না—

মল্লিককাকা বলেন—যাক্‌গে, আর কথা বোল না, এবার ঘুমোতে চেষ্টা করো।

বলে মল্লিককাকাও আবার একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা খানিক পরে আবার উঠে পড়লেন। আবার বাইরে গিয়ে দেওয়ালের ঘড়িটা দেখলেন। দেড়টা বেজেছে। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম আসা মল্লিক-কাকার অত সোজা নয়। একবার উঠে গিয়ে বাইরের ঘড়ি দেখতে হয়, আর তখনই আবার ফিরে এসে শুতে হয়। এ ঠিক ঘুমও হলো না, আবার জাগাও হলো না। মাঝখান থেকে কেবল বিছানা ছেড়ে একবার ওঠা আবার বিছানায় এসে শোওয়া।

শেষকালে সন্দীপ বললে—ড্রাইভারকে তো বলা আছে সে এসে ডেকে জানিয়ে দেবে। আপনি অত ভাবছেন কেন?

—তুমি এখনও জেগে আছো?

আর তারপরেই বললেন—আর না-জেগেই বা করবে কী? এতবার দরজা খুললে আর বন্ধ করলে কারো ঘুম আসে? তোমার কোনও দোষ নেই—

তা কথাটা সত্যি। ওপর-তলায় ঠাকমা-মণির সেই একই অবস্থা। ঠাকমা মণি বার-বার জিজ্ঞেস করেন— ওরে বিন্দু কটা বাজলো, দ্যাখ তো—

বিন্দু সারাদিনই হুকুম তামিল করে করে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে যে সে একটু ঘুমোবে প্রাণ ভরে, তাও হবার উপায় নেই বুড়ীর জ্বালায়। তাকেও বার বার উঠতে হতো আর বার-বার ঘড়ি দেখতে হতো। আর ঠাকমা মণিকে বলতে হতো ক'টা বেজেছে। কখনও ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে বারোটা, কখনও দেড়টা, আবার কখনও দু'টো। এক কথায় বলতে গেলে সারারাতই বিন্দু জেগে কাটালো সন্দীপের মতন।

কিন্তু সন্দীপ তখন কাকে বকাবকি করবে? বকাবকি করবে মল্লিককাকাকে, না নিজের ভাগ্যকে?

অথচ যে-আরাম যে-নিরাপত্তা সে এ-বাড়িতে পেয়েছিল তার জন্যে তো তার ঠাকমা-মণির বা মল্লিককাকার কাছে কৃতজ্ঞই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তবু কেন তার রাগ হলো? আসলে বোধহয় মানুষ তার যোগ্যতার চেয়ে তার দাবীর কথাটাই আগে ভাবে। যোগ্যতা আছে কি নেই সেটা যেন বড় কথা নয়, পৃথিবীর সব কিছু ভোগ আর সব কিছু আরামের বস্তুর ওপর অধিকার তার যেন জন্মগত, এটাই সে ভেবে নিয়ে মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এতদিন পরে পুরনো সেই ঘটনাগুলোর কথা ভাবলেও তার লজ্জা হয়। সন্দীপ কেবল সকলের কাছে বরাবর দাবীই করে এসেছে। কিন্তু সকলকে কিছু দেবার কথা কি তার কখনও মনে এসেছে?

হায় রে, এ-সংসারে তো সবাই নিতেই জানে। দেওয়ার কথা ক'জন ভাবে। কিছু কিছু লোক নিয়েই কৃতার্থ হয়, আর কিছু কিছু লোক দিয়ে। কিন্তু দিয়ে কৃতার্থ হবার লোক কেন সংসারে এত কমে আসছে? কেন কেউ কাউকে বলছে না—তুমি নিয়েই আমাকে কৃতার্থ করো?

ঠাকমা-মণি সৌম্যকে পাখী পড়া করে বার-বার বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু আবার বার বার বলে দিলেন—সেখানে গিয়েও কলকাতার মতন রাত ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে বাবা, বুঝলে?

সৌম্য বললে—হ্যাঁ, তাই করবো—

—আর সে বড় ঠাণ্ডার দেশ, সব সময়ে গরম-জামা-কাপড় পরে শরীর ঢেকে রাখবে। বুঝলে? একবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে তোমার দাদুর খুব নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সে গলাটলা ভেঙ্গে একেবারে একাকার। অনেক ডাক্তার টাক্তার দেখিয়ে তবে সে যাত্রা সারে। খুব সাবধানে থাকবে বাবা। আর রোজ আমাকে একটা করে চিঠি লিখবে। আর যদি তা না পারো তো অন্ততঃ একটা টেলেক্স করেও জানাবে আমাকে তুমি কেমন আছো। নইলে আমি খুব ভাববো কিন্তু তোমার জন্যে—

এগুলো হচ্ছে উপদেশ। এ ছাড়াও সঙ্গে দিলেন গৃহ বিগ্রহ সিংহবাহিনী দেবীর একটা ছবি।

ছবিটা সৌম্যর ব্যাগের মধ্যে পুরে দিয়ে বললেন—তুই যখন যেখানে যাবি এই ছবিটা সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখবি, এই মা'ই তোকে সব সময় রক্ষে করবে। রোজ ঘুম থেকে উঠে এই ছবিটাকে কপালে ঠেকিয়ে পেন্নাম করবি। বুঝলি? দেখবি সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যখন যেখানেই গিয়েছি সব সময়েই এটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। আর একটা কথা

বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—আর একটা কথা, ও দেশের মেয়েগুলো বড্ড গায়ে পড়া। বড় হ্যাংলা। তাদের সঙ্গে যেন মিশো না বাবা। যদি একবার জানতে পারে যে তুমি বড়লোক, যদি একবার জানতে পারে তোমার টাকা আছে তো তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমার নিজের চোখে সব দেখা আছে। তাই আমি তোমার দাদুকে কখনও একলা কনটিনেন্টে পাঠাইনি যতবার তিনি ওখানে গেছেন, আমি ততবার ওঁর সঙ্গে গিয়েছি। মেয়েমানুষদের কখনও ওঁর ধারে-

কাছে ঘেঁষতে দিইনি। নইলে কি আর তাবা ছেড়ে কথা কইতো? টাকার লোভে ওঁকে ছিঁড়ে খেত একেবারে! তা ভালোই হয়েছে, তোমার তো আর ওসব দিকে কোনও ঝোঁক নেই—

তারপরে একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—আর মদ! ওই একটা জিনিস! তুমি অবশ্য মদ-টদ খাও না, আমি জানি। কিন্তু বাবা, সেই যে কথায় আছে না, 'দশচক্রে ভগবান ভূত'! আমি সঙ্গে থাকবো না বলেই এত কথা তোমাকে বলা! মদ ওখানে ডাল ভাতের মত। খাওয়ার আগে মদ, খাওয়ার পরেও মদ। জলেব বদলে ওবা সবাই মদই খায়। তা যাদের দেশে যে রেওয়াজ তার ওপর আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু তুমি বাবা যেন ও-সব ছাই-পাঁশ ঠোঁটেও ঠেকিও না। শুনেছি ও-নেশা নাকি একবার শরীরে ঢুকলে তার আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই, ও একেবারে তোমাকে খেয়ে তবে ছাড়বে—

সৌম্য এ-সব কথার আব কী উত্তব দেবে! সে চুপ করেই রইল।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা যাক্‌গে, তুমি এখন শুয়ে পড়োগে যাও। আমি ঠিকসময়ে তোমাকে জাগিযে দেব'খন, যতটুকু সময় পাও, ঘুমিয়ে নাও—

সুতরাং অর্ধেক কথা আগের রাত্রে বলা হয়ে গিয়েছিল। তাই অন্য কোনও কথা বলার ছিল না। একেবারে শেষ রাত্রেব দিকে সৌম্যকে বিছানা ছেড়ে জাগিয়ে দেওয়া হলো।

ড্রাইভার, মল্লিকমশাই সবাই-ই তৈরি। সৌম্য তৈরি হয়ে ঠাক্‌মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে। ঠাক্‌মা-মণিও নাতির চিবুকে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেলেন। দুর্গা দুর্গা বলে মা'কে একবার স্মরণ করলেন।

তারপর শেষবাবের মত বললেন—যা যা বলেছিলুম, তোমার সব মনে আছে তো?

—কী কথা?

—ওমা, এবই মধ্যে সব ভুলে গেলি? অত করে পাখী-পড়া করে মুখস্থ করিয়ে দিলুম যে?

সৌম্য কিছু মনে কবতে পাবলে না।

জিজ্ঞেস করলে—কী কথা বলো তো? আমি তো ঠিক মনে করতে পারছি না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তোর এই রকম ভুলো মন নিয়ে তুই কী করে অফিস চালাবি বল তো? এখন লন্ডনে যাচ্ছিস, সেখানে কে তোকে দেখবে বল্ দিকিনি? সেখানে তোর কে আছে?

এ-সব প্রলাপ শোনবার মত সময় তখন ছিল না সৌম্যর হাতে। তাকে বহুদিনের জন্যে বিদেশে থাকতে হবে। কিন্তু ঠাক্‌মা-মণির ভরসা বলতে তো কেবল এই নাতিটিই। ওই নাতিটি ছাড়া তো তাঁর আব কেউ নেই। ওই নাতিব ওপর ভরসা করেই তো তিনি এতদিন বেঁচে আছেন। সৌম্যর বাপ নেই, মা নেই, কেউই নেই। ওই নাতির একটা স্থিতি করে দিতে পারলেই তাঁর ছুটি। তার মানে সৌম্যব একটা বিয়ে। আর সে বিয়ে তিনি এমন একটি মেয়ের সঙ্গে দেবেন যে সৌম্যকে মানুষ করে তুলবে। যে-মেয়ে শুধু সৌম্যকেই দেখবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও দেখবে, তাঁরও সেবা করবে। তাঁর সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী আনবে। তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী হবে!

এমনি কত আশা ছিল ঠাক্‌মা-মণির মনে, কত সাধ, কত কামনা-বাসনা।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় অন্য বকম।

মনে আছে মল্লিককাকা সেই ভোর রাত্রেই সৌম্যবাবুকে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে চলে গিয়েছিলেন। যখন ফিবে এলেন তখন বেলা দশটা। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—ছোটবাবু চলে গেলেন?

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, ঘাড থেকে একটা দায়িত্ব নামলো—

—প্লেন ঠিক সময়ে ছেড়েছিল?—

মল্লিক-মশাই বললেন—হ্যাঁ, কোনও অসুবিধে হয়নি—

বলে তিনি ওপবে চলে গেলেন। ঠাক্‌মা-মণি তখন মল্লিকমশাইএর জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করছিলেন। মল্লিকমশাই কাছে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলেন?

—হ্যাঁ, কোনও অসুবিধে হয়নি।

ঠাক্‌মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলেন—খোকাকে টেলেক্স করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তো?

মল্লিকমশাই বললেন—হ্যাঁ—মনে করিয়ে দিয়েছি।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন—

বলে উঠে দাঁড়াতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। টেলিফোন ধরবার ডিউটি বিন্দুর। সে টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে বললে—ঠাক্‌মা-মণি, আপনার ফোন, মেজবাবু ডাকছেন—

মল্লিক-মশাই তখন নিচেয় নেমে গেছেন। ঠাক্‌মা-মণি রিসিভারটা ধরে জিজ্ঞেস করলেন—কী রে, কিছু বলবি?

ওপাশ থেকে মুক্তিপদ বললেন—হ্যাঁ, সৌম্য চলে গেছে।

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—হ্যাঁ...তা তোর গলাটা এমন ধরা-ধরা কেন? কী হয়েছে?

মুক্তিপদ বললেন—কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি, তাই.

—কেন? ঘুম হয়নি কেন? শরীর খারাপ?

—না, কাল সারারাত ফ্যাক্টরিতে ছিলুম—

—কেন? সারা রাত ফ্যাক্টরিতে ছিলি কেন? আবার লেবার-ট্রাবল?

—হ্যাঁ, লেবাররা কাল একটা মেসিন পুড়িয়ে দিয়েছিল, তাই সেখানে আমাকে থাকতে হয়েছিল। ফায়ার ব্রিগেড এসেছিল। আগুন নিভোতে রাত প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে আর ঘুম আসেনি। তখন থেকে জেগেই আছি...

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা ঘুম তো আমাদের বাড়িরও কারো হয়নি।

—কেন?

—বাঃ, আবার জিজ্ঞেস করছিস, কেন? রাত তিনটের সময় তো সৌম্যকে জাগিয়ে দিতে হয়েছে। তাতে ঘুম কারো আসে? আমারও ঘুম হয়নি, বিন্দুরও ঘুম হয়নি, সরকার-মশাইও ঘুমোননি সারারাত।

—তা সে ঠিক সময়েই গেছে তো? ঠিক সময়ে প্লেন ছেড়েছিল?

—হ্যাঁ, সরকার-মশাই এখন এসে খবর দিয়ে গেলেন যে প্লেন ঠিক সময়েই ছেড়েছে—আমি তাকে বলেছি সেখানে পৌঁছিয়েই যেন একটা টেলেক্স করে দেয়। তুইও লন্ডন অফিসে একটা টেলেক্স করে দিস সময় পেলে, বুঝলি?

মুক্তিপদ বললেন—সময় বোধহয় আর পাবো না মা—

—কেন? তোর আবার কী হলো?

মুক্তিপদ বললেন—তোমাকে সবই তো বলেছি। তুমি তো তা বুঝতেই চাও না। আমার জ্বালা তুমি যদি না বোঝ তো অন্য লোকে কী করে বুঝবে? জানো মা, শুনলুম আমাদের ফ্যাক্টরিতে বেণুগোপাল বলে একজন শিফ্‌ট্‌-ইন্‌-চার্জ আছে, সে নাকি কার কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ খেয়ে মেসিনটা পুড়িয়ে দিয়েছে। ভেবে দেখ এই সব লোক নিয়ে আমাকে কাজ চালাতে হচ্ছে।

—তা কে তাকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিলে, শুনেছিস কিছু?

মুক্তিপদ বললেন—কে আবার দেবে, দিয়েছে গভর্মেন্ট—

—সে কী? গভর্মেন্ট কখনও ঘুষ দেয়?

মুক্তিপদ বললেন—দেয় মা, দেয়। আজকাল সবই সম্ভব। গভর্মেন্ট কি আর নিজের হাতে ঘুষ দেয়? দেয় গভর্মেন্টের দালালদের হাত দিয়ে। তারাই তো এখন গভর্মেন্ট চালাচ্ছে।

—তাতে তাদের কী লাভ?

মুক্তিপদ বললেন—তারা চায় না কোনও বাঙালী এখানে ব্যবসা চালায়। তারা চায় না বাঙালীর ছেলেরা এখানে চাকরি পায়। তারা চায় এখান থেকে বাঙালী ব্যবসাদাররা কারবার উঠিয়ে নিক—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কী যা-তা বলছিস তুই? বাঙালীরা এখানে কারবার না চালালে কোথায় যাবে?

মুক্তিপদ বললেন—কোথায় আবার যাবে? জাহান্নামে—

—তুই চুপ কব, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই আবোল-তাবোল বকছিস—

মুক্তিপদ বললেন—না মা, না। আমাব মাথা খারাপ হয়নি। আমি ঠিক বলছি। লেবার-লীডাররা তাই ই চায়। তারা চায় যে আমবা ভয় পেয়ে গিয়ে তাদেব পকেটে আরো টাকা ঢালি। আব সেই টাকাতে তারা আবো বড়লোক হোক। তুমি জানো না মা, এক-একটা লীডার এখন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাড়ি কবে ফেলেছে। আগে তারা টাকার অভাবে খেতে পেত না, আর এখন লেবারদের ক্ষেপিয়ে তারা সব মাল্‌টি-মিলিওনার হয়ে গেছে। তাদের এক-জনের গাড়িতে রোজ পনেরো-কুড়ি লিটার করে পেট্রল খরচ হয়। এ-সব টাকা তাদের পকেটে আসে কোত্থেকে? কে দেয়? তারা একদিকে যেমন গরিবদের মাবছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদেরও মারতে চাইছে—আমি কী করি বলো তো—

ঠাক্‌মা মণি বললেন—তুই সারারাত ঘুমোসনি। এখন একটু ঘুমিয়ে নে। আমারও কাল সারারাত ঘুম হয়নি। পবে কথা বলবো। এখন ছাড়ি—

বলে বিসিভাবটা রেখে দিলেন ঠাক্‌মা-মণি।

ওদিকে মুক্তিপদও বিসিভাবটা রেখে অর্জুন সবকাবকে টেলিফোন করলেন। অর্জুন সরকার তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

মুক্তিপদ বললেন—কী হলো, বেণুগোপালের সম্বন্ধে কিছু ভাবলে তুমি?

অর্জুন সরকাব বললে—হ্যাঁ স্যাব, সব পাকা কবে ফেলেছি। কালকের মধ্যেই বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করা হবে—

—কালকে? কখন?

অর্জুন সরকার বললে—কাল ভোরেব আগেই। আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। তারপর যা ডেভেলপমেন্ট হয় তা আপনাকে আমি ঠিক সময়েই জানিয়ে দেব—

মুক্তিপদ নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ঠিক আছে, আমি তোমার টেলিফোন-কলের অপেক্ষায় থাকবো—

সমুদ্রে যেমন জলের ঢেউ থাকে, ইতিহাসেও তেমনি মানুষেব মতবাদের ঢেউ থাকে। একশো দু'শো তিনশো কিম্বা এক হাজার বছর ধরে একটা মতবাদকে আশ্রয় করে মানুষ এগিয়ে যায়। আবার একশো দু'শো তিনশো কিম্বা এক হাজার বছর ধরে অন্য একটা মতবাদকে আশ্রয় করে মানুষ পেছিয়ে আসে।

এই এগিয়ে যাওয়া আর পেছিয়ে এসে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টার নামই হলো ইতিহাস। সমুদ্র যেমন কখনও থেমে থাকে না, ইতিহাসও তেমনি। সেও কখনও থেমে থাকে না।

একটা মানুষের জীবনও ঠিক তাই।

একটা মানুষ হয়ত এগিয়ে যেতে পেছিয়ে পড়লো, কিন্তু আর একজন মানুষ হয়ত এগিয়ে যেতে গিয়ে সত্যিই আবো খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপব সে যখন একদিন থেমে গেল, তখন আরও একজন মানুষ সেখান থেকে হয়ত আবাব আরো অনেক দূর এগিয়ে গেল।

মানুষের এই ঢেউ-এর ওঠা-নামা, মতবাদের এই এগোন আর পেছিয়ে যাওয়া যারা দেখতে পায় তারা দেখতে পায়। কিন্তু ক'জন তা দেখতে চায়?

মানুষের মিছিল যখন গড়িয়ে চলে তখন তাকে দু'রকম ভাবে দেখা যায়। এক—চলমান মিছিলের মধ্যেখানে একাকার হয়ে মিশে থেকে। আর দুই-দূরের একটা বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ কখনও বিযুক্ত হয়ে আবার কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সন্দীপও একদিন বেড়াপোতা থেকে বেরিয়েছিল এই মানুষের মহাযাত্রার মিছিল দেখতে। সে এই দু'ভাবেই মানুষ দেখেছে: কখনও বিযুক্ত হয়ে আবার কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে। বেড়াপোতার কাশীনাথবাবুদের লাইব্রেরীর মধ্যে তার যে মানুষ দেখা তা বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা, পরোক্ষ দেখা। আর কলকাতায় বারোর-এ বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে এসে যে মানুষ দেখা তা বিযুক্ত হয়ে দেখা, প্রত্যক্ষ দেখা। কলকাতার এই মল্লিক-কাকা, ঠাকমা-মণি, মুক্তিপদ মুখার্জী, সৌম্যবাবু আর তার সঙ্গে খিদিরপুরে মনসাতলা লেনের তপেশ গাঙ্গুলী, বিশাখা, যোগমায়া দেবী থেকে আরম্ভ করে সুশীল সরকার, গোপাল হাজরা, বরদা ঘোষাল, শ্রীপতি মিশ্র, আন্টি মেমসাহেব, জয়ন্তী দিদিমণি, বিন্দু, গিরিধারী দরোয়ান— সবাইকে তার প্রত্যক্ষ রূপে দেখা।

কিন্তু এদের সবাইকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে সে মহা জীবনযাত্রার মিছিলে কতদূর এগিয়ে গেল? সত্যি সে কি এগিয়েছে, না কি পেছিয়েছে? জীবনের হিসেবের খতিয়ানে লাভ-লোকসানের প্লাস-মাইনাসের যোগ-বিয়োগে তার জমার পাতায় কতটুকু সঞ্চয় বাড়লো?

এরও হিসেব একদিন তাকে কড়ায়-ক্রান্তিতে কষে বার করতে হবে। যতদিন বিডন্ স্ট্রীটের বাড়িতে সে থেকেছে, যতদিন রাত্রিতে তার ঘুম আসতে দেরি হয়েছে, ততদিন এই প্লাস-মাইনাসের অঙ্কই সে কেবল কষে গিয়েছে।

সৌম্যবাবু বিলেত চলে যাবার পর আর গিরিধারীকে রাত জাগতে হয় না। রাত জেগে সৌম্যবাবুকে দরজা খুলে দিতেও হয় না, আর ভোরের দিকে দরজায় তালা লাগাতেও হয় না।

সন্দীপ ভালো করে চেয়ে দেখতো গিরিধারীর দিকে। ছোটবাবুর কাছ থেকে সে মাসে মাসে রকম একটা মোটা বখশিস পেত, সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সে যেন আগের চেয়ে একটু গম্ভীর-গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মাসকাবারি উপার্জন কমে গেলে কার না মুখ গম্ভীর হয়?

প্রতি মাসে গিরিধারী সন্দীপের কাছে আসতো মাণি-অর্ডার ফর্ম নিয়ে। সেই ফর্ম ভর্তি করতো হতো সন্দীপকে। দ্বারভাঙ্গা জেলার কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ের ঠিকানায় একজনের নামে গিরিধারী টাকা পাঠাতো। রামাদীন সিং। গ্রাম — ভোজপুর। পোস্টাফিস — গঙ্গানগর।

সন্দীপ প্রথমে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—এই রামাদীন সিং তোমার কে হয় গিরিধারী?

গিরিধারী বলেছিল—আমার লেড়কা বাবুজী —

কিন্তু কোনও মাসে পাঠাতো পঞ্চাশ টাকা, আবার কোনও মাসে ষাট টাকা। আবার হয়ত বা কোনও মাসে চল্লিশ টাকা...

টাকা কম হলে সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছে—এবার এত কম টাকা পাঠাচ্ছ কেন গিরিধারী?

গিরিধারী উত্তর দিয়েছে—এ মাসে আমদানী কম হয়েছে যে বাবুজী—

অনেক সময়ে সৌম্যবাবু মদের ঝোঁকে পকেটে যত টাকা থাকতো সবই উপুড় করে ঢেলে দিত গিরিধারীর হাতে। সে-মাসে গিরিধারীর বেশি আমদানী হতো।

তাই সৌম্যবাবু বিলেত যাওয়ার পর থেকেই গিরিধারী একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ে ছিল। তখন যেন তার খেয়েও সুখ নেই, সারারাত ঘুমিয়ে সুখ নেই। তুলসী দাসের দোঁহা আউড়িয়ে সে দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অভিযোগ সমস্ত ভুলে থাকবার চেষ্টা করতো।

রাসেল স্ট্রীটের মাসিমাও যেন কেমন, মন-মরা হয়ে গিয়েছিল তার পর থেকে। তখন আর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে বিশাখার দেরি হতো না। তখন অরবিন্দও ঠিক সময়ে বিশাখাকে স্কুলে নিয়ে যেত, আর ঠিক সময়েই আবার বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

সন্দীপ রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে গেলেই যোগমায়া দেবী·অনেক আশা নিয়ে বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করতো—বলতো—ও-বাড়ির খবর কী বাবা?

সন্দীপ বলতো—নতুন খবব তো আর কিছু নেই মাসিমা—

—তোমাদের ঠাক্‌মা-মণি কেমন আছেন বাবা?

সন্দীপ বলতো—ভালোই আছে।

—আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেন না?

সন্দীপ বলতো—রোজই তো জিজ্ঞেস করেন। এখানকাব খবর তো তো রোজই তাঁর কাছে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসতে হয়—

সন্দীপের এই-ই চাকরি। এই চাকরিই তার শুরু থেকে চলেছে। সকাল বেলা রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে এসে বিশাখাদের খবরা-খবর নিয়ে ঠাক্‌মা-মণিকে দেওয়া আর দরকার হলে মল্লিক-মশাই এর কাজকর্মে সাহায্য করা। আর বিকেলবেলায় কলেজে যাওয়া আর সন্ধেবেলা লেখাপড়া করা। এ-ছাড়া কাজ বলতে আর কিছু ছিল না তার।

সেদিন যোগমায়া জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বাবা, বিলেত থেকে তোমাদের ছোটবাবু কিছু চিঠিপত্তর দিয়েছে?

সন্দীপ বললে—ঠাক্‌মা-মণিও তো সেই জন্যে খুব ভাবছেন—

—কিন্তু এতদিনে তো চিঠিপত্র কিছু আসা উচিত ছিল সেখান থেকে—

সন্দীপ বললে—ঠাক্‌মা-মণি তো বার-বার সে-কথা সৌম্যবাবুকে বলে দিয়েছিলেন। অন্ততঃ একবার সেখান থেকে তো টেলিফোনও করতে পারতেন। টেলিফোন করলে তো আর নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করতে হতো না। কোম্পানীর সঙ্গে তো কলকাতার অফিসের হরবখ্‌ত টেলিফোনে কথাবার্তা হচ্ছে—

খবরটা শুনে যোগমায়া দেবী মনেমনে কষ্ট পেতেন।

বিশাখা পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে বললে—তুমি অত ভাবছো কেন বল দিকিনি? যে বিলেতে গেছে সে কচি খোকা নাকি? খবর আবার কী দেবে? নতুন জায়গায় গিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে সময় লাগবে না?

যোগমায়া বললে-তুই চুপ করতো, তোকে কে কথা বলতে বলেছে?

বিশাখা বললে—বেশ করেছি কথা বলেছি। আমি কি জলে পড়ে গেছি নাকি যে কেউ উদ্ধার না করলে আমি একেবারে মরে যাবো?

যোগমায়া বললে—শুনলে বাবা, মেয়ের কথা? মেয়ের কথা একবার শুনলে তুমি?

তারপরে মেয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—ওরে মুখপুড়ী, তোর এত গুমোর কেন শুনি? এত গুমোর তোর কীসের? এক আমি ছাড়া তো তোর দুনিয়ায় কেউ নেই তাহলে তোর এত গুমোর কেন; তবু যদি তোর নিজের বাপ থাকতো!...'এই যে যে-বাড়িতে তুই আছিস, যে গাড়িতে করে তুই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিস, এ কার দৌলতে শুনি? রোজ যে পিণ্ডিগুলো গিলছিস, এর টাকা কে যোগান দিচ্ছে, তার খেয়াল রাখিস? সব টাকা কি আকাশ থেকে ঝর্-ঝর্ করে পড়ছে, না ভূতে পাঠিয়ে দিচ্ছে? ...চুপ করে আছিস কেন? দে, এর জবাব দে?

সন্দীপ বললে—আপনি চুপ করুন মাসিমা, আপনি চুপ করুন, ও ছেলেমানুষ ওকে এসব কথা কেন শোনাচ্ছেন?

—ছেলেমানুষ! তুমি আর আমাকে ছেলেমানুষ' চিনিয়ো না বাবা। ওর ওই বয়েসে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তা জানো? ওই বয়েসে আমি বউ হয়ে ঘোমটা দিয়ে শ্বশুর বাড়ি গেছি। আমাকে তুমি ছেলেমানুষ চিনিয়ো না—

তারপর একটু থেমে মাসিমা আবার বলতে লাগলো—মেয়ের কথা শুনলে? বলে কিনা ওকে উদ্ধার করবার লোকের অভাব নেই। তা বল্ তোকে উদ্ধার করবার লোক ক'টা আছে? তোর মত বাপ-মরা মেয়েকে কে উদ্ধার করবে, বল্ তুই? তাদের ডেকে আন্ এখানে, আমি দেখি তাদের।

সন্দীপ আবাব বললে—আব কিছু বলবেন না মাসিমা, আপনি থামুন--

মাসিমা বললে—আমাব মুখ দিযে কি সাধে কথা বেবোয বাবা? মেয়েব কথা শুনলে যে আমাব পেটেব ভাত চাল হযে যায।

হঠাৎ দবজাব ঘণ্টা বাজতেই দবজা খুলে দিল সন্দীপ। তপেশ গাঙ্গুলী ঘবে ঢুকেই সন্দীপকে দেখে বললে—কী ভায়া, খবব সব ভালো তো?

সন্দীপ এ প্রশ্নেব কোন জবাব দিলে না।

তপেশ গাঙ্গুলীব কেমন অস্বস্থি হতে লাগলো। সকলেব মুখেব দিকে চেযে বললে—এ কী সকলেব মুখ খুব গম্ভীব গম্ভীবা দেখছি যে? কোনও গোলমাল হযেছে নাকি? বিযে ভেঙ্গে গেছে?

তবু কাবো মুখে কোনও কথা নেই দেখে তপেশ গাঙ্গুলী বললে—কী ব্যাপাব বলো তো বৌদি, আমি এসে তোমাদেব কোনও অসুবিধে কবে দিলুম নাকি?

যোগমাযা বললে—না ঠাকুবপো, তুমি বোস।

তপেশ গাঙ্গুলী বললে--না, আমি এসে যদি তোমাদেব কোনও অসুবিধা কবে থাকি তো বলো. আমি না-হয এখুনি চলে যাচ্ছি। আমি এলুম এমনি তোমবা কেমন আছো তাই দেখতে—

যোগামাযা আবাব বললে—না-না, কিছু হযনি, তুমি বোস—। তোমবা সব ভালো আছো তো?

তপেশ গাঙ্গুলী একটা চেযাবে বসে পডে বললে—আব আমাদেব ভালো থাকা বৌদি, তুমিও চলে এসেছ আব আমাদেবও ভালো থাকা ঘুচে গেছে। দেখছো, না, আমি কত বোগা হযে গেছি। বাত্তিবে আমাব ভালো কবে ঘুমই হয না আজকাল, তা জানো?

যোগমাযা বললে--তা ডাক্তাব টাক্তাব দেখাও না—তোমাব নিজেব শবীব ভালো থাকলে তবে তো বাডিব সবাই থাকবে—

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—সে-কথা একমাত্র তুমিই বোঝ বৌদি. সংসাবেব আব কেউ কিছু বোঝে না। আব কেউ যদি বুঝতো তো আজ আমাব এই দুঃখু—

যোগমাযা বললে—তুমি কিছু খাবে ঠাকুবপো?

তপেশ গাঙ্গুলী বললে—খাওযাব ব্যাপাবে আমি কখনও না বলেছি, বল্ল তুমি?

এবাব যোগমাযা উঠলো। সন্দীপও উঠলো। বললে—আমি এখন যাই মাসিমা, কাল আবার আসবো।

বলে দবজাব দিকে পা বাডালো। বিশাখা পেছন পেছনে গেল দবজা বন্ধ কবতে। বাইরে যেতেই সন্দীপ কাব পায়েব শব্দ শুনে পেছনে ফিবে দেখলো বিশাখা।

একেবাবে সিঁডিব মুখ পর্যন্ত এসে দাঁডিযেছে বিশাখা। সন্দীপ জিজ্ঞেস কবলে —কিছু বলবে আমাকে?

বিশাখা কিছু উত্তব দিলে না।

সন্দীপেব মনে হলো বিশাখা যেন কিছু ভাবছে।

জিজ্ঞেস কবলে—কথা বলছো না যে? কিছু ভাবছো?

বিশাখা বললে—হ্যাঁ, ভাবছি আমাব বিয়েব ব্যাপাব নিযে আমাব চেযে তোমাদেবই যেন বেশি মাথা-ব্যথা।

সন্দীপ বললে- মেযেব বযেস হলে বাপ-মা ভাববে না তো কে ভাববে?

বিশাখা বললে—আমাব মা ভাবছে ভাবুক, কিন্তু তুমি? তুমি ভাবছো কেন? তুমি আমাব কে?

সন্দীপ বললে—আমি আবাব তোমাব কে? কেউই না—। তোমাব দেখাশোনা করবাব জন্যে খাওয়া-পরা-থাকা আব মাসে মাসে পনেবো টাকা মাইনে দিয়ে আমাকে বাধ্য হয়েছে বলেই আমি তোমার কথা ভাবি —

বিশাখা বললে—আমার যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তখন? তখন কী হবে?

সন্দীপ বললে—তখন আর কী হবে? তখন আমার চাকরি চলে যাবে—

বিশাখা জিজ্ঞেস করলে—তখন কার কথা ভাববে?

সন্দীপ এ-কথার কী জবাব দেবে? একটু ভেবে বললে—তখন কি আর তোমার কথা ভাববার অধিকার আমার থাকবে? তখন তোমারও বিয়ে হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে আমার চাকরিটাও চলে যাবে—

বিশাখা বললে—তাহলে লণ্ডন থেকে তোমাদের ছোটবাবুর চিঠি না আসতে অত ভাবছো কেন? সে চিঠি আসতে যত দেরি হয় ততই ভালো—

সন্দীপ বললে—আমি তো নিজের জন্যে ভাবছি না, ভাবছি তোমার জন্যে -

বিশাখা বললে—এ যে সেই রকম হলো' —যার বিয়ে তার ধুম নেই, পাড়া পড়শির ঘুম নেই তুমি তোমার চাকরির কথা ভাববে না পরের বিয়ের কথা ভাববে?

সন্দীপ বললে—কিন্তু আমার চাকরির কথা তো বড় কথা নয়, একটা চাকরি গেলে আমি না হয় আবার একটা চাকরি জোগাড় করে নেব। কিন্তু, তোমার বিয়ে? বিয়ে তো কারোর দু'বার হবার নয়। দু'বার হওয়াটা উচিতও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়

তারপর একটু থেমে আবার বললে - আর তা ছাড়া তুমি তো আমার পর নও—

বিশাখা বললে —পর নই?

—না।

বিশাখা বললে—ওমা, আমি তোমার পর নই তো কী? আপন?

সন্দীপ এ-কথার কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভেতর থেকে মাসিমার গলার আওয়াজ এল। মাসিমা বলছে ওরে, বিশাখা, কোথায় গেলি

মাসিমার গলার শব্দ পেয়েই বিশাখার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল।

সন্দীপ বললে - ওই তোমার ডাক এসেছে, এবার যাও

বিশাখা বললে —ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি, কিন্তু কাল তো তোমাকে আবার চাকরি করতে এখানে আসতেই হবে, তখন এ কথার জবাব আদায় করবো তবে ছাড়বো

—কীসের জবাব?

বিশাখা বললে—ওই যে তুমি একটা কথা বললে—আমি নাকি তোমার পর নই

ওদিকে মাসিমা আবার ডাকতেই বিশাখা আর দাঁড়ালো না, সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সন্দীপও আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে লাগলো--
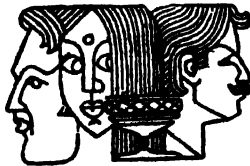
ক'দিন ধরেই লন্ডন থেকে খোকার কোনও চিঠিও আসছে না, টেলেক্সও আসছে না ঠাকমা মণি খোকার জন্য ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ভোরবেলা রোজ যেমন তিনি বিন্দুকে নিয়ে গঙ্গায় চান করতে যেতেন তেমনি যান। বাবুঘাটে দশরথ পাণ্ডা রোজ যেমন ঠাকমা মণিকে বেলপাতা আর ফুল দিয়ে মন্ত্র পাঠ করাতো, তখনও তিনি তেমনি মন্ত্র পড়তেন। সন্ধ্যেবেলা একতলার মন্দিরে যেমন রোজ সিংহবাহিনীর আরতি হতো তখনও তেমনি

ঠাক্‌মা-মণি সেখানে এসে প্রণাম করতেন আর প্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকাতেন। দৈনন্দিন সংসারের কাজকর্মে, প্রাত্যহিক নিয়মকানুনের কোথাও কোন ছন্দপতন হতো না।

কিন্তু বাড়ির ঝি-ঝিউড়ি, দরোয়ান থেকে মল্লিকমশাই, সন্দীপ পর্যন্ত সবাই জানতো যে এই এখানে এই সংসারযন্ত্রের কেন্দ্রে কোথায় কোন একটা অতি ক্ষুদ্র 'স্ক্রু' যেন আল্‌গা হয়ে গেছে। যন্ত্রটা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রাণ স্পন্দন যেন মৃদু গতি। সেখানে যেন কোনও শৃঙ্খলা নেই। সব কিছু থেকেও সে যেন নিরুদ্দেশ।

অথচ সৌম্যবাবু এ-সংসারের কতটুকু?

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু চোখে দেখা যায় তার সবই মানুষ দেখেছে। কখনও সাদা চোখে আবার কখনও বা নিউটনের আবিষ্কার করা টেলিস্কোপের সাহায্যে।

কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি? যার সঙ্গে আমাদের গ্রহ-গ্রহান্তরের জড়-জীব-জন্তুর অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত? তাকে কি দেখা যায়?

তাই সৌম্যপদবাবুর অস্তিত্বটা চোখে দেখা না গেলেও সমস্ত বাড়িটা সেই অদৃশ্য শক্তিরই আকর্ষণে আবদ্ধ ছিল। তাকে কেন্দ্র করেই সংসারের সুদর্শন চক্র একটা বিশিষ্ট গতিতে শৃঙ্খলাকৃষ্ট হয়ে আবর্তিত হতো।

কিন্তু সৌম্যবাবু চলে যাওয়ার পরদিন থেকেই যেন এই সংসার তার গতির তেজ হারালো। তার শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটলো। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও সন্দীপের চোখে এটা কটুভাবে ধরা পড়তে লাগলো।

সন্দীপ প্রতিদিনের মত তেতলায় গিয়ে ঠাক্‌মা-মণির কাছে বাসেল স্ট্রীটের বাড়ির রিপোর্ট দিত।

ঠাক্‌মা-মণি রোজকার মতই জিজ্ঞেস করতেন—বউমা কেমন আছে?

সন্দীপ বলতো—ভালো—

ঠাক্‌মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করতেন—মাংস ডিম ছানা-টানা সব খাচ্ছে তো?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ—

—আর, লেখাপড়া?

সন্দীপ বলতো—হ্যাঁ, লেখাপড়া করছে ঠিক-ঠিক—

—অরবিন্দ ঠিক সময়ে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর বাড়ি নিয়ে আসা করছে তো? কোনও বেনিয়ম হচ্ছে না?

—না —

এমনি আরো অনেক প্রশ্ন করতেন ঠাক্‌মা-মণি। মাসোহারার টাকা মল্লিককাকা নিয়মমত ঠিক ঠিক সন্দীপের হাতে দিয়ে দিতেন। সন্দীপ সেই টাকার রসিদে নিজের নাম সই দিয়ে যার যার পাওনা-গণ্ডা তাকে তা দিয়ে দিত। বিশাখার স্কুলে গিয়ে তার মাসকাবারি টাকাটা মিটিয়ে দিত, সেই সঙ্গে বাড়িতে আন্টি মেমসাহেব আর জয়ন্তী দিদিমণির মাইনেটাও দিয়ে দিত। আর সংসার খরচের সমস্ত টাকাটা তুলে দিত গিয়ে মাসিমার হাতে। দুধের দাম, দৈনিক বাজার খরচ থেকে আরম্ভ করে বিশাখার টুকি-টাকি, তার শাড়ি, ব্লাউজ সাবান, সেন্ট, হেয়ার অয়েল আর মাসিমার প্রয়োজনীয় সব জিনিসের খরচ-পত্র তার মধ্যেই ধরা থাকতো।

কিন্তু সেদিন সন্দীপ যে-খবরটা শুনলো তাতে সে যেমন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

মল্লিকমশাই ঠাক্‌মা-মণিকে হিসেব বুঝিয়ে দেবার পর নিচেয় নেমে এসেই সব বললেন। ঠাকমা-মণি নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিছানা থেকে আর নাকি উঠতেই পারছেন না।

সন্দীপও খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এত বছর ধরে সন্দীপ এ বাড়িতে রয়েছে কিন্তু এর আগে সে ঠাকমা মণিকে তো কখনও অসুস্থ হতে দেখেনি। অসুস্থ হওয়ার খবরও কখনও শোনেনি সে।

জিজ্ঞেস কবলে—কেন এমন হলো? ছোটবাবুব কোনও চিঠি পাননি বলে দুর্ভাবনায়?

মল্লিককাকা বললেন—না, সৌম্যবাবুব চিঠিও পেয়েছেন, ছোটবাবুব সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছে তাঁব—

—তাহলে হঠাৎ শবীব খাবাপ হলো কেন?

মল্লিককাকা বললেন—হলো এখানকাব ফ্যাক্টবিব ব্যাপাবে। ফ্যাক্টবিতে ভয়ানক গোলমাল লেগেছে —

ফ্যাক্টবিতে বহুদিন ধবে লেবাব-ট্রাবল তো চলছিলই। তাব ওপব একদিন নাকি দুর্ঘটনায় একটা দামী মেস্নিনে আগুন ধবে গিয়েছিল।

—সে তো আমি আগেই শুনেছি। তাবপব? তাবপব কী হলো হঠাৎ?

মল্লিকমশাই তাব পবেব ঘটনাটা বললেন—কে একজন শিফট-ইনচার্জ ছিল তাব নাম বেণুগোপাল। সে নাকি কোন পার্টিব কাছ থেকে লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে মেসিনটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল

সন্দীপ বললে—ঘুষ? এক লাখ টাকা ঘুষ? কে অত টাকা ঘুষ দিলে?

মল্লিককাকা বললেন—আজকাল যা দিনকাল পডছে বাবা, এক লাখ টাকা ঘুষ তো কিছুই না। এক লাখ টাকা এখন হাতেব ময়লা—

সন্দীপ জিজ্ঞেস কবলে—কেন ঘুষ দিলে? কে দিলে?

মল্লিককাকা বললেন—তুমি এখন ছোট এখন তুমি বুঝবে না। আব ছোটই বা তোমাকে বলি কী কবে? আমাদেব যুগ হলে তুমি দুই ছেলেব বাপ হয়ে যেতে

একটু থেমে তাবপব আবাব বললেন—আমি এতদিন আছে এ-বাডিতে, এবকম কাণ্ড কখনও দেখিনি। ঠাকমা-মণিব মনেব অবস্থা আগে কখনও এমন হয়নি। কত ঝড ঝাপ্টা গেছে মাথাব ওপব দিয়ে, তবু কখনও তাঁকে মাথা নিচু কবতে দেখিনি আমি, এমনই তাঁব মানসিক অবস্থা—

মল্লিককাকা কথাগুলো বলতে বলতে আবো গম্ভীব হয়ে গেলেন। সন্দীপও মল্লিককাকাকে এমন চঞ্চল হতে কখনও দেখেনি। মনে মনে সে খুব বিচলিত হয়ে পডলো। কী এমন ঘটনা ঘটতে পাবে যাব জন্যে ঠাক্‌মা মণি, মল্লিককাকা দুজনেই এত মুষডে পডলেন।

হঠাৎ কোন এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সন্দীপ সব খবব পেয়ে গেল পবেব দিনই। খববটা দিলে সুশীল। সুশীল সবকাব। সুশীল সবকাব বললে—খবব শুনেছেন?

—কী খবব?

—আপনি শোনেন নি কিছু? আব একটা কোম্পানী তো লালবাতি জ্বাললে আজ।

—লালবাতি জ্বাললে মানে? কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল? কোন কোম্পানী?

সুশীল বললে—বেলুডেব স্যাকসবী মুখার্জী কোম্পানী।

সন্দীপেব মাথা থেকে পা পর্যন্ত থব-থব কবে কেঁপে উঠলো। স্যাক্সবী মুখার্জি কোম্পানীতে ক্লোজাব হওযা মানে তো তাবও কলকাতা জীবনেব সমাপ্তি। এখন তাহলে কী হবে? তার চাকবিও কি তাহলে চলে যাবে? আব বিশাখা? বিশাখাব বিয়ে? সৌম্যবাবু তো এখানে নেই। তাহলে একটা কোম্পানী বন্ধ হওযা মানে তো একলা একজনেব ক্ষতি নয। এব সঙ্গে যে হাজাব-হাজাব মানুষেব জীবন, হাজাব-হাজাব মানুষেব ভবণ পোষণ, হাজাব-হাজাব মানুষেব বাঁচা-মবার সম্পর্ক জডিত।

সুশীল সবকাব সন্দীপেব নিষ্প্রাণ মুখেব দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস কবলে—কী ভাবছেন? খববটা আপনি জানতেন না? খববেব কাগজে তো বেবিয়েছে—

সন্দীপ আব কী বলবে। বলবাব মত কথা তাব কী-ই বা আব থাকতে পাবে। সন্দীপ হতবাকেব মত খববটা শুধু শুনলো আব তাবপব প্রফেশাব ক্লাশে আসাব পবেই দুজনেব কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। ক্লাশে যে সে কী পডনো হলো তা কিছুই আব তাব কানে ঢুকলো না। তাব সমস্ত মন পডে বইল সেই মুক্তিপদ মুখার্জিব দুশ্চিন্তা আব দুঃসংবাদেব দিকে আব বিশাখার জীবনেব দুর্ভাগ্য সমস্যাব দিকে।

ক্লাশের পর জন-মুখর রাস্তায়-বেরিয়ে সন্দীপের মনে হলো সারা কলকাতা শহরটা যেন হঠাৎ বড় জনশূন্য হয়ে গেছে। কোথাও যেন কেউ নেই। সেই জনবিরল রাস্তায় বিডন স্ট্রীটের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েও তার মনে হলো রাস্তাটা যেন হঠাৎ অন্য দিনের চেয়ে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। শহরের রাস্তা তো একটা বাঁধা মাপের মধ্যে স্থির হয়ে থাকে। সে রাতারাতি ছোটও হয় না, বড়ও হয় না। তাহলে এমন হলো কেন? বাড়ি পৌঁছতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

হঠাৎ একটা লোক তাকে ডাকলে—শুনছেন?

সন্দীপ যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলে? চেয়ে দেখলে একটা ছেলে তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলছে। সন্দীপ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন?

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ, কই আপনি তো এলেন না?

সন্দীপ বললে—সেই যে আপনাকে আমি বলেছিলুম 'বিশ্বশান্তি'র একটা সাইন বোর্ড সস্তায় তৈরি করিয়ে দেব—

সন্দীপ চারদিকে চেয়ে দেখলে। এ তো হাতীবাগান বাজারের মোড়। বিডন স্ট্রীটের বদলে এত দূরে সে এসে পৌঁছলো কী করে? সামনেই দাঁড় করানো সেই সাইনবোর্ডটা দেখে তার সব মনে পড়ে গেল। সেই সাইনবোর্ডের ওপরে সেদিনকার মতই লেখা রয়েছে :

শ্রীশ্রীজগন্মাতার স্বপ্নাদেশে
বিশ্বশান্তি স্থাপনের
নিমিত্ত এই দেবস্থানে প্রত্যহ
পূজাপাঠ ও যাগযজ্ঞ
অনুষ্ঠিত হইবে।
ঈশ্বরের সেই নির্দেশ পালনের হেতু
আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

সোম—ব্রহ্মা
মঙ্গল বিষ্ণু
বুধ—মহেশ্বর
বৃহস্পতি লক্ষ্মী
শুক্র সন্তোষী মা
শনি বারের দেবতা

নিচেয় সেবাইতের নাম লেখা আছে। তার পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে ডাক নাম।

সন্দীপের সমস্ত মনে পড়ে গেল। টাকা উপায় করবার কত রকম ফন্দী আজকাল। মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে কত রকম মতলবই বার করেছে ছেলেরা। সামনে একটা তামার থালার ওপর অনেকগুলো টাটকা-ফুল পড়ে আছে তার সঙ্গে কিছু খুচরো পয়সা। মির্জাপুর স্ট্রীটে ঠিক যে-রকম সাইনবোর্ড সে দেখেছিল, এও ঠিক সেই রকম। ঠিক একই কায়দা।

ছেলেটা বললে—আপনি তো চাকরি পাচ্ছেন না বলেছিলেন—

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ—

—তাই তো আপনাকে বলেছিলুম জোড়াসাঁকো বাজারের মোড়ের কথা। ওখানেও বাজারের মোড়ে এই রকম একটা খালি জায়গা আছে, খুব সস্তায় আপনাকে একটা এইরকম সাইনবোর্ড করে দিতে পারি, তা আপনি তো

সন্দীপ আর দাঁড়ালো না। চলে আসবার আগে শুধু বলল—আচ্ছা, আমি আর একদিন আসবো, আজ আসি

বলে তাড়াতাড়ি আবার উল্টো ফুটপাত ধরে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলো।

আর সত্যিই 'স্যাক্সবী মুখার্জি, কোম্পানীতে তখন অভূতপূর্ব অশান্তির তুফান বয়ে চলেছে।

বেণুগোপাল বহুদিনের শিফ্‌ট-ইনচার্জ। অনেক অভিজ্ঞ ইন্‌জিনীয়ার। তার মূল্য কোম্পানী জানে। কিন্তু সে যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। এত দিনকার সমস্ত বিশ্বাস সে হারিয়েছে। সুতরাং উচিত শাস্তিই তার পাওয়া উচিত।

অর্জুন সরকার অনেক দিন ধরে নানা দিক থেকে খবর পাচ্ছিল। মুখার্জি সাহেবের স্বার্থ দেখবার জন্যেই তাকে মোটা মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছিল। কাজটা বড় কঠিন। কিন্তু এতদিন সেই কঠিন কাজটা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সে চালিয়ে এসেছে কে তার কাজে গাফিলতি করছে, কে প্রোডাকশন কম করছে, কে অন্যায়ভাবে ওভারটাইম নিচ্ছে, কে কম্পাউন্ডের বাইরে বেআইনীভাবে মাল পাচার করছে, এ সমস্তই সরকার সাহেব ধরে ফেলে শাস্তি দিয়ে মালিকের কাছে সুনাম পেয়েছে। কোম্পানীও তাতে প্রচুর লাভবান হয়েছে।

তাই মুক্তিপদ মুখার্জি বহুকাল থেকে দরকারী খবরাখবর পাওয়ার জন্যে অর্জুন সরকারকে এ-সব কাজের ভার দিয়েছিলেন।

এবারও সেই ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল।

'স্যাক্সবী মুখার্জী' কোম্পানী স্টাফ-কোয়ার্টারের কেউ জানতে পারেনি যে বেণু গোপালবাবুর বাড়িতে সেদিন হঠাৎ সার্চ হবে। বাড়ির লোক ঘুম থেকে ওঠবার আগেই পুলিশ কখন সাদা-পোশাকে চারদিক ঘিরে ফেলেছে তাও কেউ জানতে পারেনি। সদর দরজার ইলেকট্রিক-ঘণ্টা বাজাতেই বাড়ির কাজের লোক দরজাটা খুলে দিয়েছে।

—কে?

তখনও দরজার বাইরে মানুষের গলার আওয়াজ—দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—

ভেতর থেকে দরজা খুলতেই পুলিশের লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাধা দেবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয় কিন্তু যাদের কাছে পরোয়ানা আছে তাঁদের কে বাধা দেবে? বেণুগোপাল খবর পেয়েই ঘুম থেকে উঠে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কী চাই?

জবাব দেবার মত নজির ছিল পুলিশের হাতে। সেটা দেখানো হলে পর তখন আর বেণুগোপালের কিছু বলবার ছিল না। বিনা বাধাতেই সবাই সব ঘরে ঢুকলো। খাট আলমারি ভাঁড়ার-ঘর, বাথরুম, কিচেন সব তন্ন তন্ন খোঁজা হলো। আলমারির ভেতরে কাপড়-জামা ছাড়া কিছু কাগজ-পত্রও ছিল তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো।

ততক্ষণে বাড়ির বাইরে মানুষের জটলা বেঁধে গেছে। প্রথমে অল্প, তারপরে অনেক তারপর চিৎকার। তারপর শ্লোগান। মানুষের সমস্ত অভিযোগের মূল যখন কেন্দ্র তখন আঘাত আর আক্রমণের খাঁড়া গিয়ে পড়লো অদৃশ্য মুক্তিপদ মুখার্জির মাথার ওপর।

উচ্চ কণ্ঠের শ্লোগান উঠলো—মুক্তিপদ মুখার্জি মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

সেই সুরে সমবেত শব্দ উঠলো—মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

তারপর সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো সমস্ত স্টাফ-কোয়ার্টারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত কারখানার আনাচে-কানাচে। যে-যেখানে কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিল তারা সবাই কাজ বন্ধ করে ছুটে এল বেণুগোপালের বাড়ির সামনে। তারাও সমস্বরে সকলের সুরে সুর মেলালো—মুর্দাবাদ—মুর্দাবাদ—

সে এক নরক গুলজার দৃশ্য।

সবাই একসঙ্গে ঢুকতে চায় বেণুগোপালের বাড়িতে। সবাই সেই অত্যাচারে প্রতিবাদমুখর হয়ে চিৎকারে পাড়া মাত করে। সবাই বলতে চায়—এ অত্যাচার সইবো না, এই অত্যাচার মানবো না, মানছি না—

কোথা থেকে খবর পেয়ে একদল লাঠি-ধারী পুলিশ এসে সকলকে তাড়া করতে শুরু করলো। ভাগো, ভাগো ইঁহাসে—ভাগো—

সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে যেন ঢিল পড়লো। একদিকে লাঠি চললো, অন্যদিকে ইট। লাঠিতে চিৎকারে, স্লোগানে, ইটে, জায়গাটা এমন বিপদ-সঙ্কুল হয়ে উঠলো যে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। শেষকালে সেই লোকারণ্য ফ্যাক্টরির ভেতরেও সংক্রামিত হলো। চূড়ান্ত পরিণতি হলো আর একটা মেসিনে দাউ-দাউ করে আগুন লেগে। ফাঁকা হয়ে গেল ফ্যাক্টরি। যেখানেই মানুষ দেখতে পায় সেখানেই পুলিশ হামলা করে। মানুষ দেখলেই মারো, মানুষ দেখলে তাড়া করো।

বাড়িতে বসে তখন মুক্তিপদ মুখার্জি টেলিফোনে ওয়ার্কস ম্যানেজারের রিপোর্ট শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? আগুন নেভাবার ব্যবস্থা হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়েছি। তারা আসছে—

—আর বেণুগোপালের বাড়িতে? পুলিশ কিছু পেয়েছে?

ওয়ার্কাস ম্যানেজার বলল—সার্চ এখনও চলছে স্যার, পরে আপনাকে সব জানাবো—

মুক্তিপদ টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আবার চুপ করে বসে রইলেন। সকাল থেকে একবার করে টেলিফোন আসছে আর তিনি একটা করে নতুন দুঃসংবাদ শুনছেন।

মুক্তিপদ একবার মিসেসের বেড-রুমে গিয়ে দেখেছিলেন নন্দিতা বেশ আরামে ঘুমোচ্ছে। তার কোনও চিন্তা নেই। কোথা থেকে টাকা আসছে, কে টাকা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, এ টাকা কত হাজার-হাজার মানুষের উদয়াস্ত পরিশ্রমের যে ফসল সে সব খবর তার জানবার দরকার নেই। তার জানবার ইচ্ছেও নেই। যারা খেটে মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে নন্দিতাদের আরামের জন্যে টাকা সাপ্লাই করে যাচ্ছে, তাদের দেখবার জন্য তো গভর্মেন্টই আছে। গভর্মেন্ট তো তাদের জন্যেই দাতব্য হাসপাতাল করে দিয়েছে, অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে তারা বিনা-পয়সায় ওষুধ পায়, চিকিৎসা পায়। তারপরে আমরা যেসব প্রতিষ্ঠানে চ্যারিটি করি সেই রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সেখানেও তো তারা বিনা-পয়সায় সেবা পায়। আমরা নিজেরা কেন তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে নিজেদের রাত্রের ঘুম নষ্ট করবো? যদি কোনও চ্যারিটেবল্ অর্গ্যানেজিশন আসে আমাদের কাছে, আমরা তো তাদেরও চাঁদা দিই। সেই চাঁদার টাকায় তারা গরীব লোকদের জন্যে কত কী মহৎ কাজ করছে তা কি তোমরা খবরের কাগজের পাতায় দেখতে পাও না? সে-সব চাঁদার টাকা কোথা থেকে আসছে? সে তো আমাদেরই দেওয়া টাকা। সে তো আমাদেরই খেটে উপায় করা পয়সা। আমরা যদি একটু আরাম না করি তো কী করে আমাদের শরীর টিকবে? আর কী করেই বা আমরা তোমাদের সেবার জন্যে চাঁদা যোগাবো?

মুক্তিপদ নন্দিতার বেড্-রুমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। বেশ আছে, সত্যিই বেশ আছে নন্দিতা। সংসারে ওরাই সুখী।

অনেকক্ষণ টেলিফোনের কাছে অপেক্ষা করলেন মুক্তিপদ। তিনি নিজেই ওদের কাউকে টেলিফোন করবেন নাকি? তিনি টেলিফোন করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় টেলিফোনটা নিজে থেকেই বেজে উঠলো।

—ইয়েস?

ওধার থেকে আওয়াজ এলো—আমি সরকার বলছি স্যার—

—বলো? বলো? আমি তোমার টেলিফোনের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম—কী খবর?

অর্জুন সরকার বললেন—খুব হৈ চৈ চলছে স্যার এখানে, লেবাররা সবাই ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা পুলিশের ওপর ঢিল ছুঁড়ছে। একটা মেসিনে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল

—তারপর? তারপর কী হলো, বলো শিগগির?

অর্জুন সরকার বললে—পুলিশ প্রথমে লাঠি চালিয়েছিল, তারপর যখন লেবাররা পুলিশকে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল তখন পুলিশ ফায়ারিং শুরু করেছে। এখন চারদিকে সমস্ত এলোমেলো, যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—কিছু ক্যাজুয়ালটি হয়েছে নাকি?

—এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না স্যার। পরে আপনাকে সব খবর দিচ্ছি

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলেন—আগুন নিভেছে?

—হ্যাঁ এখন ধোঁয়াই বেশি দেখা যাচ্ছে সমস্ত ফ্যাক্টরিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে একেবারে—

—আর বেণুগোপালের বাড়ি? সার্চ শেষ হয়েছে?

—শুনছি সার্চ শেষ হয়ে গেছে—

—কিছু পাওয়া গেছে?

অর্জুন সরকার বললে—শুনছি নাকি শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি।

—কিছুই পাওয়া যায়নি? সেই এক লাখ টাকা?

অর্জুন সরকার বললে—বুঝতে পারছি না টাকাটা কোথায় সরালে সে। জানি না, হয়ত কেউ আগে ভাগে খবরটা দিয়ে দিয়েছিল

—কিন্তু কে আর খবর দেবে? তুমি আমি ছাড়া আর কেউ তো জানতো না খবরটা। যদি বাড়ি সার্চ করে শেষ পর্যন্ত টাকা না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে?

অর্জুন সরকার অভয় দিলে। বললে—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, যা হয় আমি আপনাকে ঠিক সময়ে জানিয়ে দেব—

—ঠিক আছে—

বলে মুক্তিপদ রিসিভারটা রেখে দিলেন। দরোয়ান এসে জানলে গাড়ির ড্রাইভার এসেছে।

মুক্তিপদ বললেন—ঠিক আছে, তাকে বসতে বল্, আমি পরে যাবো—

বিশু বহুদিনের ড্রাইভার। অল্প টাকায় এই চাকরিতে ঢুকেছিল। এখন তার মাইনে আগের চেয়ে বহু গুণ বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্যামিলিও বেড়েছে। জিনিসপত্রের দামও তেমনি সঙ্গে -সঙ্গে বেড়ে চলেছে। মাইনে যদি বাড়ে একগুণ তো জিনিসের দাম বাড়ে পাঁচ গুণ। বাজারে গিয়ে বিশু কী কিনবে আর কী কিনবে না, তা ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায় না। যে জিনিসটাতে হাত দেয় সেটাই দেখে আগুন।

বহুদিন আগে কারখানার মাঠের সামনে ভোটের মীটিং হচ্ছিল। বিশু তখন গাড়ি রেখে বসেছিল ভেতরে। সাহেব অফিসের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ কতকগুলো কথা তার কানে গেল।

যে লোকটা লেক্চার দিচ্ছিল সে তখন বলে চলেছে—ভাই সব, আপনারা ভেবে দেখুন, আপনারা কাকে চান? যারা সরকার চালাচ্ছে তাদের, না আমাদের। যারা সরকার চালাচ্ছে তাদের আপনারা জিজ্ঞেস করুন কেন জিনিস পত্রের দাম বাড়ে? তারাও যা খায় আপনারাও তাই খান। তারা বড়লোক বলে কি তাদের পেট বড়? আর আপনারা গরীব লোক বলে কী আপনাদের পেট ছোট? তা তো নয়। মদের দাম বাড়ে বাড়ুক, ঘি-এর দাম বাড়ে বাড়ুক, মটরগাড়ির দাম বাড়ে বাড়ুক, কিন্তু চাল-ডাল-তেল-নুন-কাপড়-জামার দাম বাড়বে কেন? আপনারা আর আমরা, যারা গরীব লোক, তারা যা খেয়ে বাঁচি তার দাম বাড়বে কেন? এই যে আপনাদের চিফ্-মিনিস্টার্ যিনি নিজেকে একজন পরম দেশভক্ত বলে জাহির করেন যিনি বলে বেড়ান যে তিনি দেশ সেবার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, সেই তিনিই সম্প্রতি রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁর নিজের ঘরের লাগোয়া বাথ্‌রুমটা এক লাখ টাকা খরচ করে সাজিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা, যারা মেহনতি মানুষ তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করি এই মেহনতি মানুষের এক লাখ টাকায় তাঁর বাথ্‌রুম সাজাবার অধিকার তাঁকে কে দিলে? বলুন ভাই সব, সে অধিকার তাঁকে কে দিলে? এবার যদি আপনারা আমাদের ভোট দিয়ে সরকারে বসান তাহলে কথা দিচ্ছি ক্ষমতা পেলে আমাদের প্রথম কাজ হবে ওই বাথ্‌রুম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া'

বিশুর মনে আছে ওই বক্তৃতা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোক একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠেছিল কিন্তু ভোটে তো শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি বিশ্বনাথরা। তাই সেই কথা রাখার আর দরকারও হয়নি।

কথাগুলো অনেক দিন আগের, তবু বিশুর সমস্ত মনে আছে।

হঠাৎ দারোয়ান এল। বললে—সাহেব এখন বেরোবেন না, পরে বেরোবেন--আভি বইঠো—

সাহেব বেরোন আর না বেরোন বিশুকে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতেই হবে। সে নিজে একজন মেহনতি মানুষ। তার দুঃখ-দুর্দশার কথা কেউ বুঝবে না। সেদিন সকালে সে বাজারে গিয়ে আলু কিনেছে দু'টাকা কিলো দরে

ওপরে তখন মুক্তিপদ টেলিফোন করছে মা'কে।

ঠাকমা মণি সব শুনে বললেন—তারপর?

মুক্তিপদ বললে—তারপর আর কি, বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করে কোনও টাকা পাওয়া গেল না—

—তারপর?

—তারপর ফ্যাক্টরির স্টাফ ক্ষেপে গেছে। কাজকর্ম সব বন্ধ করে দিয়ে লেবাররা শ্লোগান দিচ্ছে। তারা বলছে বদনাম দেবার জন্যে মিছিমিছি বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করা হয়েছে। আসলে বেণুগোপাল যে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে মেসিনটা পুড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ আছে—

—কী প্রমাণ?

—আমার ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার অর্জুন সরকার খুব ভালো সোর্স থেকে সে খবর পেয়েছিল—

ঠাকমা মণি জিজ্ঞেস করলেন—ঘুষ নেওয়ার সময় কেউ কি প্রমাণ রাখে?

—প্রমাণ যদি না থাকে তো অর্জুন সরকার কি মিছিমিছি আমাকে খবরটা দিলে, মিছিমিছি আমাকে বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করবার কথা বললে?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—যদি বেণুগোপাল ঘুষ নিয়েই থাকে তো সে টাকা কোথায় গেল? সার্চ করে সে-টাকা পাওয়া গেল না কেন? তাহলে বেণুগোপালকে নিশ্চয়ই কেউ আগে থেকে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে যে তার বাড়ি সার্চ করা হবে।

মুক্তিপদ বললে—কে আর আগে থেকে কথাটা ফাঁস করে দেবে? কেউ তো কিছুই জানতো না। অর্জুন সরকার তো কথাটা কারোর সামনে বলেনি যখন শেষ রাত্তিরে আমি গাড়িতে বাড়ি আসছিলুম তখনই প্রথম সে আমাকে বললে। তখন তো সেখানে কেউ ছিল না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তাহলে এখন কী হবে?

মুক্তিপদ বললে—কী হবে তাই-ই তো ভাবছি। যদি এইরকম করে চলে তো শেষ পর্যন্ত আর কী করবো, ফ্যাক্টরি বন্ধই করে দিতে হবে—

—ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিতে হবে মানে?

মুক্তিপদ বললে—বন্ধ করে দিতে হবে মানে ফ্যাক্টরিতে লক্-আউট ডিক্লেয়ার করতে হবে। দেখি না কতদিন ওরা না খেয়ে থাকতে পারে। লক আউট করে দিলে ওরাও তো মাইনে পাবে না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তা এতদিনকার ফ্যাক্টরি, বন্ধ করে দিলে গভর্মেন্টেরও তো লোকসান হবে। গভর্মেন্ট তো ট্যাক্স পাবে না। এ-ব্যাপারে গভর্মেন্টের কিছু করবার নেই? গভর্মেন্ট কি শুধু বসে বসে চুপ করে দেখবে?

মুক্তিপদ বললে—তোমাকে তো সেই জন্যেই বলেছি মা যে মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে আমাদের সৌম্যর বিয়েটা দিয়ে দিতে—

ঠাক্‌মা মণি বললেন—গভর্মেন্টের সঙ্গে তোর চ্যাটার্জির মেয়ের কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক নয়?

—বল্ না তুই, কীসের সম্পর্ক?

মুক্তিপদ বললে—ও বিয়েটা দিলে আমাদের ফ্যাক্টরিতে আর লেবার-ট্রাবল্ হবে না। আজকাল লেবারই তো সব। ইন্ডিয়ার যতগুলো স্টেট্ আছে সকলের চেয়ে ওয়েস্টবেঙ্গলই হচ্ছে ইনডাসট্রির পক্ষে সব চেয়ে সুটেবল জায়গা। এই স্টেটেই কয়লা আছে, এই স্টেটেই আছে অফুরন্ত জল এই শহরের মধ্যেই আছে এত বড় পোর্ট—একসঙ্গে এত সুবিধে আর কোন্ স্টেটে আছে? সেই জন্যেই তো ব্রিটিশরা এত জায়গা থাকতে এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সব কিছুই উল্টে গেল। আমাদের এখানকার সব ইনডাসট্রি আজ রোগে ধুকছে, আর অন্য সব স্টেটের সব ইনডাসট্রির উন্নতি হচ্ছে

ঠাকমা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

—কেন হচ্ছে তার কারণ গভর্মেন্ট—

—তা, গভর্মেন্টকে তোরা তোদের কথা জানাতে পারছিস না? তোদের তো চেম্বার অব কমার্স রয়েছে, তারা কী বলছে? বসে বসে শুধু সভা করছে? তারা গভর্মেন্টকে বোঝাতে পারছে না যে এতে গভর্মেন্টের আয় কমছে?

মুক্তিপদ বললে—মা, তুমি ঠিক বুঝছো না। তুমি সে-কালে যা দেখেছ এ-কালে তা নেই মা। চেম্বার অব কমার্স অনেক বলে বলেও কিছু করতে পারছে না—

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—কিছু যদি না করতে পারবি তাহলে কারবার বন্ধ করে দিলেই হয়।

মুক্তিপদ বললে—তুমি এমন কথা কী করে বলতে পারলে? কারবার বন্ধ করলে কী হবে কল্পনা করতে পারো?

ঠাক্‌মা-মণি বললেন—তাহলে গভর্মেন্টকে বুঝিয়ে বল্ যে তাদের আয় কমে যাচ্ছে—

মুক্তিপদ বললে—তুমি গভর্মেন্টের মানে জানো?

—তুই বল্ না গভর্মেন্টের মানে কী?

মুক্তিপদ বললে—গভর্মেন্ট মানে লেবার-লীডার—

—লেবার-লীডার? তার মানে?

—হ্যাঁ, আজকাল গভর্মেন্ট মানেই লেবার-লীডার—

তারপর একটু থেমেই আবার বললে—সেইজন্যেই তো তোমাকে বলেছিলুম সেই মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দিতে। তার বড় ভাই একজন লেবার-লীডার। মিনিস্ট্রির ওপর খুব ইনফ্লুয়েন্স। তার কথাতেই এখানকার মিনিস্ট্রি ওঠে বসে। তার ওপর ওরা মিড্‌ল্ ইস্টে পাঁচশো কোটি টাকার কাজের কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছে। ওখানে সৌম্যর বিয়ে দিলে এক ঢিলে দু' পাখী মারা যেতো। তা তখন তো তুমি আমার কথায় রেগে গেলে। বললে তুমি কোন্ এক বাপ-মরা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছ, আর আমাদের রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে তাদের পুষছো

ঠাক্‌মা-মণির দিক থেকে এ কথার কোনও জবাব এল না।

মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলো—তা তাদের তুমি পোষো, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তুমি যা ভালো বুঝেছ তাই করেছ, তাতে আমি কী বলবো? কিন্তু আমাদের এত বড় কোম্পানীর স্বার্থের দিকেও তো তোমাকে দেখতে হবে। এখানকার হাজার-হাজার স্টাফের ভবিষ্যৎ কী হবে, তাও তো ভাবতে হবে—

এবারও ঠাক্‌মা-মণির তরফ থেকে কোনও জবাব নেই। মুক্তিপদ আবার বলতে লাগলো—আর এ মেয়ে দেখতেও খুব সুন্দরী, তার ওপর আবার এম এ পাশ। আর যে-মেয়েকে তুমি রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে পুষছো তাকে দেখতে কেমন জানি না, কিন্তু লেখাপড়াও তো কিছু জানে না, তার লেখাপড়ার জন্য তুমি তার পেছনে তো মাসে মাসে হাজার-হাজার টাকা খরচ করছো তাতে আমাদের কোম্পানীর কী ফায়দা হচ্ছে?

ঠাক্‌মা-মণি একথারও কোনও উত্তর দিলেন না।

মুক্তিপদ বললে—কী মা, তুমি কোনও কথা বলছো না যে? কথা বলছো না কেন? আমাদের চ্যাটার্জির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যর বিয়ে দেবে, না তোমার সেই পোষা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে? কথা বলো? আমারা কথার জবাব দাও—

তাতেও মা'র কোনও জবাব না পেয়ে মুক্তিপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—মা, ও মা, কথার জবাব দাও—মা, ও মা, মা...

তবু মা'র দিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

মুক্তিপদ আবার মা'কে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একটা টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতেই সেটা তুলে ধরলে মুক্তিপদ। সেটাতে তখন ওয়ার্কস্‌ ম্যানেজার কান্তি চ্যাটার্জি কথা বলছে—

মুক্তিপদ বললে—কী, বলুন?

কান্তি চ্যাটার্জি বললে—স্যার, সিচুয়েশন আমার কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে, ফায়ার ব্রিগেড্‌ আগেই এসেছিল, এবার পুলিশ এসে লাঠি চার্জ করতে আরম্ভ করেছে—

মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—বেণুগোপালের বাড়ি সার্চ করে কী পেলে পুলিশ?

চ্যাটার্জি বললে—কিছ্ছু পায়নি। কিছ্ছু পায়নি বলে সমস্ত লেবার ক্ষেপে গেছে। আর খবর পেয়ে এসে পড়েছে ওদের লীডার—

—কোন্‌ লীডার?

কান্তি চ্যাটার্জি বললে—বরদা ঘোষাল—

মুক্তিপদ বললে—ঠিক আছে, এখন ছাড়ছি—

বলে সে-রিসিভারটা রেখে দিয়ে আগের টেলিফোনের রিসিভারটা কানে দিয়ে ডাকতে লাগলো—মা, শুনছো? শুনছো মা? ও...মা, ...মা, ও...মা...

মা'র দিক থেকে তখনও কোনও জবাব এল না—
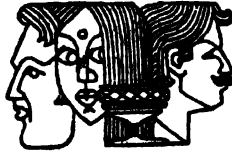
সেসব দিনের কথাও সন্দীপের মনে আছে! দুর্যোগ যখন সত্যি-সত্যিই আসে তার অনেক আগে থেকেই কানে আসে তার আগমনী-বার্তা। রাজনৈতিক-জীবনে যেমন ঘটে, ব্যক্তির জীবনেও ঘটে ঠিক তেমনই। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিদ্রোহ হঠাৎ একদিনে ঘটেনি। তার আগে ১৭৬৪ সালে গ্রেট ব্রিটেনে কাপড়-বোনার কল আবিষ্কার হয়ে গেছে। ১৭৭২ সালের বাইশে জুন তারিখে গ্রেট ব্রিটেন-এ ক্রীতদাসপ্রথা বেআইনী বলে মামলার রায় বেরিয়ে গেছে। ১৭৭৫ সালের ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ড, সবাই আমেরিকার সঙ্গে একজোট হয়ে গ্রেট ব্রিটেনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। এ সবই হচ্ছে ঝরা পাতা। কালবৈশাখীর বৃষ্টি প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কর হয়ে নামবার আগে ঝড়ের দাপটে বাতাসে , উড়ে যাওয়া ঝরা-পাতার মতই এই সব ঘটনা। এবার মুখার্জি বাবুদের 'স্যাক্‌সবী মুখার্জি কোম্পানী'র ফ্যাক্টরিতে এই যে মেসিন পোড়ানো, এই যে পুলিশের লাঠি চার্জ, এই যে লেবার-ট্রাবল্‌, এ সমস্তই আসন্ন সেই কালবৈশাখীর আগে হাওয়ার দাপটে ঝরা-পাতা ওড়বার মত অকিঞ্চিৎকর দুর্ঘটনা।

প্রথম যখন খবরটা সুশীল সরকার তাকে দিয়েছিল তখন এ-ঘটনার গুরুত্বটুকু সন্দীপ বুঝতে পারেনি। কিন্তু দু'দিন পরেই মল্লিককাকার মুখের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠেছিল। প্রথমে মল্লিক-কাকা কিছুই বলতে চান নি। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর তখন সব বললেন।

মল্লিককাকা বলেছিলেন—কী আর হবে, যা করা হলে ফ্যাক্টরিটা বাঁচে তাই-ই করা হবে—

—ফ্যাক্টরি কী করে বাঁচবে?

মল্লিককাকা বলেছিলেন—লেবার-ট্রাবল বন্ধ হলেই ফ্যাক্টরি বাঁচবে। চ্যাটার্জি ফ্যামিলির মেয়ের সঙ্গে সৌম্যবাবুর বিয়ে দিলে আর কোনও লেবার ট্রাবল থাকবে না। কারণ পাত্রীর বড় ভাই-ই তো লেবার-লীডার। লেবার লীডার হাতে থাকলে আর কাকে ভয় করবে মেজবাবু? লেবার-লীডার মানেই তো গভর্মেন্ট—

সন্দীপের যেন কান্না পেয়ে গিয়েছিল মল্লিককাকার কথা শুনে।

বলেছিল—তা হলে ওদিকে বিশাখাদের কী হবে?

বেশি কথা বলতে মল্লিককাকার তখন ভালো লাগছিল না। বলেছিলেন- তাদের আবার কী হবে, তারা তো বরাবর গরীবই ছিল, আবার গরীব হবে। তারা আবার খিদিরপুরের সেই সাত নম্বর মনসাতলা লেনের বাড়িতে ফিরে যাবে—

এ-কথা শোনার পর সন্দীপের আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে?

সন্দীপ কিন্তু তবু সাহস হারায়নি। জিজ্ঞেস করেছিল—ঠাক্‌মা-মণি কি এই নতুন পাত্রীকে দেখেছেন? সৌম্যবাবুর সঙ্গে এ-পাত্রীর বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন?

মল্লিককাকা বলেছিলেন—ও-সব বড়লোকদের ব্যাপার নিয়ে তোমার এত দুর্ভাবনা কীসের বলো তো? তুমি মাইনে পাচ্ছো, ল'কলেজে পড়ছো, তুমি এখন সেই সব নিয়ে ভাবো, এ-সব ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো কেন মিছিমিছি? তোমার চাকরি তো আর তা বলে চলে যাচ্ছে না—

—কিন্তু বিশাখার সঙ্গে যদি সৌম্যবাবুর বিয়ে না হয় তাহলে আমারও তো কোনও কাজ থাকবে না। আমি তখন কী কাজ করবো? কাজ না থাকলে আমারও তো চাকরি চলে যাবে—

মল্লিককাকা বলেছিলেন—সে-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার চাকরি না গেলেই তো হলো? আমি কথা দিচ্ছি তোমার চাকরি যাবে না—এ বাড়িতে এত লোক খায়, এত লোক থাকে, তাতে তোমার মত একটা পনেরো টাকা মাইনের লোক থাকলে খেলে কারোর কিছুই যাবে না—

মনে আছে কথাটা শুনেও সেদিন সন্দীপের দুশ্চিন্তা কাটেনি। সে কি সেদিন শুধু তার নিজের চাকরি চলে যাওয়ার ভয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল, আর কিছু নয়? আর কারো কথা কি সে ভাবেনি? আর কারো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় কি সে কাতর হয়নি? আর কারো ভালো-মন্দের দুশ্চিন্তা কি তাকে নিদ্রাহীন করেনি?

না, আসলে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড বর্ষণের আগের মুহূর্তের কিছু সতর্কবাণী ছাড়া এ আর কিছু নয়। এ সেই ঝরা-পাতা। কালবৈশাখীর বৃষ্টি আসবার আগে এই উড়ে যাওয়া ঝরাপাতাই হয়তো তার কানে সাবধান-বাণী শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সাবধান সন্দীপ, ঝড় আসছে খুব সাবধান

কিন্তু কী জন্যে সাবধান হবে সে? কত সাবধান হবে? কেন সে সাবধান হবে?

প্রথম পর্ব সমাপ্ত